

নীলরতন সেন

আধুনিক
বাংলা
ছন্দ

শ্রীযুক্ত নীলরতন সেন-রচিত ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় একখানি সর্বগ্রাহী বা বিশ্বজ্ঞর পুস্তক বলা যাইতে পারে। ইহাতে আধুনিক বাংলা ছন্দের যত বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি দেখা যায় সমস্ত কিছুই আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট ছন্দের স্বরূপ ও জাতি এবং তাহার লক্ষণ ও গুণ,— এই সকল বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার যে সমস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন সেগুলি সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে এবং গ্রন্থকারের বক্তব্যের পূর্ণ সমাধানে বিশেষ উপযোগী ও মূল্যবান। আশা করি এই বই, কেবল অনুসন্ধিৎসু এবং শিক্ষিতকাম ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে নহে, পরন্তু বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী সকল সাধারণ পাঠকদের নিকটও উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।... বইখানি বাংলা সাহিত্যে ছন্দ আলোচনার ইতিহাসে একটি লক্ষণীয় ‘মাইলস্টোন’ বা মার্গচিহ্ন-স্বরূপ কাজ করিবে।

‘সূর্যমা’

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৬, হিন্দুস্থান পার্ক। কলিকাতা

১৫-৭-৬৩

রবীন্দ্র ভবন

শান্তিনিকেতন।।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬২।।

‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ বইখানি রচনা করে তুমি একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন করেছ। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সূহৃৎ সমাবেশ দুর্লভ। এই দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছে তোমার এই বইটিতে। ফলে তোমার এই বইটি যে বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস একটি স্নায়ী আসন লাভের অধিকারী বলে গণ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। এটি শুধু যে আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রথম ইতিহাস তা নয়, একটি সর্বাপেক্ষ সম্পন্ন ইতিহাস। এ হিসাবেও বইটি স্মরণীয় থাকবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাম্প্রতিক কালে যে সকল বই প্রকাশিত হইয়াছে অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন সেন-লিখিত ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ বইখানি তাহার মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। প্রথমাধি বইখানির মধ্যে অনুসৃত পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।... তথ্যনিষ্ঠার সহিত বিশ্লেষণ-নিপুণতা গ্রন্থখানিকে সর্বত্রই উচ্চমান দান করিয়াছে। উনবিংশ শতকের মধ্যকাল হইতে একেবারে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা ছন্দের বিকাশের এমন ধারাবাহিক আলোচনা গ্রন্থখানিকে আমাদের নিকটে অত্যন্ত মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।...

৪১/৩৫-বি চারু এভিনিউ,
কলিকাতা-৩৩

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

৫-৫-৬৩

আধুনিক বাংলা ছন্দ
(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে)

আধুনিক বাংলা ছন্দ

(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে)

নীলরতন সেন



দে'জ পাবলিশিং

কলকাতা ৭৩

www.amarboi.com

ADHUNIK BANGLA CHANDA
History of Modern Bengali Prosody (Part First & Second combined)
by **NILRATAN SEN**
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 350.00

ISBN978-81-295-1958-0

প্রথম দে'জ সংস্করণ : ভাদ্র ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩

গ্রন্থস্বত্ব : দীপালি সেন

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

৩৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার। লেজার ইম্প্রেশন্স

২ গগেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে। বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

www.amarboi.com

বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিকৃৎ
প্রবীণ ছান্দসিক
আমার পূজনীয় আচার্য
প্রবোধচন্দ্র সেনের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলো, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।
(রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, ছন্দের অর্থ)

The Mantra, poetic expression of the deepest spiritual reality, is only possible when three highest intensities of poetic speech meet and become indissolubly one, a highest intensity of interwoven verbal form and thought-substance, of style, and a highest intensity of the soul's visions of truth.

[Sri Aurobindo, The Future Poetry, Rhythm and Movement]

লেখকের ছন্দচর্চা বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ

Early Eastern NIA Versification, I. I. A. S., Simla, 1973.

চর্যাঙ্গীতির ছন্দ-পরিচয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

বাংলা ছন্দ-বিবর্তনের ধারা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৩।

বাংলা ছন্দ-পরিচয়, পুথিপত্র, কলিকাতা, ১৯৮৪।

প্রসঙ্গ বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৯।

নিবেদন

‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ গ্রন্থটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৭৯-৮০) পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখে, দে’জ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে (১৯৬২) খ্রী: ১৮৫৮ থেকে ১৯৫৮ — এই একশ’ বছরের বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে এই কালসীমা খ্রী ১৮৩১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। ইচ্ছা ছিল, বর্তমান সংস্করণে দুই বাংলার সাম্প্রতিক কবিদের (১৯৫০-১৯৯০) সম্পর্কে আরও একটু বিশদ করে দুটি প্রবন্ধ লিখে, যোগ করব। কিন্তু লিখতে বসে মনে হল, এ-কালের ছন্দমনস্ক বিশিষ্ট কবিদের প্রতি সুবিচার করতে হলে দুটির বেশি প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। সুতরাং এঁদের সম্পর্কে গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব রূপে আর একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্র-ছন্দ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনারও পরিকল্পনা রয়েছে। বস্তুতঃ, এ-দুটি গ্রন্থ রচিত হবার পরই আধুনিক বাংলা ছন্দের ইতিহাস রচনা-পর্ব সম্পূর্ণ হবে।

পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায়, এবারেও গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে ‘বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপ’ এবং ‘বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ’ সংক্ষেপে সূত্রাকারে আলোচনা করে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ (১৮৩১-১৮৫৮) থেকে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের যুগ (১৮৭৩-১৮৯০) আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রযুগ-আদিপর্ব (১৮৯০-১৯০০) থেকে সাম্প্রতিক যুগ (১৯৫৮-১৯৭৮) পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ের পর একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) বাংলা কাব্যছন্দের বিবর্তন ও ভাবী সম্ভাবনা আলোচিত হয়েছে।

এবারে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে, কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত আমার ছন্দশিক্ষার গুরু ছন্দাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের (১৮৯৭-১৯৮৬) অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছি। পূর্ববর্তী দুটি সংস্করণের সর্ববিধ পরিকল্পনায় তাঁর সম্মেহ উপদেশ লাভ করেছি। এবারে সেই দুর্লভ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল। এই সংস্করণেও তাঁরই প্রবর্তিত সর্বাধুনিক ছন্দ-পরিভাষা ব্যবহার করা গেল। যাঁরা এককালে তাঁরই দ্বারা প্রবর্তিত এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত, বাংলা ছন্দরীতির মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত — এই তিন নামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা ওই তিন নামের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, এবং দলবৃত্ত নাম তিনটি মনে রাখলেই এ-গ্রন্থ পাঠে অসুবিধা বোধ করবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি গ্রন্থটির বর্তমান দে’জ-সংস্করণ প্রকাশে শ্রীসুধাংশুশেখর দে আন্তরিক আগ্রহ না দেখালে, বইটির এত তাড়াতাড়ি পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হত না।

আগস্ট ৪, ১৯৯৫

বি - ১০/২৪৭,

কল্যাণী, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গ। ৭৪১২৩৫

নীলরতন সেন

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায় ছন্দের রীতি ও রূপ

১-৮

ছন্দবোধ ১, মাত্রা ১, দল ২, কলামাত্রা ও দলমাত্রা ২, যতিভাগ ২-৩, পংক্তি-
পদ-পর্ব-উপপর্ব-অতিপর্ব ২-৩, সরল কলাবৃত্ত ৪-৫, মিশ্র কলাবৃত্ত ৫, দলবৃত্ত
৫-৬, ছন্দোবন্ধ ৭, পংক্তি ৮, স্তবক ৮, পদ্য ৮, মিল ৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ (প্রাচীন যুগ)

৯-৩০

চর্যাগীতি ৯-১১, গীতগোবিন্দ ১১, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১২-১৩, বৈষ্ণব
পদাবলী ১৩-১৯, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১৯-২০, মঙ্গলকাব্য ২০-২১, চৈতন্য
জীবনী কাব্য ২১-২২, আলাওল ২২, কাশীরাম দাস ২২, ভারতচন্দ্র ২৩-২৫,
রামপ্রসাদ ২৬-২৭, কবিওয়ালা ২৭-২৮, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২৮, ছড়াগান ২৯

তৃতীয় অধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ

৩১-৫০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগসন্ধির কবি ৩২, শ্রাব্য গীতিকারের পাঠ্য কবিতায়
রূপান্তর ৩২, গুপ্তকবির উপর ভারতচন্দ্রের ও রামপ্রসাদের প্রভাব ৩৩,
ইংরেজি ও হিন্দী শব্দ ব্যবহার ৩৪, স্তবক বৈচিত্র্য ৩৫-৩৬, চলিত গ্রাম্যশব্দ
ব্যবহার ৩৭, কলাবৃত্তের আভাস ৩৮-৩৯, ছড়াগানের ছন্দ ৪০, একপদী
ছন্দ ৪১, উচ্চারণানুগ শব্দ ব্যবহার ৪১-৪২, অনুপ্রাসধর্মী গদ্য ৪২,
রামরাম বসু ৪৩, রামমোহন রায় ৪৩, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ৪৪,
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৪৪, রাধামোহন সেন ৪৪-৪৫, রামনারায়ণ তর্করত্ন
৪৫, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৪৬, দাশরথি
রায় - কৃষ্ণকমল গোস্বামী - কমলাকান্ত ৪৭-৪৯

চতুর্থ অধ্যায় রঙ্গলাল-মধুসূদনের যুগ

৫১-১১৬

রঙ্গলাল ভাবমুক্তির সূচনা ৫১, গুপ্তকবির সঙ্গে পার্থক্য ৫২-৫৩, আঠারো
মাত্রার মহাপয়ার রচনা ৫৬-৫৭, মধুসূদন দত্ত রঙ্গলালের প্রভাব ৬২,
প্রবহমান পয়ার ৬৪-৬৭, মিলটন ও সেক্সপীয়রের প্রভাব ৬৭-৭১,
বিদ্যাসাগরের প্রভাব ৭১, হেমচন্দ্রের মন্তব্য ৭৭-৭৮, রবীন্দ্র মন্তব্য ৭৮,
রাজেন্দ্রলালের উক্তি বিচার ৮০-৮১, প্রবোধচন্দ্রের মন্তব্য ৮৩-৮৪, পংক্তি-
অনুচ্ছেদ ৮৮-৮৯, নাট্য সংলাপের প্রবহমান ছন্দ ৯১, সনেট ৯৩-১০২,

স্বকবন্ধ রচনা ১০২-০৮, মিশ্ররীতির ছন্দ ১০৯, মুক্তকাভাস ১১০,
অটোভারিমা স্বক ১১২, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১১৩-১৪

পঞ্চম অধ্যায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগ

১১৭-১৮৭

মধুসূদন-পরবর্তী যুগে প্রতিভার অভাব ১১৭, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত
ছন্দ ১১৮-২৩, সমিল প্রবহমান মহাপয়ার ১২৪, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্যসংলাপী পয়ার ও মুক্তক ১২৪-২৫, সংস্কৃতির আর্দশে চতুষ্ক ১২৭-২৮,
প্রবহমান পয়ার ১২৮-২৯, লঘুগুরু ছন্দ ১৩০-৩৩, দলবৃত্ত নাট্যসংলাপ
১৩৪-৩৫, নবীনচন্দ্র সেন : স্বকবন্ধ ১৩৭-৪০, প্রবহমান নাট্য-সংলাপী
ছন্দ ১৪১-৪৪, মিল ১৪৪-৪৫, বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৪৬-৫০,
রাজকৃষ্ণ রায় ১৫০-৫৮, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৫৮-৬৪, রবীন্দ্রনাথ (মানসী-পূর্ব
পর্ব) ১৬৫-১৭৩, বলদেব পালিত ১৭৩-৭৫, মনোমোহন বসু ১৭৫-৭৬,
হরিনাথ মজুমদার ১৭৬-৭৭, দীনবন্ধু মিত্র ১৭৭, বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৮, সুরেন্দ্র
নাথ মজুমদার ১৭৮-৭৯, গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৭৯, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৭৯-
৮০, শ্রীর মশাররফ হোসেন ১৮০, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৮১, দীনেশচরণ বসু
১৮১, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮২, আনন্দচন্দ্র মিত্র ১৮২, অধরলাল সেন
১৮৩, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩, অপ্রধান কবিবৃন্দ ১৮৩।

ব্যবহৃত ছন্দচিহ্ন :

শব্দের উপরে মুক্তদল, সংস্কৃত লঘুবর্ণ ◡

রুদ্ধদল, সংস্কৃত গুরুবর্ণ —

মুক্তদল এককলা, ◡ মুক্তদল দ্বিকলা ॥

রুদ্ধদল এককলা, — রুদ্ধদল দ্বিকলা ॥

ইংরেজি রীতির প্রস্মর , অপ্রস্মর ◡

শব্দের পাশে উপযতি

পর্বযতি বা লঘুযতি ।

পদযতি বা অর্ধযতি ॥

পংক্তিযতি বা পূর্ণযতি I

অতিপর্বের যতি)

বিষয় সূচী

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ আদি পর্ব (১৮৯০-১৯০০) ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ : মধ্যপর্ব (১৯০১-১৯১৮) ৩৫

তৃতীয় পর্ব

রবীন্দ্র যুগ : অন্ত্যপর্ব (১৯১৮-১৯৪১) ১১০

চতুর্থ পর্ব

রবীন্দ্রোত্তর যুগ ((১৯৪১-১৯৫৮) ১৭০

পঞ্চম পর্ব

সাম্প্রতিক যুগ : (১৯৫৮-১৯৭৮) ১৮৭

ষষ্ঠ পর্ব

বিবর্তন ও ভাবী-সম্ভাবনা ১৯৫

পরিশিষ্ট-ক

ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২০২

পরিশিষ্ট-খ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্যধারায় ছন্দ-সচেতনতা ২০৬

নির্দেশিকা

www.amarboi.com

২৪২

আধুনিক বাংলা ছন্দ প্রথম পর্ব

ছন্দের রীতি ও রূপ

ছন্দের রীতি

যতি (Pause) এবং গতি (motion) — এ-দুয়ের সামঞ্জস্য থেকেই ছন্দের সৃষ্টি। কোনও কিছুর আবর্তন এবং সেই আবর্তন থেকে জাগ্রত প্রত্যাশাবোধই ছন্দবোধ উদ্ভূত করে।^১ শ্রুতিগ্রাহ্য ভাষার ছন্দ ধ্বনির সূশৃঙ্খল বুনুনির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তার আবেদন পঠনের মাধ্যমে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে। সুনিরূপিত অঙ্কের হিসাবে ছন্দের মাত্রা ও

যতিবিভাগ যখন বিশ্লেষণ করা যায় তাকে পদ্য^২ বলা চলে
ছন্দবোধ

— আর এমন স্পষ্ট হিসাবের নিয়মে যখন বাঁধা চলে না তখন তাকে গদ্য বলা যেতে পারে। গদ্যভাষাকে সুনির্দিষ্ট ছন্দের বাঁধনে ধরা না গেলেও তার মধ্যে ধ্বনিসৌন্দর্য এবং বাকপর্বক পুনরাবর্তন ও প্রত্যাশাবোধ প্রকাশ পেতে পারে। পদ্যছন্দের বিশ্লেষণে মাত্রা নির্ধারণ প্রয়োজন। মাত্রার অর্থ হল, পরিমাপক

মাত্রা (unit of measure), — যা দিয়ে মাপা হয় তার একক। মাত্রার আশ্রয় হল, দল (syllable)।^৩

এক প্রযুক্তোচ্চারিত শব্দাংশকে দল (syllable) বলে। দল দুই প্রকার, মুক্তদল (open syllable) এবং রুদ্ধদল (closed syllable)। মুক্তদল টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করা যেতে পারে, রুদ্ধদল এমন টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করা চলে না। যেমন, ছন্দ শব্দটির দল-বিভাগ ছন দ। এখানে ‘ছন’ রুদ্ধদল, ‘দ’ মুক্তদল। রুদ্ধদলে একটি মূল ধ্বনি এবং

১। Rhythm and its specialised form, metre, depend upon repetition and expectancy.

[I. A. Richards Principles of Literary Criticism ‘Rhythm and Metre’, P. 134 (14th impression)]

২। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে চতুষ্পদাবদ্ধ শ্লোক এই অর্থে পদ্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (পদ্য চতুষ্পদী — ছন্দোমঞ্জরী ১/৪)। বাংলা ছন্দে সর্বপ্রকার পদবদ্ধ শ্লোককে পদ্য বলা হয়।

৩। ইংরেজি ‘সিলেবল’ শব্দের পরিবর্তে ‘অক্ষর’ শব্দটির ব্যবহার ছন্দশাস্ত্রে প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলায় ‘অক্ষর’ শব্দটি ইংরেজি ‘লেটার’ শব্দটিরও প্রতিশব্দ। রামমোহন রায় সে জনোই তাঁর ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণে’ সিলেবল-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘ধ্বন্যঘাত’ ব্যবহার করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘ছন্দ সরস্বতী’তে ‘সিলেবিক’ ছন্দকে ‘পাপড়ি গোনা ছন্দ’ বলেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর সর্বাধুনিক ছন্দ-পরিভাষাতে সিলেবল-এর প্রতিশব্দ দিয়েছেন ‘দল’। অলোচ্য গ্রন্থে তাঁর অন্যান্য পরিভাষার সঙ্গে ‘দল’ শব্দটিও গ্রহণ করা হল।

দল

সেই সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিতান্ত ধ্বনি থাকে। ‘ছন’ রুদ্রদলে ‘ছ’ মূল ধ্বনি; ‘ন’ আশ্রিতান্ত ধ্বনি। মূল বা আশ্রিতান্ত যে কোন ধ্বনি, অথবা উভয় ধ্বনিই স্বরধ্বনি হতে কিছু বাধা নেই। যেমন ‘বউ’ — এখানে ‘উ’ স্বরধ্বনি আশ্রিতান্ত, আবার ‘উই’ — এখানে মূল এবং আশ্রিতান্ত উভয় ধ্বনিই স্বরধ্বনি।

ছন্দবোধের প্রত্যাশিত পুনরাবর্তনের জন্য উচ্চারিত দলগুলির পরিমাপসমতা প্রয়োজন। কোনও একটি পরিমাপের এককের (unit) সাহায্যে এই সমতাবোধের হিসাব রাখতে হয়। ছন্দবিচারে দুই জাতীয় কলামাত্রা ও দলমাত্রা মাত্রা লক্ষ করা যায়, কলামাত্রা (time-unit) এবং দলমাত্রা

(syllabic unit)।

একটি লঘু স্বরধ্বনি (বা মুক্তদল) স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করতে যেটুকু সময় লাগে তাকে এক ‘কলা’ (mora) ধরা হয়। উচ্চারণ-সময়ের একক বোঝাতে ‘কলা’ কথাটির ব্যবহার সংস্কৃত ছন্দোশাস্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়।^৪ সূত্রাং ‘কলা’-এককের দ্বারা যেখানে মাত্রা গণনা করা হয় তাকে ‘কলাবৃত্ত’ ছন্দ বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যেখানে ‘দল’-একক দিয়ে ছন্দের মাত্রা হিসাব করা হয় তাকে ‘দলবৃত্ত’ বলা যেতে পারে।

কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দ

‘দলের সঙ্গে কলার সম্পর্ক’ বিচারে দেখা যায়, দল কখনও এককলা সময়ে কখনও দুইকলা সময়ে উচ্চারিত হয়। বাংলা ছন্দে মুক্তদলের এককলা উচ্চারণ স্বাভাবিক মাপ। ছন্দের প্রকৃতিভেদে রুদ্রদলের এককলা এবং দুইকলা, — দল ও কলার সম্পর্ক দু’রকম উচ্চারণ দেখতে পাওয়া যায়। দল এবং কলার উচ্চারণ-সম্পর্কের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

উচ্চারণ-বিরতির নাম যতি।^৫ যতি ভাবের (sense) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ভাবযতি এবং ছন্দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ছন্দযতি বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পদ্য বা গদ্য পঠনের ক্ষেত্রে শ্বাসযতির পৃথক অস্তিত্ব সিকারের প্রয়োজন নেই। ভাবযতি বা ছন্দযতির মধ্যেই শ্বাসযতি সুগুণ থাকে।

৪। ছন্দোমঞ্জরীর একটি শ্লোকে গঙ্গাদাস লিখেছেন, —

জ্ঞেয়াঃ সর্বান্তমধ্যাদিগুরবোইত্র চতুষ্কলাঃ।

গণাশ্চতুর্লঘুপেভাঃ পঞ্চার্যাদিশু সংস্থিতাঃ ॥ ১।১০

সর্বগুরু, অন্তগুরু, মধ্যগুরু, আদিগুরু ও চতুর্লঘু এই পঞ্চগুণের দ্বারা আর্যাদি ছন্দলক্ষণ নির্দিষ্ট হয় জানবে।

৫। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে পিজলাচার্য ‘যতি’ কথাটির উল্লেখ করেছেন (যতিবিচ্ছেদ:-৬।১)।

ছন্দোমঞ্জরীতে গঙ্গাশাস্ত্রী বলেছেন, —

যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরূচ্যতে।

স। বিচ্ছেদবিরামাদ্যোঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া ॥ ১।১৮ ॥

যেখানে জিহ্বা স্বেচ্ছায় বিশ্রামলাভ করে কবিগণ তাকে যতি বলেন। এরই নামান্তর বিচ্ছেদ বা বিরাম। উচ্চারণকারী স্বেচ্ছায় পদের উচ্চারণ এই বিরাম বা বিচ্ছেদ আনেন।

পদ্যছন্দে বিরতির গুরুত্ব হিসাবে যতিকে পূর্ণ, অর্ধ, লঘু এবং উপ — এই চার
 যতিবিভাগ পংক্তি, ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি এবং উপযতি
 পদ, পর্ব, উপপর্ব দ্বারা বিভক্ত পদ্যাংশকে যথাক্রমে পংক্তি (metrical line), পদ
 (caesuric section), পর্ব (foot) এবং উপপর্ব (sub-foot) বলা
 হয়। যেমন —

ওরে : ক্লিষ্ট, । ওরে : ক্লান্ত, ॥ কোথা : তোরা । বাজে : ব্যথা, ॥

কোথা : তোরে । রাখি । I

(রবীন্দ্রনাথ চিত্রা সাত্ত্বনা)

(চিহ্নার্থ I পূর্ণযতি, ॥ অর্ধযতি, । লঘুযতি, . উপযতি)

এখানে তিনটি পদসমষ্টি (ত্রিপদী) একটি পংক্তি আছে। ৮ ॥ ৮ ॥ ৬ I
 মাত্রায় বিন্যস্ত পদ তিনটির মধ্যে চার-চার মাত্রার পর্ব রয়েছে। প্রতি পূর্ণ পর্বে
 আবার দুই মাত্রার উপপর্ব আছে। পদ্যে সর্বত্র অবশ্য সব রকম যতিভাগ সুস্পষ্ট থাকে
 না।

লিখিত লাইনকে ছত্র বলা হয়। এখানে পংক্তিটি দুই ছত্রে লেখা রয়েছে। ত্রিপদী,
 চৌপদী বা আরও বেশী সংখ্যক পদসমষ্টি পংক্তি অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক ছত্রে সাজিয়ে
 লেখা হয়।

ছন্দে বিশেষ দোলা বা স্পন্দ সৃষ্টির জন্য পংক্তি, পদ এবং পর্বের প্রথমে
 অতিপর্ব অতিপংক্তিক শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে। তাকে সংক্ষেপে অতিপর্ব
 (anacrusis) বলা হয়। যেমন, —

যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
 পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
 যবে ফিরে আসে গোষ্ঠে গাভীদল
 সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,

(রবীন্দ্রনাথ, উৎসর্গ, মরণমিলন)

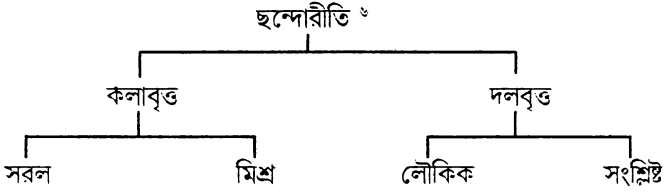
এখানে প্রত্যেক পদের প্রথমে অতিপর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রয়োজনে কবির পংক্তির এবং পদের শেষে অপূর্ণ পদ বা পর্ব ব্যবহার করেন।
 এখানে পদশেষে যথাক্রমে চার এবং তিন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্যে যতিবিভক্ত পংক্তি, পদ বা পর্বে মাত্রা-সমতা থাকে বা সম পর্যায়ে বিন্যস্ত
 হয়। — না ইলে ধ্বনির প্রত্যাশিত পুনরাবর্তন পরিস্ফুট হতে পারে না।

ছন্দোবন্ধে কোথাও পদযতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়, কোথাও পর্বযতির, কোথাও
 আবার উপপর্বযতির গুরুত্ব থাকে।

পদ্য রচনায় দল এবং কলার উচ্চারণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন
 ছন্দোবিন্যাস গড়ে উঠেছে। এই রীতিবিভাগ নিম্নরূপ, —



পদ্যছন্দের রীতি হল, উচ্চারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য। বাংলা ছন্দের মুখ্য দুটি রীতি বিভাগ হল কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত।

উচ্চারণের পার্থক্য বিচারে কলাবৃত্তকে সরল এবং মিশ্র দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

সরল কলাবৃত্ত সরল কলাবৃত্তে মুক্তদল এককলা এবং রুদ্ধদল দুই কলা হিসাবে উচ্চারিত হয়। যেমন —

বরষার | নির্ঝরে | অঙ্কিত | কায়, I

দুই তীরে | গিরিমালা | কতদূর | যায়। I

(রবীন্দ্রনাথ, মানসী, নিষ্ফল উপহার)

সরল কলাবৃত্তের আধুনিক উচ্চারণরীতিতে আরও বিশ্লিষ্ট বা সংশ্লিষ্ট ব্যবহার অসম্ভাবিক। কোন কোন কবি সংস্কৃত-প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলা-ব্রজবুলি পদ্যের আদর্শে মুক্তদলে, কোথাও কোথাও বিশ্লিষ্ট দ্বিকলা উচ্চারণের পরীক্ষা করেছেন। সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির সাফল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

সরল কলাবৃত্তে লঘুযতির প্রাধান্য। সাধারণত চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রায় লঘু পর্বযতি পড়ে। পাশাপাশি আট, দশ, বারো বা চোদ্দ মাত্রার দীর্ঘতর পদযতিও থাকতে

পারে। তবে প্রাধান্য থাকে লঘু পর্বযতির। প্রতিটি পদ্যে কবির সাধারণত পূর্ণ পর্বগুলি একই মাপে ব্যবহার করেন। পূর্বের উদ্ধৃতিটি

চতুষ্কল পর্বের উদাহরণ। এখানে পঞ্চকল, ষটকল এবং সপ্তকল পর্বিক পদ্যের একটি করে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, —

পঞ্চকল পর্ব ভদ্র মোরা, | শাস্ত্র বড়ো, | পোষ মানা এ | প্রাণ I
বোতাম আটা | জামার নীচে | শান্তিতে শয়ান। I

(রবীন্দ্রনাথ, মানসী, দূরন্ত আশা)

৬। সরল কলাবৃত্ত, মিশ্র-কলাবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত বাংলা ছন্দে যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর বৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত বাংলা পদ্যে প্রথম ব্যবহার করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতায় আংশিক সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ-ছন্দের ব্যবহার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত পরবর্তী কবিরা তেমনভাবে অনুশীলন করেননি। বোধহয় সে কারণেই ছান্দসিকগণ একে পৃথক ছন্দোবীতির মর্যাদা দিতে কৃণা বোধ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প’ (গল্পভারতী, বৈশাখ, ১৩৬৪) প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তকে পৃথক ছন্দোবীতি হিসাবে গণ্য করেছেন। পরে অবশ্য, ‘নূতন ছন্দ-পরিক্রমা’ গ্রন্থে (১৩৯২) এমন পৃথক বিভাগ অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনুল্লিখিত রেখেছেন।

ষট্‌কল পর্ব পবিত্র তুমি, | নির্মল তুমি, | তুমি দেবী, তুমি | সতী — I
কুৎসিত দীন | অধম পামর | পঙ্কিল আমি | অতি। I
(রবীন্দ্রনাথ, মানসী, সূরদাসের প্রার্থনা)

সপ্তকল পর্ব মর্ত জীবনের | শুধিব যত ধার। I
অমর জীবনের | লভিব অধিকার। I
(রবীন্দ্রনাথ, স্মৃতিঙ্গ ১৮৬)

এ-গ্রন্থে সরল কলাবৃত্তকে সংক্ষেপে ‘কলাবৃত্ত’ নামে উল্লেখ করা গেল।

মিশ্র কলাবৃত্তে যুক্তদল এককলা, রুদ্ধদল শব্দপ্রাপ্তে দুই কলা, অন্যত্র এককলা হিসাবে উচ্চারিত হয়। এ-ছন্দে দীর্ঘ আট, ছয় বা দশ মাত্রার পদযতির প্রাধান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঘু পর্বযতি লুপ্ত থাকে।

যেমন, —

পরম আত্মীয় বলে || যারে আমি মানি ; I
তারে আমি কতদিন || কতটুকু জানি। I

(রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, ক্ষণমিলন)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-সহ বহু কবিই যুক্তবর্ণে লেখা অপ্রান্তিক (অর্থাৎ শব্দের প্রথমে বা মাঝে ব্যবহৃত) রুদ্ধদল এককলারূপে গণ্য করলেও অযুক্ত বর্ণে লেখা অনুরূপ রুদ্ধদল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইকলারূপে ধরেছেন। তার ফলে, উচ্চারণ কিছুটা বিল্লিষ্ট, শিথিল হয়ে পড়েছে।^১ মিশ্র কলাবৃত্ত মুখ্যত পদযতি প্রধান ছন্দ জোড় সংখ্যক আট, দশ এবং ছয় মাত্রায় সাধারণত পদ গঠিত হয়। বিজোড় মাত্রার পদ এ-ছন্দের প্রকৃতি-বিরোধী। পরবর্তী আলোচনায় মিশ্র কলাবৃত্তকে সংক্ষেপে ‘মিশ্রবৃত্ত’ নামে পরিচিত করা গেল।

দলবৃত্ত ছন্দে দল-একককে মাত্রারূপে গণ্য করা যায়। এ-ছন্দেরও দুটি রূপ। আদি

দলবৃত্ত দুইরূপ ও অকৃত্রিম দলবৃত্ত লৌকিক ছড়া-গান থেকে এসেছে। — উচ্চারণ

বিল্লিষ্ট। দ্বিতীয় ধারাটি আধুনিক যুগে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য কাব্য-প্রভাবে রচিত হয়েছে, — উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট।

লৌকিক ছড়াগানে ব্যবহৃত দলবৃত্ত রীতিতে সাধারণত পর্বের প্রথমে বল-প্রসঙ্গ (stress accent) থাকে, — প্রতি পর্বে বিশেষ দোলাস্পন্দ প্রকাশ পায়। আধুনিক কবিরা

৭। প্রবোধচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর থেকে একাধিক আধুনিক কবি শব্দের মাঝে বিযুক্ত হরফের রুদ্ধদল এক কলামাত্রা হিসাবে দৃঢ় উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন, — এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শেষযুগের অনেক কবিতায় এই সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণ এনেছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে (১) ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ) ৪০-৫১ পৃষ্ঠাতে, (২) ‘ছন্দ’ গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ) ‘ছন্দের হস্ত হস্ত’ প্রবন্ধের ৭৪-৮২ পৃষ্ঠাতে, (৩) ‘পরিচয়’ পত্রিকার ১৩৪৮, ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেনের ‘বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা’ প্রবন্ধ

লৌকিক দলবৃত্ত অনেক সময়ে পর্বের প্রথমে আর বল-প্রস্রব দিচ্ছেন না। পূর্ণ পর্বে চার দলমাত্রা এর স্বাভাবিক মাপ। দোলাস্পন্দ সৃষ্টির জন্য অধিকাংশ পর্বে রুদ্ধদল ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণগত প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে এক বা একাধিক রুদ্ধ দলের স্পন্দন এ ছন্দের বিশেষ প্রকৃতিটি ফুটিয়ে তোলে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, —

যাঁরা অক্ষর গণনা ক’রে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবির বিদ্যায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, — সে সব জায়গায় ছন্দের রেশ কিছুটা কাজ করবার অবকাশ পায়।

(‘ছন্দের হসন্ত হলন্ত’ ছন্দ ২য় সং., পৃ. ৬৩)

লৌকিক দলবৃত্তে দল ও কলার সম্পর্কটি বিচার্য। প্রতি চতুর্দল পর্বে ছয়-কলার প্রসারণ-জনিত স্পন্দন এ-ছন্দের বিশিষ্ট উচ্চারণ-প্রকৃতিটি ফুটিয়ে তোলে। সে কারণে সাধারণত পর্বে তিন ধরনের দল-বিন্যাস লক্ষিত হয় (১) দুটি মুক্ত-দুটি রুদ্ধদল, (২) তিনটি মুক্ত-একটি রুদ্ধদল, (৩) চারটি মুক্তদল। কখনও কখনও তিন রুদ্ধদলের পর্বও রচিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এ-ছন্দে পূর্বোক্ত সব ধরনের পর্বেরই সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয়। না হলে, দলের কলা-প্রসারণ জনিত ‘ছন্দের রেশ’ পরিস্ফুটনের সুযোগ পায় না। লৌকিক দলবৃত্তে প্রতি পর্বে ছয় কলার বেশী প্রসারণের অবকাশ থাকে না বলেই চার রুদ্ধদল বা তিন রুদ্ধ-এক মুক্ত দলে পর্ব গড়া চলে না, তাহলে বিশিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে আট বা সাত কলামাত্রার উচ্চারণ এসে পড়ে এবং ছন্দের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়। গ্রন্থের পরবর্তী আলোচনায় আলোচ্য ছন্দকে সংক্ষেপে ‘দলবৃত্ত’ নামে অভিহিত করা হল। দৃষ্টান্ত, —

প ঞ্জা শৌ ধৈ । ব নে যা বে । এ মন ক থা । শা স্ত্রে ব লে । I

আমরা ব লি । বা ন প্র স্থ । যৌ ব নে তেই । ভালো চলে । I

(রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, শাস্ত্র)

(চিহ্নার্থ শব্দের উপর — রুদ্ধদল, — মুক্তদল, অন্যান্য চিহ্ন পূর্ববৎ।)

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতি আধুনিক যুগে, বাংলা পদ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেক দলের

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত সংশ্লিষ্ট দৃঢ়বন্ধ এক কলার উচ্চারণ এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য। লঘু পর্বযতির

পরিবর্তে দীর্ঘ পদযতিই এ ছন্দে প্রাধান্য লাভ করে। বাংলা পদ্যে এ ছন্দের সবচেয়ে দৃঢ়বন্ধ উচ্চারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য থেকেই একটি উদাহরণ তুলছি।—

এমন সুন্দর এমন মহান, ॥ এমন বিশ্বব্যাপী বিকাশ ॥ এ কি মহাভ্রম? I

এ ব্রহ্মাণ্ড খেলামাত্র? ॥ শিশুর ধূলির প্রাসাদ গড়া? ॥ শুধু পণ্ডশ্রম? I

এই যে মহাসৃষ্টি — একি ॥ শূন্যে উড্ডীন পরমাণুর ॥ উদভ্রান্ত সম্পাত ? I

এ আশ্চর্য বিশ্বনিয়ম ॥ এ আশ্চর্য বুদ্ধি বিকাশ — ॥ একি অকস্মাৎ ! I

(আলেখ্য সত্যযুগ)

এখানে কবি প্রতি পংক্তিতে ৮॥৮॥৫I দলমাত্রায় পদবিন্যাস করেছেন। কলামাত্রার হিসাবেও পংক্তিগুলি ৮॥৮॥৫I মাত্রক।

সংস্কৃত ছন্দ এবং অ-বাংলা দেশী-বিদেশী বিবিধ ছন্দ বাংলা পদ্যে ব্যবহারের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। অধিকাংশ কবিই এ-সব পরীক্ষায় বাংলা ছন্দের মূল উচ্চারণ-রীতি: যথাসম্ভব রক্ষা করতে চেয়েছেন। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কবিরা তার ব্যতিক্রমও করেছেন। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

গদ্য কবিতা রচনার প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতকেই সুরু হয়েছিল। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের পুনঃপ্রবর্তন করে ছন্দে ভাবমুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, গদ্য কবিতার পূর্বেই ছন্দে ভাবমুক্তির দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিল, ‘অমিত্রাক্ষর’ এবং মুক্তক ছন্দ রচনার মাধ্যমে। এ সব পরীক্ষায় ছন্দের রীতি ও রূপ — দুয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। — সে বিষয়েও যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

ছন্দের রীতি বা প্রকৃতি যেমন দলাশ্রিত ধ্বনি-উচ্চারণের মাত্রা নির্দেশক; তেমনি ছন্দের রূপ বা আকৃতি হল, যতিবিধৃত পর্ব, পদ, পংক্তি, স্তবক বা পূর্ণপদ্যের গঠনভঙ্গি নির্দেশক। ছন্দের রীতি-বিচারে যেমন ধ্বনির উচ্চারণরীতি প্রকাশ পায়; ছন্দের রূপ-বিচারে তেমনি যতিস্থাপন এবং মিলবিন্যাস-পদ্ধতি প্রকাশ পায়। তবে এ কথা স্বীকার্য, ছন্দের গঠনভঙ্গি বা রূপ অনেকাংশে উচ্চারণ-রীতিকে প্রভাবিত করে, অপর পক্ষে উচ্চারণ-রীতি অনেকাংশে ছন্দের গঠনভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করে। রীতি ও রূপ উভয়ের মিলনে ছন্দের পূর্ণাঙ্গতা ঘটে।

পর্বগঠনে লঘুযতি সুস্পষ্ট হয়। কলাবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে পর্বযতির প্রাধান্য দেখা যায়। কলাবৃত্ত রীতিতে সাধারণত চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। লৌকিক দলবৃত্ত হল, মুখ্যত চতুর্দলপর্বিক। মিশ্রবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত রীতিতে সাধারণত পদযতির প্রাধান্য দেখা যায়।

পদ কথাটি সংস্কৃত ‘পাদ’ শব্দের প্রতিক্রম। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে বলা হয়েছে, “মাতৃকস্যা (শ্লোকস্যা ইত্যর্থঃ) চতুর্ভাগ পাদ: ইত্যভিধীয়তে।” (ছন্দোমঞ্জরী ১।৪ শ্লোক)

ইংরেজি পদ্যে অনুরূপ যতিবিভাগের নাম caesuric section অথবা medial pause section ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র বাংলায় এর নাম দিয়েছেন ‘পদ’। সাধারণত আট, দশ বা ছয় মাত্রায় পদ গঠিত হয়। পূর্বেই বলেছি, মিশ্রবৃত্তে এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্তে যেমন পদযতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তেমনি কলাবৃত্তে এবং লৌকিক দলবৃত্তে পর্বযতির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে,

এই দুই পর্বপ্রধান ছন্দে পাশাপাশি যেমন পদযতিও থাকতে পারে, অনুরূপভাবে পদপ্রধান ছন্দরীতিতেও পর্বযতি থাকতে কোনও বাধা নেই।

পূর্ণযতিধৃত পদ্যাংশের নাম পংক্তি। পংক্তির মধ্যে একাধিক পর্ব বা পদ থাকতে পারে। সুপ্রচলিত পয়ার-মহাপয়ার (দ্বিপদী), ত্রিপদী, চৌপদী বন্ধে যথাক্রমে দুটি, তিনটি এবং চারটি পদবিভাগ থাকে। পংক্তির পদসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে পঞ্চপদী, ষটপদী ইত্যাদি ছন্দোবন্ধও কবিরা কখনো কখনো রচনা করে থাকেন। প্রবহমান পয়ারবন্ধে চতুর্দশমাত্রিক পয়ার-পংক্তির মাপে লিখিত ছত্র অতিক্রম করে ভাব প্রবাহিত হয়। সূত্রাং প্রবহমান পয়ারের লিখিত ছত্র সর্বাত্মক পূর্ণযতিসূচক পংক্তি নয়।

কয়েকটি পংক্তি সমন্বয়ে শব্দক (stanza) রচিত হয়। মিল ও পদ-পংক্তির ক্রমবিন্যাসের দ্বারা শব্দক গঠনে বহুবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে। প্রবহমান পয়ারে এমন সূনির্দিষ্ট কোনও মিল বা পদ-পংক্তি বিন্যাসের রূপাদর্শ (pattern) শব্দক তৈরী না হলেও ভাবের পূর্ণাঙ্গতা বিচারে অনুচ্ছেদ ভাগ করা হয়। তাকে শব্দক নাম না দিয়ে, পংক্তি-অনুচ্ছেদ (verse paragraph) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এক শব্দকের মধ্যে যেমন মিলবৈচিত্র্য থাকতে পারে, — অনেক সময় আবার মিলের বিনুনি (interlace rhyme) দ্বারা একাধিক শব্দকের মালা তৈরী হয়। যেমন তের্জারিমা (Terza Rima) বা পান্তম (pantoum) জাতীয় বিদেশী রূপাদর্শের ছন্দ। ছন্দোবন্ধের বিচারে শব্দক রচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শব্দকের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ পদ্যবন্ধেও এ-যুগে বৈচিত্র্য দেখা যায়। দুই, চার, ছয়, আট, দশ বা ততোধিক পংক্তি সমন্বয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ গীতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রচিত হয়েছে। সেখানে অবশ্য মিল বা পদবিন্যাসে তেমন বৈচিত্র্য ছিল না। মধুসূদনের হাতেই প্রথম শব্দক-বন্ধের ন্যায় পদ্যবন্ধেও গঠনবৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত পদ্যবন্ধের মধ্যে সনেটের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া ট্রিয়োলেট (triolet), ভিলানেল (villanelle), সেসটিনা (sestina) অথবা দশপংক্তিক ও দ্বাদশপংক্তিক মিলের বিদেশী নানা রূপাদর্শের পূর্ণাঙ্গ কবিতা প্রভৃতিও এযুগে লেখা হয়েছে।

ছন্দোবন্ধের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ, মিল। মিল যদিও মুখ্যত, কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত, তবে ছন্দেও তার কিছু প্রভাব রয়েছে। ছন্দবোধে ধ্বনির আবর্তন এবং প্রত্যাশাবোধ কাজ করে, মিল তার সহায়তা করে। উপপর্ব, পর্ব, পদ এবং পংক্তির বিচিত্র মিলে পদ্যবন্ধের এক একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। ইংরেজি পদ্যে rich rhyme, feminine rhyme, inverse rhyme, cross rhyme, interlace rhyme ইত্যাদি বহু বিচিত্র মিলের নিদর্শন রয়েছে। আধুনিক বাংলা পদ্যেও মিলের বৈচিত্র্য কিছু কম নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ প্রাচীন যুগ

ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতে চর্যাগীতিগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাংলা পদাছন্দের সূত্রপাত অন্তত: সেই সময় থেকে হয়েছে ধরা যেতে পারে। প্রাকৃত ছন্দে প্রথম দিকে লঘু-গুরু দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। কিন্তু পরের দিকে এই নিয়ম অন্তত: সুকবি ফণীন্দ্র (পিঙ্গলাচার্য) পাদাকুলক ছন্দের ক্ষেত্রে তুলে দিয়েছিলেন। প্রাকৃতপৈঙ্গলে তার উল্লেখ আছে।^১ চর্যাগীতিতে এই পাদাকুলক প্রধানতম ছন্দোবন্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ষোলমাত্রা পংক্তিবন্ধের এই পাদাকুলককে (৪||৪||৪) বাংলা পয়ারের (৮||৬) পূর্বসূরীরূপে গণ্য করা যেতে পারে। চর্যাগীতে প্রাকৃত দোহা (১৩||১১)^২ এবং চউপইআ (৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,২) ছন্দেরও অল্পসল্প নির্দশন মেলে। এই ছন্দগুলি ভেঙে, দোহা থেকে লঘু ত্রিপদী (৬||৬||৮) এবং চউপইআ থেকে ত্রিপদী (৮||৮||১০) মধ্যযুগের বাংলাপদ্যে গড়ে উঠেছিল অনুমিত হয়। চর্যাগীতিতে প্রাচীন রীতির কলাবৃত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কলাবৃত্তের প্রচলিত মাত্রাগণনারীতি অনুসারে এখানেও মূলদল এক কলামাত্রা এবং রুদ্ধদল দুই কলামাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; — সেই সঙ্গে, প্রয়োজনমতো সংস্কৃত-প্রাকৃত গুরু মূলদলও (আ, ঙ, উ, এ, ও) দ্বিকলামাত্রারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাকৃত শ্লোকের মতো চর্যাগীতেও পংক্তি শেষে, কখনো আবার পদান্তেও মিল দেওয়া হয়েছে। এখানে পাদাকুলক, দোহা এবং চউপইআ ছন্দোবন্ধের এক একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া

১। প্রাকৃতপৈঙ্গলের ১২৯ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত হয়েছে, —

লহগুরু এক্ণ গিঅম গহি জেহা

পঅপঅ লেক্খহি উত্তম রেহা।

সুকই ফণিন্দ্রহ কণ্ঠহ-বলঅং

সোলহ মত্তং পাআ কুলংক।।

মাত্রাবৃত্তম ১২৯ ।।

(দলবিন্যাসক্রমের) লঘু গুরু কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। পড়ে পড়ে উত্তম লেখা লিখবে। (এই হল) সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়স্বরূপ ষোল মাত্রার পাদাকুলক (ছন্দোবন্ধ)।

২। প্রাকৃতপৈঙ্গলের ৭৮ সংখ্যক শ্লোকে দোহার সংজ্ঞা দিয়েছেন, —

তেরহ মত্তা পঠম পঅ, পুণু এআরহ দেহ।

পুণু তেরহ এআরহই, দোহা লক্খণ এহ।। মাত্রাবৃত্তম ৭৮।।

তেরো মাত্রা প্রথমে পড়, পূর্ণবার এগারো দাও। পূনরায় তের-এগারো। এই হল দোহার লক্ষণ।

যেতে পারে। —

কা আ ॥ ত রু ব র ॥ প ঞ বি ॥ ডা ল। I
 পাদাকুলক
 (৪।৪।৪।৪)ঃ চ ঞ ল ঢী এ ॥ প ইঠো কা ল ॥ I
 দি ঢ ক রি অ ম হা ॥ সু হ প রি। মা গ। I
 লু ই ভ গ ই ঙু রু ॥ পু ছি অ। জা ন ॥ I চর্যা ১
 দোহা
 (১৩।১১)ঃ ছা ড় ছা ড় মা আ মো হা ॥ বি ষ মো দু ন্দো লী। I
 ম হা সু হে বি ল স স্তি শ ব রো ॥ ল ই আ সু গ
 মে হে লী ॥ I চ র্যা ৫০ ॥

এখানে শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ১৪।১০ মাত্রার পদযতি রয়েছে।

চউপইআ (৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,২)

অ মি আ আ ছ স্তে ॥ বি স গি লে সি রে ॥ চি অ প র ব স অু পা। I
 ঘারে পারোঁ কা ॥ বু জ় বিলে ম রে ॥ খা ই ব ম ই দু ঠ কু ঙ বা ॥ I চর্যা ৩৯ ॥

এখানে প্রথম পংক্তিতে ২৮ মাত্রা (১০।৮।৯) এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ৩০ মাত্রা (১০।৮।১২) বিন্যস্ত হয়েছে।

চর্যাগীতিতে সর্বত্র পংক্তিমাপের সমতা রক্ষিত হয়নি। উদ্ধৃত ৩৯ এবং ৫০ সংখ্যক গীতেই ছোট বড়ো নানা মাপের পংক্তি বিন্যস্ত হয়েছে।

চর্যাগীতিগুলি মুখ্যত লঘুগুরু উচ্চারণরীতির কলাবৃত্তে রচিত হলেও মাঝে মাঝে মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং আট বা দশ মাত্রার পদযতিভাগ লক্ষিত হয়। যেমন, —

তাস্তি বিকণঅ ডোঙ্গী ॥ অবরণা চঙ্গতা। I
 তোহোর অন্তরে ॥ ছাড়ি নড়পেড়া ॥ I
 তু লো ডোঙ্গী ॥ হাঁউ কপালী। I
 তোহোর অন্তরে মোএ ॥ ঘলিলি হাডেরি মালী ॥ I
 সরবর ভাঞ্জীঅ ডোঙ্গী ॥ খাঅ মোলাগ ॥ I
 মারমি ডোঙ্গী ॥ লেমি পরাগ ॥ I

চিহ্নিত পদগুলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে পাঠ করলেই গীতের অন্যান্য ষোলোমাত্রক পংক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয়। আট ও দশমাত্রার পদে ৩-৩-২ বা ৩-৩-৪ মাত্রক শব্দ বিন্যাসের দৃষ্টান্তও চর্যাগীতে যথেষ্ট মেলে। আলোচ্য উদ্ধৃতিটিতেও তিনটি নিদর্শন রয়েছে। এই জাতীয় পদে চতুর্মাত্রক পর্বযতি লোপ পেয়ে মিশ্রবৃত্তের দীর্ঘ পদক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। — এসব দৃষ্টান্ত পরবর্তী বাংলা কাব্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত মিশ্রবৃত্ত ছন্দের পূর্বাভাসই সূচিত করে।

চর্যাগীতির অব্যবহিত পরেই, সম্ভবত দ্বাদশ শতকের শেষ এবং ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকালের মধ্যে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যটি মুখ্যত সংস্কৃত ভাষাছন্দে রচিত হলেও কাব্যান্তর্গত চব্বিশটি গীতে কবি যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাকে বাংলা কলাবৃত্তেরই প্রাচীন রূপ বলা যেতে পারে। বস্তুত: মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিবৃন্দ জয়দেবের গীতিছন্দের এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসের আদর্শই ব্রজবুলি গীতে অণুসরণ করেছেন। এখানে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ থেকে চার ও পাঁচ মাত্রাপর্বের দুটি সুপরিচিত ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। —

(১) ৪, ৪ || ৪, ৪ || ৪, ৪, ৪ I মাত্রার চতুষ্কলপর্বিক ত্রিপদী

প ততি প ত ত্রে || বি চ ল তি প ত্রে || শ ক্তি ত ভ ব দু প যা নং || I
রচয়িত শয়নং || সচকিত নয়নং || পশ্যতি তব পশ্বনং || I
মুখরমধীরং || ত্যাজ মঞ্জীরং || রিপুমিব কেলিষু লোলং || I
চল সখি কুঞ্জং || সতিমির পুঞ্জং || শীলয় নীলনিচোলং || I

(গীতম ১১)

(২) ৪, ৪ || ৪, ৪ I মাত্রার চতুষ্কলপর্বিক দ্বিপদী (পাদাকুলক)

হ রি প রি র শু ণ || ব লি ত বি কা রা || I
কুচকলসোপরি || তরলিতহারা || I
বিচলদল কললি || তানন চন্দ্রা || I
তদধরপান র || ভস কৃত তন্দ্রা || I

(গীতম ১৪)

(৩) ৫, ৫ || ৫, ৫ || ৫, ৫, ৪ I মাত্রার পঞ্চকলপর্বিক ত্রিপদী

ত্ব ম সি ম ম ভৃ ষ ণ ং || ত্ব ম সি ম ম জী ব ন ং ||
ত্ব ম সি ম ম ভ ব জ ল ধি র ত্ব ং || I
ভবতু ভবতীহ ময়ি || সততমনুরোধিনী ||
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং || I

(গীতম ১৯)

জয়দেবের এই চার ও পাঁচ মাত্রাপর্বিক ছন্দোবন্ধের আদর্শ মধ্যযুগের ব্রজবুলি গীতে এবং আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত রীতির কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

চর্যাগীতের পর প্রাচীনতম বাংলা কাব্য-নিদর্শন মেলে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতকের কোনও সময়ে রচিত হয়েছিল। মাঝে দীর্ঘ দু-তিন শতকের কোনও বাংলা পদ্য-নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-নিদর্শন থেকে স্পষ্ট ধরা যায়, এই দু-তিন শতকে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতে উচ্চারণ-কৃত্রিমতা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠে, নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, কিছুটা শিথিল ভাবে হলেও, প্রথম মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সমগ্র মধ্য এবং আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যে কবির মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দই ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার আধুনিক যুগের পাঠ্য কবিতাশ্রয়ী ছন্দের তুলনায় কিছুটা শিথিল। মাঝে মাঝে কলামাত্রার অতিপ্রসারণ বা অতি-সংকোচন ঘটেছে। শ্রাব্য, সুরাশ্রয়ী কবিতা রচনার সেই প্রাথমিক যুগে সেটা কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। পরবর্তীকালে সুপ্রচলিত অধিকাংশ বাংলা ছন্দোবন্ধই মধ্যযুগের সেই প্রাথমিক স্তরে রচিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি করছি।—

(১) পয়ার (৮||৬)

তোম্‌কা র অ স্তরে 'কা হুগ্‌রি' ॥ ক রি লোঁ য ত নে। I
আনেক প্রকারেঁ তাক ॥ বুলিলোঁ বচনে ॥ I

তী ন ভূ ব নে না হিঁ ॥ হে ন আ ছি দ রাঁ। I
হাণে কুলে এখো নাহিঁ ॥ পাটাবুকী তিরী ॥ I

(তাসুল খণ্ড, ২১ নং)

(২) লঘু ত্রিপদী (৬||৬||৮)

সা সু ড়ী ন ন ন্দ ॥ খু রে র 'ধা র' ॥ সামী ব ড় দু রু বা র। I
হেন গতি গাএঁ ॥ ঘরক জায়িবোঁ ॥ কেমনে 'হয়িবে' নিস্তার ॥ I

(দান খণ্ড, ১০৩ নং)

(৩) দীর্ঘ ত্রিপদী (৮||৮||১০)

তোম্‌কে রাধা চন্দ্রাবলী ॥ আন্ধে দেব বনমালী ॥
আন্ধা পরিহর আকারণে। I

আম্কার পূরহ আশ ॥ ‘গাইল’ বড় চণ্ডীদাস ॥
বন্দিআ বাসলীচরণে ॥ I

(ভারথঙ, ১৮ নং)

(৪) একাবলী (৬।৫ বা ৫।৬)

উচিত বচন । শুন মুরারী । I
‘ভার বহিলে’ । নেহ মজুরী ॥ I
আন কাম আন্দে । করিতে নারী । I
এবার থাকহ । মন নেবারী ॥ I

(ভার, হত্র, খণ্ড, ৩০ নং)

(৫) মিশ্রবন্ধ পয়ার + দশমাত্রক একপদী

দুই কুচ তোর রাধা ॥ শঙ্কর আকার । I
তথি চিত্ত মজিল আম্কার ॥ I
তা দেখিআঁ সবখন ॥ না পাওঁ সোআথ । I
অনুমতি কর দেওঁ হাথ ॥ I

(দানখণ্ড, ২৮ নং)

লক্ষ করা যাবে, তিন (১), ধরে (২), ভার (৪) শব্দগুলি যেমন প্রসারিত উচ্চারণে তিন কলা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি কাহ্নাঐ (১), হ্যিবে (২), গাইল (৩), শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিকলরূপে গণ্য করা হয়েছে। গানের সুরাশ্রয়ী, নমনীয় পঠনভঙ্গিতে সে যুগে এই ধরণের বিশ্লিষ্ট বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ মিশ্রবৃত্তে খাপ খেয়ে যেত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে প্রাকৃত-প্রভাবিত কলাবৃত্তের বা লৌকিক দলবৃত্তের থেকে স্বতন্ত্র আট, দশ বা ছয় কলার পদযতি-বিভক্ত, অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট নতুন এক মিশ্রবৃত্ত

মিশ্রবৃত্তের ছন্দোবীতি গড়ে উঠেছিল তারই স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুমিত
প্রাথমিক রূপ হয়, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কলাবৃত্তকে বা লৌকিক প্রসর-প্রধান
দলবৃত্তকে তৎকালীন স্রাবিক বাকভঙ্গির তুলনায় বেশী কৃত্রিম মনে

করেই গদ্যভাষার অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি এই নব ছন্দোবীতি আখ্যায়িকাধর্মী কাব্যের জন্যে কবির উদ্ভাবন করেছিলেন। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আখ্যায়িকাধর্মী সমস্ত কাব্যেই (রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য-জীবনী কাব্য, পল্লীগীতিকা, কেছা ইত্যাদি) কিছুটা নমনীয় উচ্চারণধর্মী মিশ্রবৃত্ত মুখ্য ছন্দবাহন হয়ে উঠেছে।

আদি ও মধ্য যুগের বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর গুরুত্ব সর্বাধিক। এই গীতিধারায় বাংলা ছন্দের মুখ্য তিনটি রীতিরই, অর্থাৎ কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্তের, কমবেশী ব্যবহার হয়েছে। বিদ্যাপতি এবং তার অনুসরণকারীরা

বৈষ্ণব পদাবলী ‘ব্রজবুলি’গীতে যে লঘু-গুরু উচ্চারণ-সম্পন্ন কলাবৃত্তের ব্যবহার করেছেন তাতে জয়দেবের গীতগোবিন্দের এবং তৎকালীন

সুপ্রচলিত প্রাকৃত-অপভ্রংশ গীতিছন্দের প্রভাব রয়েছে। অধিকাংশ ‘ব্রজবুলি’গীতে প্রাচীন

কলাবৃত্তের যে উচ্চারণ পরিস্ফুট হয়েছে তাতে লঘু মুক্তদল এককলা, রুদ্ধদল দুইকলা এবং গুরু মুক্তদল প্রয়োজন মতো এককলা বা দুইকলা হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাকৃত-অপভ্রংশ শ্লোকে এবং জয়দেবী গীতে গুরু মুক্তদলও রুদ্ধদলের মতো দ্বিকলা হিসাবে ব্যবহৃত হত। বাংলা এবং অন্যান্য পূর্বা নব্যভাষার পরিবর্তিত উচ্চারণ ব্রজবুলিগীত প্রভাবেই ব্রজবুলিগীতে কলাবৃত্তের এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। আরও পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আধুনিক কালে এসে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসরণকারীরা গুরু মুক্তদলকে সর্বত্রই লঘু এককলারূপে গণ্য করে, পরিবর্তিত বাংলা উচ্চারণের আরও একধাপ কাছে চলে এসেছিলেন। ব্রজবুলি-গীতে কলাবৃত্তের চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রার পর্য্যয়তি লক্ষিত হয়। সেই সঙ্গে, সম্ভবত জয়দেবী গীতিপ্রভাবে, ধ্বনি-অনুপ্রাস-মিলের এবং পর্ব-পদ-পংক্তি-বিন্যাসের বৈচিত্র্য এই কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে বিভিন্ন পর্বমাপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

(১) চতুষ্কল পর্ব (৪।৪।৪।৪)

চি র চ ন্দ ন উ রে ॥ হা র ন । দে লা ॥
সো অব । নদীগিরি ॥ আঁতর । ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হম ॥ কাহক ন । গণলা ॥
সো পিয়া । বিনা মোহে । কে কিনা । কহলা ॥

[বিদ্যাপতি (মিত্র-মজুমদার), ২২৭ নং]

গীতটি প্রাকৃত পাদাকুলকের আদর্শে রচিত। শ্রীগীতগোবিন্দের ‘স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম’ (গীত ৯)-এর রূপাদর্শ বিদ্যাপতি এখানে অনুসরণ করেছেন।

(২) পঞ্চকল পর্ব (৫।৫।৫।৫।৫।৪) ত্রিপদী

তু ঙ্গ ম গি । ম ন্দি রে ॥ ঘ ন বি জু রি । স ঞ্জ রে ॥
মে ঘ ক চি । ব স ন প রি । ধা না ॥
য ত য়ু ব তী । ম ণ্ড লী ॥ প হু মা য়ে । পে খ লি ॥
কোই ন হ । রা ই ক স । মা না ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী, সং. সং. শশিশেখর ৪)

১। প্রাকৃত ‘বুল্লগা’ ছন্দের সঙ্গে এই পঞ্চকল-পর্বিক ছন্দের আংশিক মিল রয়েছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বুল্লগা ছন্দেই বুল্লগার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে,— বাংলা ছন্দোবদ্ধ অনুবাদে ঘল। যায়,—

পঠম দহাদিঞ্জিআ ॥ পুনরি তহ । কিঞ্জিআ ॥ প্রথম পাদে । দশটি পড় ॥

পুণ বি দহ । সত্ত তহ ॥ বিরই জাআ ॥ দ্বিতীয় পাদে । তেমনি কর ॥

এম পরি । বিহুদল, ॥ মত্ত সত । তীস পল, ॥ তৃতীয়পাদে । দশমে-সাতে ॥ বিরতি তুমি দিও ॥

এহ কহ । বুল্লগা ॥ গাঅরা । আ ॥

(প্রা, পৈ ১৫৬)

এমনি ধারা । ছত্রদ্বয়ে ॥

সহিতরিশ । মাত্রা লয়ে ॥

বুল্লগার । ছন্দ গাথা ॥ রচিয়া তুমি নিও ॥

এ-ছন্দের আদর্শও জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে রয়েছে, —

স্মরগরল । খণ্ডনং ॥ মম শিরসি । মণ্ডনং ॥

দেহি পদ । পল্লবমু । দারং । I

জ্বলতি ময়ি । দারুনো ॥ মদনকদ । নানলো ॥

হরতু তদু । পাহিত বি ॥ কারং ॥ I

(গীতগোবিন্দ, ১৯ নং গীত)

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, জয়দেবের সুপরিচিত এই পঞ্চকলপর্বিক ছন্দ বিদ্যাপতি তাঁর ব্রজবুলীগীতে ব্যবহার করেননি।^২ জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসও পঞ্চকল রূপাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হননি। সপ্তদশ শতকে শশিশেখর জয়দেবের আদর্শে বাংলা পদাবলীগীতে এ-ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দরূপকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

(৩) ষটকল পর্ব (৬ । ৬ ॥ ৬ । ৬ ॥ ৬ । ৬ ॥ ৬ । ৬ ॥ ৪) চৌপদী

ম জু বি ক চ । কু সু ম পু জ ॥

ম ধু প শ ক । গ জি গু জ ॥

কু জ র গ তি । গ জি গ ম ন ॥ ম জু ল কু ল । নারী ॥ I

ঘন গঞ্জন । চিকুর পুঞ্জ ॥

মালতী ফুল । মাল রঞ্জ ॥

অঞ্জন যুত । কঞ্জ-নয়ন ॥ খঞ্জন গতি । হারী ॥ I

(বৈ. প., সং. সং, জগদানন্দ ৩৬)

ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দ জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে একটি মাত্র গীতে (৫ সর্গ ১০ম গীত), কিছুটা যতিবৈচিত্র্যসহ, ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাপতির গীতে অল্পকিছু নিদর্শন মেলে। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসও ষটকল-পর্বিক কলাবৃত্তের কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। তবে জগদানন্দের পূর্বে, সম্ভবত গোবিন্দদাসই সর্বপ্রথম ষটকলপর্বিক কলাবৃত্তকে বৈষ্ণব গীতে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত তাঁর রসোল্লাসের সুবিখ্যাত ‘শরদচন্দ পবন মন্দ’ গীতটি স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুত জগদানন্দ-উদ্ধৃত গীতটিতে গোবিন্দদাসেরই চৌপদী ছন্দোবন্ধ ও মিল অনুসরণ করেছেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এবং তার অনুসরণকারী কবিরা ছয়কলাপর্বিক কলাবৃত্তের ব্যবহারে যেন কিছুটা বেশী অনুরাগ দেখিয়েছেন মনে হয়। জগদানন্দের আলোচ্য গীতটিতে ধ্বনি-অনুপ্রাস, মিল এবং শব্দ সূচনায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিতরঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২। একটি মাত্র পঞ্চকলপর্বিক পদ (মিত্র-মজুমদার সং, ১১১ নং পদ দ্র.) বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত থাকলেও সেটি মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির রচনা নয় বলেই মনে হয়।

জোরি ভুজ যুগ । মোরি বেঢ়ল ॥ তত হি বদন সু । ছন্দ ।।
 দাম চম্পক । কাম পূজল ॥ জইসে সারদ । চন্দ ॥ ।
 উরহি অঞ্চল । বাঁপি চঞ্চল ॥ আধ পয়োধর । হেরু ।।
 পবন পরাভব । সরদ-ঘন জনু ॥ বেকত কএল সু ॥ মেরু ।।
 (ঐ, ৬২২ নং)

প্রাকৃত বর্ণবৃত্তে (— — — — — , — — — — —) গুরুলঘু দল বিন্যাসক্রমে, ৭।৯।১২ মাত্রার যতিভাগে ‘নরেন্দ্র’ নামে একটি ছন্দ রয়েছে। গোবিন্দদাস তাকে কলাবৃত্তে রূপান্তরিত করে ৭।৯।১২ মাত্রার ত্রিপদীরূপে ব্যবহার করেছেন। যেমন, —

ଐ ଛନ ବନ ସମ୍ପର ।।
 ସରବସ ଲେଇ ॥ ପାଲଟି ପୁନ ବିକଳ ॥
 ରଞ୍ଜିନୀ ବନ୍ଧ ନେହାର ॥ I

(গোবিন্দদাসের পদাবলী,
মজুমদার, ২৩১ নং)

৩। তৃতীয় সর্গের ৭ম গীতে সপ্তকলপবীক মাত্রাবৃত্তের সামান্য অভ্যাস থাকলেও, কবি এখানে আসলে একটি সংস্কৃত ছন্দোকাপের (হরনর্তন?) পরীক্ষা করেছেন, মনে হয়।

ব্রজবুলি গীতের
মিশ্রবৃত্ত

চণ্ডীদাস^৪ এবং তাঁর বিশুদ্ধ বাংলা গীতের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণধর্মী ধারাটি সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, বিদ্যাপতিও কিছু কিছু গীতে মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার

করেছেন যেমন, —

একাবলী (৬ | ৫ I)

চুষনে নয়ন | কাজর গেলা | I
দমনে অধর || খণ্ডিত ভেলা || I
গীন পয়োধর | নখর মন্দা | I
জনি মহেসর | সিখর চন্দা || I
ন মুখ বচন | ন চিত থীরে | I
কাঁপ ঘন ঘন | সবে সরীরে || I

(বিদ্যাপতি, মিত্র-মজুমদার, ২৯৩ নং)

লঘু ত্রিপদী (৬ || ৬ || ৮ I)

বালি বিলাসিনি || জতনে আনলি || রমণ করবি রাখি || I
জৈসে মধুকর | কুসুম ন তোল || মধু পিব মুখমাখি || I

সিরিস কুসুম || কোমল ও ধনি || তোতহ কোমল কাহ্ন || I
ইঙ্গিত উপর || কেলি জে করব || জেন পরাভব জান || I
দিনে দিনে দূন | পেম বড়াওব || জৈসে বাঢ়িস সু-সসি || I

কৌতুকহ কিছু || বাম ন বোলব | নিঅর জাউবি হসী || I (ঐ ২৮৯)

বাংলা পদাবলীর
মিশ্রবৃত্ত পয়ার

এবারে চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিদের বিশুদ্ধ বাংলা গীত থেকে
কয়েকটি ছন্দোবন্ধের উদাহরণ তুলছি। —

পয়ার (৮||৬ I)

তোমাতে বুঝাই বন্ধু || তোমাতে বুঝাই | I
ডাকিয়া শুধায় মোরে || হেন জন নাই || I
অনুখন গৃহে মোর || গঞ্জয়ে সকলে || I
নিশ্চয় জানিও মুখি || ভুখিমু গরলে || I

(বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ, চণ্ডীদাস ৮৩ নং)

লঘু ত্রিপদী (৬||৬||৮I)

ঘরের বাহিরে || দণ্ডে শতবার ||
তিলে তিলে আইসে যায় | I
মন উচাটন || নিশ্বাস সঘন ||
কদম্বকাননে চায় || I

(ঐ. ৩৫ নং)

৪। পদাবলী সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস রয়েছে। এ ধারার প্রবর্তক হলেন, বিদ্যাপতি-সমকালীন, চৈতন্য-পূর্ব যুগের পদাবলী গানের কবি।

দীর্ঘ ত্রিপদী (৮॥৮॥১০।)

রজনী শাওন ঘন ॥ ঘন দেয়া গরজন ॥

রিমিঝিমি শব্দে বরিষে ।।

পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে ॥ বিগলিত চীর অঙ্গে ॥

নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥।

(জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, মজুমদার, ৪৭৫ নং)

একপদী + ত্রিপদী মিশ্রবন্ধ (২, ৮॥৬॥৬॥৮।)

সই) কি আর বলিব তোরে ।।

কোন পুণ্যফলে ॥ সে হেন বঁধুয়া ॥

আসিয়া মিলল মোরে ॥। (চণ্ডীদাসের পদাবলী, মজুমদার, ৪৫)

লৌকিক দলবৃত্তের ব্যবহার বৈষ্ণব পদাবলীতে কম হয়েছে। সপ্তদশ শতকে লোচনদাস এ রীতি কিছুটা প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্যাপতি ব্রজবুলি গীতে অবশ্য এক ধরনের দলভিত্তিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাকে অনেকাংশে প্রাকৃত বর্ণবৃত্তের সমগোত্রীয় বলা চলে। যেমন,—

ব্রজবুলির দলবৃত্ত (বর্ণবৃত্ত)

(১) পহিলি পিরীতি ॥ পরাণ আঁতর ॥ ত খ নে আইসন রীতি ।। ৬॥৬॥৮।
সে আবে কবহ ॥ হেরি ন হেরিষি ॥ ভেলি নিম স্নেহ তীতি ॥।

সাজনি) জিবথু সএ পচাস ।।

৩) ৮ ।

সহসে রমনি ॥ রয়নি খেপথু ॥ মোরাহ তহিক আস ॥। ৬॥৬॥৮।

কতনে জতনে ॥ গউরি অরাধিঅ ॥ মাগিঅ স্বামিসোহাগা ।।

তথুহ অপন ॥ করম ভুঞ্জিঅ ॥ জইসন জকর ভাগা ॥।

(বিদ্যাপতি, মিত্র-মজুমদার, ১৬১ নং)

(২) ন মিত অলকে বে ঢলা ॥ মুখ ক ম ল সোভে ।।

৯॥৭।

রা হক বাহু পস র লা ॥ সসিম গুল লোভে ॥।

কলসকুচ লোটাইলী ॥ ঘন সামরি বেণী ।।

কনঅ পবন সুতলী ॥ জনি কারি নাগিনী ॥।

(ঐ. ১৬৮)

কলাবৃত্তের উচ্চারণ-আদর্শে এই দ্বিতীয় গীতটি অবশ্য ৬।৫॥৬॥৮। যাত্রাভাগে পড়া চলতে পারে।

লৌকিক দলবৃত্তের নিদর্শন মুখ্যত লোচনদাসের পদাবলীতেই পাওয়া যায়। সেখানে অনেক সময় তিনি লৌকিক কথ্যভাষাও চমৎকার ভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন,—

পয়ার (৪।৪।৪।২।)

আর শূন্য। আলো সহি ॥ গোরা ভাবের । কথা ।।
 কোণের ভিতর । কুলবধ ॥ কান্দ্যা আকুল ॥ তথা ॥।
 ...
 কিসের রাখন । কিসের বাঢ়ন ॥ কিসের হলদি ॥ বাটা ।
 আঁখির জলে । বুক ভিঝিল ॥ ভাঙ্গা গেল ॥ পাটা ॥।
 (বৈ: প., হরেকৃষ্ণ, লোচনদাস, ৯.নং)

ত্রিপদী (৮।৮।১০।)

দীঘল দীঘল । চাঁচর চুল ॥
 তায় দিয়াছে ॥ চাঁপার ফুল ॥
 কুন্দ মালতীর ॥ মালা বেড়া । ঝুটা ।।
 চন্দন মাখা ॥ গোরা গায় ॥
 বাহু দোলাইয়া ॥ চলা যায় ॥
 লনাট উপর । ভুবন মোহন । ফোঁটা ॥। (ঐ, ২নং)

কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের তুলনায় এই লৌকিক ছন্দ তখনো বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেকটা যেন অপাংক্ত্যে হয়েই ছিল মনে হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মধ্যযুগের কাহিনীধর্মী কাব্যগুলিতে মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণরীতি অনেকটা শিথিল ছিল। কোথাও দলবৃত্তের, কোথাও কলাবৃত্তের উচ্চারণ এসে পড়েছে। তবু তার মূল ছন্দরীতি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এখানে

আখ্যায়িকা
 কাব্যের ছন্দ

কালানুক্রমিক ভাবে অনুবাদ কাব্য, মঙ্গলকাব্য, পল্লীগীতিকা প্রভৃতি থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল :—

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (পঞ্চদশ শতক)

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ ।।
 আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্বত ॥।
 সুমেরুর চূড়া 'ষাটি সহস্র যোজন ॥।
 'ত্রিশ স হ স তার' গোড়ার পত্তন ॥।

‘ভগীরথ’ সুমেরু হৈতে ‘গঙ্গা’ লইলা ।।
 কৈলাস পর্বতে গঙ্গা আসিয়া মিলিলা ॥।

শিব যদি আসিয়া ধরেন জনধার ।।
 তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥।

দশরথ ঘরে জন্ম নিবে চারিজন ।।

শ্রীরাম লক্ষণ আর ‘ভরত’ শত্রুঘ্নন ॥ I

(আদিকাণ্ড সংসদ সং., পৃ. ১৯-২২)

চিহ্নিত অংশগুলিতে কলা-প্রসারণ এবং কলা-সংকোচনের নিদর্শন রয়েছে। কোথাও আবার ৮॥৬ মাত্রার পরিবর্তে ৭॥৭-মাত্রার পদযতি লক্ষিত হয়।

কবি মিশ্রবৃত্তে ৬॥৬॥৮ মাত্রার লঘু ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন। সেখানে অনেক সময় দলবৃত্তের উচ্চারণ এসে পড়েছে। যেমন, —

শমন দমন ॥ রাবণ রাজা ॥ রামণ দমন রাম ॥ I
 দলবৃত্ত শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥ I
 সূকৃত জনন দুষ্কৃত দমন শ্রুতি সুখ রামায়ণ ॥ I
 শ্রবণ মনন করে যেই জন তারে তুষ্ট নারায়ণ ॥ I

(কিস্কিন্ধাকাণ্ড, ঐ, পৃ. ১৫৭)

এখানে প্রথম দুই পংক্তি পাঠক দলবৃত্তে পড়তেই প্রলুব্ধ হবেন। পরবর্তী শ্লোকে এসে ধরতে পারবেন, লেখক মিশ্রবৃত্তেই এ-অংশ লিখতে চেয়েছিলেন।

লঙ্কাকাণ্ডে অবশ্য মিশ্রবৃত্তের সঙ্গে সংলাপী বর্ণনায় নির্ভেজাল লৌকিক দলবৃত্তের মিশ্রণ লক্ষিত হয়। প্রথমে বিশুদ্ধ মিশ্রবৃত্তে লিখেছেন,—

অঙ্গদ বুকিল এই বেটা মেঘনাদ ।
 আকারে ইঙ্গিতে তারে পুছিল সংবাদ ॥
 তারপরই সংলাপী-ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন,
 অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা ।
 এই যত বসি আছে সব কি তোর পিতা ॥

ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্যরে তোর মাকে ।

এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে ॥ (লঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২৫৪-৫৫)

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি ও অকৃত্রিম রূপ পাওয়া দুষ্কর। ঊনবিংশ শতকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং অন্যান্য সম্পাদকগণ সংশোধিত আকারে যে স্মরণ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাতে ছন্দ বহুলাংশে আধুনিক রূপ ও রীতি লাভ করেছে। সুতরাং পঞ্চদশ শতকের অকৃত্রিম উচ্চারণ-রীতি এ-কাব্য থেকে পাওয়া যাবে না।

মঙ্গলকাব্য (মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, ১৬-১৭ শতক)

৮॥৮॥১০I-মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী :

শুনিয়া পদ্মার বাণী ॥ আনন্দিত শূলপাণি ॥

‘দ্বন্দ্বের মুখে’ নাই ‘আইসে লাজে’ ॥ I

পদ্মবনে উৎপত্তি ॥ ‘নাম হইল’ পদ্মাবতী ॥

মনসা ‘নাম থুইল’ নাগরাজে ॥ I

(বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, জয়ন্ত দাসগুপ্ত স, মনসার জন্মপালা)

একাবলী + ১২ কলা-পংক্তি, মিশ্র স্তবক (৬।৫॥৬।৫॥৬।৬ I)

মঘর তবলা । ভালুকা বাঁশ ॥ মিল ক ॥

মুড়া উপাড়িয়া । করে বিনাশ ॥ ক ॥

শেমলী সোনলা । কাটিল ধনিচা । I খ I

সরল ছাতিম । কাটিল নিম ॥ গ ॥

পারুল শিরীষ । বরুণা সীম ॥ গ ॥

ভাদিয়া শিমূল । কাটিল বালিচা ॥ I খ I

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রীকুমার বন্দ্যো, বনকর্তন)

সপ্তকলপর্বক মিশ্রবৃত্ত (৭।৭।৯)

চৌদিকে জয় জয় পূজেন হরিহর

অনন্যভাবে ভূতনাথে ।

দোখণ্ডী শঙ্খজোড়া মুদঙ্গবাজে পড়া

শতেক পুত্র লৈয়া সাথে ॥

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ক্ষুদিরাম দাস-স,

দেবখণ্ড, শিবপূজা)

অনুমিত হয়, পড়বার সময় এ ছন্দ কলাবৃত্তের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ৮॥৮॥১২ কলার ত্রিপদী হিসাবে উচ্চারিত হত ।

চৈতন্যজীবনী (বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক)

দলবৃত্তের আভাসযুক্ত মিশ্রবৃত্ত পয়ার,—

মিশ্রবৃত্ত ‘এই ভুঁইয়া’ কেনে মোরে সম্মান করিল ।

এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥

‘তোমার ঠাই’ জানি কিছু ‘দ্রব্য আছয়’ ।

‘ঈশান কহে’ — মোরে ঠাই ‘সাত মোহর’ হয় ॥

(চৈ. চ. জেনারেল লাইব্রেরী সং., মধ্যলীলা, ২০ প.)

একপদী + ত্রিপদী (মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত প্রভাবিত)

(১২I৮॥৮॥১০I)

শুন ‘বান্ধব’! কৃষ্ণের মাধুরী ।

যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদ ধর্ম,

যোগী হৈয়া হইল ভিখারী ॥

কৃষ্ণলীলা ‘মণ্ডল’, শুদ্ধ শঙ্খ-‘কুণ্ডল’,

গড়িয়াছে শুক-কারিকর ।

‘সেই কুণ্ডল’ কাণে পরি তুষণ-লাউথালি ধরি,

আশাবুলি কাক্কের উপর ॥ (ঐ, অন্তলীলা, ২৪ প)

যেকথা রামায়ণ সম্পর্কে বলেছি, মুখ্য চৈতন্য-জীবনীগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। বিভিন্ন সংস্করণের আধুনিক সম্পাদকগণ ছন্দ সংশোধন করেছেন। সে কারণেই আদি ও অকৃত্রিম পাঠ পাওয়া সম্ভব নহে।

মুসলিম কবিদের মুসলিম কবির পনের শতক থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমকাব্য
ধর্মনিরপেক্ষ লিখছিলেন। তার ভাষাও মুখ্যতঃ দলবৃত্তমিশ্রিত মিশ্রবৃত্ত। একটি
কাব্যের মিশ্রবৃত্ত উদাহরণ তুলছি। —

পয়ার কিমুখে বসিমু মুঞি নারীর সভাত।
প্রমাদ ঠেকাইলা কুমার আসিয়া এথাত ॥
এই বর ‘মাগম মুঞি’ পদে করতার।
অহর্নিশ প্রেমবাতি ‘না নিবউক’ আর ॥

(মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী,
মুহম্মদ কবীর, মধুমালতী, ষোড়শ শতক)

সপ্তদশ শতকে আলাওল তাঁর কাব্যে মিশ্রবৃত্তের ব্যবহারে অনেক বেশী সূনির্দিষ্টতা এনেছেন। যেমন, —

রত্নময় পাটে করি, ভব্য চারিজনে ধরি,
আলাওল কন্যা আনি বরের নিকট।
অন্তস্পষ্ট মাঝে দিয়া, সপ্তপাক ফিরাইয়া
তুলি ধরি বসিল প্রকট ॥ (ঐ পদ্মাবতী, সপ্তদশ শতক)

সপ্তদশ শতকেই কাশীরাম দাসের মহাভারত লিখিত হয়েছিল। তিনি সম্ভবত প্রথম তিন পর্ব লিখেছিলেন। এখন যে কাশীদাসী মহাভারত প্রচলিত তার ভাষাছন্দ অনেক পরিমার্জিত।^৫ ঊনবিংশ শতকের কবিরা যে মিশ্রবৃত্ত ব্যবহার করেছেন, — একাব্যে তারই নিদর্শন মেলে। বস্তুতঃ এ-কাব্যের কতটা কাশীদাস রচিত, আর কতটা শ্রীকরনন্দী, নিত্যানন্দ বা অদ্ভুতাচার্যের সংমিশ্রণ এবং সেই সঙ্গে জয়গোপাল প্রমুখ সম্পাদকগণের পরিমার্জন তা বলা কঠিন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরিপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥

(বিরটপর্ব, দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা)

৫। জয়গোপাল ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিমার্জিত কাশীদাসী মহাভারত যথাক্রমে খ্রী: ১৮০৩ এবং ১৮৩৬-এ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের কবিদের মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে প্রথমেই ভারতচন্দ্রের নাম করতে হয়। জয়দেব বা বিদ্যাপতি-প্রমুখ ব্রজবুলিগানের কবিদের মতো ভারতচন্দ্রও ভারতচন্দ্র একজন ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। বস্তুত তাঁকে একজন ছান্দসিক-কবি বললেও অতুলিত হয় না। তাঁর মুখ্য কাব্য, তিনখণ্ডে রচিত অন্নদামঙ্গল। তাছাড়া ‘রসমঞ্জরী’ নামক ছন্দোবদ্ধ নায়ক-নায়িকা ও বিবিধ প্রেমরস-বিষয়ক গ্রন্থটিও তাঁর নামে প্রচলিত। ত্রিপদী-চৌপদীতে রচিত ‘সত্যনারায়ণ ব্রতকথা’ এবং কয়েকটি ছোট ছোট কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন।

ভারতচন্দ্র মূখ্যতঃ অক্ষর-বা বর্ণ-সংখ্যাত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ৭, ৭ এবং ৩ ব্যতীত প্রত্যেক বর্ণকেই মাত্রা-একক হিসাবে গণ্য করেছেন। অষ্টাদশ শতক থেকে অক্ষর-সংখ্যাত ‘অক্ষরবৃত্ত’ বা মিশ্রবৃত্ত রচনার এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল। যেমন,—

(১) পয়ার (৮ || ৬ I)

গোত্রের প্রধান পিতা || মূখবংশজাত || I

পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত || I

পিতামহ দিলা মোরে অন্তর্পূর্ণা নাম || I

অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম || I

(অন্নদামঙ্গল, অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা)

(২) চৌপদী (৬||৬||৬||৬ I)

কোন ফুলে বঁধু || পান করে মধু || হয়ে এলে যদু ||

পোড়াতে মোরে || I

আলতা কঙ্কল সিন্দূর উজ্জ্বল জাগিয়া বিকল

নয়ন ঘোরে || I

(রসমঞ্জরী, প্রগলভা অধীরা)

(৩) দ্বিপদী + ত্রিপদী (৮||৮ I ৬ || ৬ || ৮ I) স্তবক

মিল: ক || ক I খ || খ || ক I

মালিনী বুঝিল মর্ম || কোটালে জানায় ধর্ম || I

হোমকুণ্ড বলি || বুঝি মোরে ছলি ||

সুন্দরের এই কর্ম || I

(অন্নদামঙ্গল, মালিনীনিগ্রহ)

(৪) দীর্ঘ দ্বিপদী + দীর্ঘ ত্রিপদী মিশ্রবৃত্ত (১০||১০ I ৮||৮||১০ I)

মিল ক||ক I খ || খ || ক I

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে ||

ধরা তিতে নয়নের জলে || I

কপালে কঙ্কণ হানে || অধীর রুধির বানে ||

কি হৈল কি হৈল ঘন বলে || I

(ঐ, বিদ্যার আক্ষেপ)

(৫) একাবলী (৬||৫I)

নারীর যৌবন । বড় দুরন্ত ।।
 শরীরের মাঝে । পোষে বসন্ত ॥ I
 বিনোদ বিনানে ॥ বিনায়ে বেণী ।।
 পুরুষে দংশিতে । পোষে সাপিনী ॥ I

ভারতচন্দ্রের । ভারতীভোগ ।।

যৌবনেতে কর । যৌবন ভোগ ॥ I (রসমঞ্জরী, যৌবন কথন)

(৬) পঞ্চকল-পর্বিক চৌপদী (১০||১০||১০||৫I)

রমণী রত্ন । সহেনা আঁচ ॥ টুটেয়ে অগ্নি ॥ পরশে কাচ ॥
 করিতে মান । দিবে না স্থান ॥ দিবে না স্থান ।।
 কি করে ক্ষোভ । সহে রামার ॥ অবলা জাতি ॥ মৃদু আকার ॥
 জ্বলয়ে অগ্নি ॥ নহে সে মান ॥ নহে সে মান ॥ I (ঐ, পীঠমর্দ)
 পাঁচমাত্রার পর্ব মিশ্রবৃত্তে স্বাভাবিক নয়। বোধহয় সে কারণেই ছন্দ-কৌতুহলী কবি এ
 ছন্দের সামান্য পরীক্ষা মাত্রই করেছেন। সেক্ষেত্রেও পুরোপুরি সফল হয়েছেন বলা চলে
 না।

ভারতচন্দ্র কাব্যবৃত্তের কিছু ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

(১) চতুষ্কল পর্বিক দ্বিপদী + চৌপদী (লঘুগুরু)

ধা ধা ॥ গুড় গুড় ॥ বাজে নাগারা ।। ৮||১০ I
 বাজে । রবাব ॥ মৃদঙ্গ । দোতারা ॥ I ৮||১০ I
 পয়দল । কলবল ॥ ভূতল । টলমল ॥ ৮||৮ ॥
 সাজল । দলবল ॥ অটল সো । যারা ।। ৮||৮ I
 যামিনী । তকতক ॥ জামকী । ধক ধক ॥
 ঝকমক । চকমক ॥ খর তর । বারা ॥ I”

(অন্নদামঙ্গল, মানসিংহের যশোর যাত্রা)

(২) সপ্তকল পর্বিক (৩+৪) ২) ৭।৭।৭।২ I

মিল ক । ক । ক । খ I গ । গ । গ । খ I
 বসি) আমারি ঘরপর । আমীর বহতর ।
 হলায় গজবর । রাজে । I
 পুর) যশোর চমকত । নকীব শত শত ।
 হঁসার ফুকরত । কাজে ॥ I

(ঐ, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ)

এখানে কবি যুক্তবর্ণে দেননি এবং সপ্তবর্ণে সপ্তকলার উচ্চারণ রেখেছেন। আর একটি
 লঘুগুরু উচ্চারণ-সমন্বিত, পঞ্চবর্ণে (দল) সপ্তকল পর্বভাগের দৃষ্টান্ত তুলছি,—

(৩) জয়) কৃষ্ণ কেশব। রাম রাঘব।

কংস দানব। ঘটন। I

জয়) পদ্মলোচন। নন্দনন্দন।

কুঞ্জকানন। রঞ্জন। I

(ঐ, হরিনামাবলী)

বিশুদ্ধ সংস্কৃত কয়েকটি ছন্দবন্ধ ও (তৃণক, দুর্মিল, ভৃঙ্গপ্রয়াত) ভারতচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। যেমন, —

তৃণক র, (— — —), জ (— — —), র (— — —), জ (— — —),
র (— — —)

মৌন তুণ্ড হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।

কেহ ধায় মুষ্টি খায় মুণ্ড ছিগি ছাড়িছে ॥

মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

ভারতের তৃণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে ॥

(ঐ, দক্ষযজ্ঞনাশ)

ভারতচন্দ্র, সম্ভবত, বাংলা পদ্যে সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণের কৃত্রিমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সে কারণেই প্রত্যেকটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ পদ্যে বিশুদ্ধ বাংলা ছন্দের উচ্চারণে পড়বারও বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন। তাছাড়া এমন কৃত্রিম উচ্চারণের ছন্দ বাংলা পাঠনরীতির স্বভাববিরোধী বুঝেই দু-একটি দৃষ্টান্ত রচনা করেই নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

ছন্দ এবং ধ্বনির বৈচিত্র্যের দিক থেকে বৈষ্ণব কবিদের পর মধ্যযুগে ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। তিনি মুখ্য বাংলা তিন রীতির ছন্দ, সংস্কৃত ছন্দ, এবং বাংলা উচ্চারণে হিন্দী ও আরব-পার্সী শব্দমিশ্র ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে তৎকালীন প্রচলিত ভাষারীতির ও ছন্দের পরিপূর্ণ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তাঁর বিরল দৃষ্ট, কিন্তু নিখুঁত লৌকিক দলবৃত্ত রীতির একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।—

আই আই। ওই বুড়া কি ॥ এই গৌরীর। বর লো। I ৪।৪॥৪।২।

বিয়ার বেলা। এয়ার মাঝে ॥ হৈল দিগ। স্বর লো ॥ I

উমার কেশ। চামর ছটা ॥ তামার শলা। বুড়ার জটা ॥ ৪।৪॥৪।৪॥

তায় বেড়িয়া। ফোঁফায় ফণী ॥ দেখে আসে ॥ জ্বর লো। I ৪।৪॥৪।২।

উমার মুখ। চাঁদের চূড়া ॥ বুড়ার দাড়ি। শণের লুড়া ॥

ছার কপালে। ছাই কপালে ॥ দেখে পায়। ডর লো ॥ I

(ঐ, কন্দল ও শিবনিন্দা)

সাধক, কবি-গায়ক রামপ্রসাদ সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ‘কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর’, ‘প্রসাদ পদাবলী’,

রামপ্রসাদ

‘আগমনী ও বিজয়া’, ‘শ্রীশ্রীকালীকীর্তন’ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে মুখ্যতঃ মিশ্রবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদী এবং কীর্তন-পদাবলীতে লৌকিক দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। তবে ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও লঘু-গুরু উচ্চারণের কলাবৃত্ত এবং সংস্কৃত ছন্দ পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে বিভিন্ন ছন্দোরীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

দলবৃত্ত পয়ার (৮||৬I)

আসার আশা। আশা, কেবল ॥ আসা মাত্রা ॥ হোলো।।

চিত্রের কমলে যেমন ॥ ভুঙ্গ ভুলে গেলো ॥ I

খেলবো বোলে। ফাঁকি দিয়ে, ॥ নাবালে ভুতলো।।

এবার) যে খেলা খেলালে মাগো, ॥ আশা না পুরিলো ॥ I

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনাবলী ১, রামপ্রসাদ সেন, কালীকীর্তন, পৃ ৩৭)

দলবৃত্ত চৌপদী (৮||৮||৮||৮I)

মৃত্যুঞ্জয়। উপযুক্ত, ॥ সেবায় হবে। আশুমুক্ত, ॥

ওরে,) সকলি সম্ভবে তাতে, ॥ পরমাত্মায় মিশাইবে।।

প্রসাদ বলে। মনভায়া, ॥ ছাড় কল্প। তরু ছায়া ॥

ওরে,) কাটা বৃক্ষের। তলে গিয়ে, ॥ মৃত্যুভয়টা। কি এড়াবে।।

(ঐ, শেষাবস্থার গীতি, পৃ ৩৮)

দলবৃত্ত একপদী + দ্বিপদী (৮I৮||৮I)

এবার কালী। তোমায় খাব।।

খাব) খাব গো দীন। দয়াময়ী ॥

তারা) গণযোগে জন্ম আমার।।

গণযোগে। জনমিলে ॥ সে হয় যে মা-।। থেকে ছেলে।।

এবার) তুমি খাও কি। আমি খাই মা, ॥ দুটার একটা। করে যাব।।

কালীর বেটা রামপ্রসাদ, ভালমত তাই জানাব।

তাতে) মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

(সাধক কবি রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী,

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত, পৃ ৯৬-৯৭)

মিশ্রবৃত্ত পয়ার (মালঝাঁপ)

কি রূপসী। অঙ্গে বসি,। অঙ্গ খসি। পড়ে ॥

প্রাণ দহে, কত সঁহে, নাহি রহে, ধড়ে ॥

মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী।

আস্যবর, হাস্যোদর, বিশ্বাধর রাশি ॥

(ঐ, বিদ্যাসুন্দর, পৃ ৪১৪)

মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী + চৌপদী (৮||৮||৮/১০ I+৮||৮||৮||৬/৮I)

আজ) শুভ নিশি পোহাইল, ||I

তোমার) এই যে নন্দিনী আইল, ||

বরণ করিয়া আনো ঘরে। I

মুখশশি দেয় আসি,

দূরে যাবে দুঃখ রাশি,

ও চাঁদ মুখের হাসি,

সুধারশি ক্ষরে || I (ঈ. র. রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৩৩)

সপ্তকল-পর্বক কলাবৃত্ত (লঘু-গুরু ৭|৭|৭|৩)

কাতর কমিনী, | বদন যামিনী, | নাথ মলিন হি | ভেল || I

মুক্তা জৈসন, | সোহত ঐসন, | সরম জল উপ | জেল || I

কোটি পরনায়, | হে প্রভু গুণধাম, | সুরতরস দেহ || ভঙ্গ || I

হাম কশোদরী, | পুরুষ কেশরী, | কৈসে সম তুহ | সঙ্গ || I

(রা. গ্র. বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ৪২০)

তোটক (— — — , — — — , — — — , — — —) :

রমনী মনি নাগররাজ কবি।

রতিনাথ বিনিন্দিত চারুছবি ||

কুচ মর্দনালিঙ্গন চূষন লো।

শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো ||

কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।

করুণাকরু কালী সুদীন জনে ||

(ঐ, ঐ, পৃ. ৪১৯-২০)

কবিওয়ালা এ যুগের কবিওয়ালা সম্প্রদায়, অর্থাৎ, নিতাই বৈরাগী, রামবসু, হরশ্যাকুর প্রমুখ কবিরা কিছুটা শিথিলবদ্ধ মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্তের মিশ্রণজাত, ধ্বনি-অনুপ্রাসবহুল ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,—

(১) যার স্বামী অকৃতি ||

৬ ||

তারে সে যুবতী, || নাহি করে মান্যমান || I

৬||৮I

বঁলে ধিক থাক | পিতামাতারে, |

৬|৫I

এমন দরিদ্রে যে | দিয়েছে দান || I

৬|৫I

যদি কপালগুণে, পুন সে জনে,

অর্থ করে উপার্জন।

তখন হেসে কয় যুবতী; পেয়েছি এ-পতি,

কোরে হর-আরাধন ॥

(দে. গু. র-১, হরঠাকুর, পৃ. ২০৪)

মনে হয়, কবি এখানে অতিপর্ব-সহ মিশ্রবৃত্ত লঘুত্রিপদী (৬।৬।৮) ও একাবলী ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন।

(২) এসো এসো। চাঁদবদনী। I	৬।৫ I
এ রসে নিরসো। কোরোনা ধনি। I	৬।৫
তোমাতে আমাতে। একই অঙ্গ, ॥	৬।৫ ॥
তুমি কমলিনী। আমি সে ভৃঙ্গ ॥	৬।৫ ॥
অনুমাণে বুঝি। আমি ভৃঙ্গ, ॥	৬।৫ ॥
তুমি 'আমার' তায়। রতনমণি ॥ I	৬।৫ I

(ঐ, নিতাই বৈরাগী, পৃ. ১১০)

এখানেও একাবলীর ব্যবহার হয়েছে, তবে পরপর চারটি একাবলী পদের সমন্বয়ে চোপদী রচিত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকাগুলি মধ্যযুগের লোককাব্যের শিথিলবদ্ধ দলবৃত্ত ও পূর্ববঙ্গগীতিকা মিশ্রবৃত্তের সুরাশ্রয়ী সংমিশ্রণের নিদর্শন রূপে গণ্য হতে পারে।
দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলছি, —

দলবৃত্ত পয়ার (৪।৪॥৪।২ I)

হমরা বাইদ্যা। ডাইক্যা কয় ॥ “ওরে মাইনক্যা। ভাই। I
ধনুক কাড়ি লয়্যা চল তামসা করতে যাই ॥”
যখন নাকি হমর্যা বাইদ্যা ডুলে মাইল বাড়ি।
বামুন কান্দার যত মানুষ লাগল দৌড়াদৌড়ি ॥ I

(প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা-১, ক্ষিতীশ মৌলিক-সম্পাদিত,
বাইদ্যা কন্যা মহুয়া, পৃ. ১৪)

মিশ্রবৃত্ত পয়ার (৮॥৬ I)

বর তো পছন্দ হয় ॥ কার্তিক কুমার। I
বংশেতে কুলীন সেই ॥ যত হালুয়ার ॥ I
হালুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে ‘বড়ো-বাপের’ বেটা।
বংশেতে কৌলীন সেই নাই কোনো বেটা ॥

(ঐ, সুন্দরী মলুয়া, পৃ. ১২৬০)

এই গীতেরই পরবর্তী অংশে লৌকিক দলবৃত্তের উচ্চারণে কবি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—
সইকা বেলা। জলের ঘাটে। সেই না কদম তলে। I
দাড়াইয়া। রয় কন্যা। ঘন নিশ্বাস। ফেলে ॥ I

(ঐ, পৃ. ১২৭)

ছড়াগানগুলি ঠিক কোন যুগে রচিত হয়েছিল বলা যায়না। তবে মধ্যযুগ থেকে পল্লী সমাজে নানা উপলক্ষে (বিবাহ, ব্রত, পূজা, ধানভাঙা, শিশুকে ঘুমপাড়ানো বা আদর করা ইত্যাদি) শিথিল উচ্চারণের ছড়াগান সুপ্রচলিত ছিল। মুখ্যত ছড়াগান লৌকিক দলবৃত্তই এ গানের ছন্দ ; তবে কলাবৃত্তের বা মিশ্রবৃত্তের আভাস মাঝে মাঝে লক্ষিত হয়। এখানে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :—

- (১) একটু খানি । গাছে, ॥
রাঙা বৌটি । নাচে I (ধাঁধা)
- (২) ঝি জব্দ । শিলে। I
বউ জব্দ । কিলে ॥ I (প্রবচন)
- (৩) ঢাকা জিলায় । চাকরী করে ।
ফিইর্যা চিডি । পাড়ায় না । I
অ কন্যা) মনের গোস্যা । রাকক না ॥ I
তোমার কতা মনে অইলে
আতের কলয় ঘুরে না ।
তোমার লাইগ্যা কিন্ছি সাড়ী।
মার ডরে পাড়াই না ॥
অ কন্যা মনের গোস্যা রাকক না ॥

(লোক সাহিত্য-৭, কুমিল্লার উমানী বাড়ার গীত,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত)

এগুলি সবই লৌকিক দলবৃত্তে রচিত। আঞ্চলিক ভাষারীতি পল্লীগীতি এবং ছড়ার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী রক্ষিত হয়েছে। শিথিল ছন্দভঙ্গিতে এই আঞ্চলিক কথ্যভাষার উচ্চারণ চমৎকার ফুটে উঠেছে।

আদি ও মধ্যযুগে রচিত কাব্যের ছন্দ-বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আর একবার সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে।—

- (১) দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত চর্যাগীতিতে লঘু-গুরু উচ্চারণ-প্রভাবিত কলাবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রাকৃত-অপভ্রংশের মুখ্য ছন্দ ‘মাত্রাবৃত্ত’ বা ‘জাতি’ থেকে এই রীতি চর্যায় এসেছে। চতুষ্কলপর্বিক ষোলমাত্রা আদি ও মধ্যযুগের পংক্তির ‘পাদাকুলক’ চর্যাগীতে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, ছন্দ-বৈশিষ্ট্য চব্বিশ-মাত্রক পংক্তির (১৩॥১১) ‘দোহা’ এবং ত্রিশ-মাত্রক পংক্তির (১০॥৮॥১২) ‘চউপইআ’ ছন্দোবন্ধের কিছু নিদর্শন লক্ষিত হয়। অনুমিত হয়, পরবর্তী বাংলা গদ্যে এই পাদাকুলক থেকেই পয়ার (৮॥৬), দোহা থেকে লঘু ত্রিপদী (৬॥৬॥৮) এবং চউপইআ থেকে দীর্ঘ ত্রিপদী (৮॥৮॥১০) ছন্দোবন্ধ রূপান্তর লাভ করেছে। চর্যাগীতিতে মিশ্রবৃত্তেরও ক্ষীণ আভাস পরিলক্ষিত হয়।

- (২) ত্রয়োদশ শতকের সূচনা কালে জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দ নামক সংস্কৃত কাব্যে

লঘু-গুরু উচ্চারণধর্মী কলাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। কবি এ কাব্যের কয়েকটি গীতে চতুষ্কল এবং পঞ্চকল-পর্বিক যে ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরবর্তী বৈষ্ণব ব্রজবুলি গীতে লক্ষিত হয়। শ্রীগীতগোবিন্দের এই সমপর্বিক চতুষ্কল ও পঞ্চকল গীতছন্দ বাংলা কলাবৃত্তেরই পূর্বরূপ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

(৩) পঞ্চদশ শতকে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে বাংলা মিশ্রবৃত্ত হৃন্দের প্রাথমিক নিদর্শন বলা যেতে পারে। উচ্চারণের কিছুটা শৈথিল্য সত্ত্বেও এ-ছন্দোবর্তীতিকে পদযতিপ্রধান মিশ্রবৃত্তেরই আদিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করতে কষ্ট হয় না। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী এবং কয়েকটি মিশ্র ছন্দোবন্ধ এ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বৈষ্ণবগীতির স্বর্ণযুগ। বৈষ্ণবগীতের ব্রজবুলি-ধারায় জয়দেবী কলাবৃত্ত এবং বাংলা ধারায় মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত এবং অংশত লৌকিক দলবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। কলাবৃত্তে চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষটকল এবং সপ্তকল পর্বের ব্যবহার লক্ষিত হয়। এই ধারা বিদ্যাপতিই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর ধারা অনুসরণ করেছেন চৈতন্য-পরবর্তী গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, জগদানন্দ, শশিশেখর প্রমুখ কবিবৃন্দ। মিশ্রবৃত্ত ছন্দ অল্পসল্প ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত হলেও চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী তাঁর অনুসারক কবিরাই এ-ছন্দকে জনপ্রিয় করে তোলেন। একপদী, একাবলী, পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ মিশ্রবৃত্তে ব্যবহৃত হয়েছে। দলবৃত্তের একটি প্রাকৃত-প্রভাবিত রূপ বিদ্যাপতির গীতে রয়েছে। তবে লৌকিক দলবৃত্ত বৈষ্ণবগীতে লোচনদাসই প্রবর্তন করেছেন।

(৫) ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের কাহিনীধর্মী কাব্যগুলিতে, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য জীবনী প্রভৃতিতে কিছুটা শিথিল উচ্চারণধর্মী মিশ্রবৃত্তই মুখ্য ছন্দ-বাহন হয়ে উঠেছে। সেখানেও পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রধান ছন্দোবন্ধ। মাঝে মাঝে অবশ্য লৌকিক দলবৃত্তের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

(৬) অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে হৃন্দের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তিনি ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। তিনি এ-কাব্যে মুখ্যত বর্ণ-সংখ্যাত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের নিখুঁত ব্যবহার করেছেন, বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগেরও পরীক্ষা চালিয়েছেন।

(৭) অষ্টাদশ শতকের সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন তাঁর উমা ও কালী বিষয়ক গানে লৌকিক দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। মাধ্যমুগে রামপ্রসাদই লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দকে তাঁর শাক্তগীতি মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লঘু-গুরু উচ্চারণের কলাবৃত্ত এবং সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে মিশ্রবৃত্ত হল এ-কাব্যের মুখ্য ছন্দবাহন।

(৮) কবিওয়ালারা কিছুটা শিথিল উচ্চারণের মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে দাশরথী রায়, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, হরঠাকুর প্রভৃতি কবিরা বিশেষ

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের ভাষারীতি ও ছন্দোবন্ধে পল্লীঅঞ্চলের আমেজ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

(৯) পূর্ববঙ্গ-গীতিকাগুলিতে মধ্যযুগের লোককাব্যের শিথিলবন্ধ মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দরীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুব্রাহ্মণ্য এ-কাব্যের আঞ্চলিক ভাষাধ্বনি এবং প্রাসরিক উচ্চারণ, — বিশেষ করে পয়ারের পর্বভিত্তিক চারটি প্রস্র লক্ষণীয়।

(১০) সেকালের পল্লীসমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল গীত ও ছড়া জাতীয় গানের প্রচলন ছিল সেখানে দলবৃত্তই মুখ্য ছন্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। সেখানেও আঞ্চলিক ভাষাধ্বনি এবং প্রাসরিক উচ্চারণভঙ্গি লক্ষ্য করবার বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ (১৮৩১-১৮৫৮)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

যে বছর জানুয়ারীতে (২৩।১।১৮৫৯) কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, তাঁর ঠিক ছয়মাস পূর্বে (জুন, ১৮৫৮) রঙ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ প্রকাশিত হয়েছিল; আর ঠিক ছয়মাস পরে (জুলাই, ১৮৫৯) মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থ ‘তিলোত্তমা সম্বদ কাব্যের’ প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ গুপ্ত কবির যুগ অবসানের মুখেই বাংলা কাব্যে নব যুগের সূচনা হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সাহিত্য সমালোচকগণ ‘যুগসন্ধির কবি’ বলেছেন। ছন্দ-আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁর কাব্যে যুগসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একদিকে পূর্বসূরীদের বিশেষ করে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আদর্শে মিশ্রবৃত্ত রীতির বিচিত্র যুগসন্ধির কবি হৃদ্যবন্ধে ধ্বনিমিলের চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন, লঘু ছড়াগানের আদর্শে দলবৃত্তেরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে, আধুনিক

যুগের দূরপ্রসারী প্রভাব তাঁর রচনাতেই প্রথম সূচিত হয়েছে। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে এ-যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ছাপাখানার প্রবর্তন। এতদিন পর্যন্ত কাব্য সুরলয়-সহযোগে কথকতা বা সঙ্গীতের আসরে গীত হত। ঊনবিংশ শতকে ছাপাখানা প্রবর্তনের পর শ্রাব্য কবিতা ধীরে ধীরে পাঠ্যকবিতায় রূপান্তরিত হল। আসরে বসে শ্রোতারূপে কথক বা গায়কের মুখে যে কাব্যের সুরারোপিত পাঠ শুনতে হত, এবারে ছাপানো গ্রন্থে

শ্রাব্য কাব্যের পাঠ্য-ঘরে বসে, পাঠ্যরূপে নিজস্ব রুচি ও অবকাশ মতো সে কবিতা কবিতায় রূপান্তর পঠনের সুযোগ এল। তার ফলে কবিকে পাঠকের পঠনরীতি সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হতে হল। এতকাল ছন্দের নমনীয়তা

বা শৈথিল্য কথক এবং গায়ক তাঁদের সুরাশ্রয়ী পঠনের দ্বারা তালবদ্ধ বা ছন্দবদ্ধ করবার যে অরুকাশ পেতেন, পাঠ্যকবিতার ক্ষেত্রে সেই সুযোগ আর রইল না। কবিকে তখন ছন্দের যতিভাগ ও মাত্রাগত উচ্চারণরীতিকে এমন একটি নির্দিষ্টতা দেবার কথা ভাবতে হল, যাতে সকল পাঠকই অনায়াসে পঠনে তাঁর প্রত্যাশিত ছন্দের রূপরীতি ধরতে পারেন। শ্রাব্য গীতিকাব্যের পাঠ্য কাব্যে রূপান্তর এই যুগের ছন্দোবিবর্তনে বিশেষ তাৎপর্যময় ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একদিকে যেমন ভারতচন্দ্রের আদর্শে ‘অক্ষর’ বা বর্ণ-সংখ্যার সমতা রেখে মিশ্রবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদী, একাবলী ইত্যাদি ছন্দোবন্ধে কাব্য রচনা করেছেন, আলঙ্কারিক ধ্বনি-অনুপ্রাসে কাব্যকে মণ্ডিত করেছেন, অপরদিকে তেমনি ষাটধর্মী উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টতার প্রতি লক্ষ রেখে মিশ্রবৃত্ত রীতির শব্দগ্রন্থন-রীতিতে সুনির্দিষ্টতা

এনেছেন ‘বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়’ — পদের শব্দবিন্যাস সম্পর্কে এই নীতি মধ্যযুগের কবিদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী সার্থক করে তুলেছেন। আবার, যে দলবৃত্ত রীতিকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক ছন্দ বলে গণ্য করেছেন, গুপ্তকবি অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই সে ছন্দেরও ব্যবহার করেছেন। এখানে আবার তিনি অনেকাংশে রামপ্রসাদের যোগ্য উত্তরসূরী। বস্তুত, গুপ্তকবি বিষয়বস্তুর মতো ভাষা-আঙ্গিক ও ছন্দ-অলঙ্কারেও মধ্যযুগের সর্বশেষ দুই বিশিষ্ট কবি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের সঙ্গে আধুনিক কাব্যধারার দুই বিশিষ্ট প্রবর্তক রঙ্গলাল-মধুসূদনের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন।

ভারতচন্দ্রের মতো ঈশ্বরচন্দ্রও যে ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন, তার কাব্যের গঠন-পারিপাট্যে এবং বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের নামকরণে সেটি প্রতীয়মান হয়। তিনি গঠনগত বৈচিত্র্যের বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন মিশ্রবৃত্ত রীতির কবিতায় তবে লঘু সুরের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে লৌকিক দলবৃত্তের স্ফন্দ ব্যবহারেও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। — এখানে তিনি একদিকে কবিওয়ালাদের উত্তরসূরী, — আবার পরবর্তী কবিদের আদর্শস্বরূপ। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলিগীতে কলাবৃত্তের লঘুগুরু উচ্চারণ-সমন্বিত যে ধারাটি গড়ে তুলেছিলেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অল্পকিছু গীতে তার বেশ লক্ষ

তিন হন্দরীতি করা যায়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ছন্দ-সচেতন কবি ঈশ্বর সম্পর্কে কবির গুপ্তও এই কলাবৃত্তের অনেকটা আধুনিক, লঘুগুরু-উচ্চারণ-বর্জিত সচেতনতা রূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা-গানে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য, আধুনিক কলাবৃত্ত উচ্চারণও রূপগত সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। গুপ্তকবি, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিবৃন্দ তার অস্ফুট আভাস এনেছিলেন মাত্র। ভারতচন্দ্রের মতো গুপ্তকবিও মুখ্যত তাঁর কাব্যে ও গানে মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতি ব্যবহার করেছেন। তবে, দলবৃত্তের ব্যবহার ভারতচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশীই করেছেন। আর কলাবৃত্তের রীতিগত পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম মিশ্রবৃত্ত কয়েকটি ছন্দোবন্ধের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

সেই হয় পূজনীয়, বিদ্যা আছে যার।

বিদ্যাহীন নর যেই, বৃথা জন্ম তার ॥

পয়ার

বিদ্বানের সমাদর, স্বদেশ বিদেশ।

বিদ্যার নিকটে নাই, ইতর বিশেষ ॥ (হিতপ্রভাকর, পদ্য)

পয়ারকে অনেক সময় কবি ‘পদ্য’ বলেছেন। এখানে ভারতচন্দ্রের আদর্শে তিনি বর্ণ বা ‘অক্ষর’ সংখ্যারও সমতা রক্ষা করেছেন। যমক-অনুপ্রাসের প্রতি কবির দুর্বলতা ছিল। সে জন্যেই লিখেছেন,

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।

আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥

সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদু হাস্য-ভরা।

অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা ভরা ॥ (কবিতাবলী, ইংরাজি নববর্ষ)

এখানে চতুর্মাত্রক যতি এবং ধ্বনিগত অনুপ্রাস লক্ষণীয়। মালঝাঁপ পয়ারে এই অনুপ্রাসের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়িই করেছেন। যেমন, —

রণদক্ষ, দুইপক্ষ, করে পক্ষ, রুদ্ধ।

জোটে জোটে, চোটে চোটে, ঠোটে ঠোটে, যুদ্ধ ॥

মহাকুদ্ধে, বাহ্যুদ্ধে, নেচে উর্ধে, ওঠে।

হাঁকে হাঁকে, জাঁকে জাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ছোটে ॥

(হিতপ্রভাকর, মালঝাঁপ)

এ-সব পদ্যে মিলের বা শব্দ ব্যবহার-কৌশলের মুসীয়ানা প্রকাশ পেলেও অত্যধিক অলঙ্কার-চেতনা কবিত্বের স্বভাবসৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

ভারতচন্দ্র সচেতনভাবেই ‘যাবনী মিশাল’ ভাষায় পদ্যরচনা করেছিলেন। সেখানে আরবী-পার্সী শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রামপ্রসাদও তাঁর কবিতা-গানে লৌকিক শব্দের ও চিত্রকল্পের সচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এদিক থেকে গুপ্তকবিকে তাঁদেরই যোগ্য শিষ্য বলা যেতে পারে। সমকালীন ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজে তখন আরবী-পার্সীর সঙ্গে বহু ইংরেজি শব্দেরও প্রবেশ ঘটেছে। সমাজ-সচেতন কবি এ-জাতীয় শব্দকে কত স্বেচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাঁর পদ্যে ব্যবহার করেছেন তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে।—

সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুণি নানা।
ইংরেজি ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা ॥
শব্দ-ব্যবহার বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিটেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥

হিপ হিপ হুররে, ডাকে হোল ক্লাস।

ডীয়ার ম্যাডাম, ইউ টেক্‌ দিস গ্লাস ॥ (কবিতাবলী, ইংরাজি নববর্ষ)

বাংলা কবিতায় হিন্দী বাক্যের ব্যবহার ভারতচন্দ্রের মতো গুপ্তকবিও কিছু কিছু করেছেন। মুখ্যতঃ কৌতুক-রস সৃষ্টির ক্ষেত্রেই এ-ভাষাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। যেমন,—

কো হাঁয়, কো হায়, আবি, হিয়া আও, শালো।
হিন্দী নেকালো নেকালো এস্কো, জুতি সে নেকালো ॥
শব্দ-ব্যবহার গেধড় হারামজাদ, কাঁহাকো বজ্জাৎ।
হামারা সামনে আকে, কহে আয়াসা বাৎ ॥

(হিতপ্রভাকর)

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্তর্যামঙ্গলে জুহু শিবের চিত্রাঙ্কনে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত নববর্ষে খ্রীষ্টান সমাজের মদ্যপানোৎসবের চিত্র দিতে গিয়ে চমৎকার লঘু ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন, —

কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।

ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ॥

চপ্চপ্ চপ্ চপ্ চপ্ চপ্ চপ্।

সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্ ॥ (কবিতাবলী, ইংরাজি নববর্ষ)
সেযুগে যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব পরিহার করে এবং একই ধরনের বাকপর্বের পুনরাবৃত্তি করে এক ধরনের পদ্য রচনার প্রচলন হয়েছিল। গুপ্ত কবির রচনা থেকে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু।

সেই নারী নারী নয় নাহি যার বঁধু ॥

সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ।

সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ ॥

(কবিতাবলী, গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা)

উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদলের ব্যবহার হয়নি, তাছাড়া চতুষ্কল লঘু পর্বযতিও ফুটে উঠেছে। তাতে, মিশ্রবৃত্তের তুলনায় কলাবৃত্তের উচ্চারণধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কলাবৃত্তে যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদলের দ্বিকল উচ্চারণ তখনো কবিদের অজানা ছিল। অর্থাৎ সচেতনভাবে কলাবৃত্তের উচ্চারণ মনে রেখে এ পদ্য রচনা করেছেন মনে হয় না।

এতক্ষণ মিশ্রবৃত্ত পয়ারেরই বিচিত্র উদাহরণ তোলা হয়েছে। এবারে একপদী, স্থবক বৈচিত্র্য
দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দোবন্ধের মিল ও স্থবক রচনার বৈচিত্র্য-নিদর্শন কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(১) মিশ্র চৌপদী+দ্বিপদী (৮॥৮॥৮॥৬। ৮॥৬।)

মিল

আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থে আমি কই,

কা॥কা॥

আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদায়।

কা॥থা

দারাপুত্র পরিবার

বল তবে কেবা কার,

গা॥গা॥

মোহমুক্ত এ সংসার, ফক্কিয়ারময় ॥

গা॥ঘা

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

—॥থা

(ঈ. গু. গ্রন্থাবলী, শরীর অনিত্য)

চৌপদী দ্বিপংক্তিক শ্লোকের শেষে একটি পয়ার পংক্তি এনে কবি এখানে স্থবকের আদল স্পষ্ট করে তুলেছেন।

(২) একপদী+দ্বিপদী+ত্রিপদী (১০। ১০॥১০। ৮॥৮॥১০। ১০।)

মনের মানুষ কোথা পাই ?

মিল কা

মানুষ যদ্যপি হবে ভাই, কা।
 যাহা বলি কর তবে তাই ॥ কা।
 দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা, খা||খা||
 জগতে মানুষ কেহ নাই। কা।
 মনের মানুষ কোথা পাই? I কা।

(কবিতাবলী, মনের মানুষ)

দীর্ঘ চৌপদী, চিত্ররেখা, চম্পকলতা, পঞ্চাল, বীরবিলাসিনী, লবঙ্গলতা ইত্যাদি নামে কবি চ||চ||চ||চ||৬/৭/৮I পদবিন্যাসের কিছু চৌপদী ছন্দোবন্ধের ব্যবহার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি,—

(৩) কোনরূপে অভিলাষে, শত্রু যদি কাছে আসে,
 সুমধুর প্রিয়ভাসে, কর তারে তোষণ।
 প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্বভাব পরিহরি,
 দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবেতে দোষণ ॥

(হিত প্রভাকর, দীর্ঘ চৌপদী)

সমগ্র কবিতায় পংক্তিশেষে একমিল (‘তোষণ’র সঙ্গে মিলিয়ে) রাখা হয়েছে।

(৪) দ্বিপদী+দ্বাদশ মাত্রক চৌপদী (চ||ডাI চ||ডাI ডা||ডা||ডা||ডা||চ I)

দিবাকর, নিশাকর, লয়ে যাব ভাস। মিল কা।
 দিবানিশি, করে করে, তিমির বিনাশ। কা।
 নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ, খা||
 রাশি রাশি রাশি, করিয়া পক্ষ, খা||
 অহরহ সহ করিয়া সখ্য, খা||
 বার বার ভ্রমে বার ॥১ গা।

(বোধেন্দু বিকাশ, মঙ্গলাচরণ সংগীত)

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হবে কবি লক্ষ, পক্ষ, সখ্য — যুক্তবর্ণ রুদ্ৰদল-সমন্বিত শব্দগুলিকে কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন, সম্ভবত তিনি কলাবৃত্ত রীতিই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী স্তবকেই সে ভ্রম দূর হয়।—

অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রম ভ্রম আশে? মিল ঘা।
 ভজ নিত্য, নিত্যবিভ, চিত্ততীর্থ বাসে ॥ ঘা।
 হৃদয় নিলয়ে পরম রতন, ঙা।
 সে ধনে তুমি হে না কর যতন, ঙা।
 বৃথায় করিছ শরীর পতন, ঙা।
 অসার ভাবিয়া সার ॥২ গা।

(ঐ)

তবে কবির সতর্ক প্রতিবেদে — যা পড়েছিল যে ‘লক্ষ’ তিনকলা উচ্চারণে ব্যবহার

করলে পরবর্তী শব্দেও অনুরূপ ধ্বনিমাত্রার বিন্যাস প্রয়োজন।

(৫) ষটপদী (চ||চ||চ||চ||চ||৭।)

প্রকাশ করিয়া মর্ম, কারে বলি নিজকর্ম,
কোথায় সে খোঁড়াধর্ম, শুকায়েছে অস্থিচর্ম,
সকলেই পেয়ে শর্ম, মম বশ হয়েছে।

কোথা বেদ কোথা তন্ত্র, আমার স্বতন্ত্র তন্ত্র
কুহক কলের যন্ত্র, গুঢ় বীজ মহামন্ত্র,

ছেড়ে সব গুরুমন্ত্র, মম মন্ত্র লয়েছে ॥ (বো. বি., ২ অঙ্ক)

এখানে পর পর পাঁচটি অষ্টকল পদে এক মিল রয়েছে; এবং প্রথম ষটপদী পংক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় ষটপদী পংক্তির প্রান্তিক মিল রেখেছেন। এ-জাতীয় রচনা ছন্দমনস্কতার পরিচায়ক।

পুনরাবৃত্ত শব্দ,
চলিত ক্রিয়াপদ,
গ্রাম্য শব্দ
ব্যবহার

শব্দের পুনরাবৃত্তি, চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং প্রয়োজনমতো গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ গুপ্তকবির রচনার বৈশিষ্ট্য। মিশ্রবৃত্ত রীতির পদ্যবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ‘বোধেন্দু বিকাশ’ অনুবাদ নাটকেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

বুক ফেটে, রক্ত উঠে মরুক, মরুক, মরুক।

মুখে, রক্ত উঠে মরুক ॥

এখনিই, ওলাউঠা, ধরুক, ধরুক, ধরুক।

এসে, ওলাউঠা ধরুক ॥

মাগিদের, হাত থেকে খাডু সরুক, সরুক।

শাঁকা, খাডু সরুক সরুক ॥

আলোচাল, খেয়ে তারা, ঠোঁটি পরুক, পরুক।

তারা, ঠোঁটি পরুক, পরুক ॥

(ঐ, প্রথম অঙ্ক, উন্মাদিনী ছন্দ)

কবি এখানে রতির সংলাপে কলহপরায়ণা, গ্রাম্য নারীর বাকভঙ্গি ফোটাতে চেয়েছেন। মরুক, ধরুক, সরুক, পরুক জাতীয় চলিত ক্রিয়াপদে প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট দ্বিকল বা বিশ্লিষ্ট ত্রিকল উচ্চারণ দিয়েছেন। ছন্দোবন্ধের নামকরণ করেছেন ‘উন্মাদিনীচ্ছন্দ’।

রামপ্রসাদের আদর্শে তিনি যন্মাত্রক যতিভাগে, মিশ্রবৃত্ত সপ্তপদী বন্ধে শক্তিবিশয়ক গান লিখেছেন। যেমন, —

১। তুলনীয,

বামা,

ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া,

ধররে বলিয়া, ঘন হাসে।

কাহার নারী হে, চিনিতে নারি হে,

মোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥

এখানে যতি ৬।৬।৬।৪।

(রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং. ২।১৩ নং গীত)

বামা, হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
 মিশ্রবৃত্ত হহঙ্কার রবে, সকল শাসিছে,
 দ্বাদশমাত্রক নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
 দীর্ঘ চৌপদী গ্রাসিছে বারণ হয়।১
 বামা, টলিছে, ঢলিছে, লাভণ্য গলিছে,
 সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
 ছলিছে ভুবনময় ॥ ৩

(ঐ, ৩য় অঙ্ক, গীত)

ছয়মাত্রার লঘু যতি ধরলে, ১২॥১২॥১২॥৮ I-মাত্রার দীর্ঘ চৌপদীবন্ধেও এ কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ চলতে পারে।

কলাবৃত্তের আধুনিক উচ্চারণ সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করেন। তবে এই ছন্দোবীতির লঘু-গুরু উচ্চারণ-সম্বন্ধিত প্রাচীন একটি ধারা চর্যাগীতি

কলাবৃত্তের ব্যবহার বৈষ্ণব ব্রজবুলি গানে আদি ও মধ্যযুগে সুপ্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অল্প কিছু কবিতা-গানে এই ছন্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। তাছাড়া, মধ্যযুগের সুরাশ্রয়ী কাহিনীধর্মী কাব্যগুলিতেও মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মাঝে মাঝে কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ বা লৌকিক দলবৃত্তের দলমাত্রক উচ্চারণ পরিস্ফুট হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের কিছু কবিতা-গানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পূর্বোক্ত দ্বিপদী-চৌপদীর একটি দৃষ্টান্তে এর নিদর্শন তুলেছি।

কয়েকটি কবিতা-গানে আরও স্পষ্টতর কলাবৃত্তের উচ্চারণ লক্ষিত হয়। যেমন,—

তৃষ্টি নিকেতন, রিষ্টি বিনাশক, সৃষ্টি পালন-লয়কারি।
 নিন্দিত রজত, শ্বেত কলেবর, ভস্মভূষণ জটাধারি ॥ ১
 সর্ব শিবময়, সম্পদ সদন, পঞ্চবদন মদনারি।
 রক্ষ নিজসূতে, মোক্ষ-প্রদায়ক, দক্ষদুহিতা মনোহরি ॥ ২

(ঐ, ৩য় অঙ্ক, ভজন)

লঘু-গুরু উচ্চারণে এটি ৮॥৮॥৮॥৬I-মাত্রক চৌপদীরূপে পড়া কিছুটা কষ্টকর বরং ৭।৭।৬।৫।I-মাত্রক চতুষ্পদিক রীতির পাঠই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক।

একটি গীতে কবি কিন্তু স্পষ্ট ভাবেই আধুনিক কলাবৃত্তের আদর্শে, কেবলমাত্র রুদ্ধদলে দ্বিকলার প্রসারণ এনেছেন। যেমন,—

দেখ, বাজিছে বাষ্প দিতেছে বাষ্প, মারিছে লক্ষ্য, হতেছে কম্প,
 গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃতি বাস ॥ ১

২। ১৮৮৬-তে প্রকাশিত ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থের ‘বিরহ’ এবং ‘গান’ কবিতা দুটিতে প্রথম এ-ছন্দের আধুনিক ব্যবহার লক্ষিত হয়।

কেরে, করাল কামিনী, মরালগামিনী, কাহারে স্বামিনী, ভুবন ভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস ॥২

(এ, কাপালিনী গীত)

অনুরূপ মোট পাঁচটি সপ্তপর্বক পংক্তিতে গীতটি রচিত। পংক্তিগুলির শেষে এক মিল। যতিভাগ : ২) ৬।৬।৬।৬।৬।৬।৬।২। তবে এমন দৃষ্টান্ত বেশী মিলবেনা। তাছাড়া অনুমিত হয়, পংক্তিপ্রান্তিক ‘বাস’, ‘হাস’ শব্দগুলি সম্ভবত গুরু উচ্চারণে ত্রিকল হিসাবেই পঠিত হত।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, কবিরা সচেতন ভাবে মিশ্রবৃত্তের সঙ্গে কলাবৃত্তের মাত্রা-গণনায় তখন পার্থক্য করতেন না। তবে কানে প্রায়শই কবিদের সেটা ধরা পড়ত। সে কারণেই গুপ্তকবি পঞ্চকলপর্বক ছন্দ ব্যবহারে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণের ব্যবহার পরিহার করেছেন। যেমন,—

হে নটবর, সরহে সর।
ছি ছি কি কর, বসন ধর ॥
আমি অবলা, গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা, ছুঁয়োনা কালা ॥

(ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী, বিবিধ,
শ্রীকৃষ্ণের সপ্নদর্শন, পৃ. ১৭৫)

কিন্তু কদাচিত যুক্তবর্ণ এসে পড়লে চোখ-কানকে প্রতারিত করেছে। যেমন এরপরই লিখেছেন,—

আমি হে সতী, নব যুবতী।
আয়ান পতি, ‘দুর্জন’ অতি ॥
না জানে প্রেম, মনের ভ্রম।
ননদী মম, সাপিনী সম ॥ (এ)

একই বৈশিষ্ট্য এবং দুর্বলতা একাবলী ছন্দেও লক্ষ করা যায়। যেমন,—

একাবলি ছাঁদে তোমারে বলি।
শুনহে কোমল কুসুমকলি ॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল রসেতে ঢলি ॥ (এ, ফুল, পৃ. ২৬৮-৬৯)

একই কবিতায় একটু পরেই লিখেছেন,

সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে ‘সৌন্দর্য’ ‘মাধুর্য’ জাল ॥ (এ)

লৌকিক দলবৃত্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে গুপ্তকবির সহজাত প্রবণতা লক্ষিত হয়। শ্লেষব্যঙ্গধর্মী কবিতা গানে, ছড়া জাতীয় রচনায়, রামপ্রসাদী ঢঙের গীতে কবি এ ছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলছি।

(দ্র. গু. বসুমতী, সঙ্গীত, পৃ. ৮৯)

করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥ (ঐ, নীলকর, পৃ. ১৩৫)

(ঐ. গু. ২, বো. বি. 'আয়রৌদ্দ হেনে' ছন্দ, পৃ. ১৮৮)

(ঐ, 'ধিস্তাধিনা পাকানোনা' ছন্দ, পৃ. ১৮৮)

(ঐ, চপলাগতি ছন্দ, পৃ. ১৮৮)

অমনি ভালো।১

www.amarboi.com

ও কথা, আর বোলোনা, আর বোলোনা, আর বোলো না। আর বোলো না,
অমনি ভালো ॥ ২

(ঐ, আদরিণী ছন্দ, পৃ. ২১৭)

এবারে কয়েকটি গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে গুপ্তকবির ছন্দ বিষয়ক আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। হিন্দী কবির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুরাশ্রয়ী আবৃত্তিতে কবিতার একই পংক্তি দুবার করে পড়ে থাকেন। ঠিক সেই ভঙ্গিতে মিশ্রবৃত্ত পয়ারবন্ধে পর পর দুবার একই পংক্তি বসিয়ে গুপ্তকবি ‘একপদী ছন্দ’ উপহার দিয়েছেন। তবে পার্থক্য এই, কবি এখানে ভাষা অভিন্ন রেখে দুই পংক্তিতে অর্থগত পার্থক্য এনেছেন। যেমন,—

বিশেষ মহিমা তার, তারানাথ মুখে।

বিশেষ মহিমা তার, তারানাথ মুখে ॥

আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী।

আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি ॥

উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা, হল ভব।

উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হল ভব ॥

(ঈ. গু. বসুমতী, মেনকার কিষ্কিৎ জ্ঞানোদয়, পৃ. ২৮৬)

এক জাতীয় পদ্যে কবি পংক্তির সূচনায় ও প্রান্তে মিল দিয়েছেন। যেমন,—

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, শিখগণ সঙ্গে।

বেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস রঙ্গে ॥

সেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার।

বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, নাহিক নিস্তার ॥ (ঐ, মুদকির যুদ্ধ, পৃ. ১৯৭)

প্রচলিত গ্রন্থাবলীগুলি দেখে মনে হয় গুপ্তকবি যেমন পদ্য, পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী, চৌপদী, মালঝাপ, ভঙ্গ ত্রিপদী, ষষ্ঠপদী, তোটক ইত্যাদি নাম ব্যবহারের দ্বারা বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের রূপ নির্দেশ করতেন, তেমনি কমা ও দাঁড়ি চিহ্নের সাহায্যে ছন্দের যতি নির্দেশ করতেন। যেমন পঞ্চকল পর্বে ৩+২ মাত্রার উপযতি বোঝাতে লিখেছেন,—

বুটিশ, গণে। অভয়, মনে।

শিখের, সনে। সেজেছে, রণে ॥

লাহোরা, ধিপ। শিশু দ,লিপ।

তার স,মীপ। সমর, দীপ ॥

বনের, আশ। করি প্র,কাশ।

প্রাণী বি,নাশ। দয়া না, বাস ॥

(ঐ, ফিরোজপুরের যুদ্ধে জয়, পৃ. ১৯৮)

উচ্চারণানুগ বানানের দিকেও গুপ্তকবির দৃষ্টি ছিল মনে হয়। কর্বে, ধর্বে, চর্বে, কোরে’, ধোরে’, দোড়য়ে, চোম্কে, বোস্‌বো, ঠেটি পরুকে, বেলাক নেটিব, মেজোবো’র ব্যাটা,

থুড়ী, বুনচে, গুণচে, চুণচে, যুবো, মাগ্গীগগু, মাগী, খাগী, কোংকা, মেজেষ্টরি, রাঁড়ের বে, হিন্দু মোছোলমান, ধিক্কা, থাবা থাবা মেরে দাও, কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত,— এমন অসংখ্য উচ্চারণানুগ বানানের প্রচলিত শব্দ ও বাকপর্ব অনায়াসে পদ্যে ব্যবহার করেছেন। ঠিক ভাবটি বোঝাতে ঠিক শব্দ বা বাক্যটি সঠিক উচ্চারণে তিনি ব্যবহার করতেন, শব্দ বা বানান শিষ্ট সাহিত্যে গ্রাহ্য হবে কিনা সে ভাবনা আদৌ ভাবতেন না।

গুপ্তকবি অনুপ্রাস ও যমকের ব্যবহারে ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেন এবং তাঁকে অনায়াসেই অতিক্রম করে যান। মাঝে মাঝে তাঁর গদ্য ভাষা যে কতটা পদ্যের এলাকায় এসে পড়েছে এখানে উদ্ধৃত তৎসমবহুল ও কথ্য ভঙ্গির দুটি দৃষ্টান্ত থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।—

(ক) তৎসম শব্দবহুল গদ্য

হে কুলেশ্বর সুশান্ত ! জীবনকান্ত ! শান্ত হও, কটুভাষি, কুকর্মান্বিত, কদাশয় কুটিল কদম্বের কটুকথায় কি হয়? দান্তিকদিগের দম্ভই বল, মিথ্যাবাদির মিথ্যাই বল, এবং ধূর্ত, শঠ, বাচালবর্গের বাকজাল ভিন্ন অন্য বল আর কিছুই নাই।

(বো. বি. ১ম অঙ্ক, মতির সংলাপ, পৃ. ১৮২)

(খ) হা:—হা:—হা:—এরা কে গঙ্গার ধারে? এতো বড়ো হাসির ব্যাপার! হাঁরে ও আঙুল নেড়ে কি ভেঙাচ্ছে? বিড়ির বিড়ির কি ঘেঙাচ্ছে। আরে ঐ ফুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে? এই বিটলে মাটি নিয়ে কি গোড়ছে? ওখানে কি পোড়ছে? ভিড়িং ভিড়িং ধিড়িং ধিড়িং পিড়িং পিড়িং এরা কি সেতার বাজাচ্ছে?

(বো. বি. ২য় অঙ্ক, মহামোহের সংলাপ, পৃ. ১৯৮)

গদ্যে পদ্যের অনুপ্রাস-মিলের আভাস পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের বহু রচনায় লক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘বোধেন্দু বিকাশে’র সংলাপী পদ্যভঙ্গিম গদ্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কি না সেটি অনুমানের বিষয়।

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে বাংলা কাব্যে মুখ্য তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। পল্লী অঞ্চলে

এক শ্রেণীর লৌকিক কবি তখন প্রেম-গীতিকা, কবিগান, পাঁচালী,

গুপ্তকবির যুগের রামায়ণ গীতি, টপ্পা, যাত্রাগান, আখড়াই, খেউড় ইত্যাদি গ্রাম্যগীতের

অপর কবিবৃন্দ চর্চায় মেতেছিলেন। রামপ্রসাদী সংগীতের ধারাটি শক্তি-সাধক এক

শ্রেণীর কবি-গায়ক সমৃদ্ধ করে তুলছিলেন। তৃতীয় ধারাটিকে বলা

যেতে পারে, নগর-সংস্কৃতিপুষ্ট আধুনিক শিষ্ট কাব্যের ধারা। এই ধারায় আধুনিক

সভ্যতাভিত্তিক, জীবনমুখীন কবিতার চর্চা শুরু হয়েছিল। গুপ্তকবি তিন ধারাতেই কিছু

কিছু কবিতা-গান রচনা করেছেন। তবে আধুনিক সভ্যতামুখীন জীবনধারাই তাঁর রচনায়

বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এই তৃতীয় ধারার রচনায় পল্লীগীতি বা শান্তীগীতির তুলনায় সুরের

প্রাধান্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। তবে তিন শ্রেণীর কবিরাই তখন মুখ্য তিনটি ছন্দরীতির

আশ্রয় নিয়েছিলেন! সুরাশ্রয়ী রচনায় ছন্দের রীতি ও রূপগত শৈথিল্য লক্ষিত হয়।

বোধহয়, গান গাইবার কালে কথক বা গায়ক সুর টেনে বা দ্রুত পঠনের সাহায্যে তখন

ছন্দ রক্ষা করতেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ্য কবিতায় সে তুলনায় ছন্দের সুনির্দিষ্টতা অনেক বেশী রক্ষিত হত। এখানে আলোচ্য যুগের অপর কয়েকজন গীতিকার ও পদ্য লেখকের রচনা-নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) গদ্যগ্রন্থ ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১) এবং ‘লিপিমাল্য পুস্তক’ (১৮০২) রচনা করে বাংলায় প্রথম গদ্যগ্রন্থের

রামরাম বসু লেখক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার-ত্রিপদীবন্ধে যিশুখুষ্টের ভজনাগীত রচনা বা অনুবাদ করেন। এ গানগুলিতে ছন্দোগত বিশেষ শৈথিল্য নেই। একটি ত্রিপদী বন্ধের (৮।৮।১০) দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি,—

ভবাবভ্রা যে বলিল কন্যাতে উদ্ভব হৈল

যিশুখ্রীষ্ট নাম বৈল তাঁর।

পাপের ‘প্রায়শ্চিত্য’ সেই তাকে বিশ্বাসিবে যেই

সে নরকে পাইবে নিস্তার ॥

(সা. সা. চ. ৬, রামরাম বসু)

কবি ছন্দের প্রয়োজনে হৈল, বৈল (বলিল) জাতীয় বানান এনেছেন। তবে তিনি যে নিছক ‘অক্ষর’ গুণে ছন্দের হিসাব করতেন না ‘প্রায়শ্চিত্য’ ত্রিকল শব্দটি তার নিদর্শন। গীতটিতে চারবার ‘প্রায়শ্চিত্য’ শব্দটি এসেছে, প্রতি ক্ষেত্রেই ত্রিকল উচ্চারণ রেখেছেন।

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থাদির জন্য বাংলা গদ্যের জনকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’

রামমোহন রায় (১৮২৮) নামক ক্ষুদ্র গীতিগ্রন্থটির প্রতি বিশেষকারও দৃষ্টি পড়েনি।

এ গ্রন্থে তাঁর ৩২টি ধর্মসঙ্গীত রয়েছে। সবগুলিই মিশ্রবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদীর শিথিল বন্ধে রচিত। এখানে দ্বিপদী + চৌপদী মিশ্রবন্ধে রচিত একটি গীত উদ্ধৃত করছি।

মিল : মাত্রা বিন্যাস

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।

কা ৪||১০ I

অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরন্তর ॥

কা ৮||৮ I

যার প্রতি যত মায়া,

খা|| ৮||

কিবা পুত্র কিবা জায়া,

খা|| ৮||

তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর ॥

—||কা ৮||৬ I

গৃহে হায় হায় শব্দ,

গা|| ৮||

সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,

গা|| ৮||

দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর ॥

—||কা ৮||৬ I

অতএব সাবধান,

ঘা|| ৮||

তাজ দস্ত অভিমান,

ঘা|| ৮||

বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর ॥

—||কা ৮||৬ I

পদ ও পংক্তির মিল ছাড়াও গীতটির শব্দগত ধ্বনি-অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮৩০-৩৪) এবং

জয়গোপাল

তর্কালঙ্কার

কাশীদাসী মহাভারত (১৮৩৬) এর পরিমার্জিত সংস্করণ (শ্রীরামপুর

মিশন প্রেস থেকে) প্রকাশ করে সে যুগে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রচলিত পুথিগুলির শিথিল-বিন্যস্ত ভাষাছন্দকে

তিনি যে বহুলাংশে আধুনিক মিশ্রবৃত্তের মাত্রাগত সুনির্দিষ্টতা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে তাঁর অনুবাদ কবিতা থেকে ‘বর্ণসংখ্যাত’ মিশ্রবৃত্ত পয়ারের একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল।—

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরাতন যত মুনীগণ।

এক চিত্তে নিত্যব্রহ্ম করুন ভজন ॥

আমরা যশোদাপুত্র বাল্যলীলা কথা।

সুধার সাগরে মন মজাই সর্বথা ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার)

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক এবং ‘স্বপ্ন

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

বাসবদত্তা’র যে বঙ্গানুবাদ করেছেন সেখানে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার-

ত্রিপদী-চৌপদী-একাবলী জাতীয় ছন্দোবন্ধের সূচু ব্যবহার লক্ষ করা

যায়। ‘শিশু শিক্ষা’ ১ম ভাগে (১৮৪১) তিনি অসংযুক্ত বর্ণ পরিচয়ের নিদর্শন হিসাবে যে কবিতা লিখেছেন এখানে তার থেকে সুপরিচিত একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।

কাননে কুসুমকলি, সকলি ফুটিল ॥

রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।

শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে ॥

ফুটিল মালতী ফুল, ‘সৌরভ’ ছুটিল।

পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পৃ. ৯৮-৯৯)

কবি এ-কবিতায় শুধু যুক্তবর্ণ বর্জনের চেষ্টা করেছেন তাই নয়, লঘু পর্বক মিল ও শব্দানুপ্রাসে কবিতাটি শিশুদের কানে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ‘সৌরভ’ শব্দটি ছাড়া এ-কবিতায় আর যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়নি। গুপ্ত কবির মতো মদনমোহনও সম্ভবত কমা চিহ্নের সাহায্যে ছন্দের যতি বুঝিয়েছেন।

রাধামোহন সেন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কয়েকটি কাব্য ও সংগীত গ্রন্থ রচনা

করে সে যুগের শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি

রাধামোহন সেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের রীতি, ছন্দ, মিল প্রভৃতি সম্পর্কেও

সচেতন ছিলেন। ‘সঙ্গীত তরঙ্গ’ গ্রন্থে তিনি বহু রাগ-রাগিনীর

ছন্দোবদ্ধ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ‘ভৈরব রাগ’ বিষয়ক মিশ্রবৃত্ত-একাবলীতে রচিত সংজ্ঞাটি থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি,—

সম্পূর্ণভাবে বেড়ান ফিরি।

ধৈবত গান্ধার দুয়েতে গিরি ॥

রিখভ সম্বাদি গান্ধার বাদি।

খরজ তাহাতে হবে অম্বাদি।

ছয়দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে।

অরুণ উদয়ে সকধা পাবে ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড রাধামোহন সেন)

রাধামোহন ভারতচন্দ্রের অনাদামঙ্গলের একটি ‘সংশোধিত’ সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে ভূমিকায় বলেছিলেন,—

ক্রম দোষ হয় অনাদার বন্দনায়।

ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায় ॥

অনুলিপি দ্বারাতে অশুদ্ধি ঘটয়াছে।

স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে ॥

কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা।

পরিবর্তে তথা তথা নূতন রচনা ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড, রাধামোহন সেন)

এমন সংশোধন এবং ‘নূতন রচনা’ জয়গোপাল ও কৃতিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতে করেছেন।— এতে মূল কবি যে অনেকাংশে স্মৃতি হয়ে পড়েন সংশোধক সে কথা ভাবেন না। তাছাড়া ভারতচন্দ্রের মতো ছন্দজ্ঞ কবির রচনায় রাধামোহনের হস্তবলেপে তার সূক্ষ্ম ছন্দোবধিনিময় কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হবারই আশঙ্কা রয়েছে। আলোচ্য ছন্দোবদ্ধ মন্তব্যটি আর যাই হোক, কবিত্বগুণ-সমৃদ্ধ নয় সে কথা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) নাট্যকার রূপেই বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি

অর্জন করেছেন। নাটকের সংলাপেই তাঁর কিছু পদ্যবন্ধ লক্ষিত হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

এখানে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) নাটকে প্রদত্ত উত্তম, মধ্যম এবং

অধম ফলার-বিষয়ক মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদীবন্ধে (৮॥৮॥১০১) রচিত সুপরিচিত সংজ্ঞা তিনটির একটি থেকে দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি

কচুরি তাহাতে খান দুই।

ছকা আর শাক ভাজা, মতিচূর বঁদে খাজা,

ফল যোগাড় বা ।

(সা. সা. চ, ১খণ্ড

রায়ণ তর্করত্ন)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) মুখ্যত গদ্যশিল্পী ছিলেন। তাঁর নববাবু

ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলাস, নববিবি বিলাস, দূতীবিলাস ইত্যাদি শ্লেষধর্মী কাহিনীগুলিতে
মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার লক্ষিত হয়। এখানে ‘সুকোমল পয়ারাদি
নানা ছন্দ রচিত’ দূতী বিলাস (১৮২৫) থেকে যুবতীদের অলঙ্কার

বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সঁতি অতি শোভাকর ॥
কানবালা কর্ণফুল কপালে পরেছে।
মনোহর মুক্তলচ্ছা তাহাতে দিয়েছে ॥
মুক্তনয় মুণ্ডিত লত নাসায় দুলিছে।
মঞ্জনে মার্জিত দন্ত দামিনী খসিছে ॥

সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায় ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড,

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৮-২৯)

কবি এখানে মিশ্রবৃত্ত পয়ারের শব্দ-বিন্যাসক্রম শুধু নিখুঁত রেখেছেন তাই নয়, প্রায়
প্রতি পংক্তিতেই ধ্বনি-অনুপ্রাসের অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (১৭৯৩-১৮৪৫) এ-যুগের আর একজন ছন্দ-সচেতন কবি।

তিনি কিছু সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপায়ণের প্রয়াস করেছেন; কিছু
রামচন্দ্র
তর্কালঙ্কার
নতুন বাংলা ছন্দোবন্ধেরও প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ যুগে
এমন নব ছন্দোবন্ধ রচনার প্রয়াসে অধিকাংশ কবিই সফল হতে

পারেননি; রামচন্দ্রও তার কিছু ব্যতিক্রম নন। এখানে তাঁর রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত
উদ্ধৃত করছি।—

পঞ্চাবলী ছন্দ

তোমার রূপে	সুধার কূপে	বন করেছে	আল।
ভস্ম মাথায়	সে বুড়াটায়	সাজবে না তো	ভাল ॥
পদ্মমুখে	গন্ধ সুখে	ভ্রমর করে	ভোগ।
সে ছার মুখ	দেখলে দুখ	পলাচ্ছে	ভোগ শোণ ॥

(সা. সা. চ, ১ম খণ্ড, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার)

প্রথম দুটি পংক্তি পাঠে মনে হবে, পঞ্চবর্ণ সমন্বিত পর্ব ব্যবহারের জন্যে কবি
এমন নাম রেখেছেন; কিন্তু তৃতীয় পংক্তিতে সে বিষয়ে সংশয় জাগে। তবে দলবৃত্তে,
কিছুটা শিথিল উচ্চারণে এটি পাঠ করা চলে।

পূর্বযুগের ধারাপথে যে সব কবিওয়ালা বা শাস্ত্রগীতিকার এ-যুগেও বিশেষ নাম

দাশরথি রায়,
কৃষ্ণকমল গোস্বামী,
কমলাকান্ত

করেছেন তাঁদের মধ্যে পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭),
কৃষ্ণযাত্রাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) এবং শান্ত
সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা
সকলেই মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্তের কিছুটা শিথিল উচ্চারণধর্মী

ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান এবং শান্তগীতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে উভয় গানেরই
একটি করে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

গৌর বলে আনন্দে মেতে,
একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে,
বাগ্গী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।
পাঁচালী বিল্বপত্র জবার ফুল,
দেখতে নারেন চক্ষুর শূল,
কালীনাম শুনলে কানে হস্ত।

কিবা ভক্তি কি তপস্বী,
জপের মালা সেবাদাসী,
ভজন কুঠরী আইরী কাঠের বেড়া।
গোসাঞিকে পাঁচ শিকে দিয়ে,
ছেলেশুদ্ধ করেন বিয়ে,
জাত্যাংশে কুলীন বড়ো নেড়া ॥

(দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ সং, পৃ. ৫৪৬)
শিথিল দলবৃত্তভঙ্গিম এই মিশ্র-ত্রিপদী-টোপদী ছন্দোবন্ধে সমাজ-সচেতন লোককবি
তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের নৈতিক অবনতির চিত্র চমৎকার ফুটিয়েছেন।

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো ॥
শান্তগীতি কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার।
মায়ের প্রতি মায়া নেই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥

(অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত শান্ত পদাবলী, আগমনী, ১১নং)

মিশ্রবৃত্তের একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দাবল্লের সংমিশ্রণে, কিছুটা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে কবি এ গীত রচনা করেছেন। ছয়মাত্রার পর্ব এবং বারোমাত্রার পদবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। তাছাড়া, অনুপ্রাস-যমকের তৎকালে প্রচলিত ধারাটি দাশরথি সম্বন্ধে রক্ষা করেছেন।

কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনী, স্বপ্নবিলাস, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি পালা সে যুগে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সুরাশ্রয়ী গল্পবর্ণনের একটি বিশেষ রীতি কৃষ্ণযাত্রায় অনুসৃত হত। এখানে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

রাধা। হায়! কি করিব গো, আমি বঁধুর লাগি—

তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,

(ধরা চূড়া পরে গো সুবলের,—)

গেলাম আমি সুবল হইয়ে।

দেখি, নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অমনি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে,

রাখিলাম শ্যামে হিয়ার উপরি;

(—কত যতন করে গো, সে যতনের ধনে,—)

আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে,

কোথা আমার পরাগকিশোরী!

(সুবল বল্ বল্বে, — কেঁদে কেঁদে বলে।)

(দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃ ১৬০১)

শিখিল বিন্যস্ত দলবৃত্ত রীতিতে কবি গানটি রচনা করেছেন। সংলাপী আমেজ এ গানের মুখ্য আকর্ষণ বলা যেতে পারে।

কমলাকান্ত রামপ্রসাদী আদর্শেই শক্তিদেবী ও উমা বিষয়ক গীত রচনা করেছেন। তিনিও রামপ্রসাদের মতো দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। তবে রামপ্রসাদের পক্ষপাত যেমন লৌকিক দলবৃত্তের প্রতি, কমলাকান্তের বেশীরভাগ গীত তেমনি মিশ্রবৃত্তে রচিত হয়েছে। এখানে কবির দুই রীতির দুটি গীত উদ্ধৃত করছি।—

মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী + ত্রিপদী + চৌপদী

যতিভাগ

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।

৪।১০।

হরিষে বিষাদে, প্রমোদে প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে।

৬।৬।৬।৪।

মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্করশিব,

৮।৮।

আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে।

৮।৬।

পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,

৮।৮।

ঘরে আমি কি কব রাগীরে ॥

১০।

দূরে থাকি শৈল-রাজা, দেখি শ্রীমন্দির-ধ্বজা,

৮।৮।

পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে।

৮।৬।

মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে ॥

৮॥৮॥

১০।

(অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত শান্তিপদাবলী আগমনী ৩১নং গীত)

দলবৃত্ত দ্বিপদী

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী গো মা !
তুমি আপনসুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশি ভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত বলে দিয়ে গালাগালি—
এবার সর্বনাশি, ধ'রে অসি, ধর্মাধর্ম দুটোই খেলি ॥

(ঐ, মা কি ও কেমন, ১৪৯ নং গীত)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, রামপ্রসাদের তুলনায় কমলাকান্তের গীতে ছন্দের গঠনগত শৈথিল্য বা নমনীয়তা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

সন্ধিযুগের কাব্যধারার ছন্দ-বিবর্তন-বিষয়ক আলোচনা এখানে শেষ করা যেতে পারে। প্রতিভার বিচারে এ-যুগে কোনও শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটেনি, সেকথা সত্য। তবু একথাও স্বীকার্য, এ-যুগের লেখকবৃন্দ ছন্দের রূপ-রীতিকে পাঠ্যকাব্যোচিত একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করবার ফলেই পরবর্তী কবিদের, বিশেষ করে মধুসূদনের কাব্যে বিষয়, ভাব এবং আঙ্গিকের দিক থেকে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সেদিক থেকে বিচারে, আলোচ্য যুগের ছন্দ-বিবর্তনের পরিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত যুগ-বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সূত্রাকারে আর একবারে স্মরণ করা যেতে পারে।—

(১) বিষয় এবং আঙ্গিক, — উভয়দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধির কবি। একদিকে, তাঁর রচনায় সুরাশ্রয়ী কবি-সংগীত ও গ্রাম্য হুড়াগানের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, অপরদিকে, সম্পূর্ণ সুর-নিরপেক্ষ তথ্যধর্মী কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। লৌকিক রীতির রচনায় যেমন দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন, দ্বিতীয় ধরনের রচনায় তেমনি মিশ্রবৃত্তকে মুখ্য ছন্দবাহন করেছেন।

(২) এ-যুগেই প্রথম শ্রাব্য, সুরাশ্রয়ী কবিতার সুর-নিরপেক্ষ পাঠ্য কবিতায় রূপান্তর ঘটল। ছাপাখানার প্রচলন এবং ইংরেজি-মাধ্যমে পাশ্চাত্য কাব্যের সঙ্গে পরিচয় এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করল।

(৩) গুপ্ত কবির রচনাঙ্গিকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। মুখ্যত তিন ছন্দোবৃত্তির প্রয়োগে এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধের নির্মাণ-কৌশলে এই দুই পূর্বসূরী কবির প্রভাব পড়েছে। ভারতচন্দ্রের মতো গুপ্তকবিও পদ্যের অলঙ্করণ বা কার

বিষয়ে সচেতন ছিলেন। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী, ষট্পদী ইত্যাদি নামোল্লেখ, স্ববকবন্ধের নতুন নতুন নামকরণে, ছন্দযতিসূচক কমা-দাড়ি চিহ্নের ব্যবহারে গুপ্তকবির ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় মেলে।

(৪) ভারতচন্দ্রের মতো ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁর কবিতায় ‘যাবনী মিশাল’ শব্দাবলী ব্যবহার করে বাংলা কাব্যের শব্দৈশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর বিবিধ পদ্যে হিন্দী, উর্দু এবং ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

(৫) উচ্চারণানুগ বানানে কথ্যভাষার ব্যবহার কবির বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। তিনি এখানে কাব্যের ভাষাকে যথাসম্ভব উচ্চারণ-কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

(৬) গুপ্তকবি বিশেষ এক ধরনের গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। সেখানে ধ্বনি-অনুপ্রাস এবং ছন্দের আমেজ মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হয়েছে। অনেকটা এই ধরনের ছন্দ-মিল-প্রভাবিত গদ্যভাষা পরবর্তীকালে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছিলেন। গুপ্তকবির তুলনায় অবনীন্দ্রনাথের ভাষা অবশ্য অনেক বেশী শিল্পিত ও পরিশীলিত।

(৭) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যে মুখ্য তিনটি ধারা লক্ষিত হয়।—

(ক) লৌকিক গান ও ছড়া, (ক) প্রসাদী সংগীত এবং (গ) নগর-সংস্কৃতিমুখীন ‘শিষ্ট কাব্য’। ছন্দের ও মুখ্য তিনটি ধারা ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লৌকিক গান ও ছড়ায় দলবৃত্তের প্রাধান্য থাকলেও শিথিল উচ্চারণভঙ্গির মিশ্রবৃত্তও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসাদী গীত সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। নবযুগের শহরকেন্দ্রিক শিষ্ট কবিতায় মিশ্রবৃত্তই মুখ্য ছন্দবাহন হয়েছে। সংস্কৃত স্তোত্রাদির আদর্শে রচিত ধর্ম-সংগীতে লঘু-গুরু উচ্চারণ-সমন্বিত কলাবৃত্তের ব্যবহার লক্ষিত হয়। গুপ্তকবির কাব্যে এই তিন ভাবধারার এবং ত্রি-ছন্দধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮) এই যুগের মুখ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অপর যাঁরা গীত বা পদ্য রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রামরাম বসু, রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাধামোহন সেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ভবানীরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি লেখকদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের কাউকেই অবশ্য মূখ্যত কবি বলা চলে না।

(৯) কবিগান বা প্রসাদীগান রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ গীতকারদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

(১০) সন্ধিযুগের মুখ্য ছন্দশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পাশে থেকে উল্লিখিত লেখক ও গায়কগণ এ-যুগের কাব্যধারাকে কিছুটা পরিপুষ্ট করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার মধ্যযুগের প্রখ্যাত কাব্যগুলি পরিমার্জিত করেও পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন। এই ভাবেই নবযুগের কাব্যের জন্য ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। রঙ্গলালের হাতে সেই নবযুগের সূচনা এবং মধুসূদনের হাতে তার বলিষ্ঠতম বিকাশ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ঘটেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

রঙ্গলাল-মধুসূদনের যুগ (১৮৫৮-১৮৭৩)

(ক)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে নব রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল ছন্দে (১৮২৭-১৮৮৭)। রোমান্টিক দেশপ্রেমমূলক কাব্য লিখতে গিয়ে
ভাবমুক্তির সূচনা সেই কাব্যের উপযোগী ছন্দ উদ্ভাবনে তিনি সচেতন হয়েছিলেন।

বাংলা ছন্দে প্রবহমান পয়ার প্রবর্তন করে মধুসূদন ভাবমুক্তির যে
নতুন পথ তৈরী করেছেন, কিছুটা দুর্বল এবং অস্পষ্ট হলেও তার সূচনা হয়েছে রঙ্গলালের
'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যে।

চর্যাগীতি থেকে গুপ্তকবির কাব্য পর্যন্ত, অর্থাৎ দশম থেকে ঊনবিংশ শতকের
প্রথমার্ধ পর্যন্ত, বাংলা কাব্যের বিবর্তনধারায় মুখ্য তিন ছন্দোবীতির বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে
সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও, ছন্দে ভাবমুক্তির কথা কোনো কবিই এতকাল চিন্তা করেননি।
তাঁরা সকলেই মুখ্যত 'মিত্রাক্ষর' ছন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। আধুনিক যুগে ছাপাখানার
প্রভাবে বিভিন্ন রীতির বাংলা ছন্দে যে মাত্রাগত সুনির্দিষ্টতা এসে গিয়েছিল, গুপ্তকবির
কাব্যেই তা লক্ষ করা গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত বাকধর্মী ভাষারীতি এবং বিদেশী ও দেশী গ্রাম্য
শব্দাবলীর ব্যবহারে ছন্দে অনেক বেশী নমনীয়তা এনে দিয়েছিলেন। তবু স্বীকার করতে
হয়, কবিতায় কৃত্রিম ছন্দবন্ধন থেকে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে মুক্তি দেবার, এবং সেই
পথে কাব্যের ছন্দে গঠনগত পরিবর্তন সাধনের কথা তিনি আদৌ চিন্তা করেননি। বরং
ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নতুন নতুন পথে ছন্দের অলঙ্কার-বৈচিত্র্য সৃষ্টির
উপায়গুলিই ভেবেছিলেন। মিল-অনুপ্রাসের ফুলঝুরিতে, যতিপ্রান্তিক পংক্তির নানাবিধ
পর্ব-ও পদ-সমন্বিত বিন্যাসে ছন্দের ধ্বনিমধুর্য বাড়তে চেয়েছিলেন। সে-ছন্দে ভাবের
প্রবহমানতা সৃষ্টির কোনো প্রয়াসই ছিল না। বাংলা কাব্যের ভাব ও ছন্দে যথার্থ
আধুনিকতার সূচনা হয়েছে রঙ্গলালের হাতে। যে-যুগে স্পন্দমান গদ্য রচনা করে
বিদ্যাসাগর বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং অক্ষয়কুমার (দত্ত), দেবেন্দ্রনাথ
ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সেই ধ্বনিগম্ভীর গদ্য আরও পরিণত হয়ে উঠেছিল, সেই যুগেই
রঙ্গলাল বাংলা পদ্যে নব রোমান্টিক বিষয়োপযোগী ভাবগম্ভীর ও স্বচ্ছন্দ মিশ্রবৃত্ত রীতির
ছন্দ ব্যবহার করে এতদিনের গতানুগতিকতা ভেঙে দিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নব
দেশপ্রেমমূলক রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি 'মিত্রাক্ষর' অর্থাৎ

যতিপ্রান্তিক ছন্দের পূর্বতন ‘jingling monotony’,— সুললিত মিলের একঘেষেমী পরিহার করতে চেয়েছেন। তৎকালপ্রচলিত গদ্যের বাকধর্মী ভাবপ্রবহমানতা পদ্যের ছন্দবন্ধনেও প্রবর্তন সম্ভব কিনা তারই পরীক্ষা করেছেন। সেদিক রঙ্গলাল : থেকে তিনি মধুসূদনের পূর্বসূরী। ছন্দে ভাবমুক্তির অস্পষ্ট আভাস মধুসূদনের পূর্বসূরী ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ই সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে ১৮৫৯-তে প্রকাশিত মধুসূদনের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ এই ভাবমুক্তির বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলা কাব্যে এক অভিনব রসাস্বাদ বহন করে এনেছে। রঙ্গলাল পদ্যছন্দে ভাবমুক্তির সূচনা করেছেন, — মধুসূদন যৌবনের শৃঙ্খলমুক্ত প্রাণবন্ধ্যার আবেগে তাতে তটপ্লাবী প্রবহমানতা এনে দিয়েছেন। এতদিনের নৃত্যচটুল এবং গীতিকোমল বাংলা পদ্যছন্দ রঙ্গলাল-মধুসূদনের হাতে বাকধর্মী স্বাভূতা এবং ভাবধর্মী বলিষ্ঠতা লাভ ক’রে নবযুগের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ক’রে দিয়েছে। রঙ্গলাল-মধুসূদন-যুগ বাংলা ছন্দে আধুনিকতার,—ভাবমুক্তির প্রথম যুগ।

১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ এই তেইশ বছর মোটামুটিভাবে রঙ্গলালের কবিজীবন ধরা যেতে পারে। এই যুগে তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) কর্মদেবী (১৮৬২), শূর সুন্দরী (১৮৬৮), কুমারসম্ভব (১৮৭২), নীতিকুসুমাজ্জলি (১৮৭৬), এবং কাঞ্চীকাবেরী (১৮৮০)—এই কয়টি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে একমাত্র ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যটি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের পূর্বে রচিত হয়েছে। ছন্দবৈচিত্র্যের দিক থেকেও রঙ্গলাল নতুন আর কোনও মৌলিকতা দেখাতে পারেননি।

শেকসপীয়রের প্রবহমান ছন্দ রচনার আভাস ক্ষীণভাবে হলেও, মার্লো, গ্রীণ এবং ছন্দে ভাবমুক্তির পীলের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। স্যাক্ভিল লিখিত তৎকালীন প্রথম সচেতন Gorboduc নাটকে প্রবহমান ছন্দের অপরিণত সূচনা লক্ষিত হয়। প্রয়াস এই যুগের কবিদের ছন্দসম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ছান্দসিক জর্জ সেন্টসবেরী মন্তব্য করেছেন,—

The majesty of Marlowe, the sweetness of Peele, the grace which Greene manages sometimes to give, are all achieved without, and therefore all limited by want of enjambment and equivalence. The gain in dignity, in finish, even in ease, is real and great; but it is accomplished within the line, and for the most part within the iambic foot.

[G. Saintsbury : Hist of Eng. Prosody, Vol I : p. 343-344]

১। রঙ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ ১৮৫৮তে জুন-জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ ১৮৫৯ জুলাই থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’ প্রকাশিত হতে থাকে। মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে যে প্রবহমান মুক্তকাভাসযুক্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয় তার প্রকাশ ১৮৫৯ মে মাসের পূর্বে।

রঙ্গলালের পয়ার-বন্ধ সম্পর্কেও এই উক্তি অনেকাংশে প্রযোজ্য। এই যুগে সাধু বাংলার রচনারীতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অনতিলক্ষ্য ছন্দঃশ্রোত^৩ রক্ষা করে ভাষার ধ্বনিসৌন্দর্য এবং গতিস্পন্দ এনে দিয়েছিলেন, কাব্যছন্দে তারই রূপায়নে রঙ্গলাল উদ্যোগী হয়েছিলেন। ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে স্বাধীন ভাবপ্রকাশের পক্ষে কতটা উপযোগী করে তোলা যেতে পারে, গীতি-সুরাশ্রয় থেকে মুক্ত করে তাকে কতখানি বাকধর্মী সাধু গদ্যভাষা পঠনের স্বাভাবিকতা দেওয়া যেতে পারে, রঙ্গলাল সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে সচেতন পরীক্ষা করেছেন। সাফল্যের জয়মাল্য তিনি অর্জন করতে না পারলেও,— ছন্দে ভাবমুক্তি-পথের প্রথম পথিকরূপে যে দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়।^৪

গুপ্তকবি যে ভারতচন্দ্রের আদর্শে কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কারু-সৌন্দর্যের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন তার মুখ্য কারণ গুপ্তকবির হল, নব ভাবের কোনও ঐশ্বর্য নিয়ে রহস্যময়ী কাব্যলক্ষ্মী তখনো সঙ্গে পার্থক্য কবির কাছে ধরা দেননি। বাংলা কাব্যে নব রোমাণ্টিক ভাবনার প্রথম রূপকার হলেন রঙ্গলাল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রদর্শিত গুপ্তকবির অধিকাংশ দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যের ভাবগত রিক্ততা এবং মাত্রাতিরিক্ত বহিরঙ্গ অলঙ্করণ-ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। তুলনামূলক বিচারের সুবিধার জন্য এখানে পাশাপাশি উভয় কবির দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

গুপ্তকবি লিখেছেন,—

(১) বঁধু বধু মধু পানে মত্ত হয়ে ঢলিলে।

প্রেমভরে নলিনীর নলিনাক্ষ ঢলিলে ॥

আমারে প্রবোধ দিয়া মিছাছলে ছলিলে।

সোহাগের সোহাগায় সোনা হয়ে গলিলে ॥

(ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী

বসুমতী সং, ১৩১১, মন ভ্রমরের প্রতি করুণা মুকুল)

২। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে,—

... বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃশ্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

(চারিত্রপূজা বিদ্যাসাগর চরিত)

৩। বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা-নির্দশন ‘শকুন্তলা’র রচনাকাল ১৮৫৪। ‘কথামালা’ এবং ‘চরিতাবলী’ ১৮৫৬তে রচিত হয়। সুতরাং রঙ্গলালের পক্ষে বিদ্যাসাগরের সুখপাঠ্য গদ্যরচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

- (২) হকুম জাহির করে দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির জাঁক শিবির গাড়িয়া ॥
চোটপাট জোটপাট আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধরে ॥

(ঐ বড়দিন)

ধ্বনি-অনুপ্রাসের এমন অলংকরণের বাড়াবাড়ি ঈশ্বরগুপ্তের অধিকাংশ পদ্যেই লক্ষিত হয়। মিলবিন্যাসেও গুপ্তকবি ললিত মিল (feminine rhyme)-এর মিলের কোমলতা বেশী পছন্দ করতেন। এমন পদবিন্যাসে ভাবের বাকধর্মী দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলা কঠিন। রঙ্গলালের রচনারীতিতে এত অলংকরণ নেই। সে জন্যেই ভাব সেখানে সংহত হতে পেরেছে। যেমন—

- (১) ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে, ধিক ওরে দুষ্ট যবন পামর ॥
এই কি যোদ্ধার ধর্ম রে রে দুরাচার?
এই কিরে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার?

(পদ্মিনী উপাখ্যান ভীমসিংহের বন্ধনদশা প. ৬৩-৬৬)

- (২) শুনিযে পিতার বাক্য নির্ভয়-হৃদয়।
ধরিল সমর-সজ্জা রাজপুত্রচয় ॥
হায় একি পরিতাপ! একি মনঃক্লেশ?
মৃত্যুমুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ ॥
যৌবন-সাহস-বীর্য-রূপ-গুণধর।
এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
এ হেন কুমারচয় মরিবে অকালে।
হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ প. ৩৩-৪০)

গুপ্তকবি চেয়েছেন, সুললিত ছন্দের সঙ্গে অনুপ্রাস অলঙ্কার বিন্যাসে পাঠকের কানকে তৃপ্ত করতে। অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ধ্বনি-অনুপ্রাস একঘেয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠকের (বা শ্রোতার) মনকে অবসন্ন করে আনে। ভাবের প্রবাহ সেখানে সুনির্দিষ্ট ছন্দের তালে খণ্ডিত ও সীমিত হয়ে কিছুটা গোঁণ হয়ে পড়ে। ছন্দের কারুরূপেই সেখানে প্রাধান্য নিয়ে ধ্বনিনিষ্কণ্ণে শ্রোতাকে তৃপ্ত করতে চায়। প্রকৃত কাব্যরসিক এমন ছন্দ অলঙ্করণের একঘেয়েমী এবং ভাবের সশঙ্কিত কুণ্ঠিত পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে পছন্দ করতে পারেন না। রঙ্গলাল অলঙ্কার-বাহুল্য কমিয়ে, ললিত মিলবিন্যাস পরিহার করে এবং চৌদ্দ মাত্রার পয়ার-পরিসরেও যথাসম্ভব ভাষাকে বাকধর্মী করে, ভাবের প্রবাহকে আংশিক মুক্তি দিলেন। তিনি ‘পদ্মিনী উপাখ্যানে’র ভূমিকায় লিখেছেন, “আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা

ইংলণ্ডীয় আদর্শ
অনুসরণ

আমার বহুদিনের অভ্যাস।” ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবধর্ম এবং দৃঢ় বাকপর্বিক প্রকাশভঙ্গি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তারই ফলে বাংলা কাব্যের পূর্বতন ধারা বর্জন করে দেশপ্রেমমূলক রোমান্টিক ইতিহাস-কাহিনী অবলম্বনে আখ্যায়িকা কাব্য লিখেছেন।— সেখানে ছন্দকেও যথাসাধ্য ভাবানুগ, দৃঢ় উচ্চারণধর্মী করতে চেষ্টা করেছেন। ইংলণ্ডে ষোড়শশতকের কবিগোষ্ঠী (মার্লো-গ্রীণ-পীল) যেমন শেকসপীয়র ও মিল্টনের Blank-verse রচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, রঙ্গলালও তেমনি মধুসূদনের প্রবহমান ছন্দ রচনার পথ সুগম করে দিয়েছেন বলা চলে। ইংলণ্ডীয় এই কবিগোষ্ঠীর মতো রঙ্গলালেরও ছন্দের দুর্বলতা প্রধানতম দুর্বলতা হল, তিনি চৌদ্দ মাত্রার পংক্তি-পরিসরের মধ্যে, — এমনকি অনেকসময় পয়ারের আট-ছয় মাত্রার পদবন্ধের মধ্যেই ভাবের ক্ষেত্রে ‘majesty, grace and sweetness’ আনতে প্রয়াস করেছেন, — সে কারণেই এই প্রয়াস দুর্বলতর হয়েছে। যেখানে এই সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রার পদভাগ থেকে ভাবপ্রবাহকে কিছুটা মুক্ত করতে পেরেছেন সেখানে ইংলণ্ডীয় রোমান্টিক যুগের ছন্দ-দৃঢ়তা, বিদ্যাসাগরী বাংলা গদ্যের ‘অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত’ আংশিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান এবং পরবর্তী কাব্যগুলিতে রঙ্গলাল বহুক্ষেত্রেই আট-ছয় মাত্রার পদযতি পরিবর্তন করে সুনির্দিষ্ট পদযতি তুলে দিয়ে, কেবলমাত্র পংক্তিশেষে যতি রেখে ভাবমুক্তির চেষ্টা ছন্দে ভাবমুক্তির নতুনতর পরীক্ষা করেছিলেন। এখানে পদ্মিনী উপাখ্যান থেকে দু একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

(১) অধার্মিক । বিশ্বাসঘাতক দুরাচার ।

সকল জাতির প্রতি । ঘোর অহঙ্কার ॥

যায় যাক রাজ্যধন, । যায় যাক দেশ ।

যায় যাক বংশ, । ক্ষত্রকুল হোক শেষ ॥

কোনোমতে পদ্মিনীরে । না পারিবি নিতে ।

কার সাধ্য । অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে?

(পদ্মিনী উপাখ্যান, ভীমসিংহের বন্ধনদশা পংক্তি ৩-৪, ৭৩-৭৬,

ঐ পৃ ৫৬-৫৮)

(২) তদন্তে শোভিত । দেবালয় দুই ভিতে ।

পণ্যবীথি পূর্ণ । সারি সারি পসারিতে ॥

না দেখে পর্য্যঙ্কে । মহীপতি-মৃত কায় ।

কেবল প্রফুল্ল পদ্মজাল । শোভাপায় ॥

যাঁর প্রিয়তমা । সে পদ্মিনী মনোরমা ।

রূপে, গুণে, জ্ঞানে, । অবনীতে অনুপমা ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান সূচনা পংক্তি ৬৭-৬৮, ১৪১-১৪২, ১৫৩-১৫৪)

ঐ পৃ. ২২-২৬)

সমগ্র পদ্মিনী-উপাখ্যানে কবি মোট ৭০৮টি পয়ার পংক্তি (মালঝাঁপ পংক্তি এ হিসাবে ধরা হয়নি) লিখেছেন। সেখানে ৮২বার কবি আট-ছয় মাত্রাভাগের প্রচলিত পদযতি ভেঙে দিয়েছেন।— অর্থাৎ প্রায় প্রতি নয় পংক্তিতে একবার করে এমনটি ঘটেছে। সুতরাং এই রীতিটি আকস্মিকভাবে এসেছে বলা চলে না। ভাবমূর্তির প্রচেষ্টা হিসাবেই কবি এমন পরীক্ষা করেছেন। তিনি কোনও ক্ষেত্রেই চারমাত্রার কমে বা দশমাত্রার বেশীতে পদযতি দেননি। সর্বত্র যে সৃষ্টি যতিবিভাগ করতে পেরেছেন এমন নয়।— তবু ছন্দে বাকধর্মী ভাবমূর্তির প্রথম প্রয়াস হিসাবে পুরাতন ‘পয়ার ছাঁদে’র এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা উপেক্ষণীয় নয়। ভাবপ্রবাহকে সূনির্দিষ্ট পদভাগের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে হলে ছন্দে যে পংক্তিসীমাকেও অতিক্রম করে যেতে হয়, ইংরেজি Blank-verse এর অগ্রদূত মার্লো-গ্রীণ-পীল যেমন সেটি বৃদ্ধিতে পারেননি, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রঙ্গলালও সেটি ধরতে পারেননি। শেকসপীয়র এবং মিল্টনের মিলিত ভূমিকা বাংলা কাব্যে মধুসূদন একাই গ্রহণ করেছিলেন বলা চলে।

দশমাত্রার পংক্তি, ছয় বা আটমাত্রার পদের তুলনায় ভাবের মূর্তি সাধনে অনেকটা বেশী উপযোগী, রঙ্গলাল একথা উপলব্ধি করেছিলেন। পয়ারে চার এবং দশমাত্রার পদবিন্যাস তিনি সে কারণেই করেছেন, কিন্তু পংক্তিমাপ চোদ্দমাত্রায় সীমায়িত করলে অসুবিধা থাকে। দশমাত্রার পদক্ষেপে কিছুটা ভাবমূর্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় বলেই তিনি আট এবং দশ মাত্রার দীর্ঘ পদক্ষেপের উপযোগী আঠার মাত্রার ‘মহাপয়ার’ পংক্তি প্রবর্তন করলেন। মহাপয়ার রচনায় তিনি দীর্ঘ ত্রিপদী, (৮||৮||১০) থেকে প্রথম আটমাত্রার একটি পদ বর্জন করেছেন।— এই ছন্দে পয়ারের (যতিপ্রাস্তিক) তুলনায় অনেক বেশী ভাবের মূর্তি সাধন সম্ভব। উদাত্ত গম্ভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ যে বেশ উপযোগী রঙ্গলাল প্রথম সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-সহ অন্যান্য অনেক কবি মহাপয়ারবন্ধ বিচিত্রভাবে, বিভিন্ন ছন্দ-প্রকৃতিতে ব্যবহার করেছেন।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পদ্যে আঠারোমাত্রিক পংক্তি বিক্ষিপ্তভাবে কদাচিত ব্যবহৃত হলেও^৪ পূর্ণাবয়ব মহাপয়ার-বন্ধের কবিতা ইতিপূর্বে কোনও কবিই রচনা করেননি।—

৪। যেমন —

(১) হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈতমন্দিরে চল যাই।

নিমাই আইল তাহা কহিল নিতাই ॥ (বৈষ্ণবপদাবলী বল্লভদাস)

(২) দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।

কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়

নয়ন ভরিয়া দেখসিয়া ॥ (বৈষ্ণবপদাবলী যাদবেন্দ্র দাস)

এ ছন্দের বাকধর্মী ভাবপ্রকাশক শক্তি সম্পর্কেও ইতিপূর্বে কোন কবিই সচেতন হননি। সেদিক থেকে বাংলা ছন্দে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহাপয়ার কবিতা হিসাবে পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের ‘অরিসিংহের যুদ্ধ বর্ণনা’ অংশটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কবিতাটি সম্পূর্ণ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

মহাপয়ার

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার ॥
সেইদিন রাজা তথা পরিহরি ছত্রসিংহাসনে।
রাজ্যপাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে ॥
অরিসিংহ নাম তার, অরিপক্ষে সিংহের সমান।
তিনদিন পরে শূর সৈন্যোতে রণভূমে যান ॥
ঘোরতর রাগ নাগ গরলে অন্তর জরজর।
অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
কোটি কোটি তারা-মাঝে মৃগাক্ষের প্রভাব যেমন।
অস্থির শত্রুর দল চারিদিকে করে পলায়ন ॥
কিন্তু সে পাঠান-সেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান।
সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান ॥
যেন কোটি ক্রৌঞ্চসহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে।
বিশেষে যবন সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে ॥
যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরনী-উপর ॥
সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বলহত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন বিগত ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান

অরিসিংহের যুদ্ধবর্ণনা)

আঠারো মাত্রার আঠারোটি পংক্তিতে এই পদ্যাংশ রচিত হয়েছে। সমগ্র পদ্যাংশে মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, শব্দগ্রন্থন-রীতি এমন কি পদবিভাগেও কোথাও কোনও শৈথিল্য প্রকাশ পায়নি। সুনির্দিষ্ট আট-দশ মাত্রার পদভাগে পংক্তি রচিত হয়েছে। পরীক্ষামূলক এই প্রথম রচনাতেই কবি তাঁর ইঙ্গিত ধ্বনিগাঙ্গীর্ষ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াসে অনেকাংশে সফল হয়েছেন, স্বীকার করতে হয়।

(৩) দ্বিজ ঈশান কয় কন্যা আরে না কর ক্রন্দন।

বিধির নির্বন্ধ থাকলে কন্যা আরে অবশ্য মিলন ॥

(মৈমনসিংহ গীতিকা পৃ. ১৭০)

পদ্মিনী উপাখ্যানে দ্বিপদী এবং ত্রিপদী পংক্তির সমন্বয়ে দ্বিপত্রিক স্তবক রচনায় কবি দীর্ঘ আট ও দশ মাত্রার পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। সেখানেও স্তবক রচনা বাকধর্মী গদ্যভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন মনে হয়। ভাবমুক্তির উদ্দেশ্যেই তিনি দীর্ঘ পদভাগের ত্রিপদীবন্ধও পছন্দ করেছেন অনুমিত হয়। যেমন,—

দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।
হইল মাহেন্দ্রক্ষণ, অস্থির শাহার মন,
সচকিত হইল লোচন ॥
করিতেছে ছায়া দরশন,
হেন সব মায়ার রচন,
কাচেতে কাঞ্চন-কাঙ্ক্ষি চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূর্তি বিমোহন ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান পদ্মিনী প্রদর্শন, প. ৩৯-৪২)

প্রাচীন ছন্দরীতির প্রভাব রঙ্গলাল সর্বতোভাবে অতিক্রম করেননি। এগার মাত্রার একাবলী পংক্তি, ভূজঙ্গপ্রয়াতের সংস্কৃত লঘু-গুরু কৃত্রিম উচ্চারণ-রীতির পংক্তি, প্রাচীন ছন্দের মালঝাঁপের চতুর্মাত্রক, পর্বমিল দেওয়া পংক্তি, স্তোত্রের সংস্কৃত প্রভাব উচ্চারণ-প্রভাবিত দশ মাত্রার পংক্তি ইত্যাদি রচনায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। পদ্মিনী উপাখ্যানের একটি উদ্দীপন ভাবমূলক পদ্যে কবি ছন্দের ভাবপ্রকাশক শক্তির সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। যথা,—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

(পদ্মিনী উপাখ্যান ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য, ঐ প. ১-২)
উদ্দীপন ভাব প্রকাশে এখানে পদের পুনরুক্তি এবং উৎসাহবোধক মূক্ত একদল শব্দ ‘হে’-এর প্রসারিত দ্বিকলমাত্রক উচ্চারণ ছন্দের ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধি করেছে।— এ ছন্দোবন্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গুপ্তকবি লিখেছেন,—

দয়াময় তোমাবিনা আর কিছু চাইনে।
আর কিছু চাইনে।
তব নামসুধা বিনা আর কিছু খাইনে,
আর কিছু খাইনে ॥

(ঈ. গু. গ্রন্থাবলী, বসু সং, পৃ. ৩২)

তবে গুপ্তকবির তুলনায় রঙ্গলাল ভাব-সংহতির গুণে এ কবিতায় অনেক বেশী ধ্বনির দৃঢ়তা আনতে সক্ষম হয়েছেন।

পূর্বেই বলেছি, রঙ্গলাল গুপ্তকবির অব্যবহিত পরে এসে যে পুরোপুরি পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়াতে পারেননি ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালঝাঁপ, একাবলী, নয়মাত্রা পংক্তিক স্তোত্র পূর্বসূরী কবিদের (লঘুগুরু-কলাবৃত্ত) জাতীয় ছন্দোবন্ধের ব্যবহারেও তার সাক্ষ্য বহন করছে। এমনকি, মিশ্রবৃত্ত পয়ার বন্ধের ব্যবহারেও মাঝে মাঝে তিনি ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির ধ্বনি-অলঙ্কারের মোহে পড়েছেন দেখা যায়। যেমন,—

আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।

সঙ্গিনীকুলের কুল খাইতে আকুল ॥

কবি কহে ‘এ নহে’ নারিকেলি কুল।

কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল ॥

(প. উ., ভীমসিংহের পরিব্রাজ, পৃ ১৭১-৭৪)

তবু একথা অবশ্যই স্বীকার্য, রঙ্গলালই প্রথম অলঙ্কারবহুল ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দের ‘jingling monotony’ কাটিয়ে তাকে নব ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছিলেন।

মিশ্রবৃত্তকে ভারতচন্দ্র যেমন বহুলাংশে বর্ণসংখ্যাত করে তুলেছিলেন, ঈশ্বরগুপ্ত আবার তাকে উচ্চারণগত কিছুটা নমনীয়তা এনে দিয়েছিলেন। এই নমনীয়তা রঙ্গলাল ও মধুসূদনও প্রয়োজনবোধে রক্ষা করেছেন। মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণে প্রয়োজনমতো কবি যে বিশ্লিষ্টতা ও সংশ্লিষ্টতা এনেছেন এখানে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

উচ্চারণ- (১) নিজহস্তে ‘পদ্মিনী’ লিখে পত্রোত্তর।
বিশ্লিষ্টতা ধরণী ঈশ্বরী পদে প্রণাম বিস্তর ॥

(প. উ. শিবিরে গমন, প. ৪৫-৪৬)

(২) কুসুম চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয়।

‘কোমলা’ বালা বলি যাহাদের কয় ॥

(ঐ, ভীমসিংহের পরিব্রাজ, প. ৭৩-৭৪)

এখানে ‘পদ্মিনী’ এবং ‘কোমলা’ শব্দদুটি মিশ্রবৃত্তের মাত্রাগণনারীতি লঙ্ঘন করেই কবি চতুর্মাত্রক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে আবার,

উচ্চারণ- (১) গুঁড়া করি ছড়াইব ‘মসজীদের’ দ্বারে।

সংশ্লিষ্টতা দেখিব ‘সয়তান-বাচ্ছা’ কি করিতে পারে ॥

(প. উ., ভীমসিংহের বন্ধন দশা, প. ১১৫-১৬)

আলোচ্য দৃষ্টান্তে কবি ‘মসজীদের’, এবং ‘সয়তান’ শব্দ দুটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে চার ও তিন মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এখানে অবশ্য রীতিলঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু যখন আরও সংহত উচ্চারণে লেখেন,

(২) ‘অবশ্যই ইহার’ আছে গুঢ় অভিপ্রায়।

মম প্রাণ হেতু কোন করেছে উপায় ॥

(ঐ, শিবিরে গমন, প. ৪১-৪১)

নিঃসন্দেহে ‘অবশ্যই ইহার’ শব্দগুচ্ছের ছয়মাত্রক উচ্চারণে রীতিলঙ্ঘন ঘটে। এমন শব্দ-সন্ধির দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের কবিতাতে কিছু পাওয়া যায়।

রঙ্গলালের ছন্দ আলোচনায় এতক্ষণ আমরা পদ্মিনী উপাখ্যান থেকেই উদাহরণ নিয়েছি। তার দুটি কারণ। প্রথমত, একমাত্র এই কাব্যগ্রন্থটিই তিনি মধুসূদনের তিলোত্তমা পদ্মিনী উপাখ্যান সম্ভব কাব্য এবং পদ্মাবতী নাটক রচনার পূর্বে লিখেছেন। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেঘনাদবধকাব্য বা বীরঙ্গনাকাব্য প্রকাশের পরবর্তী কালে রচিত। দ্বিতীয়ত, রঙ্গলাল তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে পদ্মিনী-উপাখ্যান-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য আর কোনও নতুন ছন্দ ব্যবহার করেননি।

মহাপয়ার রচনায় রঙ্গলাল সফল হয়েছেন পূর্বে আমরা বাইশ মাত্রা পংক্তি দেখেছি। কর্মদেবী কাব্যে তিনি দীর্ঘ বাইশমাত্রার পংক্তি রচনার দুর্বল প্রয়াস পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

(১) শোকস্র উঠে, উভয় মেলায়, নিরাশ্বাস অরণ্যকমল।

কর্মদেবী জীবন ত্যাজিলা শূনি, হলো অতি হৃদয় বিকল ॥

(জয়তঙ্গের উক্তি কর্মদেবী, বসু. সং. পৃ ৩৮)

(২) বিচেতন শোকে মনপ্রাণ কর্মদেবী-প্রিয়সহচরীগণ।

ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমে জ্ঞানহারী, দাবদন্ধ মৃগী-স্বরূপ-লক্ষণ ॥

(কর্মদেবী জয়তঙ্গের উক্তি বসু সং, পৃ. ৩৯)

১২॥১০। এবং ১০॥১২। মাত্রাভাগের এতদীর্ঘ দ্বিপদীবন্ধের মাঝে লঘুযতি ফুটে ওঠে। ছন্দে বাকধর্মী উচ্চারণের প্রবহমানতা তাতে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

রঙ্গলাল পংক্তি ডিঙিয়ে ভাবের প্রবহমানতা আনতে শেষ পর্যন্ত দ্বিধা বোধ

করেছেন। এমনকি মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার ছন্দকে যে

প্রবহমান পয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন মনে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, তারও সাক্ষ্য মিলছে।

রঙ্গলালের মনোভাব মধুসূদন ১৮৬০-এ রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন,—

I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks of blank-verse. I don't think R, — either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article,

(নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি, ২য় সং. পৃ. ৬১২)

প্রবহমান পয়ার সে-যুগে বাঙালী পাঠক স্ভাবিকভাবে পড়তে পারবেনা এবং পছন্দ

করবে না এমনতর ধারণা রঙ্গলালের ছিল।— মধুসূদন আর একটি চিঠিতে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ১৮৬০-এ রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন,—

I had a long talk with Rungolal last evening on the subject of versification in general and Blank-verse in particular; he said — “I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come.

(নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি, ২য় সং. পৃ. ৬০৯-৬১০)

রঙ্গলালের এই মতবাদ অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ ছিল স্বীকার করেও বলতে হয়, এই বিপ্লবী ধারার প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্যই পরবর্তী কাব্য রচনায় ভাবমুক্তির দিকে তিনি আর অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পাননি। পয়ার ছন্দোবন্ধের সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রার পদযতিস্থাপন-রীতি অতিক্রম করে তিনিই প্রথম ছন্দশৃঙ্খল থেকে ভাবমুক্তির বিদ্রোহ-চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, — মহাপয়ার প্রবর্তন করে দীর্ঘ আট-দশ মাত্রার পদভাগে ভাবপ্রবাহকে আরও কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দানের পথ তিনিই প্রথম তৈরী করেছিলেন।— তারই ফলে মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার রচনার পথ কিছুটা সুগম হয়েছিল। কিন্তু পূর্ণ ভাবমুক্তির পথ তিনি উদ্ভাবন করতে পারেননি,— তাঁরই সতীর্থ বন্ধু সে পথ তৈরী করলে তিনি তা প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণে মধুসূদন বাংলা ছন্দে যে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, — কার্যত সেই ধারাকে পরবর্তী কবিরাও পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। পরে যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রঙ্গলালও এমন আমূল পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তবু আধুনিক বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির প্রয়াসে রঙ্গলালকে প্রথম সূচনাকার রূপে স্বরণ করতে হয়। ছন্দের সুনির্দিষ্ট যতিবন্ধন থেকে ভাবপ্রবাহকে মুক্ত করবার যে সচেতন প্রয়াস পদ্মিনী উপাখ্যানে (১৮৫৮) সূচিত হয়েছে পরবর্তী প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার, মুক্তক এবং গদ্য-কবিতা-ছন্দের শতাব্দীকাল-ব্যাপী বিচিত্র বিবর্তনধারার মাধ্যমে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। রঙ্গলাল আধুনিক বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির প্রথম সূচনাকার।

(খ)

মধুসূদন দত্ত।

রঙ্গলালে যার অস্পষ্ট সূচনা, মধুসূদনে (১৮২৪-১৮৭৩) তার সুস্পষ্ট প্রবর্তনা লক্ষিত হয়। ছন্দে ভাবমুক্তির বিবর্তন ধারায় প্রবহমান পয়ার-স্রষ্টা মধুসূদনকে একটি পৃথক যুগ-পরিচয়ে চিহ্নিত করা চলে। ইংরেজী run-on-Blank-verse-এর প্রকৃতিধর্মী বাংলা প্রবহমান পয়ার প্রবর্তনে তিনি যে নব রীতির সন্ধান দিলেন পরবর্তী রচনাকারদের বাকধর্মী রচনাপ্রভাব তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর,—অপরদিকে পূর্বতন বাংলা ছন্দের ধারায় সম্পূর্ণ অভাবনীয়ও বটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পয়ারবন্ধ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। পূর্বসূরীদের হাতে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার যখন উচ্চারণের এবং শব্দ-গ্রন্থনের দিক থেকে প্রায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে তখন রঙ্গলাল এবং মধুসূদন বাকধর্মী স্রাব্য উচ্চারণের আদর্শরূপে এ-ছন্দকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে গ্রহণ করলেন। রঙ্গলাল তাঁর কাব্যগুলিতে বৈচিত্র্য-সাধন মানসে মিশ্রবৃত্ত রীতির অন্যান্য ছন্দাবন্ধও ব্যবহার করেছেন, মধুসূদন কিন্তু কয়েকটি Ode জাতীয় কবিতা ছাড়া, সমস্ত কাব্যেই প্রবহমান পয়ারকে ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহনরূপে গণ্য করেছেন। রঙ্গলাল ছন্দকে গীতিসুরের এবং এক্ষেপে যমক-অনুপ্রাসের সন্মোহক প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে যথাসম্ভব বাকধর্মী করে তুলতে চেয়েছিলেন। রঙ্গলালের প্রভাব বাল্যবন্ধুর এই রচনারীতি থেকে মধুসূদন হয়তো ভাবমুক্তির কিছুটা আভাস পেতে পারেন। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলা পদ্যে বিদ্যাসাগর যে ‘অনতিলক্ষ্য’ কিন্তু সুমিষ্ট ছন্দ-স্পন্দমান গদ্যবন্ধ রচনা করেছিলেন (দ্র. পৃ ৫৩, পাদটিকা ২), ভাবগম্বীর গদ্যভাষার সেই স্পন্দমানতা মধুসূদনকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল মনে হয়। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যময়ী জননী সংস্কৃতের শব্দৈশ্বর্য এবং ধ্বনি-নির্ঘোষ সম্পর্কেও কবি বেশ সচেতন ছিলেন।^১ এই মূল্যবান উপকরণের সাহায্যে তিনি বাংলা পয়ারবন্ধে মিস্টনের Blank-verse-এর প্রবহমানতা এবং ধ্বনিস্পন্দ অনেকটা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরই হাতে বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির এক নবীন সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত হয়েছে। ইংরেজী Blank-verse-এর প্রবহমানতা,— এবং বিশেষ করে ধ্বনিস্পন্দ মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে আংশিকভাবেও ফুটিয়ে তোলা বিস্ময়কর প্রতিভারই পরিচায়ক। রঙ্গলাল যে যুগের অশ্রুত সূচনা করেছেন, এক তটপ্লাবী জোয়ারের উচ্ছ্বাসে,— গম্বীর ধ্বনিনির্ঘোষে, মধুসূদন তার প্রকৃত যৌবন-মুক্তি ঘটিয়েছেন বলা যেতে পারে।

১। Blank-verse-এর অনুরূপ বাংলা প্রবহমান পয়ার রচনা কিছু কঠিন নয়, একথা বোঝাতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে মধুসূদন বলেছিলেন,—

“You forget my dear fellow, that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist.”

(তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা, সা. প. সং, পৃ. ১/০)

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন এবং রঙ্গলাল প্রায় সমকালীন। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের রচনাকাল ১৮৫৮ জুন-জুলাই (আষাঢ় ১২৬৫)। এর এক বছরের মধ্যেই, মধুসূদনের ১৮৫৯ জুলাইতে, মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দে লিখিত প্রথম গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থ রচনাকাল ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’র প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে, সম্ভবত এর অল্প কিছু পূর্বেই ‘পদ্মাবতী’-নাটকে মুক্তকাভাস-যুক্ত ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দ ব্যবহার করেছেন।^২ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য গ্রন্থাকারে ১৮৬০ মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল (মধুসূদন গ্রন্থাবলী— তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা, পৃ. ১১০, সাহিত্য পরিষৎ সং, দ্রষ্টব্য)। কবির পরবর্তী কাব্যগুলির রচনাকাল নিম্নরূপ।—

মেঘনাদবধ কাব্য ১ম খণ্ড ১৮৬১-জানুয়ারীতে এবং ২য় খণ্ড ১৮৬১-জুলাইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (সা. প. সং, মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা, পৃ. ৭ দ্র)।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬০-এপ্রিলের পূর্বে লিখিত এবং ১৮৬১-জুলাইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (সা. প. সং, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা, পৃ. ১০০ দ্র)।

বীরাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১-এর শেষদিকে রচিত এবং ১৮৬২-এর প্রথমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (সা. প. সং, বীরাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা, পৃ. ১০১ দ্র)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অধিকাংশ সনেট ১৮৬২-৬৩-তে লিখিত এবং ১৮৬৬-আগস্টে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (সা. প. সং, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভূমিকা, পৃ. ১১০ দ্র)।

২। প্রবহমান পয়ার সর্বপ্রথম কোন গ্রন্থে, কোন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা সংশয় রয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার পর ১৯. ৩ ১৮৫৯ তারিখে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে লিখেছেন,—

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometimes ago, I sent a synopsis of the plot, and they appear to be quite taken-up with it. The first act is finished.

(নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি, ২য় সং, পৃ. ৫৯৭)

এরই দেড়মাস পরে ৮. ৫. ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে এক চিঠিতে লিখেছেন,—

পদ্মাবতী নাটকে এ-ছন্দ Three or I believe four acts of your new drama are with my brother.

১৮৫৯, মার্চ-এপ্রিলে

(সা. প. সং পদ্মাবতী, ভূমিকা, পৃ. ১০)

ব্যবহৃত হয়েছে

দুটি উক্তিই কার্যত পদ্মাবতী নাটক সম্পর্কে করা হয়েছে। পদ্মাবতী নাটকের ২য় অঙ্কের ২য় গর্তাঙ্কে এবং ৪র্থ অঙ্কের ১ম গর্তাঙ্কে প্রবহমান পয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত পত্রাংশ দুটি থেকে ধরা যেতে পারে, ১৯. ৩. ১৮৫৯ থেকে ৮. ৫. ১৮৫৯ তারিখের মধ্যেই লেখক পদ্মাবতী নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

‘বিবিধকাব্য’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে কবির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে কবিতাগুলি (তার মধ্যে কিছু অসমাপ্ত কবিতাও রয়েছে) ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কবির পাঠ্য জীবনে ও কৈশোরে লিখিত কবিতা থেকে সুরু করে সায়াহ্নে রচিত সর্বশেষ রচনাটিও স্থান পেয়েছে (সা. প. সং. বিবিধকাব্যের ভূমিকা, পৃ — ১/০ দ্র)।

প্রবহমান পয়ার রচনা মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছন্দের গুণবৈশিষ্ট্য স্বয়ং মধুসূদন থেকে সুরু করে হেমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রখ্যাত কবি ও সমালোচকেরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। প্রবীন এবং নবীন প্রায় সমস্ত ছান্দসিকই এ ছন্দ সম্পর্কে কিছু না কিছু মন্তব্য করেছেন। মধুসূদন স্বয়ং এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সকল প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন এখানে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করছি। কবি নিজে যে ছন্দের প্রবর্তক,—তাঁরই মুখে সে ছন্দের ভাষা প্রথম শোনা উচিত।

প্রবহমান পয়ার প্রবহমান পয়ার সে যুগের পাঠকের কাছে কিছুটা দুরূহ সম্পর্কে লেগেছিল। সে বিষয়ে কৈফিয়ত দিয়ে ২৪ এপ্রিল, ১৮৬০ তারিখে কবির মন্তব্য রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে কবি লিখেছেন,—

অপরপক্ষে, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ‘অমিত্রাক্ষর’ রচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে বিবরণ দিয়েছেন (সাহিত্য পরিষৎ সং, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা, পৃ. ১০৮ — ১০৯) তাতে অনুমিত হয়, বিবিধার্থ সংগ্রহে, ১৮৫৯ জুলাই-আগষ্ট সংখ্যায় (১৮৭১শকাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা) প্রথম দুই সর্গ প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে এই অংশ লেখা হয়েছিল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পদ্মাবতী নাটকের সম্পাদকদ্বয় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস) ও বসুমতী সংস্করণ মধুসূদন গ্রন্থাবলীর সম্পাদকের মতে, পদ্মাবতী নাটকেই সর্বপ্রথম ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত ২৩ সংখ্যক ‘মধুসূদন দত্ত’ জীবনী গ্রন্থে (পৃ ৪১ ও ৪৩ দ্র) এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধুসূতী’তে (২য় সং পৃ ২৪২-৪৩ দ্র) এ গৌরব ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’কে দেওয়া হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একাধারে সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত ‘মধুসূদন দত্ত’ জীবনীগ্রন্থের লেখক এবং মধুসূদন গ্রন্থাবলীর অন্যতম সম্পাদক। সুতরাং পরস্পর বিরোধী তাঁর দুটি উক্তি মধ্যে বেশী যুক্তিসহ উক্তিটি গ্রহণ করতে পারি। নগেন্দ্রনাথ সোমের মন্তব্যটি এবারে বিচার করে দেখা যেতে পারে। তিনি মধুসূতীতে (২য় সং ২৪২-৪৩ পৃ) মন্তব্য করেছেন, ‘পদ্মাবতী-নাটক প্রথমে আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত হয়। ১৮৬৭, ১৪ সেপ্টেম্বর The Bengal Amateur Theatrical Society কর্তৃক অভিনয় উপলক্ষে নাকি উদ্যোক্তাদের অনুরোধে নাটকের কিছু অংশ ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দে’ পরিবর্তিত করেন। দুটি কারণে এ উক্তিটির সত্যতায় সন্দেহ জাগে। প্রথমত, ১৫. ৫. ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে আলোচ্য নাটক সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছেন,—

(মধুসূতি ২য় সঃ পৃ. ৫৯৭)

(মধুস্মৃতি, ২য় সং পৃ. ৬০১-২)

(সা সা. চ. মধুসূদন দত্ত ওয় সং, পৃ. ৪১)

www.amarboi.com

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th.

(মধুস্মৃতি, ২য় সং পৃ. ৬১০-১১)

প্রবহমান পয়ারের বাকধর্মী গদ্যভাষা-ভঙ্গির উচ্চারণ-রীতি এবং নাট্যসংলাপে এ ছন্দের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে (তারিখ বিহীন) এক চিঠিতে লিখেছিলেন,—

Blank-verse, and its melody and power astonish me. The form of verse in which the drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank-verse sounds like English prose—retaining at the same time a sweet musical impression. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no ‘genius’ among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman’s play called ‘Gorboduc’ first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is. “Fire away, my boys!”

নাট্যসংলাপে এ
ছন্দের উপযোগিতা

(মধুস্মৃতি, ২য় সং পৃ. ৬২৬)

নাটক এবং কাব্যের প্রবহমান ছন্দ রচনায় যে কিছুটা পার্থক্য রাখা প্রয়োজন সে কথার উল্লেখ করে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এই চিঠিরই আর এক স্থানে লিখেছেন,—

The verse is what in English we would call. ‘Alexandrine’ i.e., containing 6 feet. The longest verse in our language is 7 footed পয়ার— but that is, like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our ‘heroic’ measure.

নাটক ও কাব্যের
প্রবহমান ছন্দের
পার্থক্য রাখা
প্রয়োজন

(মধুস্মৃতি, ২য় সং পৃ. ৬২৬)

মধুসূদনের উক্তিগুলি থেকে জানা যায়, তিনি ইংরেজি সাহিত্যে Blank-verse ছন্দের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; এবং সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বাংলা কাব্য-নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে নাটকেই প্রথম এ-ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। শেকসপীয়র মূলত নাট্যসংলাপেই এ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন।



মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক এবং কাব্য রচনার কথা চিন্তা করতে গিয়ে, উভয়ের ভাষা ও ছন্দে যে কিছুটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন। নাট্য সংলাপে প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়েও রচনার ইতিহাস কবি তার উপযুক্ত পংক্তিমাপ কি হবে সে সম্পর্কে কবি সুনিশ্চিত হতে জানতেন না। পদ্মাবতী নাটকের মাত্র তিনটি দৃশ্যে (২।২, ৪।১, ৫।২) সামান্য কয়েক পংক্তি প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করে নিবৃত্ত থেকেছিলেন। কাব্যে প্রবহমান পয়ার ব্যবহারে তিনি প্রধানত মিলটনের Blank-verse-এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন। সে কারণেই তাঁর কাব্য কিভাবে পাঠ করতে হবে সে প্রশ্নের উত্তরে বার বার মিলটনের Blank-verse পঠনের রীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর প্রবহমান পয়ারের বিশ্লেষণে ইংরেজি নাটক ও কাব্যের দুই শ্রেষ্ঠ রচনাকার শেকসপীয়র ও মিলটনের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় গ্রহণ অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না।

Blank-verse রচনায় নাট্যকার শেকসপীয়র এবং কবি মিলটনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। উভয়েই অন্ত্যগুরু, পঞ্চ-দ্বিদল পর্বক শেকসপীয়রের ও মিলটনের Blank-verse -এর পার্থক্য Iambic পংক্তিবন্ধে প্রবহমানতা এনেছেন।— তবে যতি সংস্থাপনে মিলটনের তুলনায় শেকসপীয়র অনেক বেশী স্বাধীনতা নিয়েছেন। G. Saintsbury-র ভাষায় শেকসপীয়রের নাট্যসংলাপের Blank-verse সম্পর্কে বলা যায়,—

In arranging the pause— at any syllable from first to ninth, and at no syllable at all, not even tenth,— he is helped infinitely by that distribution of weight of words... The lines rise, fall, sweep, wave, dart straight forward, are arrested in mid air, insinuate themselves in serpentine fashion as if in sword-play against an invisible adversary.

(A Hist. of Eng. Prosody, Vol II. Page 52)

আর সে তুলনায়—

Milton's verse is too uniformly stately for comparison.

[Do. p. 52]

শেকসপীয়রের দ্বিদল পর্বভাগের মধ্যে ত্রিদল পর্বের মিশ্রণ,—দশদল পংক্তিবন্ধে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত দল-বিন্যাস লক্ষ করা যায়। মিলটন নাট্যকাব্য (Dramatic Poetry) এবং বিশুদ্ধ কাব্যের (Non-dramatic Poetry) ছন্দগত পৃথক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্মৃত হননি। নাট্য সংলাপে দীর্ঘ পদগঠন সব সময় অভিপ্রেত নয়। নাট্যকারকে সেখানে অভিনেতা এবং দর্শক (শ্রোতা) উভয়ের কথা মনে রেখে সংলাপ রচনা করতে হয়। বিভিন্ন চরিত্র সেখানে অভিনয় মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয় বলেই পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষাকে ছোট-বড়ো বিভিন্ন মাপের পদবন্ধে,—বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। শেকসপীয়র একথা মনে রেখেই তার নাটকে অপেক্ষাকৃত

স্বাধীন পদভাগে Blank-verse ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অপরপক্ষে, মিল্টন গভীর ভাবব্যঞ্জক মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁর ছন্দে দশদল পংক্তিভাগ বা দ্বিদল পর্বভাগ এত সূনিয়মিত। সমগ্র Paradise মিল্টনের Blank-verse এর সূশৃঙ্খল ছন্দবদ্ধতা লক্ষণীয়। মিল্টনের Blank-verse-এ caesuric pause বা পদযতির স্থান পরিবর্তন জনিত (foot-pause variation) ভাব-প্রবহমানতা স্ভাবিক হতে পেরেছে। সর্বোপরি মহিমাব্যঞ্জক এই অসম যতিভাগের পদগুলিকে এক-একটি পূর্ণ পংক্তি-অনুচ্ছেদে (verse-paragraph) তিনি যেভাবে গ্রথিত করেছেন, তাতে এ ছন্দ আশ্চর্য সংহতি এবং দৃঢ়তা লাভ করেছে। Saintsbury এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

Very occasionally he allows himself, as Virgil has done in his hexameters, a fragment of a line, very occasionally what may be a Alexandrine. But generally he confines himself to the so-called decasyllable—really to the five-foot line. His business is with this, with the equivalence of feet, with the shifting of pause, and with the superior concerting effect which we have called the verse-paragraph—to make as harmonious lines as he can.

[Hist. of Eng. Prosody : Vol-II, Page 259-60]

ইংরেজি doggrel জাতীয় শৃঙ্খলাবিহীন পদ্যকে স্পেনসার সুবিন্যস্ত করতে গিয়ে যেন কিছুটা বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। শেকসপীয়র প্রবহমান পঞ্চ-দ্বিদল (অন্তঃপদ্য lambic)-পর্বক ছন্দে নাট্যসংলাপ রচনা করে এ ছন্দের অভাবিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। তখন মিল্টন,—

applying the astringent of his austerly beautiful style, and the widely conditioned but never slipshod order of his measure, tightened things up again yet with all adequate possibilities of easement.

[Hist. of Eng. prosody : Vol II, p. 266]

মিল্টনই প্রকৃতপক্ষে নাট্য সংলাপের বাইরে বিশুদ্ধ কাব্যে Blank-verse-এর প্রবহমানতা এনেছেন,—এ ছন্দে মহিমাস্তিত ভাবপ্রকাশের উপযোগী ধ্বনিস্পন্দ ও গাভীর এনে দিয়েছেন। মিল্টন তার মহিমাস্তিত কাব্যের উপযুক্ত ছন্দ রচনায় ইংরেজি accent বা প্রসঙ্গের সহায়তা পেয়েছেন,— সেই সঙ্গে ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টিতে গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ-সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার করেছেন। — অপরদিকে শেকসপীয়র তার কথ্য বাকধর্মী নাট্যসংলাপ রচনার উপযুক্ত Anglo-Saxon শব্দ থেকেই বেশী সাহায্য নিয়েছেন, সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

তুলনামূলক বিচারের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে

উভয়ের ছন্দ
উদ্ভব

শেকসপীয়রের নাট্যসংলাপ থেকে কিছুটা Blank-verse রচনা এবং
মিল্টনের কাব্য থেকে একটি পূর্ণ Verse-paragraph উদ্ধৃত
করছি

শেকসপীয়রের নাট্যসংলাপের ছন্দ নিদর্শন।—

To-mor | row, and | to-mor | row, and | to mor | row,
 creeps in | this pett | y pace | from day | to day
 To the last | sylla | ble of | record | ed time
 And all | our yes | terdays | have light | ed fools
 The way | to dust | y death. | Out, | out, | brief can | dle
 Life's but | a walk | ing sha | dow, a | poor play | er
 That struts | and frets | his hour | upon | the stage
 And then | is heard | no more | it is | a tale
 Told by | an i | diot, full | of sound | and fu | ry.
 Sig | nify | ing no | thing.

[Macbeth Sc. 5, Act V]

মিলটনের কাব্য-ছন্দ নিদর্শন :—

Of mans | first dis obe | dience, and | the fruit
 Of that | forbi | dden tree | whose mor | tal taste
 Brought death | into | this world | and all | our woe
 With loss | of E | den, till | one great | er man
 Restore | us and | regain | the bliss | ful seat.
 Sing Hea | venly Muse, | that on | the se | cret top
 Of O | reb, or | of Si | nai didst | inspire
 That she | pherd who | first taught | the cho | sen seed
 In the | begin | ning how | the Hea | vens and earth
 Rose out | of cha | os or, | if Si | on hill

Delight | the more, | and Si | lo's brook | that flowed
 Fast by | the ora | cle of God, | I thence
 Invoke | thy aid | to my | adven | turous song,
 That with | no mid | dle fight | intends | te soar
 Above | the A | onian mount, | while it | pursues
 Things un | attemp | ted yet | in prose | or rhyme.
 And chief | ly Thou | O Spi | rit, that | dost prefer
 Before | all tem | ples the up | right heart | and pure,
 Instruct | me, for | Thou know'st | Thou from | the first
 Wast pre | sent, and | with migh | ty wings | out spread,
 Dove like | sat's brood | ing on | the vast | Abyss,
 And mid'st | it | reg | nant | what | in me | is dark
 Illu | mine, what | is low | raise and | support
 That, to | the highth | of this | great ar | gument,
 I may | assert | Eter | nal pro | vidence.
 and jus | tify | the ways | of God | to men.

[Paradise Lost : Book I, lines 1-26 A. W. Verity Edition 1952.]

(চিহ্ন সংকেত পাশে । পর্ব (foot) উপরের চিহ্ন 'accented বা প্রসঙ্গ জ্ঞাপক,
 - unaccented বা অপ্রসঙ্গ জ্ঞাপক)

এখানে মিলটনের একটি পূর্ণ Verse-paragraph বা পংক্তি-অনুচ্ছেদ তুলেছি, তাঁর এ ছন্দের ভাব ও ছন্দ-গ্রন্থনের দৃঢ়বদ্ধতার উদাহরণ হিসাবে। শেকসপীয়রের উদ্ধৃতিটিতে দেখা যায় Iambic এর সঙ্গে দ্বিকল Trochee, Pyrrhic, Spondee, ত্রিদল Anapest এবং একদল Acephalous পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দশদল পংক্তি বিন্যাসের মধ্যে অতিপর্বিক দল-বিন্যাসের একাদশ-দল পংক্তি আনতে নাট্যকার দ্বিধা করেননি। মিলটনের উদ্ধৃত এই দীর্ঘ পংক্তি-অনুচ্ছেদটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁর ছন্দে ত্রিদল পর্ব বা একদল পর্ব বিরল। পংক্তি-মাপের সুনির্দিষ্টতাও (দশ দল) প্রায় কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। অবশ্য ছন্দের প্রসঙ্গ-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে Iambic

পর্বের সঙ্গে Trochee, Pyrrhic বা Spondee পর্ব মাঝে মাঝে এনেছেন। শেকসপীয়রের তুলনায় তাঁর রচনার ভাব ও হৃন্দের পারস্পরিক গ্রন্থন অনেক বেশী দৃঢ়বদ্ধ (compact)।

পাশ্চাত্য নাট্যকার এবং কবির প্রবহমান হৃন্দের এই গঠনগত পার্থক্য সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কবি মিলটনের দৃঢ়বদ্ধ প্রবহমান হৃন্দকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

মধুসূদনের সর্বপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় হল, ইংরেজি Heroic verse-এর বিকল্পরূপে মিশ্রবৃত্ত হৃন্দকে গভীর ভাবাত্মক কাব্যের উপযুক্ত হৃন্দরূপে নির্বাচন। তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট দ্বিমাত্রক রুদ্ধদল উচ্চারণের আধুনিক কলাবৃত্তরীতি গড়ে ওঠেনি।— তাছাড়া, এ হৃন্দের বিশিষ্ট (আংশিক সুরধর্মী) মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণভঙ্গি বাকধর্মী বাক্যগঠনের অনুপযোগীও বটে। ছড়া উপযোগিতা গানে ব্যবহৃত দলবৃত্ত তখনও কাব্যে কৌলিন্য লাভ করতে পারেনি।—এ হৃন্দের সংশ্লিষ্ট, দৃঢ়বদ্ধ উচ্চারণ-রীতিও তখন পর্যন্ত

আবিস্কৃত হয়নি। অপরদিকে কৃতিবাস, কাশীরাম দাস, বৈষ্ণব চরিত লেখকগণ এবং মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ক্রমান্বয়ে মিশ্রবৃত্ত রীতির স্বাভাবিক বাকধর্মী উচ্চারণ ফুটিয়ে তুলছিলেন। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত এবং সর্বোপরি রঙ্গলাল এ-হৃন্দের আরও দৃঢ় পরিণত উচ্চারণ এনে দিলেন। মধুসূদন পদ্মাবতী নাটক লিখতে গিয়ে সংলাপের উপযোগী আরও কিছুটা ছোট পংক্তিমাপ চেয়েছিলেন, তবে মহাকাব্য রচনার পক্ষে ইংরেজি আয়াসিক পঞ্চদ্বিদল-পর্বিক হৃন্দোবন্ধের বিকল্পরূপে মিশ্রবৃত্ত পয়ারকেই সর্বপেক্ষা উপযুক্ত হৃন্দ হিসাবে গণ্য করলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রঙ্গলাল এবং মধুসূদনের মধ্যে বাংলা হৃন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। ‘মিত্রাক্ষর’ পয়ারের মাধ্যমে রঙ্গলালের ভাবমুক্তির প্রচেষ্টা মধুসূদন লক্ষ্য করেছিলেন অনুমিত হয়। পয়ারে পদযতির আংশিক স্বাধীনতা এবং মহাপয়ারে দীর্ঘ দশমাত্রার পদ ব্যবহার-প্রচেষ্টাকে হৃন্দে ভাবমুক্তির প্রাথমিক সচেতন প্রয়াসরূপে গণ্য করা যেতে পারে।—এখান থেকেই হয়তো মধুসূদন কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারবন্ধে বাকধর্মী ভাবমুক্তির এক বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

প্রবহমান হৃন্দ রচনায় মধুসূদন বিদ্যাসাগরের সুললিত গদ্যভাষা থেকেও সাহায্য পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে হৃন্দম্পন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের

ভাষায় তিনি ‘গদ্যের পদগুলির মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া
বিদ্যাসাগরের
রচনার
প্রভাব
তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ হৃন্দঃশ্রোত রক্ষা করিয়া,
সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য
পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন [পৃ ৫৩, পাদটিকা ২ দ্র.]। মিশ্রবৃত্ত

রীতির প্রবহমান পয়ারে মধুসূদন এই গদ্যভাষার বাকধর্মী হৃন্দঃশ্রোত আরও পূর্ণাঙ্গভাবে পদ্যহৃন্দের কাঠামোয় রূপান্তরিত করলেন।

বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন উভয়েই বাকধর্মী ভাষায় সুগিষ্ট ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। রুদ্রদল-বহুল তৎসম শব্দ উভয়েই সচ্ছন্দ ভাবে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি

Blank-verse ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে প্রস্র (accent) প্রয়োগরীতি
সংস্কৃত শব্দের
প্রভাব
বেশ সহায়ক হয়। বাংলাভাষা উচ্চারণে এমন সুনির্দিষ্ট প্রস্র প্রয়োগ
রীতি নেই;—সে কারণে অনুরূপ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি প্রায় দুঃসাধ্য

বলা চলে। রুদ্রদলবহুল তৎসম শব্দের সাহায্যে এই স্পন্দন কিছুটা সৃষ্টি করা সম্ভব। একথা মনে রেখেই, মধুসূদন বাংলায় প্রবহমান ছন্দ রচনা কিভাবে সম্ভব হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, বিরুদ্ধ মতবাদী সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, The Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist.

[সাহিত্য পরিষৎ সং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা । ১. দ্র.]

পূর্বেই বলেছি, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে Blank-verse প্রবর্তিত হবার সময়ে শেকসপীয়র তার নাট্যসংলাপে লঘুধ্বনি-সম্মিশ্রিত Anglo-Saxon শব্দভাণ্ডার থেকে সাহায্য নিয়েছেন; কাব্যের উপযোগী গম্ভীর এবং উদাত্ত ভঙ্গির Blank-verse রচনায় মিলটনের দৃষ্টি ছিল ল্যাটিন এবং গ্রীক শব্দ-সম্পদের দিকে। ধ্বনি-গম্ভীর হিব্রু নাম ব্যবহার করে মিলটন তাঁর ছন্দকে মহিমাম্বিত করতে দ্বিধা করেননি।^৭ বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আলোচ্য যুগে দেশী শব্দ-পুষ্টি আলালীভাষা^৮ এবং তৎসম শব্দবহুল বিদ্যাসাগরী ভাষার দুটি ধারা পাশাপাশি চলছিল। মধুসূদন মিলটনের আদর্শে Blank-verse-এর অনুরূপ প্রবহমান-পয়ার রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরী ভাষা-রীতিকেই বেশী অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত আলালী লঘু ভাষা-ভঙ্গির প্রতি এবং সেই সঙ্গে যতিপ্রাস্তিক ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রেখে সে যুগের সাহিত্য-রসিকেরা বাংলায় ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ প্রবর্তন সম্ভব নয় বলে রায় দিয়েছিলেন। অপরদিকে ল্যাটিন শব্দৈশ্বর্যময় মিলটনের Blank-verse-এর কথা মনে রেখেই মধুসূদন বাংলাভাষার জননী-রূপিনী সংস্কৃতের অনুরূপ ধ্বনিঝঙ্কারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি একাধারে সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিঝঙ্কার এবং পয়ার-বন্ধের ভাব-প্রবহমানতাব সমঙ্গ্য ঘটিয়ে ইংরেজি heroicBlank-verse এর প্রকাশ-ধর্ম অনেকাংশে বাংলাছন্দে সঞ্চারিত করেছেন। মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে রঙ্গলালের পদ্বিনী উপাখ্যান থেকে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে উত্তরণ বাংলা ছন্দে যুগান্তর এনে দিয়েছে বলা চলে। রঙ্গলাল পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলেও মূলতঃ ভারতচন্দ্র এবং

৩। যেমন—

Bind Thamyris and blind Maeonides

And Tiresius and Phineus—prophets of old. [Lucidus]

[Saintsbury লিখিত Hist of Eng. Prosody. Vol II P 271 দ্র.]

৪। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ১৮৫৪তে ‘মাসিক পত্রিকা’ নামক পত্রে ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

রঙ্গলালের 'মিত্রাক্ষর'
প্রভাব : মধুসূদনের
হাতে ভাবমুক্তি

ঈশ্বরগুপ্তের পূর্বসংস্কার মেনে নিয়েই বাংলাছন্দে নতুন ভাবমুক্তির
সমস্কেচ পরীক্ষা চালিয়েছেন। ভাবকে ছন্দের অনুশাসন মেনে নিয়ে
তারই অনুগামী হয়ে চলতে হবে,—এই পূর্ব সংস্কার মেনে নিয়েই
তিনি চলেছেন। অপরদিকে মধুসূদন কৈশোর কাল থেকেই এক

ভিন্নতর আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি শেকসপীয়র-মিলটনের
নাটক-কবিতার অনুশীলন করেছেন। ক্লাসিক গ্রীক-লাটিন-সংস্কৃত কাব্যের রসাস্বাদন
করেছেন। সে তুলনায় বাংলা কবিতা খুবই কম পড়েছেন। যতিপ্রাপ্তিক বাংলা পয়ার-
ত্রিপদীতে তাঁর কান আদৌ অভ্যস্ত হতে পারেনি।—বরণ বলা যায়, কৃত্তিবাস, কাশীরাম
দাস বা ভারতচন্দ্রের 'মিত্রাক্ষর' ছন্দকে ভাবের স্বাধীন চলার পথে কৃত্রিম নিষ্ঠুর
বেড়িক্রুপেই গণ্য করেছেন তিনি। প্রাচ্য পাশ্চাত্য ক্লাসিক সাহিত্য এবং Blank-verse

সে যুগের পাঠকের
প্রবহমান পয়ার
-পঠনে বিধার কারণ

ছন্দোবন্ধে মিলটনের মহিমাস্তিত কাব্য পাঠের ফলে, মিত্রাক্ষর
ছন্দের পংক্তি-প্রাপ্তিক যতি-শৃঙ্খল মোচন করে কাব্যের ভাবমুক্তির
পথ প্রশস্ত করতে গিয়ে তিনি এই heroic Blank-verse-এর আদর্শ
গ্রহণ একান্ত স্ভাবিক পন্থা রুপেই মনে করেছেন। সে যুগের (এবং
অংশত পরবর্তী যুগের) পাঠক তাঁর প্রবহমান ছন্দ পাঠ করতে প্রথম অস্বস্তি বোধ
করেছিলেন সত্য, তাঁর প্রধান দুটি কারণ, (১) যতি-প্রাপ্তিক পয়ার পঠনের পূর্বসংস্কার,

মিত্রাক্ষর সম্পর্কে
মধুসূদনের মনোভাব

এবং (২) পাশ্চাত্য Blank-verse ছন্দের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব।
কবি নিজে কিন্তু কৃত্রিম প্রচেষ্টার দ্বারা এ ছন্দ রচনা করেননি। The
words came unsought floating in the stream of inspiration

(পৃ ৬৫ দ্র)। যতিপ্রাপ্তিক 'মিত্রাক্ষর' ছন্দকে মধুসূদন যে মনোভাব নিয়ে দেখেছেন
একটি সনেটে তা সুন্দর প্রকাশ করেছেন।—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
ছিল নাকি ভাব ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাঙারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মস্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে.—

চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৯৭ সংখ্যক কবিতা]

এই মনোভাবই মধুসূদনকে ‘মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি’ ভেঙে প্রবহমান পয়ার রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। দুর্লভ প্রতিভাবে তিনি দেশীয় উপকরণ ও বিদেশীয় আদর্শের কত সহজ মিলন ঘটিয়েছেন।—বাকধর্মী প্রবহমান ছন্দরীতির আবিষ্কার করে কাব্যে যৌবনমুক্তির পথ তৈরী করেছেন।

মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার রচনারীতি সম্পর্কে এবার কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পয়ারের সংজ্ঞা নির্দেশে বলেছিলেন, আট-ছয়
অমিত্রাক্ষর ছন্দের আট-ছয়। পয়ারের ছাঁদ কয়।। এই আট-ছয় মাত্রাভাগের পয়ারের
পংক্তি-ডিঙানো ছাঁদ (pattern) রঙ্গলাল প্রথম সচেতন ভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা
প্রবহমানতা করেছেন। কিন্তু চোদ্দ মাত্রার পংক্তি শেষে পূর্ণযতি রাখতে গিয়ে
তাঁর ছন্দে প্রকৃত ভাবমুক্তি ঘটল না। ছন্দশৃঙ্খল সামান্য শিথিল
হলেও ভাব তখনও ছন্দের অধীন থেকে গেল। পংক্তিশেষের পূর্ণযতি বা অর্ধযতি তুলে
দেবার কথা রঙ্গলাল ভাবতেই পারেন নি,—এমন কি মধুসূদন পংক্তি ডিঙানো প্রবহমান
পয়ার রচনার পর এর সফলতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। পক্ষান্তরে, মধুসূদন দীর্ঘদিন
ধরে ইংরেজি Blank-verse পঠনে অভ্যস্ত হবার ফলে বাংলা ছন্দে এ রীতি প্রবর্তন
নিতান্তই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দশৃঙ্খল থেকে এতদিনে ভাবের মুক্তি
ঘটল,—এবারে ছন্দই ভাবপ্রবাহের অনুগামী হয়ে উঠল।

ভাবের দিক থেকে মধুসূদন যতিপ্রাস্তিক ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দের শৃঙ্খল ছিন্ন করেছেন
কৃত্রিম চোদ্দমাত্রার বটে,—তবু চোদ্দমাত্রার পয়ার পংক্তিবন্ধ রক্ষা করে চলেছেন।
পংক্তিমাপ-রক্ষা রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কিত একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে
পারে,—

পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো
রবীন্দ্র-মন্তব্য সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে রয়ে
গেছে। ঠিক যেন পুরোনো বাড়ির অন্দর মহল, দেয়ালগুলো সরানো
হয়নি, কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে
যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরী ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা
শুরু হয়েছে।

[ছন্দ (১ম সং) ‘গদ্যছন্দ’ প্রবন্ধ, পৃ. ৭৫ দ্র.]

মধুসূদন পুরোনো বাড়ীর সদর আর অন্দরের মাঝের দেয়াল অর্থাৎ পয়ারের
চোদ্দমাত্রা পংক্তির ছাঁদ তখনো ভাঙেন নি। তাকে ডিঙিয়ে ভাবের অনায়াসে চলাচল
শুরু হয়েছে। প্রকৃত ছন্দ-শৃঙ্খল থেকে ভাবমুক্তি মধুসূদনের হাতে ঘটেছে,— তবে
বাহ্য্যরূপে গণ্য চোদ্দমাত্রা-পংক্তির ছাঁদ তুলে দিয়ে নতুন ‘মুক্তক’রূপী ইমারত তৈরির
কাজ তখনও বাকি রয়ে গেছে।

প্রবহমান পয়ারে চোদ্দমাত্রার পংক্তিসীমা মধুসূদন রক্ষা করে চলেছেন বটে, তবে ভাবের সচ্ছন্দ গতি রাখতে গিয়ে এই পংক্তিমাপের মর্যাদা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পংক্তিপ্রান্তিক তিনি একটুকু দ্বিধা করতেন না মনে হয়। কিন্তু পুরোনো বাড়ীর সদর লঘুযতি লোপ এবং অন্দরের মাঝের বাহুল্য দেয়ালটি যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ করার অসুবিধা আধুনিকার সদর অন্দরে সচ্ছন্দে চলাফেরা করলেও ওই অনাবশ্যক দেয়ালটির কথা বেমানুম ভুলে যেতে পারেন না। প্রবহমান পয়ার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যতক্ষণ পয়ার পংক্তির অস্তিত্ব রয়েছে,—ততক্ষণ পূর্ণযতি বা অর্ধযতি তুলে দিয়ে ভাবের সচ্ছন্দ চলাচল শুরু হলেও, পংক্তি ডিঙিয়ে যাবার কালে অন্ততঃ লঘু বা লঘুতর যতির মর্যাদা রেখে চলতে হয়। পদ্যে পংক্তি মাত্রেই যে কোন একটি যতির প্রত্যাশা রাখে। মধুসূদন প্রবহমান পয়ার ছন্দে পংক্তিশেষের এই স্বল্পতম যতি পরিণত রচনাতেও দ্বিধাহীনভাবে লঙ্ঘন করেছেন দেখা যায়। তাঁর প্রথম রচনা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে ৬৬৬ পংক্তিতে লঘুযতিবিহীন পংক্তি সংখ্যা ৮;—মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে ৭৮৫ পংক্তিতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ হয়েছে; মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গের ৪৪৩ পংক্তিতে হয়েছে ১৪। অপেক্ষাকৃত পরিণত স্বল্পতম যতি না বীরাদ্রনা কাব্যের পূর্ণ অপূর্ণ পত্রিকাগুলির ১৭৮৪ পংক্তিতে অবশ্য রেখে পংক্তি এই সংখ্যা কমে হয়েছে ২৬;— আর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর এবং রচনার দৃষ্টান্ত বিবিধ কাব্যের ১০৮টি সনেটে, ১৫১২ পংক্তিতে এমন দৃষ্টান্ত আরও কমে হয়েছে ১৪। ক্রমান্বয়ে এমন প্রয়োগ কমে এসেছে বটে, তবে সচেতনভাবে কখনও কবি এ রীতি বর্জন করেন নি। স্বল্পযতিবিহীন পংক্তি রচনার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক দুর্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে। কয়েকটি উদাহরণ তুলছি,—

(১) কহ রে সন্দেশ-

বহ, কহ শুনি আমি, কেমনে পশিলা

দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?

[মে. কা. ১ম সর্গ প. ১৭৩-১৭৫]

(২) নিশার শিশির

পূর্ণ পদ্মপত্র যেন !

[ঐ প. ৩৩০-৩৩১]

(৩) নবীন যৌবন-

মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা

মধু কালে।

[ঐ প্রথম সর্গ প. ৬৪১-৬৪৩]

(৪) রক্ষ রক্ষকুল-

মান এ কাল সমরে, রক্ষ চূড়ামণি !

[ঐ ১ম সর্গ প. ৬৭৭-৬৭৮]

এখানে প্রত্যেকটি উদাহরণে কবি লঘু, এমনকি উপযতির মর্যাদাও অস্বীকার করেছেন।

অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনায় কবি এমন যুগ্মশব্দকে ভেঙে দুই পংক্তিতে বিন্যাস না করলেও, লঘুযতির স্বীকৃতি লোপ করেছেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারে চোদ্দ মাত্রার পংক্তিবিন্যাস যে অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম,—নিছক প্রাচীন পয়ার কাঠামোর অনুবৃত্তি মাত্র তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া

কবির পয়ার	যায় মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে। সেখানে কবির অনবধানতায়
পংক্তি মাপের	একটি পংক্তিতে ১৩ মাত্রা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ছন্দ সেখানে ক্ষুণ্ণ
কৃত্রিমতার	হয়নি, আর সে কারণেই কবির জীবিতকালের মধ্যে এ কাব্যের পর
একটি দৃষ্টান্ত	পর ছয়টি সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য পংক্তির এই নিছক চোখে

দেখার ভ্রটিটুকু কবির অগোচরে রয়ে গেছে। উদাহরণটি এখানে তুলে দিচ্ছি:—

দৈববলে বলী যে জন, কাহারে

ডরে সে ত্রিভুবনে দেবকুল পতি

সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ;

[ঐ ৬ সর্গ প. ৭০-৭২]

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটিতে যে তের মাত্রা রয়েছে চোখে দেখে গণনার দ্বারা সেটি ধরা যায়। ভাবপ্রবাহ যে দুটি বাক্যাংশে বিন্যস্ত হয়েছে (কাহারে ডরে সে ত্রিভুবনে ৩+৩+৪, দেবকুল পতি সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ৬+৪+৪), সেখানে শব্দগত্বনে ভ্রটি নেই বলে এ ছন্দ পঠনে কান প্রসন্ন থাকে। আসলে, পাঠকের কান অপ্রসন্ন হয় প্রথম পংক্তির বিজোড়মাত্রক ‘দৈববলে বলী যে জন’ পদটি পড়তে গিয়ে। বিজোড় মাত্রায় পদগঠন প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা পরে আসছি। এখানে পংক্তির শব্দবিন্যাসেও কিছুটা পাঠকের প্রত্যাশাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। পংক্তির একেবারে শেষে তিন মাত্রার ‘কাহারে’ শব্দটি এনে নতুন পদ সুরু হয়েছে,—এবং পদের বাকী অংশটি ‘ডরে সে ত্রিভুবনে’ পরবর্তী পংক্তিতে দেওয়া হয়েছে। কবি যদি লিখতেন,—

দৈববলে বলী যে জন,

কাহারে ডরে সে ত্রিভুবনে ?

দেবকুলপতি সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ;

ছন্দের প্রবহমানতা আরও সুষ্ঠু হত। পয়ারের চোদ্দ মাত্রার কৃত্রিম কাঠামো রাখতে গিয়ে কবি পংক্তির মর্যাদা সর্বত্র রাখতে পারেন নি।

মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার-রচনার আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি বিজোড়-মাত্রক পদগঠনে দ্বিধা করতেন না। মিশ্র কলাবৃত্ত প্রকৃতির ছন্দে বিজোড় মাত্রার পর

বিজোড়-মাত্রক	যতিস্থাপনে ছন্দের স্বাভাবিক প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ হয়। কবির
পদ গঠন প্রসঙ্গ	নবপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিভাবে পড়তে হবে সে যুগের
	পাঠকদের সে বিষয়ে সংশয় ছিল (পৃ. ৩৭ ও ৮৮)। কবি সংশয়ী

পাঠকদের ইংরেজি Blank-verse-এর যতি প্রয়োগরীতিতে এ-কাব্যছন্দ পাঠ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। একটি চিঠিতে সুস্পষ্ট ভাবেই এ ছন্দের যতিস্থাপন-রীতির উল্লেখ

কবির মন্তব্য করে লিখেছেন, I find that the যতি, instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, and 12th.

[মধুস্মৃতি ৬১০-৬১১ পৃ.]

পয়ার পংক্তির কাঠামোটি কবির মনে রয়ে গেছে, তাই চোদ্দমাত্রার পংক্তি-কাঠামোকে আদর্শ পূর্ণমাপ ধরে নিয়ে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম এবং ১২শ মাত্রায় যতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন; ৫ম, ৯ম, ১১শ এবং ১৩শ মাত্রায় যতির কথা উল্লেখ করেন নি। ৫ম, ৯ম এবং ১৩শ মাত্রায় যতি অনুল্লেক্ষের কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু ১১ মাত্রায় যতির দৃষ্টান্ত, তাঁর হিসাবমতো দেখলেও, বেশ কিছু পরিমাণে লক্ষিত হয়। স্ভাবিক ভাবযতি-বিভক্ত পদগঠনের হিসাব ধরলে বিজোড়-মাত্রক যতির মধ্যে ৯ম এবং ৫ম মাত্রায় যতির নিদর্শনই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। ১১ এবং ১৩ মাত্রাতেও যতি বিভাগ করেছেন দেখা যায়।^৫

মধুসূদনের জীবিতকালেই ১৮৬৭-তে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধ হেমচন্দ্রের কাব্যের ২য় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বিজোড় সমালোচনা মাত্রার পদযতি প্রয়োগের ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন,—বিরামযতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা—

৫। কবি যেখানেই পংক্তি ডিঙিয়ে পরবর্তী পংক্তিতে ভাবের প্রবাহ টেনে নিয়েছেন, সেখানে পয়ার পংক্তির হিসাবে সাধারণত ২, ৩, ৪ মাত্রার পর যতি পড়েছে। বিজোড় একটি তিন মাত্রার শব্দ এসে যেখানেই যতি পড়েছে পরবর্তী পদের প্রথমে আর একটি তিন মাত্রার শব্দ গ্রহণ করেছেন,— এবং তারপর ২, ৪ বা ততোধিক মাত্রার শব্দ গ্রহণ করে পদ গঠন করেছেন।— সে কারণেই পূর্বোক্ত কৃত্রিম পংক্তি-কাঠামো ধরে গণনায় কবি ৫ বা ৯ মাত্রায় যতি দেখেন নি। আবার যেখানে ২ বা ৪ মাত্রার একটি শব্দ পংক্তির সুরুতেই বিন্যস্ত করে ভাবযতি দিয়েছেন,— সেখানে পরবর্তী পদটি জোড়মাত্রক শব্দ দিয়ে সুরু করেছেন। সুতরাং সেখানেও উক্ত কৃত্রিম হিসাবে দেখলে ৫ বা ৯ মাত্রার যতি পাওয়া যায় না। পূর্ণ চোদ্দমাত্রার যেখানে যতিপ্রাপ্তিক পদ রচনা করেছেন সেখানে কদাচিত এমন দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন,—

রজনী গঙ্গা, — রজনীকুণ্ডলশোভিনী (তি কা. ১ সর্গ, প. ৫৩৫)

কবি তের মাত্রায় যতি দেখতে পাননি, তার কারণ তের মাত্রায় পয়ার পংক্তিতে যতি পড়লে, তারপরে আর মাত্র এক মাত্রা অবশিষ্ট থাকে। পংক্তি শেষে এক মাত্রার সঙ্গে পরবর্তী পংক্তির শব্দগ্রহণ সম্ভব হয় না। কিন্তু এগার মাত্রায় যতি দেননি বলার সম্ভব কারণ দেখা যায় না। তাঁর হিসাবমতো দেখলেই এমন অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে। এখানে একটি উদাহরণ তুলছি,—

নলিনীর সখা আসি নাই দেন দেখা

কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলে

দশ দিশ,

(তি, কা, ১ সর্গ, প. ২৬৬-৬৮)

‘কাঁদেন রাঘব-বাঙ্গা আঁধার কুটিরে
নীরবে।—’

‘নাচিছে নর্তকীবন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক।—’

‘হেনকালে হনুসহ উত্তরিল দ্বীপী
শিবিরে।—’

‘রক্ষাবধু মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।’

‘দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত;—’

এই সকল স্থানে ‘গায়ক’, ‘শিবিরে’, ‘বীরেন্দ্র’, ‘আবৃত’, শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত
হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গহেতু শ্রবণকঠোর হইয়াছে।

[সা. প. সং. মেঘনাদবধ কাব্য, পৃ. ২৩]

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে প্রথম তিন পংক্তিতে মধুসূদন লিখেছেন,—

সন্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহ চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে,

রবীন্দ্রনাথ এই অংশ অবলম্বনে মন্তব্য করেছেন,—

তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হয়। সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা।... প্রথম আরম্ভেই
বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগভীর হয়ে বাজল— “সন্মুখসমরে পড়ি
বীরচূড়ামণি বীরবাহ”; তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার
মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—“চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।”

[ছন্দ (১ম সং.), ‘ছন্দের অর্থ’, পৃ. ২৭-২৮ দ্র.)]

হেমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের ভাঙা ছন্দের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে
হয় এবং দশ মাত্রার পদের শেষে একটি তিনমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সংযুক্ত হয়ে বিজোড়
মাত্রার পদ গঠিত হয়েছে। উভয়েই এমন উদাহরণ তুলেছেন যেখানে মূল পদের পরবর্তী

মধুসূদনের বিজোড়-
মাত্রক পদগঠনের
একটি পরিচিত রীতি

এই তিন মাত্রার শব্দটি পংক্তি ডিঙিয়ে পরবর্তী পংক্তির প্রথমে
বসেছে এবং সেখানেই পদযতি পড়েছে। বিজোড়-মাত্রক পদরচনায়
তিনমাত্রার শব্দশেষে যতিস্থাপন মধুসূদনের প্রবহমান ছন্দের একটি
সুপরিচিত রীতি। আর যেখানেই এমন তিনমাত্রার একটি শব্দশেষে

পদযতি পড়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী পদে ৩+২ মাত্রাভাগের শব্দগ্রন্থিতে পাঁচ
মাত্রায় একটি যতি বসেছে। যেমন,—

কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা ॥ আঁধার কুটিরে
 নীরবে ।। দূরন্ত চেড়ী,। সীতারে ছাড়িয়া
 ফেরে দূরে ॥ মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে—

[মে. কা: ৪সর্গ: প. ৪৭-৪৯]

সে যুগে হেমচন্দ্র একা নন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম প্রবহমান পয়ার ঠিকমতো পড়তে পারেন নি (মধুস্মৃতি পৃ. ৬২৪) ; পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এ ছন্দকে আয়ত্ত করতে না পেরে বিরূপ মন্তব্য করেছেন (মধুস্মৃতি, পৃ. ১৫৭) । এ ছন্দ পাঠ করতে গিয়ে অনেকেই যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন তার অন্যতম প্রধান কারণ হল, কবির এত বেশী বিজোড়-মাত্রক শব্দে পদগঠন-প্রবণতা।

বিজোড়-মাত্রক পদগঠনে যে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ দুর্বল হয় মধুসূদন নিজে কিন্তু তা বুঝতে পারেন নি। পূর্বোক্ত পত্রাংশে (৭৬ পৃ.) যেমন তার উল্লেখ আছে, তাঁর এ বিষয়ে রচনা থেকে তেমনি সে বিষয়ে আরও নিঃসংশয় হওয়া যায়। তিনি তুলনামূলক ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’র প্রথম সর্গে ৬৬৬ পংক্তিতে ১১৪টি তথ্য পঙ্ক্তি বিজোড় মাত্রক পদ গঠন করেছেন।—এই সর্গের প্রথম ১৩৭ পংক্তিতে অনুরূপ পদের সংখ্যা মাত্র ৮টি;—এই অংশটি যখন পরিবর্তন করে লিখলেন, সেই সংশোধিত ১৫৪ পংক্তিতে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৬৬। পরবর্তী রচনা ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র ১ম সর্গের ৭৮৫ পংক্তিতে বিজোড়-মাত্রক পদ সংখ্যা ১৫৪;—অপেক্ষাকৃত পরিণত নবম সর্গের ৪৪৩ পংক্তিতে এই সংখ্যা হল ৮৪। আরও পরবর্তী ‘বীরঙ্গনা কাব্যে’র পত্রিকাগুলির (সম্পূর্ণ-ও অসম্পূর্ণ-সহ) ১৭৮৪ পংক্তিতে মধুসূদন কিভাবে অনুরূপ পদসংখ্যা ২৭০। ১০৮টি সনেটের ১৫১২ পংক্তিতে এ ছন্দ বিজোড় মাত্রার পদসংখ্যা ১৮৪। সুতরাং একুশ পদগঠনের ত্রুটি পাঠ করতেন? সম্পর্কে কবি যে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। এখন প্রশ্ন আসে, বিজোড়-মাত্রক এমন ছন্দোবদ্ধ পদ পাঠ করবার সময় কবি নিজে কিভাবে উচ্চারণের বন্ধুরতা কাটিয়ে উঠতেন ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এ বিষয়ে একটি উক্তি বিচার কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে লিখেছেন,—

“তাঁহার গলাব আওয়াজ ছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি তাঁর ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙাগলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতা পাঠের কায়দাই এক ছিল স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া একটানে বলিয়া যাইতেন। যথা—

সম্মুখ-সমরে-পড়ি-বীর-চূড়ামণি
বীর-বাহু-চলি-যবে-গেলা-যম-পুরে
অকালে-কহে-দেবী-ইত্যাদি

[মধুস্মৃতি, পৃ. ১৭৬-৭৭]

‘মেঘনাদবধ কাব্য’-প্রকাশের পূর্বে কবির পঠনভঙ্গি যদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুনে থাকেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো-বার বৎসর।^১ তৎকালীন প্রচলিত পদ্যপঠনরীতি থেকে মধুসূদন এক পৃথক রীতিতে পাঠ করেছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি সেইটুকুই কেবলমাত্র উপলব্ধি করেছিলেন মনে হয়। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ ব্যবহৃত প্রবহমান পয়ারের ছন্দবদ্ধতার উপলব্ধি করবার মতো রসবোধ তখনো তাঁর জন্মাবার কথা নয়। সে যুগে গদ্যভাষা পঠনেও তৎসম শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ এখনকার তুলনায় বেশী হত। মধুসূদন সেইরূপ পদ্যপঠনরীতিতে এবং সংস্কৃত ও গ্রীক-ল্যাটিন উচ্চারণরীতিতে প্রবহমান পয়ার পাঠ করেছিলেন হয়তো। ভাঙাগলার এমন পঠনভঙ্গি সে যুগের একটি বারো বৎসরের কিশোরের কানে ভালো না লাগা অসম্ভাবিক নয়। কিন্তু চীনাবাজারের এক সাধারণ দোকানীকে ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র অংশবিশেষ পাঠ করে শুনিয়া মধুসূদন তার প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, একটি চিঠিতে সে বিবরণ দিয়েছেন। কবি লিখেছেন,—

মধুসূদনের নিজস্ব উক্তি
পয়ার পাঠ করেছিলেন হয়তো। ভাঙাগলার এমন পঠনভঙ্গি সে যুগের একটি বারো বৎসরের কিশোরের কানে ভালো না লাগা অসম্ভাবিক নয়। কিন্তু চীনাবাজারের এক সাধারণ দোকানীকে

I took the poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked where I lived? On parting I asked him if he thought Blank-verse would do in Bengali. His reply was, ‘Certainly, Sir, it is the noble measure in language.

[মধুস্মৃতি : পৃ. ৬১৭-৬১৮]

এখানে ধরা যাচ্ছে, কোনও কাব্যরসিক দোকানী কবির ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ পঠনভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজোড়মাত্রক পদে ‘ভাঙা ছন্দে’র বন্ধুরতা কবি কি ভাবে পড়বার সময়ে কাটিয়ে উঠতেন সে রহস্য এ উক্তি থেকেও ধরা যাচ্ছে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায়’ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম দুটি

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি বিচার
সর্গ প্রবহমান পয়ারের নিদর্শনরূপে, ১৮৫৯ জুলাই-আগস্টে, প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬০, নভেম্বরে (১৭৮২ শক, অগ্রহায়ণ)

রাজেন্দ্রলাল তাঁর পত্রিকায় ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’র পঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এখানে সেটিও উল্লেখ করছি,—

যাহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাহারা যে প্রকারে মিলটন কবিকৃত ‘প্যারাডাইস লষ্ট’ নামক বাক্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহা পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের

শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ যে প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকারে অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার বিরামচিহ্ন ব্যতীত ছন্দে দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। [মধুস্মৃতি পৃ. ১২২]

রাজেন্দ্রলাল এখানে ভাবযতি থেকে পৃথকভাবে ‘মিত্রাক্ষর’ পয়ারের মতো আট-ছয় মাত্রাভাগে ছন্দযতিও দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ছন্দ ভাবের অনুগামী অথবা ভাব ছন্দের অনুগামী হয়ে না চললে,—অর্থাৎ ছন্দ ও ভাব সহযাত্রী না হলে পদ্যে ছন্দবোধ রক্ষিত হতে পারে না। মধুসূদন মিত্রাক্ষর পয়ারের সুনির্দিষ্ট আট মাত্রক অর্থযতির পরিবর্তন করে ভাবের অনুগামী যতি ব্যবহার করেছেন;—এবং নিজেও সে কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৬৫ দ্র.)। তাছাড়া, ভাবপ্রবাহকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখতে গিয়ে অনেক সময় পংক্তিপ্রান্তিক লঘু বা লঘুতর যতিও লোপ করেছেন। কিন্তু কখনও ভাবযতি ও ছন্দযতিকে পৃথক ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেন নি। যেখানেই ছন্দযতির খাতিরে ভাবযতিকে অঙ্গীকার করেছেন,—অথবা, ভাবযতির অনুরোধে ছন্দযতির প্রাথমিক ধ্বনি-আবর্তনরীতি লঙ্ঘন করেছেন, সেখানেই ছন্দের প্রত্যাশাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল-নির্দেশিত রীতিতে ধ্বনিসূষমা রক্ষা করে এই ছন্দপঠন সম্ভবপর হয় না।—সেকারণে তাঁর এই ছন্দপঠনরীতি-সম্পর্কিত নির্দেশ সমগ্রভাবে মেনে নেওয়া চলেনা।

কবির পঠনরীতি

সম্পর্কে

দুটি অনুমান

মধুসূদন তাহলে কি ভাবে এই বিজোড়মাত্রক পদগুলি

পড়বার সময়ে ছন্দের বন্ধুরতা কাটিয়ে উঠতেন ?— এ বিষয়ে দুটি দিক থেকে অনুমান করা যেতে পারে।—

- (১) তিন চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার স্বাভাবিক শব্দবিন্যাসের পর তিন মাত্রার-একটি শব্দ বসিয়ে সাত, নয়, এগার বা তের মাত্রার (বিজোড়মাত্রক) পদ রচনা করতেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরবর্তী পদ বিজোড়মাত্রক ভাবে রচনা করতেন, এবং সেই পদের প্রথমেই একটি তিনমাত্রার শব্দ এনে তার পর দুই, চার, ছয়, আট ও দশ মাত্রার স্বাভাবিক শব্দ বিন্যাস করতেন। এক্ষেত্রে অনুমান করা চলে, হয়তো তিনি উক্ত প্রথম পদের শেষ তিন মাত্রায় সম্পূর্ণ যতি না দিয়ে পরবর্তী পদের প্রথম তিন মাত্রায় উচ্চারণের ধ্বনি-প্রবহমানতা টেনে আনতেন;—অর্থাৎ ছন্দের খাতিরে ভাবের যতি অংশত লুপ্ত করতেন। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য আরও স্পষ্ট করা যাক।—

(i) তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী

X

কল্পনা ! | কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু

লয়ে, রচ মধুচক্র ;

[মে. কা. ১সর্গ. ২৮-৩১ প.]

(ii) সুচারু চামর চারু-লোচনা কিংকরী

X

ঢুলায়, ; | মৃগাল-ভূজ আনন্দে আন্দোলি

চন্দ্রাননা, [ঐ: ৫৮-৫১ প.]

(iii) আইলা পৌলমী সতী মেঘাসনে বসি

তেজোরশি-বেষ্টিতা | নাদিলা জলধর;

[তি. কা. ১ সর্গ, ৩৭২-৩৭৩ প.]

এখানে যথাক্রমে (i), (ii) এবং (iii) উদাহরণে ৬+৩, ৮+৩ এবং ৮+৩, মাত্রাভাগে শব্দগ্রন্থি দিয়ে কবি প্রথম বিজোড়মাত্রক পদ গঠন করেছেন। অনুবর্তী পদগুলিতে যথাক্রমে (i) ৩+৮, (ii) ৩+২, (iii) ৩+৮ মাত্রাভাগে শব্দগ্রন্থি দিয়েছেন। এখানে প্রথম তিনটি পদশেষের (i) ‘কল্পনা’, (ii) ‘চুলায়’ এবং (iii) ‘বেষ্টিতা’ ত্রিমাত্রক শব্দের পর পূর্ণভাবযতিকে অনেকাংশে লুপ্ত করে পরবর্তী তিনটি পদের (i) ‘কবির’ (ii) ‘মৃণাল’ এবং (iii) ‘নাদিলা’ ত্রিমাত্রক শব্দে ধ্বনিপ্রবাহ টেনে নিয়ে গেলে ছন্দরক্ষার কৃত্রিম প্রয়াস চলতে পারে। কিন্তু তার ফলে কবির ইম্পিত ভাবমুক্তির প্রয়াস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে সন্দেহ নেই।

বিজোড় মাত্রাকে
প্রসারিত উচ্চারণে
জোড়মাত্রা রূপে
পড়তেন কি?

(২) দ্বিতীয় সম্ভাব্য পঠনপদ্ধতি হল, যেখানে বিজোড় মাত্রায় পদ রচিত হত, কবি সেখানে হয়তো নিজেরই আগোচরে যতি দেবার সময়ে একটি মাত্রা পূরণ করে উচ্চারণ করতেন। যেমন—

সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে
কহিলা,—“লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার । ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
কহিও পিতার পদে এসব বারতা
বাসন্তি। মায়েরে মোর”—হায়রে, বহিল
সহসা নয়ন জল !

[মে. কা. ৯ সর্গ, ৩৪৮-৩৫৩ প.]

উদ্ধৃত সাত পংক্তিতে তিনটি নয় মাত্রার এবং অনুবর্তী তিনটি পাঁচমাত্রার পদ রয়েছে ! নয় মাত্রার পদশেষে যে তিন মাত্রার শব্দ রয়েছে তাকে চার মাত্রায় প্রসারিত করে, দশমাত্রায় ভাবযতি হয়তো দেওয়া চলে। কিন্তু তার পরই ১+৮ অথবা ৩+২ মাত্রার শব্দগ্রন্থনে পাঁচমাত্রার যে পদ রচিত হয়েছে সেখানে বিজোড়মাত্রক শব্দ পদের প্রথমে থাকতে মাত্রা প্রসারণে বাধা জন্মে। তাছাড়া, এমন রীতিতে উচ্চারণ করলে ধ্বনিপ্রবাহে কিছুটা বিশিষ্ট শিথিল উচ্চারণ এসে পড়ে।

মধুসূদনের ৬+৩ মাত্রক শব্দ-গ্রন্থিতে নয়মাত্রার পদের পর, ৩+২ মাত্রক শব্দ-

৬+৩||৩+২

মাত্রাভাগে

পদবিন্যাস প্রবণতা

গ্রন্থিতে পাঁচমাত্রার একটি পদবিন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল।

তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে ৬৬৬ পংক্তিতে ১১৪টি

বিজোড়মাত্রক পদ দিয়েছেন, তার মধ্যে ২১টি ক্ষেত্রে উক্তরূপ

নয়মাত্রা পদের পর পাঁচমাত্রার পদ ব্যবহার করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে ৭৮৫ পংক্তিতে ১৫৪টি বিজোড়মাত্রক পদ,—তার মধ্যে ৬৯টি ক্ষেত্রে কবি উক্তরূপ নয়মাত্রা পদের পর পাঁচমাত্রার পদ এনেছেন। বীরাস্তনা কাব্যের ১৭৮৪ পংক্তির মধ্যে ২৭০টি বিজোড়মাত্রক পদ।—সেখানে ১০১টি উক্তরূপ নয়মাত্রক পদের পর পাঁচমাত্রার পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ১০৮টি সনেটের ১৫১২ পংক্তিতে ১৪৮টি পদ বিজোড়মাত্রক। সেখানেও ৮০টি ক্ষেত্রে এইরূপ পাঁচমাত্রকপদ নয়মাত্রকপদের অনুবর্তী হয়েছে দেখা গেল, প্রাথমিক এবং অপেক্ষাকৃত পরিণত,—সকল কাব্যেই মধুসূদন বিজোড় মাত্রার পদগঠনে ৬+৩ মাত্রাভাগে নয়মাত্রার পদের পর ৩+২ মাত্রাভাগের পাঁচমাত্রার পদের ব্যবহার বেশী পছন্দ করতেন। আলোচ্য কাব্যংশগুলির হিসাবে দেখা যাবে, সমগ্র বিজোড়মাত্রক পদসংখ্যার প্রায় ৮০% ভাগ এই রীতিতে বিন্যস্ত হয়েছে। অন্যান্য বিজোড় তিনমাত্রার শব্দবিন্যাস-পদ্ধতির মধ্যে ৪+৩ ॥ ৩+৪, ৮+৩ ॥ ৩+৪, এবং ৪+৩ ॥ ৩+৮ মাত্রক শব্দবিন্যাসের উদাহরণও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মধুসূদন তাঁর প্রবহমান পয়ার পঠনরীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

মধুসূদন স্বরাস্ত
উচ্চারণে পড়তেন
অনুমিত হয়

‘if well recited, sounds as much like prose as English
Blank-verse sounds like English prose—retaining at the
same time a sweet musical impression’

[মধুস্মৃতি ৬২৫-২৬ পৃ.]

বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা গদ্যে তৎসম শব্দের প্রাধান্য ছিল,—এবং সে সকল শব্দ প্রধানত স্বরাস্ত উচ্চারণে, কিছুটা বিশ্লিষ্টভাবে পঠিত হত। অনুমিত হয়, মধুসূদনও তৎসম রুদ্ধদলবহুল শব্দে রচিত প্রবহমান পয়ার তৎকালীন গদ্যভাষা পঠনরীতিতে স্বরাস্ত উচ্চারণে পড়তেন। স্বরাস্ত উচ্চারণেই পদান্ত একক বিজোড় শব্দে মাত্রা বাড়াবার অবকাশ থাকে। মধুসূদন ৬+৩ ॥ ৩+২ মাত্রার পদবিন্যাসে অনুরূপ স্বরাস্ত উচ্চারণে পদান্ত তিন মাত্রাকে চার মাত্রায় রূপান্তরিত করতেন হয়তো। তবে সেখানেও পাঁচ মাত্রার পদে ৩+২

প্রবোধচন্দ্র সেনের
মন্তব্য

মাত্রক শব্দবিন্যাসকে প্রসারিত উচ্চারণে পাঠ করা কঠিন। প্রবহমান পয়ারের বাকধর্মী দৃঢ় উচ্চারণভঙ্গি এতে ক্ষুণ্ণ হয়। সে-কথাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন পূর্বোক্ত রবীন্দ্রমন্তব্যটি

স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন,—

মেঘনাদবধ কাব্যে যৌগিক ছন্দে^৮ সদ্যোমুক্ত প্রবল শক্তির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ও ছন্দ ব্যবহারের ত্রুটি বিচ্যুতির নিদর্শনও যথেষ্ট রয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে.....

৮। মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ‘ছন্দোক্ত রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থলেখক যৌগিক ছন্দ নাম দিয়েছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের এই প্রথম তিনটি পংক্তিতেই মধুসূদন-প্রবর্তিত যৌগিক ছন্দের শক্তি ও যতিস্থাপনের ক্রটিও প্রমাণ রয়েছে। এই অংশটুকুকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এখানে বীরবাহুর ‘অকালমৃত্যুর সংবাদটি ভাঙ্গা রণ-পতাকার মতো ভাঙ্গা ছন্দে ভেঙে পড়ল।’ ভাঙা ছন্দ বলার হেতু ত্রিমাত্রিক ‘অকালে’ শব্দের পরে যতিস্থাপন। মধুসূদন পংক্তির যে কোনও স্থানে যতি স্থাপন করতে দ্বিধা করতেন না; অথচ অসমসংখ্যক মাত্রার পরে বিরতি ঘটানো এ ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

[ছন্দোঙ্কর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং) ৩৪-৩৫ পৃ.]

মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারে আর একটি উল্লেখযোগ্য শব্দগ্রন্থনরীতি লক্ষিত হয়। তিনি আট মাত্রার পদে অনেক সময় ৩+২+৩ মাত্রাক্রমে শব্দবিন্যাস করেছেন। পয়ার ছন্দোবন্ধের শব্দবিন্যাস সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সূত্র আটমাত্রার পদে দিয়েছিলেন, ‘বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।’ বিজোড়মাত্রক শব্দের পর বিজোড়মাত্রক শব্দ এবং জোড়মাত্রক শব্দের পর জোড়মাত্রক শব্দ ব্যবহারই পয়ারাঙ্গের পদবন্ধ-রচনার স্বাভাবিক রীতি। এর ব্যতিক্রম ঘটলে ছন্দের প্রত্যাশিত ধ্বনিপ্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়। মধুসূদন তাঁর প্রবহমান পয়ারে (বিশেষতঃ প্রথম দিকের কাব্যে) ৩+২+৩ মাত্রাক্রমে আটমাত্রার পদে শব্দগ্রন্থি দিয়েছেন এমন বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই শব্দ-গ্রন্থনের দুর্বলতা তিনি ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠেছেন। কবি নিজেই তাঁর প্রাথমিক রচনার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ সংশোধন করবেন ভেবেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্কু রাজনারায়ণ বসুকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন,—

I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective.....I think if spared some years yet, and allowed to go on my own way, I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else between Tilottama and Meghanad.

[মধুসূতি, ৬১৪-৬১৫ পৃ.]

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের যে ১৩৭ পংক্তি তিনি সংশোধনের সুযোগ পেয়েছিলেন সুযোগসত্তা সেখানে ৩+২+৩ মাত্রক শব্দবিন্যাসের দুর্বলতা সম্পূর্ণ পরিহার এ-রীতি সংশোধন করেছেন দেখা যায়। প্রথম সংস্করণে যেখানে লিখেছেন,—

(১) যেন উর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী

‘নিমগ্ন তপঃ সাগরে’ ব্যোমকেশ শূলী—

যোগীকুলধোয় যোগী ! [তি. কা. সর্গ ৪-৬ পৃ.]

(২) ‘ফণিনী-মণি-কুন্তলা’ বিষাকর ফণী, [ঐ ১ সর্গ. ১৮ পৃ.]

(৩) ‘অদূরে ঘোর তিমির’ গভীর গহ্বরে, [ঐ. ২০ পৃ.]

পরিমার্জিত অংশে উক্ত পংক্তিগুলি সংশোধন করে লিখেছেন—

(১) ব্যোমকেশ যেন

উর্ধ্ববাহু শুভ্রবেগে মজি চির যোগে

যোগীকূলে পূজা যোগী !

[তি. কা. (পুনর্লিখিত) ৪-৬ প., সা. প. সং. দ্র.)]

(২) ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষভরা [" ১৭]

(৩) সতত তিমিরময় গভীর গহ্বরে । [" ১৯]

—এ প্রসঙ্গে কবির একটি পত্রাংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,—

I believe you like the opening lines of the Second Book of Meghand. In that description of evening you have these lines.

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি

শর্বরী, বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the ‘তারাকুন্তলা’ and substitute সূচাকু-তারা ? You improve the music of the line, because the double syllable কু mars the strength of লা, Read—

আইলা সূচাকু তারা শশী সহ হাসি

শর্বরী সূগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী

কোন কোন ফলে চুপি কি ধন পাইলা ? [মধুস্মৃতি ৬২০ পৃ.]

এখানে কবি ৩+২+৩-মাত্রাক্রমে শব্দবিন্যাসের পরিবর্তে ৩+৩+২-মাত্রাক্রমে শব্দবিন্যাস করে ছন্দের স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি অবশ্য কারণ দেখিয়েছেন যে, ‘কুন্তলা’ শব্দটি পদশেষে থাকবার ফলে, যুক্তবর্ণ ‘কু’ পদান্ত ‘লা’ বর্ণের উচ্চারণ-গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, তাতেই ছন্দোবোধ ক্ষুণ্ণ হয়।—কিন্তু তাঁর নির্দেশিত এই ত্রুটি সংশোধন করে যদি লেখা যায়, ‘আইলা তারা চিকুরা’—কান তাতেও প্রসন্ন হবে না। আবার তাঁর নির্দেশিত ত্রুটি রেখেও যদি লেখা যায় ‘আইলা কুন্তলা তারা’, ছন্দের প্রত্যাশিত ধ্বনিপ্রবাহ ফিরে আসে। আসলে যে ত্রুটির ফলে কবির কান প্রথম প্রসন্ন হতে পারেনি সে হল, ৩+২+৩-মাত্রাক্রমের শব্দবিন্যাস। সংশোধনকালে তাঁর শ্রুতিবোধ স্বভাবতই ৩+৩+২-মাত্রাক্রমের শব্দবিন্যাস পছন্দ করে নিয়েছে;—এবং তারই ফলে ছন্দের স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ ফিরে এসেছে।

মধুসূদন অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনাশুলিতে অবশ্য ক্রমান্বয়ে এই ত্রুটিপূর্ণ শব্দবিন্যাসরীতি সংশোধন করে নিয়েছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ, ৬৬৬

ক্রমান্বয়ে একপ
দুর্বল বিন্যাসরীতি
কমে এসেছে

পংক্তিতে ১৩ বার তিন ৩+২+৩-মাত্রার শব্দক্রমে পদ গঠন
করেছেন। সেখানে পুনর্লিখিত ১৩৭ পংক্তিতে অনুরূপ শব্দক্রম
সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে ৭৮৫

পংক্তিতে একুপ শব্দবিন্যাস ১৮বার করেছেন; সে তুলনায় নবম সর্গের ৪৪৩ পংক্তিতে মাত্র একবার করেছেন। আরও পরিণত বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১৮৪ পংক্তিতে মাত্র ১১টি একুপ দৃষ্টান্ত মেলে।—আর ১০৮টি সনেটের ১৫১২ পংক্তিতে এমন একটি মাত্র উদাহরণ রয়েছে। শব্দগ্রন্থের এই ত্রুটি সম্পর্কে মধুসূদন যে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়েছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

এখানে কবির প্রবহমান পয়ার ছন্দের প্রধানতম কয়েকটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করা গেল। শব্দবিন্যাসে বা পদগঠনে তাঁর আরও কিছু কিছু দুর্বলতা লক্ষিত হয়। সেগুলিও পরিণত রচনায় ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। তুলনামূলক বিচারের তুলনামূলক সুবিধার্থে কবির বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবহমান পয়ারের কয়েকটি তথ্যতালিকা নিদর্শন থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগগত ত্রুটির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। সময়ে পেলে কবি তাঁর ছন্দের দুর্বলতাগুলি পরিহার করে প্রবহমান পয়ারকে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারতেন বলে মন্তব্য করেছিলেন (পৃ. ৮৪)। এই তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই ক্রমান্বয়ে কবি তাঁর প্রবহমান পয়ারের ত্রুটি কত দ্রুত সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

মধুসূদন ইংরেজি 'heroic-verse'-এর অনুরূপ বাংলা প্রবহমান পয়ার রচনা করতে গিয়ে যতিস্থাপনায় বা শব্দবিন্যাসে মাঝে মাঝে সামান্য কিছু দুর্বলতা দেখালেও, প্রবহমান পয়ারের সামগ্রিক বিচারে এ ছন্দে প্রবল ওজঃশক্তি এবং সচ্ছন্দ প্রবহমানতা ওজঃশক্তি ও এনে দিতে পেরেছেন। ইংরেজি ছন্দের accentuation বা প্রসঙ্গ-ধর্ম বাংলা উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলা অসাধ্য না হলেও দুর্কর। মধুসূদন সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদলবহুল তৎসম শব্দ ব্যবহারে এই প্রাসঙ্গিকতার গুণ কিছুটা ফুটিয়ে তুলেছেন। উমিবিষ্কৃত সমুদ্রোচ্ছ্বাসের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখলেন,—

যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে

[মে. কা. ১ সর্গ, ৫৩৩ প]

পাঠক মাগ্রেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে এ অংশ পাঠ করতে গিয়ে প্রসঙ্গস্পন্দন বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। গভীর উদাত্ত ভাবের উপযোগী ছন্দের প্রসঙ্গ-স্পন্দন কবি বহুলাংশে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটি উদাহরণ তুলছি।—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুকরূপী

বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষেপনধারী,

সুবর্ণ সান্দনারুঢ়; তালজঙ্ঘাকৃতি

দীর্ঘ তালজঙ্ঘাশূর-গদাধর যথা

মূর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে

রিপুকুলকালবলী; বিশারদ রণে,
 বর্ণপ্রিয়, বীর মদে প্রমত্ত সতত
 প্রমত্ত; চিহ্নব-রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;—

[মে. কা. ৬ সর্গ, ৩২২-৩২৯ পৃ.]

এখানে চিহ্নিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদল ব্যবহার দ্বারা বল-প্রসার (stress accent) সৃষ্টি-কৌশল লক্ষণীয়। মধুসূদনের সমগ্র রচনায় এমন বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

পয়ারবন্ধকে প্রবহমান করবার উদ্দেশ্যেই মধুসূদন পংক্তিশেষের মিল তুলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। মিল থাকলে যতিপ্রান্তিক ‘মিত্রাক্ষর পয়ার’ পঠনে অভ্যস্ত যতিপ্রান্তিক মিলের পাঠক পদগুলিকে আর ভাবপ্রবহমান করে পংক্তি ডিঙিয়ে পড়তে উৎসাহিত হবেন না। পংক্তিপ্রান্তে পূর্ণ যতি দিয়ে তার ছন্দকে পঙ্ক পরিবর্তে অনুপ্রাস করে ফেলবেন এমন আশঙ্কা ছিল। অবশ্য পংক্তিমিলের অভাবে যে সে যুগের সমিল যতিপ্রান্তিক পয়ার পঠনে অভ্যস্ত পাঠকের প্রত্যাশাবোধ অতৃপ্ত থেকে যাবে মধুসূদন তা ধরতে পেরেছিলেন। তাদের কানকে তৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যেই অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনতিরিক্ত অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। প্রায় সর্বত্রিতির অনুপ্রাসই তাঁর প্রবহমান পয়ারে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এখানে দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

(১) সশঙ্ক লঙ্কেশ-শূর স্মরিতা শঙ্করে [মে. কা. ৬ সর্গ, ৬৩৩ পৃ.]

এখানে একাধারে ‘স’ (শ, স্ম) এবং ‘ঙ্ক’—ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে।

(২) সিংহনাদে শূরসিংহ অরোহিতা রথে

[মে. কা. ৬ সর্গ, ২১৪ পৃ.]

এখানে ‘সিংহ’ শব্দটির এবং ‘র’ ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে।

(৩) চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি

জাহ্নবী;

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ‘কাশীরামদাস’]

এখানে সূক্ষ্ম ধ্বনি-মিল সমন্বিত চ, ছ, জ (য) ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে।

(৪) শত শরদের শশী সদৃশী শোভিল

বিভা !

[বীরাঙ্গনাকাব্য, ৩য় সর্গ, ৩২-৩৩ পৃ.]

এখানে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে শ-ধ্বনির অনুপ্রাস হয়েছে।

অনুপ্রাস ব্যবহার এই ধরনের অতিরিক্ত ধ্বনি-অনুপ্রাস কবি নিজে যে পছন্দ সম্পর্কে কবির করতেন এমন নয়। এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি মন্তব্য লিখেছিলেন,—

I have used more ‘অনুপ্রাস’ and ‘যমক’ than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank-verse.

[মধুস্মৃতি, ৬২৬ পৃ.]

মিত্রাক্ষর পয়ারের 'jingling monotony'র প্রভাব থেকে বাঙালী পাঠককে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই তিনি সচেতনভাবে প্রবহমান ছন্দে বেশী ধ্বনি-অনুপ্রাস দিয়েছেন। এর থেকেই অনুমান করা যায়, ভারতচন্দ্রের 'মিত্রাক্ষর'-প্লাবিত কাব্যক্ষেত্রে নব ছন্দ প্রবর্তনে তাঁকে কতটা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। আর কত সাবধানতার সঙ্গে তিনি এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে দলের মাত্রাগত উচ্চরণ-সুনির্দিষ্টতা ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্ত এনে দিয়েছেন। তবে শব্দ-মধ্য অযুক্ত রুদ্ধদল ব্যবহারে তখন শৈথিল্য ছিল।

শব্দমধ্য রুদ্ধদলের সে শৈথিল্য এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, পরবর্তী কবিদের ছন্দ প্রসারিত উচ্চারণ বিশ্লেষণে তা দেখা যাবে। মধুসূদন শব্দের মাঝে রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই বেশী পছন্দ করতেন। তবে সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্লিষ্ট উভয়

উচ্চারণেই রুদ্ধদল প্রয়োগ করেছেন তেমন দৃষ্টান্ত কিছু কিছু মেলে। যেমন,—

(i) নৃপরের 'বানবানি', কিক্কিনীর বোলী [মে. কা. ৩ সর্গ, ৯৫ প.]

এখানে 'বানবানি' শব্দটি বিশ্লিষ্ট চতুর্মাত্রক উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন। আবার,—

(ii) অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি বাজিল 'বানবানি' [ঐ ৩ সর্গ, ১০৬ প.]

এখানে 'বানবানি' শব্দটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ত্রিমাত্রকরূপে ব্যবহার করেছেন। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ ছন্দের উচ্চরণ-দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হয়, ছন্দের বাঁধুনি শিথিল হয়ে পড়ে। মধুসূদন এমন শিথিল উচ্চারণ বেশী না আনলেও মাঝে মাঝে এনেছেন দেখা যায়।

মধুসূদন প্রবহমান পয়ার রচনায় প্রধানত মিল্টনের আদর্শই সামনে রেখেছিলেন।

সম্ভবত মিল্টনের রচনা থেকেই তিনি Verse-paragraph বা পংক্তি-অনুচ্ছেদ গঠনের

মিল্টনের আদর্শে আদর্শও গ্রহণ করেছিলেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ বিচিত্র ভাবগ্রাহী পদগ্রন্থের

Verse-paragraph মাধ্যমে একটি ছন্দবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ অনুচ্ছেদ গঠনে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যবোধের

বা পংক্তি-প্রয়োজন হয়। মিল্টনের প্রতিবোধ এত নিখুঁত ছিল যে দীর্ঘ

অনুচ্ছেদ রচনা ভাবযতি এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসের সূক্ষ্ম সঙ্গতি এনে সার্থক পংক্তি-

অনুচ্ছেদ রচনায় সফল হয়েছিলেন। মধুসূদনও 'those prosodic rosin secret of Milton's.....his hardly excelled power of knitting the whole of a verse-paragraph into one, by variation of pause and weight'

[G. Saintsbury : A Hist of Eng. Prosody, Vol II, P. 217]

— অনেকাংশে আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছোট বড়ো নানা মাপের পংক্তি-অনুচ্ছেদ রচনায় তিনি ভাব ও ছন্দের সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কবির প্রবহমান পয়ারে রচিত কাব্যগুলির পংক্তি-অনুচ্ছেদ রচনা-কৌশলের প্রতি লক্ষ করলেই এটি উপলব্ধি করা যায়। এখানে দুটি পংক্তি-অনুচ্ছেদের পারস্পর্য রেখে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

উতরি সাগর তীরে, রচিলা সত্ত্বরে

যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে

সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
 মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
 শবে, সুকৌশিক বস্ত্র পরাই, থইল
 দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
 মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
 মহাতীর্থে সাধবীসতী প্রমীলা সুন্দরী
 খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।
 প্রণমিয়া গুরুজনে মধুর-ভাষিণী,
 সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবানাদলে,
 কহিলা,—“লো সহচরি, এতদিনে আজি
 ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
 আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
 কহিও পিতার পদে এসব বারতা,
 বাসন্তি ! মায়েরে মোর”—হায়রে, বহিল
 সহসা নয়ন জল ! নীরবিলা সতী;—
 কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !

মূহূর্তে সম্মরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
 “কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
 লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
 এতদিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
 পিতামাতা, চলি নু লো আজি তাঁর সাথে ;—
 পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
 আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
 প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে !”

[মে. কা, ৯ সর্গ : ৩৩৮-৩৬৩ প.]

পাশ্চাত্য আদর্শ
 প্রভাবিত দুরাস্রয় ও
 বন্ধনী ব্যবহারে
 দুর্বলতা

মধুসূদন প্রবহমান পয়ারবন্ধ রচনায় ইংরেজি রচনা-দর্শ
 গ্রহণ করবার ফলে বহুক্ষেত্রেই দুরাস্রয় এবং বন্ধনী প্রয়োগে ছন্দে
 স্বাভাবিক ধ্বনি-প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ করেছেন। একটি উদাহরণ
 তুলছি,—

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
 রথীন্দ্র, মধুর স্নরে, হায়রে, যেমতি
 নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
 প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
 চুপি নিম্নলিখিত আঁখি) “ডাকিছে কৃজনে

হৈমবতী উষা তুমি, রূপসী তোমারে
পাখিকুল !

[মে. কা. ৫ সর্গ, ৩৭৪-৩৮০ প.]

এখানে মূল বাক্যটি হল,—

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুরস্বরে কহিলা,
ডাকিছে কুজনে,
রূপসি, তোমারে পাখিকুল।

সেই সঙ্গে কবি এখানে,

- (১) হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জবিয়া
প্রেমের রহস্যকথা
- (২) (আদরে চুপি নিমীলিত আঁখি)
- (৩) হৈমবতী উষা তুমি

তিনটি পৃথক বাক্যাংশ দূরান্তিত ভাবে, অথবা বন্ধনী ব্যবহারের দ্বারা যুক্ত করেছেন। মূলবাক্যের সঙ্গে এমন ভাবে উপমাত্মক বা বিশেষণাত্মক বাক্যাংশ গ্রথিত হবার ফলে মূল ভাবপ্রবাহ মাঝে মাঝে বিম্লিত হয়েছে। বাংলা কাব্যরচনারীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে কবি এমন বাক্য গঠন করেছেন কি ? না এভাবে বাক্যগঠনের দ্বারা প্রসঙ্গসম্পন্দন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন ? যে কারণেই করুন, এ রীতি তাঁর প্রবহমান পয়ার ছন্দে দুর্বলতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে মনে হয়।

কাব্য রচনাক্ষেত্রে প্রবহমান পয়ারের যে 'steel frame' বা সুদৃঢ় বন্ধন রক্ষা করতে নাট্যসংলাপের হয়, নাট্য-সংলাপের প্রবহমান ছন্দ সে তুলনায় পৃথক রীতিতে রচিত প্রবহমান ছন্দ হওয়াই অভিপ্রেত। শেকসপীয়ার এবং মিলটনের Blank-verse-এর রচনারীতিতে যে পার্থক্য রয়েছে আমরা ইতিপূর্বেই তার আলোচনা করেছি। মধুসূদনও কবির মন্তব্য উভয় রচনারীতির পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,—

I would like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgement. Where the sentiment is elevated or idea is poetical—there only should short and smooth flowing passages in Blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed,—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear.

[সা. প. মধুসূদন গ্রন্থাবলী পদ্মাবতী নাটকের ভূমিকা, পৃ. ১৫]

লঘুবাকধর্মী প্রবহমান স্বচ্ছন্দ প্রবহমান, একাধারে বাকধর্মী এবং পদ্যছন্দের সঙ্গীত-
 ছন্দ নাট্যসংলাপে মাধুর্য্য সমন্বিত ছোট ছোট বাক্যাংশে গ্রথিত ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’
 অভিপ্রেত মধুসূদন ধীরে ধীরে নাট্যসংলাপে চালু করতে চেয়েছিলেন।
 কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,—

The verse is what in English we would call ‘Alexandrine’ i.e., containing 6 feet. The longest verse in our language is 7 footed *payer* ^১—but that is, like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes, The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our ‘heroic’ measure.

[মধুস্মৃতি. ৬২৫-৬২৬ পৃ.]

মধুসূদন স্পষ্টতই এখানে কাব্যরচনার উপযুক্ত বাংলা heroic measure —পয়ার ছন্দকে নাট্যসংলাপ রচনার পক্ষে too long and pompous বলেছেন।

পদ্মাবতী নাটকের চারটি দৃশ্য (২।২, ৪।১, ৪।২, ৫।২) আংশিকভাবে মধুসূদন প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এর পরও তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ এবং ‘মায়া কানন’

রচনা করেছেন। সেখানে গদ্যভাষার সংলাপই ব্যবহার করেছেন।
 পদ্মাবতী নাটকের তার একটি কারণ মনে হয়, শ্রোতার কান প্রবহমান ছন্দের সংলাপ
 মূজাকাসিত গ্রহণে তখনও তৈরী হয়ে উঠেনি, কবি সেটা বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়
 প্রবহমান ছন্দ আর একটি কারণ অনুমিত হয়। মধুসূদন সম্ভবত চতুর্দশমাত্রক

পয়ারবন্ধকে নাট্য-সংলাপের পক্ষে বেশী দীর্ঘ এবং মহিমাব্যঞ্জক বলে মনে করতেন।
 সেই কারণেই নাট্য-সংলাপে অপেক্ষাকৃত লঘুযতি ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছেন এবং
 তার ফলে মুক্তকের আভাষ কিছুটা এই নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে যেমন,—

কলি। (স্বগত) এই তো হরণ করি অনিনু রাণীঘরে
 এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ?

যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)

অহো ! এই যে পৌলমী

মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর কি করেছ, বল ?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,

বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

৯। ইংরেজি দ্বিদলপর্ব্বিক ছন্দের আদর্শে বাংলা চতুর্দশমাত্রক পয়ারকে মধুসূদন সপ্তপর্ব্বিক ছন্দরূপে কল্পনা করেছেন। বলাবাহুল্য, বাংলা ছন্দে এরূপ গণনা অচল।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তारे ?

কলি। এই ঘোর বনে

সখী সহ আনি তারে রেখেছি মহিষি। (সহাস্যবদনে)

রথে যবে তুলি দৌঁছে উঠিনু আকাশে

কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,

সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!

মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে ?

(প্রকাশ্যে) ভাল কলিদেব,—

কিছু কি হল না দয়া তোমার হৃদয়ে ?

কলি। সেকি, দেবি। হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী

ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,

সদয় হইয়া সেকি ছাড়ি দেয় তারে ?

শচী। কলিদেব,

শত ধন্যবান আমি করি গো তোমারে !

[পদ্মাবতী নাটক, ৪।২]

উদ্ধৃতাংশে ২৪ পংক্তিতে লেখক আটটি মুক্তক (১৪ মাত্রার পংক্তি থেকে ছোট ৪, ৬, ৮, ১০ মাত্রার)-পংক্তি ব্যবহার করেছেন। আরও লক্ষণীয়, অপ্রচলিত রুদ্ধদলবহুল তৎসম শব্দ, অনুপ্রাস অলঙ্কার, দুরাস্তিত বাক্য গঠনরীতি, দীর্ঘতর পংক্তি ডিঙানো ভাব-প্রবহমানতা যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। সহজ বাকধর্মী সংলাপ রচনার দিকেই তিনি মনোযোগী হয়েছেন; মুক্তকধর্মী পংক্তি রচনায় মধুসূদন মিশ্রবৃত্ত রীতির শব্দগ্রন্থন-রীতি মেনে চলেছেন; পূর্ণ পয়ার পংক্তিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যযতি (caesura) বা পংক্তিপ্রান্তিক যতি দিয়েছেন। সুতরাং নাট্যসংলাপের উপযুক্ত অপেক্ষাকৃত লঘু পদক্ষেপের সরল বাক্য রচনার দিকে যে তাঁর সম্যক চোঁটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। Verse-Paragraph বা পংক্তি-অনুচ্ছেদ গঠনে যে steel frame-এর বা দৃঢ়বন্ধ প্রবহমান পয়ারের আদর্শ নিয়েছিলেন, সে তুলনায় নাট্য সংলাপের ছন্দে ভাবের প্রবহমানতা, ভাবাবিন্যাস, শব্দচয়ন বা যতি সংস্থাপনায় অনেক লঘু, সরল ধারা গ্রহণ করেছেন। তারই আদর্শে পরবর্তীযুগে নাট্যসংলাপের উপযোগী ‘গৈরিশ’ মুক্তক ছন্দবন্ধ রচিত হয়েছে। মুক্তকাভাসযুক্ত শিথিল ছন্দাবন্ধের পরীক্ষা কবি কাব্যের ক্ষেত্রেও করেছেন, সে বিষয়ে পরে ‘বিবিধ কাব্য’-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে মধুসূদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল, পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্য

সনেটাদর্শে

চতুর্দশপদী রচনা

সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা। সতের-আঠারো বছর বয়সে, হিন্দুকলেজে পাঠ্যাবস্থায়ই মধুসূদন ইংরেজি সনেট কবিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গৌর দাস বসাকের সংগ্রহে, হিন্দুকলেজের ছাত্রজীবনে রচিত মধুসূদনের কবিতাবলীর মধ্যে ‘Sonnets : To

a Star during a coludy night' নামে নয়টি সনেটের গুচ্ছ এবং Sonnet : written at the Hindu College নামে একটি সনেট মিলছে [মধুস্মৃতি : পৃ. ১৬-২০, ৩১]। সনেটগুচ্ছে কবির নিসর্গপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, এক তারকাসুন্দরীকে মেঘাচ্ছন্নরাতে কবি প্রশস্তি জানিয়েছেন;—একক সনেটটি স্বদেশপ্রীতি-মূলক। সবগুলিই Iambic দ্বিদল (অন্ত্যগুরু)-পঞ্চপর্বিক, প্রবহমান প্রাথমিক ইংরেজি পংক্তিবন্ধে রচিত। মিলবিন্যাসে শিথিল পেত্রাকীয় এবং স্বাধীন রীতি সনেট রচনা গ্রহণ করেছেন, শেকসপীয়রীয় রীতি অনুসরণ করেননি। তখনও তিনি বাংলাভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেননি। সবগুলিই ইংরেজিতে লেখা। তবে সনেট রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে প্রথম জীবনেই কবির সচেতনতা এবং Iambic heroic verse-এর প্রতি অনুরাগ পরবর্তী জীবনে বাংলা কাব্যের (বিশেষতঃ সনেটের) নতুন ছন্দোবন্ধ রচনার সহায়ক হয়েছিল অনুমান করা যায়।^{১০} মাদ্রাজের প্রবাসী জীবনে (১৮৪৮-৫৬) মধুসূদন ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করেছেন। Timothy Penpoem ছদ্মনামে এই সময়ে দুটি সনেট লিখেছেন। সনেট দুটির মিলবিন্যাস যথাক্রমে কখকখ, খককখ, গঘঙগঘঙ এবং কখকখ কখকখ গঘঙগঘঙ। প্রথম অষ্টকে দুটি মিল,—পরবর্তী ষটক-তে তিনটি মিল। এ ভঙ্গি পেত্রাকীয়। মধুসূদন এই যুগেও সনেটের রচনারীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন দেখা গেল।

বাংলা সনেট রচনার সূত্রপাত হয় ১৮৬০-সেপ্টেম্বরে। ৭ই বাংলায় সনেট প্রবর্তন সেপ্টেম্বর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে সর্বপ্রথম 'কবি মাতৃভাষা' নামক সনেটটি রচনা করে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে চিঠিতে লিখেছিলেন,—

I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago made the following.....what say you to this, my good friend ? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

[মধুস্মৃতি ২৭৪ পৃ.]

১০। উপরোক্ত দশটি সনেটে মধুসূদন নয় রকমের মিলবৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। প্রথম ও নবম কবিতায় কখকখ গঘগঘ ঙচঙচছছ, দ্বিতীয় কবিতায় কখকখ গঘগঘ ঙচঙচছছ, তৃতীয় কবিতায় কখকখ গঘগঘ ঙচঙচঙচ, চতুর্থ কবিতায়, কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ, পঞ্চম কবিতায় কখকখ গঘগঘ ঙচঙচঙচ, ষষ্ঠ কবিতায়, কখকখ, কখকখ, গকগকগক, সপ্তম কবিতায়, কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ, অষ্টম কবিতায়, কখকখ কগকগ ঘঙঘচঙচ, দশম কবিতায়, কখকখ গঘগঘ ঙচঙচছছ।

পরবর্তী যুগে বাংলা সনেট লিখতে গিয়ে কবি আলাচ্য মিলবিন্যাসের মধ্যে চতুর্থ সনেটটির মিল সবচেয়ে বেশী (১০৮টি সনেটের মধ্যে ৩০টিতে) ব্যবহার করেছেন, সপ্তম সনেটটির মিল বিন্যাসও আটটি সনেটে দিয়েছেন। অন্যান্য মিলবিন্যাস-রীতি পরিত্যাগ করেছিলেন।

আরও পাঁচ বছর পরে ১৮৬৫-তে ফ্রান্সের Versailles নগরীতে অবস্থানকালে তিনি পেত্রার্কার সনেট পড়ে আবার সনেট রচনায় আগ্রহী হন।
 পেত্রার্কার আদর্শ ১৮৬৫, ২৬শে জানুয়ারী মধুসূদন গৌরদাস বসাককে গ্রহণ চারটি সনেট লিখে পাঠান। সেই সঙ্গে চিঠিতে মন্তব্য করেন,—

I have been lately reading Petrarca—the Italian poet, and scribbling some ‘sonnets’ after his manner. I dare say the sonnet ‘চতুর্দশপদী’ will do wonderfully well in our language^{১১}

[সা. প. সং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভূমিকা, ১৬ — ১৬ পৃ.]
 মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১০২টি সনেট এবং অন্যান্য কিছু কবিতাসহ ১৮৬৬, ১লা আগস্ট প্রকাশিত হয়। এর পর কবি আর কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন।^{১২} তাঁর মোট রচিত সনেট সংখ্যা হল ১০৮।

মধুসূদন পেত্রার্কার আদর্শে সনেট লিখেছিলেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। আঙ্গিকে কিছুটা পেত্রার্কার সঙ্গে মিল থাকলেও পেত্রার্কার Laura Poems-এর প্রেমবিষয়ক কাব্যগুচ্ছের রচনাদর্শ মধুসূদন প্রায় গ্রহণ করেননি দেখা যায়। আঙ্গিক বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধুসূদন শেকসপীয়রকেও বিশেষ অনুসরণ করেননি। তবে মিলটনের সনেটাদর্শ এবং রোমান্টিক যুগের কবিদের পেত্রার্কীয় আঙ্গিকের কিছুটা স্বাধীন রচনাদর্শ মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল মনে হয়।

পেত্রার্কির সুপরিচিত সনেট-আঙ্গিকের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে একাদশ দলমাত্রক পংক্তিবন্ধে চতুর্দশ পংক্তিতে কবিতাটি শেষ হবে।

পেত্রার্কার তার মধ্যে যথাক্রমে আট (octave বা অষ্টক) এবং ছয় (sestet বা ষটক) পংক্তিতে ভাবগত এবং মিলগত দুটি ভাগ থাকবে।
 সনেটাদর্শ অষ্টকের প্রথম চার পংক্তির পর সামান্য ভাবযতি থাকবে, আট

পংক্তিশেষে সে যতি স্পষ্টতর হবে। এই আট পংক্তিতে মাত্র দুটি পংক্তি-মিল থাকবে,— সেই মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা থাকলেও প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং অষ্টম পংক্তিতে একটি মিল, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পংক্তিতে আর একটি মিলবিন্যাসই সবচেয়ে সুপ্রচলিত রীতি। অষ্টক যেমন অনতিস্পষ্ট দুটি চতুঃপংক্তিক শ্লোকে বিভক্ত

১১। চিঠির সঙ্গে কবি সর্বপ্রথম, ‘অন্নপূর্ণার ঝাঁপি’, ‘জয়দেব’, ‘কপোতাক্ষ নদ’ এবং ‘সায়ংকাল’ এই চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন।—এর মধ্যে ‘জয়দেব’ কবিতাটি পেত্রার্কীয় পংক্তিমিলের আদর্শ-বিরোধী। শেষ দুটি পংক্তিতে এক মিল দেওয়া হয়েছে।

১২। (ক) ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উদ্ভবে, (খ) পুংলিয়া, (গ) পরেশনাথ গিরি, (ঘ) কবির ধর্মপুত্র, (ঙ) পঞ্চকোট গিরি, (চ) পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী—এই ছয়টি সনেট পরে রচনা করেছেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ৩ সংখ্যক ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি পূর্বেই ‘কবি মাতৃভাষা’ কবিতাটিরই পরিমার্জিত রূপ। দুটি কবিতাকে পৃথক ধরলে মোট সনেট সংখ্যা হবে ১০৯।

হয়, ষটক তেমনি দুটি ত্রিপংক্তিক শ্লোকে (tercet) দুই বা তিনটি মিলে বিন্যস্ত হয়।—শেষ দুই পংক্তিতে এক মিল (couplet) এ সনেটের রীতি-বিরোধী। আদর্শ পেত্রাকীয় সনেটে অষ্টক-ষটক স্ববকভাবে ভাবের জোয়ার-ভাটার অনুরূপ আবর্তনলীলা লক্ষ করা যায়।—অবশ্য এমন উচ্ছ্বাস-আবর্তন-বিহীন,—এমনকি অষ্টক-ষটক ভাবগত বিভাগহীন পেত্রাকীয় সনেটেরও নিদর্শন মেলে। তবে তাকে এই রীতির আদর্শ সনেট বলা চলে না। পেত্রাকীয় সনেটে অষ্টকের মাত্র দুটি মিল এবং ষটকের দুটি (বা তিনটি) মিল একটি সুস্পষ্ট ক্রমবিন্যাসে আবর্তিত হবার ফলে ছন্দধ্বনিগত এবং ভাবগত বন্ধনমুক্তির একটি পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যায়। উৎকৃষ্ট পেত্রাকীয় সনেট সম্পর্কে ইংরেজ কবি Theodore Watts Dunton যে ছন্দোবদ্ধ সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

A sonnet is a wave of melody :
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole.
Flow in the “Octave”; then returning free,
Its ebbing surges in the “Sestet” roll
Back to the deeps of Life’s tumultuous sea.

[Four Sonnets on the Sonnets : T. W. Dunton]

এই কথারই ইঙ্গিত দিতে গিয়ে প্রথম চৌধুরী তাঁর সভাবনিপুণ চটুলভাষণে বলেছেন,—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।

শিল্পী যাহে মুক্তিলভে অপরে ক্রন্দন ॥

ইংরেজ কবি জি. জি. রসেটি আদর্শ পেত্রাকীয় সনেটের এই চতুর্দশপংক্তিক সন্ধ্যায়তনে ভাব ও ছন্দের বিস্ময়কর প্রকাশাবেগ স্মরণ করেই লিখেছেন—A Sonnet is a moment’s monument. [The House of Life এর Introduction দ্র.]

ইরেজি সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে Saintsbury মন্তব্য
শেকসপীয়রের করেছেন,—I have no doubt, that exquisite as have been
সনেটাদর্শ some—nay, many—compositions in English on the
Octave-sestet-tercet plan, the model for our language is
the douzain-couplet.

[A Hist of Eng. Pro. Vol II, 146 P.]

শেকসপীয়র এই শেষোক্ত আদর্শের ইংরেজি সনেটের ধারা প্রবর্তন করেছেন। ছান্দসিক Saintsbury আদর্শ শেকসপীয়রীয় সনেটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

In the very first line there is the spread and beating of the wings this flight rises till the end of the douzain, when it stoops or sinks quietly to close in the couplet.

[A Hist. of Eng. Prosody Vol II. 60 P.]

প্রথম তিনটি চৌপংক্তিক শ্লোকে কল্পনা-বিহঙ্গের ক্রম উর্ধ্বগতিতে নিঃসীম নভোযাত্রা এবং শেষ দুটি মিত্রাক্ষর পংক্তিতে ডানা গুটিয়ে একান্তভাবে নীচে নেমে আসবার ভাবসৌন্দর্য শেকসপীয়রীয় আদর্শ সনেট পাঠে উপলব্ধি করা যায়।

মধুসূদন তাঁর ১০৮টি বাংলা সনেটের মধ্যে পাঁচটিতে (বঙ্গভাষা, কাশীরাম দাস, জয়দেব, মেঘদূত-২, পুরুলিয়া) শেকসপীয়রীয় মিল দিয়েছেন। সেখানেও বিশুদ্ধ শেকসপীয়রীয় রীতির তিনটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকশেষে একটি দ্বিপংক্তিক মিল (couplet) মাত্র দুটি কবিতায় (‘বঙ্গভাষা’ এবং ‘কাশীরাম দাস’) রয়েছে। অবশ্য ভাবগত উচ্চাদর্শের বিচারে এ দুটির কোনোটিই শেকসপীয়রীয় উৎকৃষ্ট সনেটের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

ইতালীয় সনেটের আদর্শ পংক্তিমাপ, একাদশদল ফরাসী সনেট সাধারণতঃ দ্বাদশদলে রচিত হয়; ইংরেজি সনেটের স্বাভাবিক মাপ হল দশদল পংক্তি। বাংলায় মধুসূদন ইংরেজি পঞ্চদ্বিদল-পর্বিক heroic-verse এর বিকল্প চতুর্দশমাত্রক পয়ারবন্ধকেই সনেটের আদর্শ পংক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

মধুসূদন তাঁর সনেটের অষ্টক স্তবকবন্ধে পেরাকীর্ষ আদর্শে দুটি মাত্র মিল দিয়েছেন;

মধুসূদনের ১০৮টি সনেট মিলের তালিকা

ষটক স্তবকবন্ধে দুই মিল, অল্প কিছু বৈচিত্র্যধর্মী তিন মিলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা এক নজরে দেখবার সুবিধার্থে এখানে কবির সমগ্র সনেট-আঙ্গিকের (স্তবক বিভাগ ও পংক্তিমিলের) একটি তালিকা দিচ্ছি।—

পংক্তি মিল	কবিতার নাম
	(বন্ধনী মধ্যে ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে’ প্রদত্ত কবিতার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হল)।
(১) কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ	উপক্রম (১,২), অন্তর্পূর্ণার ঝাঁপি (৫), পরিচয় (১৩), কবি (১৬), দেবদোল (১৭), কুসুমে কীট (২৬), সরস্বতী (৩৩), কল্পনা (৩৮), মধুকর (৪১), নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির (৪২), কিরাত আর্জুনীয়ম (৪৪), সীতা বনবাসে (৫০), বিজয়াদশমী (৫১), কোজাগর লক্ষ্মীপূজা (৫২), বীররস (৫৩), গোগৃহরণে (৫৫), দৃঃশাসন (৬২), দ্বৈষ (৭০), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (৭৫), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭৮), শিশুপাল (৭৯), অর্থ (৮১), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৮৬), হরিপর্বতে

পংক্তি মিল

কবিতার নাম

দৌপদীর মৃত্যু (৮৯), আমরা (৯২),
শকুন্তলা (৯৩), ব্রজবৃত্তান্ত (৯৮), পঞ্চকোট
গিরি।

(২) কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ

—এ পর্যায়ে ২৯টি সনেট লিখিত হয়েছে।
সায়ংকাল (২১), ছায়াপথ (২৫),
সৃষ্টিকর্তা (২৮), সীতাদেবী (৩০),
নন্দনকানন (৩২), বসন্তে একটি পাখির
প্রতি (৩৬), পরলোক (৪৫), গদাযুদ্ধ
(৫৪), শ্যামাপক্ষী (৬৮), যশঃ (৭১),
ভাষা (৭২), মিত্রাক্ষর (৯৭), ভূতকাল
(১০০), আশা (১০১)।

(৩) কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ

—এ পর্যায়ে ১৪টি সনেট লিখিত হয়েছে।
পরিচয় (১৪), কপোতাক্ষ নদ (৩৪),
সীতা বনবাসে (৪৯), শূল্যবরস (৫৮), উর্বশী
(৬০), হিড়িম্বা (৬৩, ৬৪), নূতন বৎসর
(৬৬), কেউটিয়া সাপ (৬৭), শনি (৭৬),
পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্ট্রুকার (৮৩),
পৃথিবী (৯১), সমাপ্তে (১০২), ঢাকা-
বাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে, পরেশনাথ
গিরি।

(৪) কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ

—এ পর্যায়ে ১৫টি সনেট লিখিত হয়েছে।
কালিদাস (৯), বটকথাকও (১২), কবিতা
(১৯), নিশা (২৩), নিশাকালে নদীতীরে
বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির (২৪), বটবৃক্ষ
(২৭), রাশিচক্র (৩৯), সুভদ্রা (৫৯),
দ্বৈষ (৬৯), তারা (৮০), কবিগুরু দাস্তে
(৮২), ভারতভূমি (৯০), ভূতকাল (৯৯),
কবির ধর্মপুত্র।

(৫) কখকখ কখকখ গঘগঘগঘ

—এ পর্যায়ে ১৪টি সনেট লিখিত হয়েছে।
প্রাণ (৩৭), সুভদ্রাহরণ (৪০), ভরসেলস
নগরে রাজপুরী ও উদ্যান (৪৩), সাংসারিক
জ্ঞান (৪৬), সাগরে তরি (৭৭), কবিবর

পংক্তি মিল	কবিতার নাম
	ভিক্তর হুগো (৫৩), শ্রীমন্তের টোপর (৯৫)। —এ পর্যায়ে ৭টি সনেট লিখিত হয়েছে।
(৬) কখখক কখখক গঘগঘগঘ	সায়ং কালের তারা (২২), মহাভারত (৩১) ঈশ্বর পাটনী (৩৫), শ্মশান (৪৭), রামায়ণ (৮৮), কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া (৯৬)। —এ পর্যায়ে ৬টি সনেট লিখিত হয়েছে।
(৭) কখখক খকখক গঘগঘগঘ	শ্রীপঞ্চমী (১৮), অশ্বিনমাস (২০), করুণরস (৪৮), রৌদ্ররস (৬১), সংস্কৃত (৮৭)। —এ পর্যায়ে ৫টি সনেট লিখিত হয়েছে।
(৮) কখকখ খককখ গঘগঘগঘ	সূর্য (২৯), বঙ্গদেশে এক মান্য-বন্ধুর উপলক্ষে (৪৬), কুরুক্ষেত্রে (৫৬), শৃঙ্গাররস (৫৭)। —এ পর্যায়ে ৪টি সনেট লিখিত হয়েছে।
(৯) কখখক খকখক গঘগঘগঘ	যশের মন্দির (১৫), উদ্যানে পুষ্করিণী (৬৫)। —এ পর্যায়ে ২টি সনেট লেখা হয়েছে।
(১০) কখকখ খকখক গঘগঘগঙ	বঙ্গভাষা (৩)।
(১১) কখকখ খকখক গঘগঘগঘ	কবি মাতৃভাষা।
(১২) কখখক কখখক গঘগঘগঙ	কমলে কামিনী (৪)।
(১৩) কখকখ কখকখ গঘগঘগঙ	কাশীরাম দাস (৬)।
(১৪) কখকখ কখকখ গঘগঘগঙ	কৃতিবাস (৭)।
(১৫) কখখক খকখক গঘগঘগক	জয়দেব (৮)।
(১৬) কখকখ খকখক গঘগঘগঘ	মেঘদূত (১০)।
(১৭) কখখক কখকখ কগকগক	মেঘদূত (১১)।
(১৮) কখকখ খকখক গখগখগখ	পুরুষবা (৭৪)।
(১৯) কখখক কখকখ গঘগঘগঘ	বাল্মীকি (৯৪)।
(২০) কখকখ কখকখ গঘগঘ গঙ	পুরুলিয়া।
(২১) কখকখ খকখক গখগখগখ	পঞ্চকোটসা রাজশ্রী।

আলোচ্য বিবরণী থেকে দেখা গেল, প্রথম অষ্টকের মাত্র দুই মিলে মধুসূদন নয় প্রকারের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। যথা, (১) কখকখ কখকখ, (২) কখখক খকখক, (৩) কখকখ কখখক, (৪) কখকখ খকখক, (৫) কখখক কখকখ, (৬) কখখক কখখক, (৭) কখখক খকখক, (৮) কখকখ খককখ, (৯) কখখক ককখক। পরবর্তী ষটক স্বরকেও দুই বা তিন মিলে নয়প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যথা, (১) গঘগঘগঘ, (২) গঘগঘগঘ, (৩) গঘগঘগঙ, (৪) গঘগঘগঘ, (৫) গঘগঘগঙ, (৬) গঘগঘগক, (৭) কগকগকক, (৮) গখগখগখ, (৯) গখখগখগ।

অষ্টক পংক্তি মিলে (১৯) কখখক ককখক [বাল্মীকি (৯৪) চতুর্দশপদী কবিতাবলী দ্র.] — উদাহরণটি দুর্বল মিলের নিদর্শন।

ষটক পংক্তিমিলে (৭) কগকগকক, (৮) গখগখগখ, এবং (৯) গখখগখগ, [যথাক্রমে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মেঘদূত (১১), পুরুষবা (৭৪), এবং বিবিধকাব্যের ‘পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী’ কবিতা দ্র.] উদাহরণ তিনটি দুর্বল মিলের পরিচায়ক।

সীতাদেবী (৩০) সনেটটিতে কখখক খকখক—অষ্টকমিলে পঞ্চম ও সপ্তম পংক্তিতে দুর্বল মিলের (বৃথা—রথী) পরিচয় দিয়েছেন।

চতুষ্পংক্তিক শ্লোকের যতিভাগ, অষ্টক-ষটকের ভাবগত ভাগ, ষটকের ত্রিপংক্তিক যতিভাগ খুব অল্পসংখ্যক কবিতায়ই রক্ষিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রচলিত পেত্রাকীয় পংক্তিমিলে মধুসূদন মাত্র একটি সনেট (কমলে কামিনী) রচনা করেছেন। সেখানেও অষ্টকের মাঝে চতুষ্পংক্তিক বিভাগ বা ষটকের মাঝে ত্রিপংক্তিক বিভাগ রাখেননি।

কিছুটা শিথিল পংক্তিমিলে পেত্রাকীয় আদর্শে রচিত মধুসূদনের একটি উৎকৃষ্ট সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি।—

“যেওনা, রজনী, আজি লয়ে তারা দলে!

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—

উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

বারমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,

পেয়েছি উমায় আমি! কি সাধুনা ভাবে—

তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা কুন্তলে,

এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে?

তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে

দূর করি অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী—

মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!

দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,

নিবাও এ দীপ যদি !”—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী বিজয়াদশমী (৫১)]

কবি এখানে ৪র্থ পংক্তিতে অল্প ভাবযতি এবং ৮ম পংক্তিতে স্পষ্টতর ভাবযতি দিয়ে অষ্টকের স্তবকবিভাগ রেখেছেন। ষটক স্তবকেও ৩য় এবং ৬ষ্ঠ পংক্তিশেষে ভাবযতি রয়েছে। অষ্টক অংশে দুটি মিল (কথকথ, কথকথ) এবং ষটক অংশে দুটি মিল (গঘগ, ঘগঘ) দিয়েছেন। ভাবের আবর্তনও এখানে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

বিশুদ্ধ শেকসপীয়রীয় মিলবিন্যাসে (কথকথ, গঘগঘ, ঙ্চঙচ, ছছ) মধুসূদন একটিও সনেট লেখেননি। তবে শেকসপীয়রের আদর্শে শেষ শেকসপীয়রীয় দুই পংক্তিতে এক মিল (couplet) দিয়ে পাঁচটি সনেট (আংশিক) আদর্শের লিখেছেন।— সেখানে অষ্টক মিল পেত্রার্কে'র আদর্শে দিয়েছেন। এই মিশ্ররীতির একটি উৎকৃষ্ট সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি,—

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল। যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হৃদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত বোদন।
কঠোর গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল ধন !)
সাগর বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি সবলে,
ভারত রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা এ বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি !
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান॥

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী কাশীরাম দাস (৬)]

এখানে তিনটি চতুঃপংক্তিক শ্লোকে যেমন অশ্রুত ভাবযতি রয়েছে,—তেমনি দ্বাদশ পংক্তির ভাবের ক্রম-নভচারী উচ্ছ্বাস শেষের দ্বিপংক্তিক শ্লোকে (couplet) যেন ডানা গুটিয়ে আবার নেমে এসেছে। শেকসপীয়রীয় সনেটের দ্বাদশ পংক্তিক ও দ্বিপংক্তিক ভাবের আবর্তন এখানেও যেন আংশিকভাবে উপলব্ধি করা যা

কিন্তু মধুসূদনের বহু সংখ্যক সনেটেই সুস্পষ্ট অষ্টক-ষট্‌ক ভাবের আবর্তন রক্ষিত হয়নি।—এমনকি সনেটের চতুর্দশ পংক্তির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সনেট রচনায় ভাবের পূর্ণ রূপায়ন, ভাব ও ছন্দের সংযত গাঞ্জীর্ষ কবির অধিকাংশ মিলটনের প্রভাব চতুর্দশপদী কবিতায়ই পরিস্ফুট হতে পারেনি। সেদিক থেকে মিলটনের সনেটের সঙ্গেই তার বেশী সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। Saintsbury মিলটনের অষ্টক-ষট্‌ক সুস্পষ্ট ভাগবিহীন সনেট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

To Milton indeed, the sonnet is not much more than a form of verse-paragraph.

[A Hist of Eng Prosody, vol II, P. 217]

—অনুরূপ মন্তব্য মধুসূদনের অনেকগুলি সনেট সম্পর্কে করা যেতে পারে। ১০৮টি সনেটের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৫১টি সনেটে মধুসূদন অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগে ভাবের আবর্তন রক্ষা করেননি।^{১৩} সাতটি সনেটে দুটি করে চতুর্দশপদী দিয়ে সনেট-পরম্পরা (Sonnet sequence) রচনা করেছেন। সেখানে পাঠ করতে গেলেই, পাঠকমনে দুটি পংক্তি-অনুচ্ছেদে (Verse-paragraph) গ্রথিত একটি কবিতা পঠনের অনুভূতি আসে। মিলটন পেত্রার্কার মিলবিন্যাস অনুসরণ করলেও সেখানে কিছু স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; তিনি বিষয়বস্তুর দিক থেকে পেত্রার্কী বা শেকসপীয়রের প্রেম-বর্ণনাদর্শ ত্যাগ করেছেন, তিনি সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ বা দ্বাদশ পংক্তিক-দ্বিপংক্তিক ভাবের আবর্তন-লীলাও অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা করেননি।—অনুরূপ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের ‘চতুর্দশপদী’ রচনার ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়। মিলটনের সনেটে প্রবহমান Blank-verse ব্যবহৃত হয়েছে,—মধুসূদনও চতুর্দশপদীতে প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন।—এই সকল রচনা বৈশিষ্ট্যের সাধর্ম্যে মধুসূদনকে মিলটনের অনুগামী সনেটকার বলাই অধিকতর সম্ভব হবে।

সনেটবন্ধের ‘পিণ্ডবন্ধ বন্ধল শাসিত শকুন্তলার যৌবনের’ ন্যায় ভাবাবেগ মধুসূদনের সামান্য সংখ্যক সনেটে কিছুটা পাওয়া গেলেও অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দশ পংক্তিক

১৩। নিম্নলিখিত চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে মধুসূদন অষ্টক-ষট্‌ক ভাবগত আবর্তন বিভাগ রক্ষা করেননি, নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।— উপক্রম ১, জয়দেব, মেঘদূত ২, পরিচয় ১, দেবদোল, কবি, আশ্বিনমাস, সায়াংকাল, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, কুসুমের কীট, সৃষ্টিকর্তা, সূর্য, সীতাদেবী, মহাভারত, নন্দনকানন, সরস্বতী, প্রাণ, কল্পনা, রাশিচক্র, সুভদ্রাহরণ, মধুকর, ভরসেল্‌স্‌ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, করুণরস, সীতা-বনবাসে ১, ২, বীররস, গদাযুদ্ধ, গোগুহে রণ, কুরুক্ষেত্রে, শৃঙ্গাররস ১, ২; উদ্যানে পুষ্করিণী, দেখ ১, পুরুষবা, সাগরে তরি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, সংস্কৃত, ভারতভূমি, পৃথিবী, আমরা, শ্রীমন্তের টোপর, ভূতকাল ১, ২, সমাপ্তে, ঢাকাবাসীগণের অভিনন্দনের উদ্ভবে, পরেশনাথ গিরি, কবির ধর্মপুত্র, পঞ্চকোট গিরি।

পংক্তি- অনুচ্ছেদের (verse-paragraph) সাধর্ম্যে রচিত হয়েছে। তবে তিনি যে ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian,—সে উক্তি অনেকাংশে সফল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক একাধিক সনেটকারের সনেট পড়তে গিয়ে সে কথা উপলব্ধি করা যায়। মধুসূদনের আর কোনও কাব্যাদর্শ বা রচনারীতি পরবর্তী কবিরা ঠিক ভাবে অনুকরণ করেননি।—একমাত্র সনেটের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তিনি উত্তরসূরীদের মধ্যে আরও প্রাণবন্তভাবে বেঁচে রয়েছেন। সেদিক থেকে বিচারে মধুসূদনের সনেট রচনা বাংলা ছন্দের (এবং কাব্যের ও বটে) ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।^{১৩}

১৮৬১, জুলাইতে ব্রজানন্দ কাব্য প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এ কাব্যকে ‘Odes’ নামে

১৪। এ গ্রন্থে ছন্দের আঙ্গিক আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবু প্রসঙ্গত’দু একটি কথা জগদীশ ভট্টাচার্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর ‘সনেটের আলোকে মন্তব্য বিচার মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে (১৯৫৬ মার্চমাসে প্রকাশিত) মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি সনেট রচনার রীতি সম্পর্কে বলেছেন,—

‘সনেটের ছন্দমিল এবং ভাবের বাহ্য ও আভ্যন্তর সঙ্গতি ও আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে হৃদয় মূর্জিলীলায় তাকে বিলসিত করে তোলাই সনেট রচয়িতার মুখ্য শিল্পকৃত্য। (পৃ ৮০-৮১)
তারপরই মন্তব্য করেছে ন,

মধুসূদনের চতুর্দশ পদী বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় সঙ্গতিতেই বিশুদ্ধ সনেটের কঠিন আদর্শকে অটুট রেখেছে।... কয়েকটি অনুগ্রীর্ণ কবিতা ছাড়া সর্বত্রই অষ্টক ও ষট্‌ক বন্ধে আবর্তন সন্ধিতে ছন্দ ও ভাবের লীলাবিলাস সার্থক। (পৃ ৮১)

শ্রীযুত ভট্টাচার্যের মতে ‘৭০টি সনেটে আবর্তন সন্ধি আছে, ৩২টিতে নাই।’ প্রথমতঃ মধুসূদন ১০২টি (৭০+৩২) নয়, ১০৮টি সনেট লিখেছেন। দ্বিতীয়ত, সমালোচক বোধ হয় নিছক বহিরঙ্গের পংক্তিগণিত দেখে এমন সিদ্ধান্ত করেছেন। রসেটি যাকে ‘moment’s monument’ বলে অভিহিত করেছেন, ওয়াটস ডানটন যাকে ‘wave of melody’ বিশেষণে সমুদ্রে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন,—এমনকি স্বয়ং সমালোচক সনেট রচনায় যে আদর্শের উল্লেখ করেছেন, মধুসূদনের অন্ততঃ ৫১টি চতুর্দশপদী কবিতায় সেই ভাবের প্রগাঢ়তা বা আবর্তন-লীলা আদৌ প্রকাশ পায়নি। গাঢ়বন্ধ ভাব বা অষ্টক-ষট্‌কের আবর্তন সার্থক ভাবে তাঁর অতি অল্প সংখ্যক কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য এই দিকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ না করেই সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি মধুসূদনের সনেটকে তাঁর ‘গীতিকাব্য লক্ষ্মী’ বলেছেন। কবির ব্যক্তিমানস অনেকাংশে তার সনেটগুলিতে এবং ‘আত্মবিলাপ’ ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ গীতিকবিতা দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সনেটে এই ব্যক্তিমানের গীতিপ্রকাশ ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু চাই। সেই দিক থেকে বিচারে মধুসূদনের চতুর্দশপদীকে সনেট বলা চলে কিনা বিবেচ্য। সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ রচনার প্রশংসা করে সনেট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন,—

Of his sonnets we are no great admirers, though they might serve to win a name for a less distinguished author.

(মধুস্মৃতি, পৃ: ১৫৪)

‘ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে Ode—এক শ্রেণীর গীতি Ode জাতীয় কবিতাকে বলে।^{১১} আলোচ্য কাব্যটি বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত শ্রীরাধিকার মিত্রাক্ষর কবিতা বিরহমূলক আঠারটি গীতি কবিতার সমষ্টি। প্রায় প্রত্যেক কবিতায়ই ভিন্নতর মিলবিন্যাসে এবং পদ-পংক্তি বিভাগে শব্দকবন্ধ রচিত হয়েছে।— একমাত্র উষা (৭) এবং সখী (১৬) কবিতা দুটিতে এক রীতির শব্দক ব্যবহার করেছেন। আবার এক কবিতায় দুই বা তিন প্রকারের শব্দক ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আছে। পৃথিবী (৫) এবং গোধূলি (১১) —প্রতিটি কবিতায় দুই প্রকারের এবং নিকুঞ্জবনে (১৫) কবিতাটিতে তিন প্রকারের ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ১৮টি ‘Ode’ বা গীতি কবিতায় একুশটি বিভিন্ন পদবিন্যাসের ও বিচিত্র মিলের ছন্দোবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা কাব্যে নবরীতির ছন্দোবন্ধ প্রবর্তন করতে গিয়ে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৬০, ১৪ই জুলাই তারিখের চিঠিতে লিখেছেন,—

I have made-up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do some thing in rhyme ; dont fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Ottava Rima and write a romantic tale in it.

[সা. প. সং. ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা পৃ IV.]

প্রকৃত Ottava Rima (abababcc)-মিলবিন্যাসে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে মধুসূদন কোনও কবিতা না লিখলেও, শব্দক রচনার ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত শব্দক রচনার সূত্রপাত করলেও বৈচিত্র্য সাধনের বিশেষ চেষ্টা করেননি। রঙ্গলাল সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে পয়ার-ত্রিপদী ব্যবহার ছাড়া, শব্দক রচনার প্রয়াসই করেননি। ইউরোপীয় কাব্যের

শব্দকবন্ধ রচনার
বৈচিত্র্য

কবিসমালোচক (ছান্দসিক) মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনিও কবির সনেটকে সার্থক বলে মনে করেননি। কারণ ‘সনেটগুলির ভাববস্তু অকিঞ্চিৎকর, ভাষা গদ্যগদ্যী, ছন্দও নিতান্তই শ্রোতোহীন।’ ‘যে গূঢ়সম্বোধী ভাব ও ভাবনার দীপ্ত আবেগ এবং সেই আবেগের অতিশয় সংহত বাণীরূপ সনেটের প্রধান গৌরব— মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।’ (বাংলা কবিতার ছন্দ, ২য় সং, পৃ ১৮৫) — বঙ্কিমচন্দ্র বা মোহিতলালের এই যুক্তিপূর্ণ মতবাদ অস্বীকারের কারণ দেখিনা।

১৫। Ode—a poem intended to be sung, an elaborate lyric, generally addressed to some person or thing (Chambers’s Dictionary).

Ottava Rima a stanza of Italian origin, containing normally of eight eleven-syllabic lines, rhyming, ab. ab. ab. cc: it was adapted to English by the substitution of 5 stress lines (frequently with feminine rhyme).

(Cassell’s Encyclopaedia Vol. I., P 403)

১৬। মধুসূদনের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র ‘দ্রৌপদী স্বয়ম্বর’ নামক অসমাপ্ত কাব্যটির প্রথম একটি শব্দক Ottava Rima ছন্দমিলে রচিত হয়েছে। (পৃ ১১২ দ্র.)।

স্তবকবন্ধের বৈচিত্র্য সম্পর্কে মধুসূদন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই বাংলা কাব্যে এই পূর্ণাঙ্গ তালিকা বৈচিত্র্যধর্মী ছন্দোবন্ধ রচনারীতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত একুশটি স্তবকবন্ধের পূর্ণ পরিচয়মূলক তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে।^{১৭}

কবিতার নাম এবং

(I) পদ-পংক্তির মিল

পদ-পংক্তি-বিভাগ-পরিচয়

(II) পদ-পংক্তির মাত্রাভাগ

১। বংশীধ্বনি (১) : চতুষ্পংক্তিক
স্তবক; ত্রিপদী চৌপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||কাখা||খা||গা||গা||—||কাখা||খা||—||কা
(II) চ||চ||ভ||চ||চ||ভ||চ||চ||ভ||চ||চ||ভ||চ||চ||ভ||

২। জলধর (২) : ত্রিপংক্তিক
স্তবক; দ্বিপদী ও চৌপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) —||কাখা||খা||—কা||গা||গা||—||কা
(II) চ||ভ||চ||চ||চ||ভ||চ||চ||চ||ভ||

৩। যমুনা তটে (৩) : ত্রিপংক্তিক
স্তবক; চৌপদী ও দ্বিপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) —||কা||—||খা||গা||গা||—||খা||—||কা
(II) চ||ভ||চ||ভ||চ||চ||চ||ভ||চ||ভ||

৪। ময়ূরী (৪) : চতুষ্পংক্তিক
স্তবক; দ্বিপদী ও ত্রিপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) ক||—||খা||গা||গা||খা||—||খা||—||কা
(II) ১০||চ||ভ||চ||চ||ভ||চ||চ||ভ||চ||ভ||

৫। পৃথিবী (৫) : পঞ্চপংক্তিক
স্তবক; একপদী, দ্বিপদী ও চৌপদী
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) ক||—||খা||গা||খা||গা||খা||খা||—||কা
(II) ১০||চ||ভ||চ||চ||ভ||১০||চ||চ||চ||ভ||

৬। পৃথিবী (৫) : ত্রিপংক্তিক
স্তবক; ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) ক||—||খা||গা||গা||খা||খা||—||কা
(II) ১০||চ||ভ||চ||চ||১০||চ||চ||চ||ভ||

৭। প্রতিধ্বনি (৬) : চতুষ্পংক্তিক
স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||কাখা||খা||—||কা||—||গা||—||গা
(II) চ||ভ||ভ||চ||চ||চ||ভ||চ||ভ||চ||ভ||

১৭। বঙ্কনী মধ্যে মূল গ্রন্থে প্রদত্ত কবিতার সংখ্যা দেখানো হল।

কবিতার নাম এবং	(I) পদ-পংক্তির মিল
পদ-পংক্তি-বিভাগ-পরিচয়	(II) পদ-পংক্তির মাত্রাভাগ

৮। উষা (৭), সখী (১৬) { (I) —||—||কIখ||খ||—||কIগ||গ||—||কI
ত্রিপংক্তিক স্তবক; ত্রিপদী ও (II) চ||ভ||ভIচ||চ||চ||ভIচ||চ||চ||ভI
চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

৯। কুসুম (৮) ত্রিপংক্তিক { (I) —||ক||খI—||ক||খIগ||গ||খI
স্তবক; লঘু ত্রিপদী পংক্তি (II) ভ||ভ||৫Iভ||ভ||৫Iভ||ভ||৫I
বন্ধ।

১০। মলয় মারুত (৯) { (I) —||—||কIখ||খ||—||কIগ||গ||—||কI
ত্রিপংক্তিক স্তবক; ত্রিপদী ও (II) চ||ভ||ভIচ||চ||চ||ভIচ||চ||চ||ভI
চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

১১। বংশীধ্বনি (১০) : ত্রিপংক্তিক { (I) ক||খIক||খIগ||গI { ওয়, ৪র্থ স্তবক পঞ্চম
স্তবক; লঘু চতুঃপদভাগের (II) ১১|১১|১১|১১|১১|১১I { পংক্তি দ্বাদশমাত্রায় রচিত
একাবলী।

১২। গোধূলি (১১) : চতুঃপংক্তিক { (I) কIখ||খ||কI—||গI—||গI
স্তবক; একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী (II) ১০Iচ||চ||১০Iচ||ভIচ||ভI
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

১৩। গোধূলি (১১) : চতুঃপংক্তিক { (I) কIখ||খ||—||কI—||গI—||গI
স্তবক, একপদী, দ্বিপদী, চৌপদী (II) ১০Iচ||চ||চ||ভIচ||ভIচ||ভI
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

১৪। কৃষ্ণচূড়া (১৪) : চতুঃপংক্তিক { (I) ক||খIক||খIগ||গ||ঘIগ||গ||—||ঘI
স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী (II) ১০||ভI১০||ভIচ||চ||ভIচ||চ||চ||ভI
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

১৫। গোবর্ধনগিরি (১২) সপ্ত { (I) —||কI—||খI—||কI—||কIখIগ||গ||—||কI—||খI
পংক্তিক স্তবক ; একপদী, (II) চ||ভIচ||ভIচ||ভIচ||ভI১০Iচ||চ||চ||ভI১০||১০I
দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

১৬। সারিকা (১৩) : চতুঃপংক্তিক { (I) —||—||কIখ||খ||—||কI—||গI—||গI
স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী (II) চ||চ||ভIচ||চ||চ||ভIচ||ভI চ||ভI
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

কবিতার নাম এবং

(I) পদ-পংক্তির মিল

পদ-পংক্তি-বিভাগ-পরিচয়

(II) পদ-পংক্তির মাত্রাভাগ

১৭। নিকুঞ্জবনে (১৫) পঞ্চ-
পংক্তিক স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী,
চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||—ক[খা|খা|—||ক[গা|গা|—||ঘা|ঙা|ঙা|—||ঘা|—||ক[(II)
চ||ডা||ডা||চ||চা||চা||ডা||চা||চা||ডা||চা||চা||ডা||১০||১০||

১৮। নিকুঞ্জবনে (১৫)
চতুষ্পংক্তিক স্তবক; দ্বিপদী, চৌপদী,
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||ক[খা|খা|—||ক[গা|গা|—||ঘা|ঙা|ঙা|—||ক[(II)
চ||ডা||ডা||চা||চা||চা||ডা||চা||চা||চা||ডা||চা||চা||১০||১০||

১৯। নিকুঞ্জবনে (১৫) ষট
পংক্তিক স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী,
চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||ক[খা|খা|—||ক[গা|গা|—||ঘা|ঙা|ঙা|—||ঘা|—||ক[(II)
চ||ডা||ডা||চা||চা||চা||ডা||চা||চা||চা||ডা||চা||চা||১০||১০||

২০। বসন্তে (১৭) : চতুষ্পংক্তিক;
স্তবক; দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী
মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

(I) —||—||ক[খা|খা|ক[গা|গা|—||ঘা|—||ঘা| (II)
চ||চা||চা||ডা||চা||চা||ডা||চা||চা||চা||ডা||চা||ডা||

২১। বসন্তে (১৭) ত্রিপংক্তিক
স্তবক; দ্বিপদী, চৌপদী মিশ্র-
পংক্তিবন্ধ।

(I) —||ক[খা|খা|খা|ক[—||ক[(II) ৩||১০||৫||৮||
চ||৫||৮||৫||

এ কবিতায় পংক্তিসূচনায়
তিনমাত্রার অতিপর্ব আছে।
মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-
বিরোধী রুদ্ধদলের প্রসারিত
উচ্চারণ আছে।

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়,—কবি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে

পদ-পংক্তি-মিলের বিচিত্র বিন্যাসের দ্বারা সার্থক স্তবকবন্ধ
বচিত্র-মিলবিন্যাসের
স্তবক-উদাহরণ
রচনার পরীক্ষা করেছিলেন।—এই মিলবৈচিত্র্যের আদর্শ তিনি
প্রধানত পাশ্চাত্য কাব্য থেকেই নিয়েছিলেন। মিল-বিন্যাসের প্রকৃষ্ট

উদাহরণ হিসাবে এখানে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(১) ত্রিপংক্তিক স্তবক দ্বিপদী ও চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

মৃদু কলরবে তুমি, || ওহে শৈবলিনি, ||

কি কহিছ ভাল করে || কহনা আমারে। I

সাগর বিরহে যদি, || প্রাণ তব কাঁদে, নদি, ||

তোমার মনের কথা || কহ রাখিকারে—I

তুমি কি জাননা, ধনি || সে বিরহিনী ? I

[যমুনা তটে (৩)]

(২) চতুষ্পংক্তিক স্তবক দ্বিপদী ও ত্রিপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

তরুছায়া উপরে, শিখিনি, ॥

কেনে লো বসিয়া তুই ॥ বিরস বদনে ? I

না হেরিয়া শ্যাম চাঁদে ॥ তোরও কি পরাণ কাঁদে ॥

তুইও কি দুঃখিনী ? I

আহা ! কে না ভালবাসে ॥ রাধিকা-রমণে ? I

কার না জুড়ায় আঁখি ॥ শশী—বিহঙ্গিনি ? I [ময়ূরী (৪)]

(৩) পঞ্চপংক্তিক স্তবক একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

হে বসুধে, জগৎ জননি ! I

দয়াবতী তুমি সতি, ॥ বিদিত ভুবনে ! I

যবে দশানন অরি, ॥

বিসর্জিলা হতাশনে ॥ জানকী সুন্দরী ; I

তুমি গো রাখিলা বরাননে । I

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, ॥ বৈদেহীরে কোলে লয়ে, ॥

জুড়ালে তাহার জ্বালা ॥ বাসুকি রমণি । I [পৃথিবী (৫)]

(৪) ষটপংক্তিক স্তবক দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

কহ, সুখে, জান যদি ॥ কোথা গুণমণি—

রাধিকারমণ ? I

কামবঁধু যথা মধু ॥ তুমি হে শ্যামের বঁধু ॥

একাকী আজি গো তুমি ॥ কিসের কারণ, I

হে বসন্ত, কোথা আজি ॥ তোমার মদন ? I

তব পদে বিলাপিনী ॥ কাঁদি যদি অভাগিনী ॥

কোথা মম শ্যামমণি ॥ —কহ কুঞ্জবর ! I

কোথায় হৃদয়ে দয়া ॥ পদে যথা পদ্মালয়া, ॥

বধোনা রাধার প্রাণ ॥ না দিয়ে উত্তর ! I

মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, ॥ মধুপুরে শ্রীমধুসূদন ! I

[নিকুঞ্জবনে (১৫)]

(৫) সপ্তপংক্তিক স্তবক একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্র-পংক্তিবন্ধ।

হে ধীর ! শরমহীন ॥ ভেবোনা রাধারে—I

অসহ যাতনা দেব ॥ সহিব কেমনে ? I

ডুবি আমি কুলবালা ॥ অকুল পাথারে I

কি করে নীরব রবো ॥ শিখাও আমারে — I

এ মিনতি তোমার চরণে । I

কুলবতী যে রমণী, ॥ লজ্জা তার শিরোমণি—॥

কিন্তু এবে এ মন কি ॥ বৃষ্টিতে তা পারে ! I

মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ॥ ভজ, বামা

শ্রীমধুসূদনে ! I [গোবর্ধনগিরি (১২)]

আর উদাহরণ বাড়ানো অনাবশ্যক। আকৃতি-বন্ধ এবং মিল-বৈচিত্র্য রচনায় মধুসূদন যে সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন, পরবর্তীযুগে রবীন্দ্র-ছন্দোবন্ধে তার আরও ঐশ্বর্যময় পরিণত বিকাশরূপ লক্ষ্য করা যায়।

মধুসূদন গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে ভাবের কোমলতার উপযোগী ছন্দকেও গীতি-প্রভাবিত হলে মাঝে মাঝে কোমল গীতি-সুরাশ্রয়ী করেছেন। ‘বসন্তে’ কবিতাটির উচ্চারণের কোমলতা স্তবক রচনায় যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ-শব্দ পরিহার করেছেন,—এমনকি, কদাচিত স্বরাস্ত মুক্তদল-শব্দের মাঝে রুদ্ধদল-শব্দ এসে পড়লেও তাকে কলাবৃত্ত রীতির প্রসারিত উচ্চারণে, মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ-বিরোধী ভাবেই ব্যবহার করেছেন যেমন,—

সথিরে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল ‘চঞ্চল’ অলিদল

উছলে সুব জল,

চললো বনে।

চললো জুড়াবো আঁখি দেখি ব্রজ রমণে !

[বসন্তে (১৮)]

এখানে ‘চঞ্চল’ শব্দটিতে চারমাত্রার প্রসারিত উচ্চারণ লক্ষণীয়। তাছাড়া, মুক্তদল-শব্দ এবং পংক্তিশেষের বিজেড় মাত্রার পদ ব্যবহারে ছন্দে কলাবৃত্ত-ভঙ্গিম কোমল ধ্বনিপ্রবাহ ফুটে উঠেছে।

‘বিবিধ কাব্য’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মধুসূদনের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা

‘বিবিধ কাব্য’ এবং কয়েকটি অসমাপ্ত কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছন্দোবন্ধ রচনার সনেটগুলির উল্লেখ আগেই করেছি। ‘বর্ষাকাল’ এবং ‘হিমঝতু’—কবিতা দুটি যতিপ্রান্তিক পয়ার,—কবির বাল্যকালের রচনা। রিজিয়া, নতন পরীক্ষা

দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, মৎস্যগন্ধা, সুভদ্রা হরণ, পাণ্ডববিজয়, দুর্যোধনের

মৃত্যু, সিংহল বিজয়,—এ সকল অসমাপ্ত কাব্য প্রবহমান পয়ারবন্ধে লিখিত।—এই পর্যায়ে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৬ পংক্তিক কবিতা), জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে (১২ ছত্রে লিখিত), হতাশাপীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি (৭ পংক্তিক কবিতা), —উল্লেখযোগ্য রচনা। ‘দেবদানবীয়ম’ মহাকাব্যের মাত্র আট পংক্তি লিখেছিলেন।

মিশ্র-প্রকৃতির ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক থেকে এই আট পংক্তি উল্লেখযোগ্য।—

ছন্দ উদাহরণ কাব্যোক্তানি, রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি !
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষ বৃন্দে, এ সুবঙ্গ দেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃত রূপে তব কৃপাবারি
দেহ জননি গো, ঢালি এপেটে ॥ [বিবিধ কাব্য, পৃ. ৪৭]

শেষ পংক্তিতে (॥) চিহ্ন দিয়েছেন কবি;—মনে হয়, একটি যতিপ্রাস্তিক অমিল পংক্তিবন্ধের পূর্ণ স্তবক রচনা করেছেন। এখানে ছন্দের প্রকৃতি-ধর্মেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
সমিল প্রবহমান কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্ত,—কোনও রীতিরই উচ্চারণ-বিশুদ্ধি
ছন্দের রক্ষিত হয়নি। ছন্দের ধ্বনি-সৌম্য রেখে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বা
পরীক্ষা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা ৬। ৬। মাত্রাভাগে ১২-মাত্রার পংক্তি হিসাবে
কাব্য্যাংশটি পাঠ করতে হয়।—এই নতুনতর উচ্চারণরীতি আর
পরীক্ষা করবার অবকাশ পাননি কবি। ‘পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত’ কবিতাটি সমিল,
কিন্তু প্রবহমান অসমান পংক্তিতে রচনা করেছেন। মিলবিন্যাসও দূরাস্থিত, শিথিল।
যেমন,—

উদাহরণ ভেবেছিঁনু গিরিবর ! রমার প্রসাদে
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙাগড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিথায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে !

[বিবিধ কাব্য : পৃ ৪১]

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাটির প্রথম পংক্তিটি দ্বিপদী
‘বঙ্গভূমির প্রতি’ (৮॥৮।) ;—অবশিষ্ট আটটি পংক্তি চৌপদী (৮॥৮॥৮॥৮।) ।
‘আত্মবিলাপ’ চৌপদীর প্রথম দুইটি পদে এক মিল, পংক্তিমিলেও কিছু বৈচিত্র্য
কবিতার মিলবিন্যাস (ক I ক I—I কা ক I—I ক I ক I কা) লক্ষিত হয়।

‘আত্মবিলাপ’ কবিতাটি ত্রিপদী (৮॥৮॥৬।) ও চৌপদী (৮॥৮॥৮॥৮।)
মিশ্র-পংক্তিবন্ধে, বিচিত্র মিলবিন্যাসে রচিত। একটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি।

	পদ-পংক্তিমিল	মাত্রাভাগ
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়	—॥কা॥	৮॥৮॥
তাই ভাবি মনে	খা	৬।

জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়	— কা	৮ ৮
ফিরাব কেমনে ?	থা	৬।
দিনদিন আয়ুহীন হীনবল দিনদিন,—	গা গা	৮ ৮
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় ! —	— কা	৮ ৮।

[বিবিধ কাব্য : আত্মবিলাপ]

বিবিধ কাব্যের অন্তর্গত ‘নীতিগর্ভ কাব্য’ পর্যায়ে এগারটি কবিতায় মধুসূদন শিখিল সমিল মূক্তকাভাস পংক্তিবন্ধ ও স্তবকবন্ধ রচনার বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন। গদা ও সদা, ময়ূর ও গৌরী, কুকুট ও মণি, সূর্য ও মৈনাক গিরি, সিংহ ও মশক,—কবিতাগুলিতে মূক্তকের আভাস ফুটে উঠেছে। গদা ও সদা কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

পদ-পংক্তিমিল

গদা সদা নামে	ক
কোন এক গ্রামে	ক
ছিল দুইজন।	খ
দূরদেশে যাইতে হইল,	গ
দুজনে চলিল।	গ
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,	খ
ভল্লুক শার্দূল তাহে গর্জে অনুক্ষণ।	খ
কালসর্প যেমতি বিবরে	ঘ
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে,	ঘ
পথিকের অর্থ অপহরে,	ঘ
কখন বা প্রাণ নাশ করে।	ঘ
কহে সদা গদারে আত্মনি	ঙ
কর কিরা স্পর্শি মোর পানি	ঙ
ধর্মে সাক্ষী মানি,	ঙ
আজি হতে আমরা দুজন	খ
হনু এক প্রাণ এক মন,—	খ
সুন্দ-উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।	ঙ

[বিবিধকাব্য : গদা ও সদা, পৃ ২৫-২৬]

মধুসূদন এখানে ৮, ৬ বা ১০ মাত্রার পূর্ণ পদ-ভাগ রেখে মূক্তক লাইন বিন্যাস করেছেন। পরবর্তী মূক্তক রচনাকারদের মতো চার বা দুই মাত্রার উপপর্ব-বিভাগে লাইন বিন্যাস করেননি। কবি পরপর দুই, তিন বা চার লাইনে একই মিল দিয়েছেন,—আবার দ্রাবস্তি মিলও রেখেছেন। এমন দ্রাবস্তি মিলের পরীক্ষা রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরাও কিছু কিছু করেছেন।

মুক্তক-স্তবকবন্ধ
রচনার চেষ্টা

এই পর্যায়ে ‘অশ্ব ও কুরঙ্গ’ কবিতাটিতে মধুসূদন শিখিল মিলে, মুক্তক রচনাদর্শে, স্তবক-বন্ধ রচনা করেছেন। কবিতার এগারটি স্তবকেই পংক্তি-বিন্যাসে পার্থক্য রেখেছেন। দুটি ছোট স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

(১) নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, “ওরে বর্বর !

কে তুই কত বা বল ?

সং পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।”

কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাঙিল সরোষে যেন দুইটি তপন।।

[বিবিধ কাব্য : অশ্ব ও কুরঙ্গ,

৫ম স্তবক, পৃ ২২]

(২) হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল

লাফে পৃষ্ঠে দৃষ্ট সাদী তখনি চড়িল।

লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায,

তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।

মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্ত মতি,

চলে সাদী যে দিকে চালায়।

[বিবিধ কাব্য : অশ্ব ও কুরঙ্গ,

১০ম স্তবক, পৃ ২৩]

কবি ত্রিপদী, দ্বিপদী, একপদীর মিশ্রণে স্তবক রচনা করেছেন। এখানে ভাব-মুক্তিই কবির প্রধান লক্ষ্য; ছন্দকে যথাসম্ভব শিখিল-বন্ধ রেখেছেন।

শিখিলবন্ধ স্তবক
উদাহরণ

শিখিলবন্ধ রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ‘মেঘ ও

চাতক’ কবিতাটি। প্রথম ও শেষে দ্বিপদী পংক্তির মিল রেখে মাঝে

যতি প্রান্তিক ‘মিত্রাক্ষর’ একপদী পংক্তি দিয়ে আংশিকভাবে স্তবক

রচনার আভাস ফুটিয়েছেন। যেমন,—

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে;—

ভানু পলাইল ত্রাসে

তা দেখি তড়িৎ হাসে;

বহিল নিম্নাস ঝড়ে;

ভাঙে তরু মড়মড়ে;

গিরি শিরে চূড়া নড়ে;

যেন ভূকম্পনে;

অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।

[বিবিধকাব্য : মেঘ ও চাতক, পৃ ৩২]

অনুরূপ দীর্ঘতর স্তবকবন্ধের আভাস এ কবিতায় রয়েছে।

একাধিক চিঠিতে মধুসূদন ইতালীয় Ottava Rima স্তবক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।^{১৮} ১৮৬৩ সেপ্টেম্বরে ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে Ottava Rima স্তবক রচনা ‘দ্রৌপদীস্বয়ম্বর’ কাব্যটি সম্ভবত এই অভিলাষ নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। পুনর্লিখিত অংশের প্রথম স্তবকটি এ প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য।—

পংক্তিমিল

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে	ক
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে	খ
লভিলা দ্রুপদ বাল্য কৃষ্ণামহাধনে,	ক
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধি দেববরে,—	খ
গাইব সে মহাগীত। এভিক্ষা চরণে,	ক
বাগ্‌দেবি ! গাইব মাগো নব মধুস্বরে,	খ
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে	গ
দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতভূজে !	গ

[বিবিধ কাব্য : দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, পৃ ১১]

মধুসূদনের সমগ্র রচনাবলীতে এই একটি মাত্র Ottava Rima পংক্তিমিলের স্তবক নিদর্শন মেলে। কবির অন্যান্য বহুবিধ আকৃতিবন্ধের মতো আলোচ্য রীতিটিও একান্তই প্রাথমিক পরীক্ষার স্তরে থেকে গেল।—পরিণত রূপ দেবার আর সুযোগ পেলেন না।

বাংলা কবিতার ছন্দে মধুসূদনের যুগান্তকারী দান সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এক রকম শেষ হল। নূতন ছন্দোবীতির পরীক্ষা সম্পর্কে মধুসূদন নিজে যে কতটা সচেতন

মধুসূদন পাশ্চাত্য ছিলেন উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিতে যেমন তার পরিচয় মেলে, বহু আদর্শে বাংলা চিঠিপত্রও তেমনি তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। প্রামাণিক সে সকল ছন্দের ধারা চিঠিপত্র কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছি। মধুসূদনের সাহিত্যমানস অনেকাংশে পরিবর্তন-প্রয়াসী পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল (গ্রীক, ল্যাটিন ও এলিজাবেথীয় যুগের ছিলেন ইংরেজি) আদর্শে গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যও

(রামায়ণ, মহাভারত) তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। তারই প্রভাবে প্রবহমান পয়ারবন্ধে মহাকাব্য, পত্রকাব্য, নাট্যসংলাপ ইত্যাদি রচনার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮। ১৮৬০, ১৪ই জুলাই তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,—

‘I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it (ব্রজঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা সা. প. সং ১১/০ পৃ)। এই বছরেই আর একটি চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, I am just now reading Tasso in the original If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the Ottava Rima or stanzas of eight lines like his.

(মধুস্মৃতি পৃ ৬১২)

অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডীয় রোমান্টিক কবিদের আঙ্গিকের প্রভাবও তার ওপর কিছুটা পড়েছিল। নবরীতির স্তবক রচনা-প্রচেষ্টায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। তবে বাংলা পদ্যে পাশ্চাত্য ছন্দোরীতি প্রবর্তনে, তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি যেমন আশাবিত ছিলেন,—একাজে নিজস্ব পরিমিত শক্তি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন;—প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্রে তার পরিচয় রয়েছে। তবু সম্ভাবনাময় পাশ্চাত্য ছন্দোরীতিগুলি একবার বাংলা পদ্যে চালু করে দিতে পারলে যোগ্যতর প্রতিভার স্পর্শে একদিন তা বাংলা কাব্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠতে পারে এই আশায় এত বিচিত্রতর দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বাংলার Pope ভারতচন্দ্রের অন্ধ অনুকারক ‘Nimby Pimby wallas’-দের বিরুদ্ধে ভাবমূন্ডির মশাল জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন;—“Fire away my boys !” আশা করেছিলেন, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সেই পথ অনুসরণ করবেন। বাংলা পদ্যছন্দে আমূল পরিবর্তন মধুসূদন চেয়েছিলেন। তাঁর এই আশা সর্বাংশে পূর্ণ হয়নি। ‘ডাঃ ইংরেজ’ মধুসূদনের সঙ্গে সমভাবে পরবর্তী বাঙালী কবিরা পদক্ষেপ করতে সম্ভাবতই দ্বিধা বোধ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পরবর্তী এই কবিগোষ্ঠীর ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হল।

গ

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের মধ্যে অন্তত একজনের নাম ছন্দোবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন, ‘সম্ভাব-কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : শতকের’ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। সম্ভাবশতক সর্বপ্রথম ১৮৬১-সম্ভাবশতক তে প্রকাশিত হয়েছে। এ কাব্যে কবি প্রধানত মিশ্রবৃত্তরীতির একাবলী, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি সমিল যতিপ্রান্তিক ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন। তবে সেখানেও দু’একটি কবিতায় নতুনতর ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। মধুসূদন প্রবহমান পয়ার লিখেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রবহমান দ্বাদশমাত্রক পংক্তি রচনা করেছেন। যেমন,—

গত দিনে যেই প্রিয়জন ফুল্ল—

বদন সরোজ, সুললিত বাণী

মধুময়-হেরি, লভিল বিশুদ্ধ

সুখ মম চিত্তমধুকর; অদ্য

নিরখি বিশুদ্ধ, বিগলিত তাহা,

বিষম শোকদহন দহে রে !

অহ ! অহ ! যেই নয়ন সূচারু—

কমল পলাশে ! মধু কর কৈলে

দশন নিবেশ, বাঁধিত মনেতে

সম দুখ-শেল, খরতর,

[সম্ভাবশতক, বন্ধুবিরোগে প্রণয়ীর বিলাপ : ১৮ সং : পৃ ৭৯]

এই মিলহীন প্রবহমান দ্বাদশমাত্রক পংক্তিবিন্যাসে কবি সর্বত্র প্রান্তিক লঘুযতির মর্যাদা রক্ষা করেননি; সর্বত্র সুনির্দিষ্টভাবে দ্বাদশমাত্রার পংক্তিও রচিত হয়নি। পাঠ করতে গেলে, মুক্তকধর্মী যতিবিভাগই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক মনে হতে পারে। মধুসূদনের মিলহীন প্রবহমান পয়ারের আদর্শেই কৃষ্ণচন্দ্র এই দ্বাদশমাত্রক ছন্দ রচনা করেছিলেন কিনা সেটি অনুমানের বিষয়। এই কাব্যের অন্তর্গত ‘উৎপত্তিস্থল মহত্বের কারণ নয়’ [পৃ ৮১] কবিতাটিও একই ছন্দোবন্ধে রচিত।

গদ্যকবিতার ছন্দের
আভাস

ছন্দের নতুন পরীক্ষায় কবি আরও এগিয়েছেন ‘গর্বিত
রাজার প্রতি’ কবিতায়। সেখানে সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগের উচ্চারণ না
রেখে গদ্যকবিতার ছন্দের আভাস এনেছেন। যেমন,—

ভো রাজন ! গর্ব পরিহর;
স্মর স্মর পূর্ব ভূপগণ-কাহিনী।

তব রূপ নরেশ কত
শাসিত সাগরাস্ররা ধরা;

সম্পদ-মদ মত্ততায়,
ভাবিত তৃণসম বিশ্বপুর;

সে সব ভূপ কোথায় ?
কই বা সেই পদ-মদ মত্ততা ?

সে ক্রোধ-রাগ-রঞ্জিত
লোচন ; যাহা বর্ষিত অগ্নিকণা

দীন অধীন জনপ্রতি;
সে আর্তনাদ শ্রবণ-বধিরা

শ্রুতি, সে কর্কশ ভাষিণী
কোমল রসনা; পর পীড়নোদ্যত

সে করযুগল কোথা হে ?

[সন্ধ্যাবশতক (১৮-সং) : গর্বিত রাজার প্রতি : পৃ ২৭-২৮]^{১১}

শব্দগ্রন্থি-যোজনা সর্বত্র সূষ্ঠ হয়নি, পংক্তি গঠনও সর্বাংশে সফল হয়নি। তবে মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারে যে ভাবমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে,—এখানে কবি সেই প্রচেষ্টা আরও এগিয়ে নেবার পরীক্ষা করেছেন। ভাষায় সংলাপের বাকধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। ছন্দোবন্ধ, পংক্তিরচনা, শব্দবিন্যাস ইত্যাদিতে যথেষ্ট শৈথিল্য রয়েছে। মিশ্রবৃত্তের সুনির্দিষ্ট শব্দগ্রন্থি এবং পদভাগ থাকলে এ রচনাকে মুক্তক বলা যেত। কিন্তু

কবি-ছন্দসিক জনাব আব্দুল কাদির এই কবিতাটি সংস্কৃত ‘আর্য্য্য’ ছন্দের দৃষ্টান্ত করেছেন। ‘আর্য্য্য’ নির্দেশ মেনে এ কবিতা পাঠ করা সম্ভবপর নয় বলেই মনে করি।

ছন্দোবন্ধ আরও শিথিল করে কবি গদ্য কবিতার আভাস ফুটিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ‘গদ্য-পদ্য’ (মেঘ, বৃষ্টি, খদ্যোত) বা রাজকৃষ্ণ রায়-রচিত ‘পদ্য পৌণ্ডলিক গদ্য’ কবিতা ভাবের দিক থেকে, ভাষাবিন্যাসের দিক থেকে অনেক বেশী সফল হয়েছে। তবু ছন্দের ক্রম-ভাবমুক্তির দিক থেকে এ রচনার গুরুত্ব রয়েছে।^{২০}

বর্তমান অধ্যায়ে এবারে আলোচিত মূল বক্তব্যগুলি সূত্রাকারে আর আলোচিত বক্তব্যের একবার উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে সংক্ষিপ্তসার পারে।—

(১) বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম রঙ্গলাল বাকধর্মী, গীতিসুর-নিরপেক্ষ এবং আংশিকভাবে ভাবপ্রবাহ-অনুগামী ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছেন।

(২) রঙ্গলাল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যতিপ্রান্তিক পয়ার-ত্রিপদী-বন্ধে পূর্বপ্রচলিত পদযতি সামান্য পরিবর্তন করে ভাবমুক্তির চেষ্টা করেছেন।

(৩) পয়ারের সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রাভাগে ভাবমুক্তির বাধা ঘটে একথা উপলব্ধি করে রঙ্গলাল আট-দশ মাত্রাভাগে আঠারো মাত্রার মহাপয়ার প্রবর্তনের দ্বারা ভাবের মুক্তি আনতে চেয়েছেন।

(৪) রঙ্গলাল ভাবমুক্তির প্রয়োজন স্বীকার করেও যতিপ্রান্তিক ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দের পুরাতন কাঠামো ভাঙবার কথা চিন্তা করেননি। ‘প্রবহমান পয়ার’ রচনা করে মধুসূদন দৃঢ় হাতে পুরাতন ছন্দযতিশৃঙ্খল ছিন্ন করে ভাবমুক্তির প্রকৃত পথ তৈরী করলেন।

(৫) মধুসূদন প্রবহমান ছন্দরচনায় কৃত্রিম পয়ার পংক্তি রক্ষা করে চলেছেন। তবে ভাবের স্বাধীন প্রবাহ এই কৃত্রিম পংক্তি ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছে।

(৬) কাব্যরচনায় মধুসূদন মিলটনের heroic Blank-verse-এর আদর্শে প্রবহমান পয়ার রচনা করতে চেয়েছিলেন। শেকস্পীয়রের নাট্যসংলাপের Blank-verse থেকে মিলটনের মহাকাব্যের Blank-verse-এর রচনারীতি পৃথক। মধুসূদন এই উভয় লেখকের Blank-verse রচনার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, অনুমিত হয়।

(৭) প্রবহমান পয়ারে মধুসূদন যে চোদ্দ মাত্রার পংক্তি রেখেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা কৃত্রিম হয়েছে। পংক্তিপ্রান্তে অন্তত একটি লঘুযতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।—অনেক সময় কবি লঘুতর উপযতিও রক্ষা করেননি।—তার ফলে ছন্দ দুর্বল হয়েছে।

(৮) বিজোড় মাত্রার পদভাগ মিশ্রবৃত্তের রীতি-বিরোধী। মধুসূদন বিজোড় মাত্রক পদগঠনে দ্বিধা করতেন না। তাঁর সুপরিচিত একটি রীতি হল, তিন মাত্রার একটি শব্দ পদের শেষে বসিয়ে বিজোড়মাত্রায় পদরচনা, এবং সেইসঙ্গে, পরবর্তী পদের প্রথমেই

২০। উদ্ধৃতিগুলি কমিনী কুমার গুহ-সম্পাদিত, ১৩১৪ সালে প্রকাশিত, অষ্টাদশ সংস্করণের ‘সম্ভাষণতক’ থেকে দিয়েছি। প্রথম প্রকাশের (১৮৬১) পর বিভিন্ন সংস্করণে কবি কতটা কি পরিবর্তন করেছিলেন জানতে পারিনি।

একটি তিন মাত্রার শব্দ বসিয়ে আর একটি বিজোড়মাত্রক পদরচনা। এই রীতি ছন্দ ও ভাবের প্রবহমানতা রক্ষায় কিছুটা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

(৯) আটমাত্রার পদ গঠনে মধুসূদন অনেক সময় ৩+২+৩ মাত্রাক্রমে শব্দ-গ্রন্থি দিয়ে ছন্দের স্বাভাবিক প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ করেছেন।—অবশ্য ধীরে ধীরে এই দুর্বল শব্দগ্রন্থনরীতি তিনি পরিহার করেছিলেন।

(১০) ইংরেজী ছন্দে accent বা প্রসঙ্গ রয়েছে। বাংলা ছন্দে প্রসঙ্গ-স্পন্দন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মধুসূদন সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদলবহুল বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে এই শব্দ আহরণ করেছেন।

(১১) মধুসূদন প্রবহমান পয়ারে ভাবমুক্তির উদ্দেশ্যে পংক্তিশেষের মিল তুলে দিয়েছেন। বিনিময়ে বহুল অনুপ্রাসের সাহায্যে ‘মিত্রাক্ষর’ পঠনে অভ্যস্ত পাঠকের ধ্বনিমিলগত অভাববোধ পূরণ করতে চেয়েছেন।

(১২) মিলটনের আদর্শে পংক্তি-অনুচ্ছেদ (verse-paragraph) রচনার দ্বারা তিনি প্রবহমান পয়ারে ভাব ও ছন্দের দৃঢ়বদ্ধতা এনেছেন। তবে দূরাস্বয়, এবং বন্ধনীমধ্যে বাক্যব্যবহার-রীতি অনেক সময় তাঁর ছন্দের প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ করেছে। উভয় রীতিই তিনি পাশ্চাত্য রচনাদর্শ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

(১৩) ‘পদ্মাবতী’ নাটকে মধুসূদন মুক্তকাভাস-যুক্ত প্রবহমান ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। কাব্যের ছন্দোবন্ধের তুলনায় কিছুটা হ্রস্ব মাপের পংক্তিবন্ধ তিনি নাট্যসংলাপে ধীরে ধীরে প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

(১৪) মধুসূদন বাংলা সনেটের প্রবর্তক। তাঁর সনেটে প্রধানত পেত্রার্কীয় রচনাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। ভাবের দিক থেকে তাঁর অধিকাংশ সনেটেই অষ্টক-ষটক আবর্তনলীলা প্রকাশ পায়নি। মিলটনের আদর্শে তিনি কিছু সনেট-পরম্পরা (sonnet sequence) রচনা করেছেন।

(১৫) ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্যের ‘মিত্রাক্ষর’ স্তবক রচনায় মধুসূদন পাশ্চাত্য Ode-জাতীয় কবিতার আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে পদ-পংক্তির মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

(১৬) ‘বিবিধ কাব্যের’ অন্তর্গত অনেকগুলি পূর্ণ-অপূর্ণ কবিতায় মধুসূদন ছন্দের নতুন পরীক্ষা করেছেন। একটি পদ্যে মিশ্র ছন্দ-প্রকৃতির পরীক্ষা করেছেন। সমিল (দূরস্বিত)-মুক্তক এবং মুক্তক-স্তবক রচনা করেছেন। ইতালীয় কবি Tasso-র স্তবকাদর্শে Ottava Rima স্তবক (কখকখকখগগ) লিখেছেন।

(১৭) এই যুগের অন্যতম কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার দ্বাদশ মাত্রার পংক্তিবিন্যাসে মিলবিহীন প্রবহমান ছন্দোবন্ধ এবং সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগহীন গদ্য কবিতার ছন্দ রচনায় ভাবমুক্তির নতুন পরীক্ষা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

হেমচন্দ্র—নবীনচন্দ্রের যুগ (১৮৭৩-১৮৯০)

।।ক।।

রঙ্গলাল-মধুসূদন যুগকে আধুনিক বাংলা ছন্দে এক বলিষ্ঠ মৌলিক রীতি-প্রবর্তনার যুগ বলা যেতে পারে। সে তুলনায় পরবর্তী যুগে (১৮৭৩-১৮৯০) এই ঐশ্বর্যদীপ্তি

আলোচ্য যুগে অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছে। তার সর্বপ্রধান কারণ হল, মধুসূদনের মতো বিস্ময়কর সৃজনীপ্রতিভা এযুগের কোনও কবির মধ্যে প্রকাশ পায়নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফূরণ হয়েছে আরও (১) প্রতিভার পরে,—মানসী পর্বে (১৮৯০)। আলোচ্য যুগে মধুসূদন-প্রবর্তিত অভাবে বলিষ্ঠ ধারা স্তিমিত হয়ে পড়বার আরও একাধিক কারণ রয়েছে।

মধুসূদন মিলটনের Blank-verse ছন্দের এবং সেই সঙ্গে ক্লাসিকধর্মী গ্রীক ও সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিগভীর ভাব-প্রকাশক শক্তি যতটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এযুগের কোনও

(২) এযুগের কবিরা মধুসূদনের পাশ্চাত্য বিচিত্র মিলবিন্যাস ও স্ববক-গঠনাদর্শে মধুসূদন বাংলা ছন্দাবন্ধের যে বৈচিত্র্যসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এ-যুগের কবিরা সে বিষয়েও আগ্রহের অভাব দেখিয়েছেন। তৃতীয় আর একটি কারণ অনুমিত হয়। প্রাচীন বাংলা পদ্যে যে ললিত সুরধর্মী উচ্চারণ, সুনির্দিষ্ট

যতিবিভাগ এবং মিলবিন্যাসের প্রাধান্য ছিল, মধুসূদন দৃঢ় হস্তে সেই রীতির পরিবর্তন করে ছন্দে বাকধর্মী ভাবমুক্তির পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন।—বস্তুত ভাব, ভাষা এবং ছন্দে তিনি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। এই নবরীতির প্রবর্তন বাঙালী-চেতনাকে

(৩) সুরধর্মী গভীর ভাবে নাড়া দিলেও,—এতকালের সুরধর্মী কোমল ছন্দের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই এ-যুগের কবিগোষ্ঠী প্রাচীন বাংলা পদ্যের লঘু-গুরু উচ্চারণরীতি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন, বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণরীতি কৃত্রিম ভাবে বাংলা পদ্যে

ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। মিশ্রবৃত্ত প্রকৃতির যতিপ্রাস্তিক সমিল পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছেন। একমাত্র গিরিশচন্দ্র (আংশিক ভাবে এই কৃতিত্ব ব্রজমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং রবীন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য) এই ‘মিত্রাক্ষর’ পদবন্ধ রচনার প্রভাব কাটিয়ে, নাট্যসংলাপের উপযোগী ‘মুক্তক’ রচনার মাধ্যমে মধুসূদন-প্রবর্তিত ভাবমুক্তি-প্রচেষ্টাকে নতুন পদক্ষেপে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখানে গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের

ইঙ্গিত নাট্যসংলাপের উপযোগী প্রবহমান ছন্দ রচনায় সফলকাম হয়েছেন। অন্য কোনও দিকেই এ-যুগের কবিগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের ছন্দে ভাবমুক্তির ধারাকে এযুগে গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপের মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ রচনারীতি এতদিনের সংস্কার-বদ্ধ বাঙালীমনের ছন্দে ভাবমুক্তির প্রত্যাশাবোধকে তৃপ্ত করতে পারেনি। সে কারণেই বলদেব পালিত, প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবিরা সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে বাংলা ছন্দ রচনায় সচেষ্ট হলেন। হেমচন্দ্র প্রবহমান পয়ারের পাশে অমিল

যতিপ্রাস্তিক পয়ারবন্ধ (সংস্কৃত চতুষ্পাদ শ্লোকের আদর্শে) প্রবর্তনে আগ্রহী হলেন। বিহারীলাল যুগ্মাক্ষর বর্জন করে ললিত ছন্দ (আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির বিকল্প) রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। নবীনচন্দ্র মিশ্রবৃত্ত রীতির সমিল, প্রবহমান, লঘুযতি-বিভক্ত ছন্দ রচনায় অগ্রসর হলেন। একমাত্র গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারকে ভিত্তি করে,—আরও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে নাট্যসংলাপের উপযোগী প্রবহমান মুক্তক রচনা করে ভাবমুক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখলেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্র ব্যতীত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই ছন্দের দিক থেকে মধুসূদনের যুগধর্মের কিছুটা বিপরীত মুখী, মধ্যযুগের ললিত সুরাশ্রয়ী ধারায় প্রত্যাবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উভয় যুগের ভিন্নমুখী ছন্দের ধারায় সামঞ্জস্য এনে ঐশ্বর্যপুষ্ট নবীনধারা পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন। তবে একথা সত্য, এযুগের কবিরাও মধুসূদনের রচনা-প্রভাবকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। তার সাক্ষ্য মিলছে প্রবহমান পয়ার রচনার দুর্বল প্রচেষ্টায়, অপেক্ষাকৃত সরল মিল ও পদবিন্যাসে স্তবক রচনায়, সর্বোপরি নাট্যসংলাপের উপযোগী ‘গৈরিশ মুক্তক’ রচনাক্ষেত্রে। প্রবল জোয়ারের উচ্ছ্বাসের সূচনায় অন্তঃসলিলা ভাটার কিছুটা বিপরীতমুখী টান থেকে যায়। মধুসূদন বাংলা ছন্দে যে প্রবল জোয়ারের স্রোত এনেছিলেন প্রায় তারই পাশাপাশি এ-যুগের কবিগোষ্ঠী সেই ভাটার টানকে অনেকাংশে ধরে রেখেছেন। এ-যুগে একাধারে মধুসূদনের অনুকৃতির সাক্ষ্য রয়েছে, প্রাচীন সংস্কৃতধর্মী ছন্দের প্রতি অন্ধ মমতা রয়েছে, পরবর্তী রবীন্দ্র-গীতিকাব্যছন্দ রচনার পূর্বাভাস রয়েছে, নাট্যসংলাপে মধুসূদনের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন রয়েছে। তবু সব মিলিয়ে বলা যায়, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় প্রবাহিত দুই বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যবর্তী একটি স্নগ্ধকালীন, অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ ছন্দপ্রবাহেরই ধারা এ-যুগের কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছিল।

।।থ।।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)।

এই যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রথম কাব্য, মেঘদূত (রচনা ১৮৫৭, প্রকাশ

১৮৬০)—কালিদাসের মেঘদূতের পদ্যানুবাদ, মিশ্রবৃত্ত রীতির ‘মিত্রাক্ষর’
 দ্বিজেন্দ্রনাথের পয়ার-ত্রিপদীতে রচিত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, স্বপ্নপ্রয়াণ (রচনা
 কবিতাবলী ১৮৭৩, প্রকাশ ১৮৭৫),—এখানে কবি সংস্কৃত ছন্দের নতুন
 পরীক্ষা করেছেন। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, কাব্যমালা—‘মেঘদূত’-সহ
 অনেকগুলি কবিতা-গানের সংকলন (রচনা প্রধানত ১৮৬০-১৮৮৯, প্রকাশ
 ১৯২০)। এখানেও স্বপ্নপ্রয়াণের মত পদবিন্যাসের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কবি ‘রেখাক্ষর
 বর্ণমালা’ নামে (১৯১২) মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতিতে একটি বাংলা সটহ্যাণ্ড শিক্ষার
 বইও লিখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন পদ্য নিদর্শন থেকে দেখা যায়, ছন্দের রূপ ও প্রকৃতি
 সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রধানত সংস্কৃত ছন্দের রূপাদর্শ নিয়েই বেশী
 পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন।

বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ এক নবরীতির পরীক্ষা
 করেছেন। এতদিন যাঁরা বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাঁরা প্রধানত
 সংস্কৃতের লঘু-গুরু উচ্চারণ-সহ (যে উচ্চারণ বাংলায় অনেকাংশে কৃত্রিম) সে ছন্দ
 বাংলায় প্রয়োগ করেছেন। বৈষ্ণব কবিরা সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণ বাংলায় (প্রাকৃত
 বাংলাপদ্যে ছন্দের প্রভাবে) অনেকটা শিথিল করেছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত
 সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কৃত্রিম লঘু-গুরু দলবিন্যাস ফিরিয়ে আনতে
 ছন্দ ব্যবহারের চেয়েছেন। এই যুগে বলদেব পালিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
 নতুন পরীক্ষা কবিরাও সেই কৃত্রিম লঘু-গুরু উচ্চারণ-রীতিতে সংস্কৃত ছন্দ বাংলা
 পদ্যে ব্যবহার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু এই গতানুগতিক কৃত্রিম রীতি পরিহার
 করলেন। তিনি স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে সংস্কৃত ছন্দের পদযতি
 বাংলা ছন্দে প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত বৃত্তরীতির বিভিন্ন ছন্দোবন্ধে দেখা
 যায়, প্রতি পাদের দলসংখ্যা লঘু-গুরু নির্দিষ্ট হিসাব মতো বিন্যস্ত হয়। সূত্রাং সেখানে
 কলামাত্রার সংখ্যা এবং যতিবিভাগের একটি হিসাবও পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র
 কলামাত্রার হিসাব ঠিক রেখে এবং যতিবিভাগের মাপ যথাসম্ভব রক্ষা করে বাংলা পদ্যে
 সংস্কৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ আনবার চেষ্টা করেছেন। সূত্রাং স্বাভাবিক উচ্চারণে সংস্কৃত
 ছন্দকে বাংলায় প্রবর্তনের চেষ্টা সর্বপ্রথম তিনিই করেছেন। এদিক থেকে তিনি
 সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অগ্রদূত। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কলাবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ রেখে
 সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ক্রমটিও প্রবর্তন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ
 নির্দিষ্ট দলবিন্যাসক্রমের কথা না ভেবে, শুধু যতিবিভাগ এবং পদ ও পংক্তির কলামাত্রক
 হিসাব রেখে, এ ছন্দ রচনার পরীক্ষা করেছেন। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য স্পষ্টতর করা
 যেতে পারে। যেমন,—

- (১) রম্য এষে উপবন
 কহে কবি তখন
 ফিরাইয়া নয়ন

চৌদিক পানে।

পুষ্পপাতা মিলিজুলি

সমীরে হেলি দুলি

করিছে কোলাকুলি

অভেদ প্রাণে॥

[সপ্তপ্রয়াণ : মনোবাজ্যে প্রয়াণ : (১৩০৩ সং) পৃ. ৫-৬]

কবি এখানে মন্দাক্রান্ত্য ছন্দের চ||৭||১২। কলামাত্রাভাগের আকৃতিবন্ধ গ্রহণ করেছেন। মন্দাক্রান্ত্যের লঘু-গুরু দলবিন্যাসের ভাগ হল, — — — — || — — — — — || — — — — — । অর্থাৎ যথাক্রমে চারিটি গুরু দ্বিমাত্রক দলে আট কলামাত্রায়, পাঁচটি লঘু ও একটি গুরু দলে সাত কলামাত্রায় এবং পাঁচটি গুরু ও দুটি লঘু দলে বারো কলামাত্রায় যতিবিভাগ হয়। কবি এখানে দলবিন্যাসের লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট ক্রম মেনে চলেন নি।—শুধু আট, সাত এবং বারো মাত্রায় যতিবিভাগ ঠিক রেখেছেন।—সেখানেও দীর্ঘ বারোমাত্রার পদ বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে আরও ভেঙে ৭+৫ মাত্রাভাগে ভাগ করেছেন। কবি পংক্তিমাঝে যেমন রেখেছেন, পদান্ত মিলও দিয়েছেন। বিচিত্র চ+৭+৭+৫ কলামাত্রার যতিভাগে। এবং মিলবিন্যাসে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আর একটি উদাহরণ তুলছি,—

(২) লজ্জা বলিল ‘হবে

কিলো তবে !

কতদিন পরাণ র’বে

অমন করি।

হইয়ে জলহীন

যথা মীন

থাকিবে ওলো কতদিন

মরমে মরি।’ [সপ্তপ্রয়াণ নন্দনপুর প্রয়াণ, পৃ. ২৮]

এটি সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দের ১১||১৪। মাত্রাভাগের আদর্শে লিখিত। শিখরিণীর লঘু-গুরু দলবিন্যাসের ভাগ হল, — — — — — । — — — — — — — — — — ।^১ অর্থাৎ

১। “মন্দাক্রান্ত্য”স্থধিরসনগৈর্মৌ ভনৌ গৌ যযুগ্মম্। (ছন্দোমঞ্জরী ২য় স্তবক, ১৬৪ সূত্র) যাহার পাদগুলি ক্রমশঃ ম (— — —), ত (— — —), ন (— — —), এবং, দুইটি গ (—), দুইটি য (— — —) গণে গঠিত হয়, এবং প্রথমত চতুর্থাঙ্করে (syllable) পরে ষষ্ঠাঙ্করে তদানন্তর সপ্তমাঙ্করে যতি থাকে, তাকে ‘মন্দাক্রান্ত্য’ ছন্দ বলে। (চিহ্নসংকেত, — গুরুদল, — লঘুদল, || যতিবিভাগ)

২। রসৈ রুদ্রৈশ্চিমা যমনসভলা গঃ ‘শিখরিণী’। (ছন্দোমঞ্জরী ২য় স্তবক, ১৬১ সূত্র) যাহার পদগুলি ক্রমশঃ য (— — —) ম (— — —), ন (— — —) স (— — —), ত (— — —), ল (—) এবং গ (—) গণে গঠিত এবং প্রথমত ছয়দলে, পরে একাদশদলে যতি থাকে তাকে শিখরিণী ছন্দ বলে। চিহ্ন সংকেত পূর্ববৎ।

প্রথমে একটি লঘু ও পাঁচটি গুরু দলে একাদশ কলামাত্রায় এবং তারপর আটটি লঘু ও তিনটি গুরুদলে চতুর্দশ মাত্রায় যতি পড়বে। বাংলা ছন্দে এত দীর্ঘ যতিবিহীন পদবিন্যাস সাভাবিক নয় বলেই কবি প্রথম একাদশ মাত্রাকে ৭+৪ এবং পরবর্তী চতুর্দশ মাত্রাকে ৯+৫ মাত্রাভাগে যথাক্রমে কাঁকাঁকাঁথা গাঁগাঁগাঁথা মিলে বিন্যস্ত করে, দ্বিপংক্তিক শ্লোক রচনা করেছেন। লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাস এখানেও কবি রাখেননি। সুপরিচিত পদবিন্যাসের আর একটি উদাহরণ তুলছি।—

(৩) কুমারসেন যবে বালক অতি,
জননী তার রাজরাণী—
স্বর্গে গেল চলি, ধরণীপতি
শূণ্য দেখে রাজধানী।

[কাব্যমালা, কুমার সেন (১৩২৭ সং). পৃ. ১]
এখানে কবি বসন্ত তিলক^৩ ছন্দের আদর্শ নিয়েছেন।—এ ছন্দের লঘুগুরু দলবিন্যাসের ভাগ হল — — — — — | — — — — — I অর্থাৎ প্রথম চারটি লঘু, চারটি গুরুদলে বারো কলামাত্রায় এবং তৎপরে তিনটি গুরু ও তিনটি লঘুদলে নয় কলামাত্রায় যতি পড়ে। কবি এখানে বারো ও নয় মাত্রাকে আবার যথাক্রমে ৭+৫ এবং ৫+৪ মাত্রাভাগে ভাগ করে ৭+৫+৫+৪ যতিভাগে পংক্তি রচনা করেছেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মাত্রাভাগে বিশুদ্ধ সরল কলাবৃত্ত রীতিতে গানভঙ্গ (সোনার তরী), মস্তক বিক্রয় (কথা) প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। হয়তো বড়দাদার রচনার কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের সাভাবিকতা রক্ষা করে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের বিচিত্র মিশ্রবন্দের রূপাদর্শ বাংলা পদ্যে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রধানত উচ্চারণ-প্রভাব তৎকালীন প্রচলিত মিশ্রবৃত্তছন্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই ছন্দে বিজোড় মাত্রক যতি যে সাভাবিক নয়, সচেতন ভাবে সে কথা ধরতে পারেননি। তারই ফলে স্বচ্ছন্দে ৭+৫+৫+৪ মাত্রাভাগে অথবা ৭+৪+৫+৪+৫ মাত্রাভাগে পংক্তি রচনা করেছেন। কিন্তু সচেতন ভাবে এই দুর্বলতা না ধরতে পারলেও কলাবৃত্তের উচ্চারণ কবির সাভাবিক ছন্দের শ্রুতিবোধে অবচেতন মনে সে রহস্য রহস্য ধরতে কিছুটা ধরা পড়েছিল। তারই ফলে বিজোড়মাত্রক পদে অনেক সময় পারেননি কলাবৃত্তের সাভাবিক বিশিষ্ট উচ্চারণে ছন্দের ধ্বনিগত শ্রুতি-সৌম্য রক্ষা করেছেন।—এ কাজ তিনি সচেতন ভাবে করেননি;—কারণ তা যদি হত, কোনও কোনও কবিতায় সর্বত্রই রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ দেখা যেত। বরং বলা যায়, সচেতন মনে মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণই রাখতে চেয়েছেন,—এই কৃত্রিম সচেতনতা

৩। জ্যেষ্ঠ ‘বসন্ততিলকং’ তভজা জগৌ গঃ। (ছন্দোমঞ্জরী ২য় স্তবক, ১১২ সূত্র)
যে ছন্দে প্রতিপাদে ক্রমশঃ একটি ত (— — —), একটি ভ (— — —), দুটি জ (— — —) ও দুটি গ (—) থাকে তাকে বসন্ততিলক বলে জানবে।—এ ছন্দে সাধারণতঃ প্রথম আটদলে, পরে চতুর্দশ দলে যতি থাকে। চিহ্ন সংকেত পূর্ববৎ।

যখন থাকেনি, তখনই কলাবৃত্তের রুদ্ধদলে দ্বিমাত্রক উচ্চারণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কলাবৃত্তের পূর্বোক্ত (৩) উদাহরণে ‘স্বর্গে’ এবং ‘শূন্য’ দুটি শব্দই কলাবৃত্ত রুদ্ধদলে দ্বিমাত্রক রীতিতে কবি তিন কলা-মাত্রারূপে উচ্চারণ করেছেন;— এবং ব্যবহার দৃষ্টান্ত তাতেই এ অংশে ধ্বনিসৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও উদাহরণ তুলছি,—

হেথায় ঝরঝর ঝরঝর ঝরণা ঝরে।

পাদপ মরমর, মরমর, শবদ করে

কি জানি কোথা হতে, বায়ুপথে আসিছে গীত;

বীণায় ‘ঝঙ্কার,’ হয় আর, আচমবিত ॥^৪

[স্পন্দপ্রয়াণ নন্দপুর প্রয়াণ,

(১৯১৪ সং) পৃ. ৩৮]

এখানে ‘ঝরণা’, ‘শবদ’, ‘আচমবিত’,—তিনটি রুদ্ধদল শব্দকে কবি মাত্রা প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিযুক্ত হরফে লিখেছেন। তার কারণ কলাবৃত্ত রীতির যুক্ত হরফের বিশিষ্ট দ্বিমাত্রক

কলাবৃত্তের আদর্শে উচ্চারণ সম্পর্কে এযুগের অন্যান্য কবিদের মতো তিনিও যুক্তবর্ণের বিশিষ্ট সুনিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু এই সঙ্গে যুক্ত হরফে লিখিত ‘ঝঙ্কার’ শব্দে প্রসারিত চারমাত্রার উচ্চারণ-কালে কবির সচেতন মন কাজ না করলেও কান প্রসন্ন হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর একটি উদাহরণ

দিচ্ছি,—

করিয়া জয়

মহা প্রলয়

বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা।

তাল বেতাল

‘দিচ্ছে’ তাল

ধেই ধেই নাচে পিশাচ দানা।

গাধায় চড়ি’

লাগায় ছড়ি

অদ্ভূত-রস ‘কিম্পুরুষ’।

দুটি অধরে

হাসি না ধরে,

৪। সম্ভবতঃ কবি এ-পদ্যাংশ ‘প্রিয়ংবদা’ ছন্দোবন্ধের আদর্শে লিখেছেন। ন (— — —), ভ (— — —), জ (— — —), র (— — —), — এই চারটি গণে বারো দলে, ষোল কলামাত্রায় প্রিয়ংবদা ছন্দ রচিত হয়। ভূবি ভবেন্নভজরৈঃ ‘প্রিয়ংবদা’।

(হৃদ্যোমঞ্জরী, ২য় স্তবক, ৮২ সূত্র)

‘লম্ব’ উদর বেটে মানুষ।।’

[স্বপ্নপ্রয়াণ বিষাদপুর প্রয়াণ (১৯১৪ সং). পৃ. ৯১]

এখানে ৫+৫+৬+৫-মাত্রাভাগে পংক্তি রচিত হয়েছে। ‘বাজনা’ এবং ‘অদভূত’ শব্দ দুটি বিযুক্ত হ্রস্বে লিখিত, যথাক্রমে তিন ও চারমাত্রার প্রসারিত উচ্চারণ বিশিষ্ট। ‘দিচ্ছে’, ‘কিম্পুরুষ’, ‘লম্ব-উদর’—শব্দ তিনটি যুক্তহ্রস্বে লিখিত;—এখানেও বিশিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে তিন, পাঁচ, পাঁচ কলামাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। বিজোড় পাঁচমাত্রার পর্বে বিশিষ্ট কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণই স্বাভাবিক হয়। সচেতন মনে না ভাবলেও স্বাভাবিক ছন্দের সৌম্যম্যবোধেই কবি কলাবৃত্তের উচ্চারণ এখানে এনেছেন। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ এই রীতির রুদ্ধদল প্রয়োগ-রহস্য সুনির্দিষ্ট ভাবে ধরতে পেরেছেন,—এ যুগে অবচেতন ভাবে তার অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ আভাস প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের এমনতর যুক্তবর্ণে লিখিত কলাবৃত্তের রুদ্ধদল-দ্বিমাত্রক উচ্চারণের দৃষ্টান্ত স্বপ্নপ্রয়াণ এবং কাব্যমালার অনেকগুলি পদ্যেই লক্ষ করা যায়।

পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে রঙ্গলাল সর্বপ্রথম যতিপ্রান্তিক মহাপয়ার ব্যবহার করেছিলেন। এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সমিল প্রবহমান রচনার দ্বারা ছন্দে ভাবমুক্তির ধারাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে মহাপয়ার রচনা গেলেন। প্রবহমান মহাপয়ারে তিনি পংক্তিমিলে এবং স্তবক রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন যেমন,—

গভীর পাতাল ! যথা কালরাত্রি করালবদনা	পংক্তিমিল	ক
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা		ক
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল		খ
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ॥১॥		গ
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল !		খ
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্দিদিক !		ঘ
রসাতল গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল !		খ
দেখে যদি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সেকি আর ॥২ ॥		ঙ
আসে ফিরে ! আপাদমস্তক ঘুরি টানিয়া চরণ,		চ
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন যুগল,		খ
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষ পৃষ্ঠে লভে শেষ গতি !		ছ
দলবল একত্র করিছে হেথা রসাতল পতি ॥৩ ॥		ছ

[স্বপ্নপ্রয়াণ, রসাতল প্রয়াণ,]

৫। এ পদ্যটি মালিনী ছন্দের আদর্শে লিখিত মনে হয়। মালিনী ছন্দের লঘুগুরু দল বিন্যাসক্রম হল, ন (— — —), ন (— — —), ম (— — —), য (— — —), য (— — —)। বাইশ মাত্রার পংক্তিযুক্ত যথাক্রমে ১০ ও ১২ মাত্রায় যতি পড়ে। এখানে কবি ২১ মাত্রার পদ রচনা করে ১০ এবং ১১ মাত্রায় যতি দিয়েছেন। (দ্র: ছন্দোমঞ্জরী পৃ. ৯২, সূত্রসংখ্যা ১৩৪)

এখানে তিনটি স্তবকেই কবি শিথিল মিল রেখেছেন। তিনটি স্তবকেই একটি সাধারণ মিল (খ)-সহ প্রত্যেক স্তবকে অন্ততঃ দুটি পংক্তিতে মিল দিয়েছেন। মিলবৈচিত্র্য আবার প্রথম স্তবকের চতুর্থ পংক্তি, দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি এবং তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তিতে কোনও মিল রাখেননি। ভাবের প্রবহমানতা কবি প্রথম স্তবক থেকে দ্বিতীয় স্তবকে এবং দ্বিতীয় স্তবক থেকে তৃতীয় স্তবকে টেনে নিয়ে গেছেন। পংক্তিডিঙানো ভাব-প্রবহমানতার আদর্শ সম্ভবত তিনি মধুসূদন থেকেই নিয়েছেন। তবে স্তবকডিঙানো ভাব-প্রবহমানতায় স্তবক রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত মহাপয়ার এবং অন্যান্য ছন্দোবন্ধেও সেরূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কিছু কবিতায় দলবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। তবে সেখানে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। সংস্কৃত উচ্চারণের লঘুগুরু দলবিন্যাসেও ছন্দ রচনা করেছেন, পরিহাস তরল রচনায়।—এমন উচ্চারণ বাংলা ছন্দে কৃত্রিম তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন মনে হয়। সংস্কৃত মেঘদূতের বাংলা অনুবাদে তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতির ‘মিত্রাক্ষর’ পয়ার-ত্রিপদী অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

।।গ।।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রীতি-সচেতন কবি ছিলেন। ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর এই সচেতনতা লক্ষ করা যায়। সুদীর্ঘ সাইত্রিশ বছর (১৮৬১-১৮৯৮) তিনি সাহিত্যসাধনা করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিত্রতরঙ্গিনী (১৮৬১) ; সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ চিত্র বিকাশ (১৮৯৮)। পরবর্তী কয়েক বছরেও তিনি কিছু গীতি কবিতা লিখেছেন;—সেগুলি ‘বিবিধ’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত ‘হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী’র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিচারে কবির, ‘নলিনীবসন্ত’ নাটক (১৮৬৮), ‘বৃত্তসংহার’ মহাকাব্য (১৮৭৫-৭৭), ‘ছায়াময়ী’ কাব্য (১৮৮০) ‘দশমহাবিদ্যা’ কাব্য (১৮৮২), ‘রোমিও জুলিয়েট’ নাটক (১৮৯৪) এবং ‘বিবিধ’ কবিতাগুলোর নামোল্লেখ করা যায়।

মধুসূদনের সমসাময়িক কালেই হেমচন্দ্র ‘মিত্রাক্ষর’ পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদীতে ভারতচন্দ্রের এবং ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নলিনী বসন্ত নাটকে। মধুসূদন প্রবহমান পয়ার ছন্দকে নাট্যসংলাপে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, তবে অনভ্যস্ত বাঙালী শ্রোতার কথা মনে রেখে এ রীতি ধীরে ধীরে প্রবর্তনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। ১৮৫৯-এ লিখিত, পদ্মাবতী নাটকে সম্ভবত সে কারণেই পরীক্ষামূলক ভাবে মাত্র চারটি দৃশ্যে (২।২, ৪।১,

নলিনীবসন্ত নাটকের মুক্তকান্ডাসমূহ পয়ার ৪।২, ৫।২) আংশিকভাবে এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। নয় বৎসর পরে (১৮৬৮) হেমচন্দ্র সেই কাজ করতে আবার অগ্রসর হলেন। কিন্তু নাট্যসংলাপে এই ছন্দের ব্যবহারে হেমচন্দ্র বিশেষ সফল হতে পেরেছেন বলা চলেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর পয়ারবন্ধ অমিল যতিপ্রাপ্তিক পয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। পংক্তিমাপ কদাচিত কখন কমিয়ে মুক্তকের আভাস এনেছেন, তবু এ-ছন্দকে বিশুদ্ধ প্রবহমান পয়ার বা মুক্তক বলা চলে না; মূলতঃ তিনি মিলবিহীন যতিপ্রাপ্তিক পয়ার রচনা করেছেন। এখানে আমাদের মন্তব্যের স্বপক্ষে একটি উদাহরণ তুলছি।—

বৈজ। অব্যর্থ কুহকমন্ত্র ফলিছে অবাধে;
আজ্ঞাবহ পরিগণ খাটিতেছে সবে;
সময় সরলভাবে করিছে গমন;—
হলো বুঝি এতদিনে ব্রত উদযাপন—
বেলা কত ?

সুমা। দিবাকর অন্তপ্রায়, অপরাহ্ন শেষ,
যে সময় আমাদের শ্রম অবসান
হবে কহেছিলো, প্রভু !

বৈজ। বলেছিণু বটে, যবে উঠাইণু ঝড়।
সে কথা নিষ্ফল, পরি হবে না আমার,
কিন্তু বাপ, বল দেখি কোথায় এখন,
কি ভাবে গুজরাটপতি সঙ্গীগণসহ
করিছে সময়ক্ষেপ ?

[নলিনী বসন্ত ৫।১ স. প. সং, পৃ ৭০]

উদ্ধৃতাংশে (এবং নাটকের অন্যত্রও) পূর্ণপংক্তি-মাপ কবি চৌদ্দমাত্রা রেখেছেন। অধিকাংশ পংক্তিই যতিপ্রাপ্তিক। এক এক জনের সংলাপ যেখানে শেষ হচ্ছে, প্রয়োজনে সেখানে অপূর্ণ পংক্তি রেখেছেন; কদাচিত দু-একটি ক্ষেত্রে অপূর্ণ পংক্তি সংলাপের মাঝেও রেখেছেন;—তবে তেমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত কম। অধিকাংশ পংক্তিই আট-ছয় মাত্রা-ভাগে বিভক্ত; মাঝে মাঝে ৬+৮ বা ৪+১০ মাত্রাভাগও দিয়েছেন। লাইন ডিঙানো প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত সমগ্র নাটকে খুবই কম রয়েছে। এখানে দুটিমাত্র প্রবহমান পংক্তি রয়েছে,—

(১) যে সময় আমাদের শ্রম অবসান
হবে কহেছিলো প্রভু

এবং

(২) কিভাবে গুজরাটপতি সঙ্গীগণসহ
করিছে সময়ক্ষেপ;

হেমচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দমধ্য বিষুবর্ণের লিখিত রুদ্ধদল, সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে মিশ্রবৃত্ত ছন্দে এক কলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে ‘উদযাপন’ এবং শব্দমধ্য রুদ্ধদলের ‘গুজরাটপতি’ শব্দ দুটির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ লক্ষণীয়। আরও দু-একটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

- (১) কানামাছি বোলতা ডাঁস সারারাত্রি ধরো
দংশিবে যে আজ তোরে বিকিতে থাকিবে।
ভিমরুলের চাক যথা—তেমনি হবে ফুলে... [নলিনীবসন্ত ১।১]
- (২) শুনছি বটে; কিন্তু এয়ে স্বপ্নের প্রলাপ—
নিদ্রিতের অসঙ্গত বাক্যএ তোমার।
কি বলছিলে তুমি? [নলিনীবসন্ত ২।১]
- (৩) করছি কি ভ্রমতে ভুলে প্রেমের প্রলাপে। [নলিনীবসন্ত ৩।১]

এখানে বিশেষ্যপদ বোলতা, ভিমরুল,—এবং সর্বনাম ও চলতি ক্রিয়াপদ তেমনি শুনছি, বলছিলে, করছি,—প্রকৃতি শব্দগুলির মধ্যবর্তী অযুক্তর্গে লিখিত রুদ্ধদলকে সঙ্কচিত দৃঢ় উচ্চারণে এক কলার মর্যাদা দিয়েছেন। হেমচন্দ্র নলিনীবসন্ত নাটকের সাতটি গর্ভাঙ্কেই ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। ভাষা যথাসম্ভব কথারীতিতে রেখেছেন; তবে ছন্দের খাতিরে কথ্য ও সাধু উভয় ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন। ছন্দে চলতি ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে নলিনীবসন্ত নাটকটির কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে বলা যায়।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদল দুই কলামাত্রার মর্যাদা
শব্দপ্রান্তিক পায়,— এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। হেমচন্দ্রও এই নিয়ম অধিকাংশ
রুদ্ধদলের ক্ষেত্রে মেনে চলেছেন। তবে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও এই
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ নাটকটিতে রয়েছে। যেমন,—

- (১) হাঁরে মূর্খ—আমিও তাই বলচি—সেই সে
সেই বর্বট—আমার যে কিস্কর এখন; [নলিনীবসন্ত, ১।১]
- (২) দেখিস, এর শাস্তি আজ রাত্রি পাবি তুই, [ঐ]

সম্ভবত পল্লী-কবিরাজ ও পাঁচালীকারদের শিখিল ছন্দ এখানে কবিকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে।

নলিনীবসন্ত নাটকে কবি দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তরীতির ত্রিপদী-চৌপদী-বন্ধ দু-একটি অংশে (২।১, ২।২, ৪।১) ব্যবহার করেছেন। দলবৃত্তে লৌকিক ভাবস্পন্দন সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তবে মিশ্রবৃত্তে ত্রিপদী ও চৌপদীর ব্যবহার সংলাপকে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করে তুলেছে।

১৮৯৪-তে হেমচন্দ্র রোমিও জুলিয়েট নাটকটি রচনা করেন। সেখানেও তিনি প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে মুক্তকের আভাস এসেছে। তবে উল্লেখযোগ্য নতুন কোনও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়নি।

বৃত্তসংহার
কাব্যের ভূমিকা

হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা, বৃত্তসংহার কাব্য। এ কাব্যে কবি
ছন্দের কিছু নতুন পরীক্ষা করেছেন। ভূমিকায় সে বিষয়ে উল্লেখও
করেছেন।—

“নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা
আশঙ্কা করিয়া পয়াবাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও
অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সম্মিলিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন
দত্ত সর্বাগ্রে বাংলা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদবিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার
গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয়
অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিলটন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে।
কিন্তু ইংরেজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাংলাভাষার সর্বাধিক নৈকট্য সম্পন্ন
বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎ পরিমাণে
তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাংলায় লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায়
সংস্কৃত কোনও ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই।...পয়ারের যতি
সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই।

[বৃত্তসংহার কাব্য, সা. প. সং, ১৩৬০, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, পৃ. ৩]

কবির এই মন্তব্য থেকেই ধরা যায়, তিনি মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার সর্বত্র
হেমচন্দ্র মধুসূদনের যথাযথ ব্যবহার করতে চাননি, যতিপ্রাস্তিক অমিল পয়ারবন্ধে
প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করতে সংস্কৃত চতুষ্পদী শ্লোকের আদর্শে বাংলা চতুষ্পাংক্তিক শ্লোক রচনা
করতে চেয়েছিলেন। বৃত্তসংহার কাব্যের (১ম ও ২য় খণ্ড)
২৪টি সর্গের মধ্যে কবি সাতটি সর্গে (১, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৩ এবং ১৭ সর্গ দ্র.)
চতুষ্পাংক্তিক শ্লোক ব্যবহার করেছেন। প্রবহমান পয়ার প্রথম খণ্ডের
সংস্কৃত চৌপদীশ্লোক এগারোটি সর্গে আদৌ ব্যবহার করেন নি। দ্বিতীয়খণ্ডে অবশ্য
ব্যবহার করতে অনেকগুলি সর্গেই (১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২৩ এবং ২৪ সর্গ
দ্র.) এ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কবি বিভিন্ন স্তবকবন্ধে মিত্রাক্ষর
দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চৌপদী ছন্দ ও এই মহাকাব্যের কয়েকটি সর্গে ব্যবহার করেছেন।
এখানে কবির যতিপ্রাস্তিক ‘সংস্কৃত শ্লোক’ রচনাদর্শে লিখিত অমিল পয়ার চতুষ্পদের
দু’একটি উদাহরণ তুলছি।—

“দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,

তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্যগণ?

দেব অজ্ঞাঘাতে নহে দানব’ বিনাশ,

সে দেব বিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?

“নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?

দেব কি মানব কিম্বা মানব সন্তানে ?

সাহসে যে পারে তার কাটিতে

নিয়ত কিস্কর তার শুন দেবগণ।

[বৃত্তসংহার কাব্য, ১ম সর্গ, পং ১৩৭-১৪৪]

আলোচ্য উদাহরণে কবি ‘পয়ারের যতি সংস্থাপনরীতি’ মেনে চলেছেন। কিন্তু প্রবহমান পয়ারের ভঙ্গিতেও চতুষ্পংক্তিক স্তবক রচনা করেছেন। যেমন,—

নাহি কি ভাবিতে অন্য—হৃদয় বেদনা

জুড়াতে নাহি কি আর উপায়,—সরলে ?

সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি

ভুলিলে কি চারুমতি ?—ভুলিলে শচীরে ?

[বৃত্তসংহার কাব্য, ১৭ সর্গ, পং ৩১৩-৩১৬]

চতুষ্পংক্তিক শ্লোক
অতিক্রমকারী
ভাবের প্রবহমানতা

এখানে ভাবের প্রবহমানতা পংক্তি অতিক্রম করলেও চতুষ্পংক্তিক শ্লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু যখন লিখেছেন,—

এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি

“শীঘ্র যাও, মনোমোহিনী, শচীপাশে,

কহ তারে আসিতে এথায় কায়ক্লেশ

ঘুচাব তাহার অচিরাৎ।” দ্রুতগতি

দৈত্যপতি হইলা বাহির, মহাবেগে

উঠিল প্রাচীরে চাহি দেখিলা চৌদিকে,—

দৈত্যদৃষ্টি যতদূর—দূরপ্রান্তে তার,

অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে !

স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—

কোথা অবিরল শ্রেণী—দু’একটি কোথা !

দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি

হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী সলিলে

ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া

কার্তিকের অমানিশা—অঙ্ককার হরি,—

মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী উৎসবে !

[বৃত্তসংহার কাব্য, ১২ সর্গ, পং ২২২-২৩৬]

—এখানে প্রত্যেকটি স্তবক ডিঙিয়ে ভাবের প্রবাহ পরবর্তী স্তবকে চলে এসেছে। এমন ক্ষেত্রে স্তবক রচনার উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়। এখানে ছন্দ মূলত প্রবহমান পয়ার হয়েছে,—চতুষ্পংক্তিক স্তবক বিন্যাসের বিশেষ সার্থকতা নেই।

হেমচন্দ্র প্রবহমান পয়ার রচনায় মূলত মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন। তবে বিজোড়মাত্রায় ভাবযতি স্থাপনে ছন্দ “শ্রোতোভঙ্গহেতু শ্রবণকঠোর” হয় (দ্র. ৩য় অধ্যায়, পৃ ৭৮) উপলব্ধি করে যথাসম্ভব জোড়মাত্রায় পদ গঠন করেছেন। প্রবহমান পয়ার মধুসূদনের তুলনায় হেমচন্দ্রের প্রবহমান পয়ার অনেকটা নিস্তব্ধ, রচনা-বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে। শব্দের অনুপ্রাস, ধ্বনিবন্ধার, ছোটবড়ো বিচিত্র পদগ্রন্থন-রীতি মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শে যে মহিমার দীপ্তি লাভ করেছে, সে তুলনায় হেমচন্দ্রের প্রবহমান পয়ারে প্রতিভার বিদ্যুৎচমকের অভাব লক্ষিত হয়। হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষরে অনভ্যাস পাঠকের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে ছন্দের ওজঃগুণ অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছেন। ভাবের বহুবিচিত্র প্রকাশনায় দৃঢ়বদ্ধ ছোটবড়ো পংক্তি-অনুচ্ছেদে মধুসূদন প্রবহমান ছন্দকে যতটা নমনীয়তা দিয়েছেন, যতটা স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, হেমচন্দ্রের প্রবহমান পয়ারে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অতটা সুস্পষ্ট হতে পারেনি। কবির প্রবহমান পয়ার রচনার নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী তীরে
মন্দির পাশাণময়, নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম ;—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে !
চতুর্দিকে সেই সব নিকুঞ্জকানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সে পারিজাত-পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিন্ত। শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র অট্টালিকা—
চারু কারুকার্যে যার সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমর শিল্পী শিল্পীকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ ; সুখিত অমর বাসগৃহ।

[বৃহৎসংহার কাব্য, ১৪ সর্গ, প. ১-১২]

এ-ছন্দে পংক্তিডিঙানো প্রবহমানতা কম ;— আট-ছয় মাত্রার স্তিমিত পদক্ষেপে গতি যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মধুসূদনের ছন্দের সেই দুর্বীর আবেগ এবং ভাবের উত্থান-পতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেমচন্দ্রের রচনায় অনুপস্থিত।

হেমচন্দ্র বৃহৎসংহার কাব্যে ‘মিত্রাক্ষর’ এবং ‘অমিত্রাক্ষর’ উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত করেছেন বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দ ব্যবহারে কবি সমিল মিত্রাক্ষর যতিপ্রাপ্তিক পয়ারের নিদর্শন দিয়েছেন, ত্রিপদী (লঘু ও দীর্ঘ) ও স্তবকবদ্ধ চৌপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ কাব্যে (এবং অন্যত্রও) কবি একাধিক রীতির স্তবক রচনা করেছেন। দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

	মাত্রাভাগ	মিল
(১) হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর	৬।৬।।	কা।
পতি সহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,	৬।৬।।	কা।
দানবরমণী করিছে ক্রীড়া।	৬।৫।	খা
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,	৬।৬।।	গা।
পরিছে হরিশে সুষমাতে তুলি,	৬।৬।।	গা।
বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।	৬।৫।	খা

[বৃত্তসংহার কাব্য ২য় সর্গ, ১ম স্তবক]

এটি দীর্ঘ পদভাগের ত্রিপদীবদ্ধ। সাধারণত মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয়, আট বা দশ মাত্রার পদ দেখা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহু কবিই ছয় মাত্রার দুটি পর্ব সহযোগে দীর্ঘ বারো মাত্রায় পদ গঠন করেছেন। আলোচ্য স্তবকবন্ধে হেমচন্দ্র তারই নিদর্শন দিয়েছেন। ছয় মাত্রার পর্বযতি এই ছন্দে কিছুটা লঘু চাল ফুটিয়ে তুলেছে।

	পদ ভাগ	মিল
(২) অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময় রথ	৮।।৬।	কা।
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে	৮।।৮।।	খা।খা।
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,	৮।।৬।	—।।গা।
শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।	৮।।৬।	গা।

[বৃত্তসংহার কাব্য দ্বাবিংশ সর্গ, পৃ. ২৪৩]

ইতিপূর্বে মধুসূদনের স্তবক-নিদর্শনে দেখা গেছে, প্রয়োজনে তিনি মিলবদ্ধ পংক্তির মাঝে অমিল পংক্তি এনেছেন। হেমচন্দ্রও এখানে প্রতি স্তবকের প্রথম দ্বিপদী পংক্তিটি মিলহীন রেখেছেন।

বৃত্তসংহার কাব্যের ভূমিকায় যদিও হেমচন্দ্র বলেছেন যে, “বাংলায় লঘু-গুরু সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোনও ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই;”—তবু এ কাব্যের একটি অংশে (৫ম সর্গে) বেশ সফলভাবেই এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

				পর্বের মাত্রাভ
মা ন স ।	মো হ ক র ।	ন ব দ্র ম ।	রা জি ।	৪।৪।৪।৪
প্রকাশিল	সুন্দর	কিশলয়ে	সাজি ।	
ধাবিল	সমীরণ	মলয়	সুগন্ধি	
চুম্বনে	ঘন ঘন	কুসুম	আনন্দি ।	
কাঁপিল	থরথর	তরুশিঃ	সাধে,	
শিহরিল	পল্লব	মরমর	নাদে ।	

কোকিল	ব্রাহ্মণ	কুহরবে	কুঞ্জ
শোভিল	সরোবরে	সরোজিনী	পুঞ্জ ।

[বৃত্তসংহার কাব্য ৫ম সর্গ, পৃ. ৪১]

গুরুস্বরের দীর্ঘ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সম্পর্কে হেমচন্দ্র আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা

করেছেন ‘দশমহাবিদ্যা’ (১৮৮২) কাব্যে। এ সম্পর্কে কবি

আলোচ্য গ্রন্থের ‘গন্ধকারের বিজ্ঞাপন’ অংশে মন্তব্য করেছেন,—

“ইহাতে গুটিকত, নতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও

সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।...

...গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলি সম্বন্ধে এই কয়টি স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যক—সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট সকল গুরু বর্ণেরই সর্বত্র গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেইভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্তবর্ণের সর্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদেস্থিত অ-কার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।...

[দশমহাবিদ্যা, গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন

সা. প. সং (১৩৬০) পৃ. ৩,]

দশমহাবিদ্যা কাব্যে কবি পনেরটি ছন্দোবন্ধের নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলি (i) দীর্ঘ ত্রিপদী [মিশ্রবৃত্ত চ||চ||১০I], (ii) দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী [লঘু-গুরু চ||চ||১১I] (iii) ধীর ললিত ত্রিপদী [লঘু-গুরু চ||চ||চ||চI], (iv) ভঙ্গপদী পয়ার [লঘু-গুরু ৩|৪||৪||৪I], (v) লতিকাপদী [মিশ্রবৃত্ত ডাডা||ডাটা], (vi) ত্রিপদী পয়ার [মিশ্রবৃত্ত ৪|৪||৪|৩I], (vii) দ্রুত ললিত পয়ার [লঘু-গুরু ৪|৪||৪||৪I], (viii) দীর্ঘ ললিত ত্রিপদী [লঘু-গুরু পঞ্চ ও যট প্রভাবিত ছন্দ পংক্তিক স্তবকবিন্যাস্ত চ||চIচ||চ||চ||চIচ||চIচ||৭Iচ||৭I, যটপংক্তিক স্তবকে প্রথমে আর একটি চ||চI পদভাগের পংক্তি আছে], (ix) ললিত পয়ার [মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত ৪|৪||৪|৩I], (x) ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী [মিশ্রবৃত্ত ত্রিপংক্তিক স্তবক-বিন্যাস্ত চ||চ||চ||৭Iচ||চ||চ||৭I চ||৭I], (xi) লঘু ললিত ত্রিপদী [মিশ্রবৃত্ত ডা||ডা||চI], (xii) লঘু ভঙ্গ পয়ার [মিশ্রবৃত্ত ৪|৪||৪|৩I], (xiii) দ্রুত ঘনপদী ছন্দ [লঘু-গুরু চ||চ||চ||চI], (xiv) ললিত ত্রিপদী [লঘু-গুরু চ||চ||চ||চI], (xv) ধীর ঘনপদী ছন্দ [লঘু-গুরু চ||চ||চ||চI] ।

এখানে যে পনেরটি ছন্দের নাম দিয়েছেন তার মধ্যে (iii) ধীর ললিত ত্রিপদী, (xiii) দ্রুত ঘনপদী ছন্দ, (xiv) ললিত ত্রিপদী এবং (xv) ধীর ঘনপদী ছন্দ মূলতঃ একই পদবন্ধে (লঘু-গুরু চ||চ||চ||চ||) রচিত। কোথাও বা কবি গুরুস্বর বেশী ব্যবহার করেছেন, কোথাও কম ব্যবহার করেছেন। আবার অনুরূপভাবেই ছন্দের নামকরণ বলা যায়, (iv) ভঙ্গপদী পয়ার এবং (vii) দ্রুত ললিত পয়ারে (লঘু-গুরু ৪|৪||৪|৪|) আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নেই। কেবলমাত্র দ্রুত ললিত পয়ারে কবি দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি, (vi) ত্রিপদী পয়ার এবং (ix) ললিত পয়ার (মিশ্রবৃত্ত ৪|৪||৪|৩|) প্রকৃতিগত বা আকৃতিগত বিচারে একই ছন্দের পরিচয় বহন করছে। সূত্রাং পনেরটি নাম থাকলেও ছন্দোবন্ধ আছে দশটি। তার মধ্যে ছয়টি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লিখিত, বাকী চারটি লঘু-গুরু কলাবৃত্ত রীতিতে, স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে লিখিত। দুটি স্তবক রচনার নিদর্শনও [(viii) দীর্ঘ ললিত ত্রিপদী লঘুগুরু এবং (x) ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী মিশ্রবৃত্ত।] এখানে রয়েছে।

মুক্ত স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ছন্দে কৃত্রিম; হেমচন্দ্র নিজেই বৃত্তসংহার লঘু-গুরু উচ্চারণ কাব্যের ভূমিকায় তার উল্লেখ করেছেন। তবু এ ছন্দ বাংলায় বাংলা ছন্দে কৃত্রিম চালাবার পরীক্ষা করেছেন। সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা চলেনা। তবে মাঝে মাঝে আংশিকভাবে সফল হয়েছেন। তার নিদর্শন বৃত্তসংহার কাব্য থেকে দিয়েছি। এখানে আর একটি উদাহরণ তুলছি,—

“রে সতি, অরে সতি,” কান্দিল পশুপতি

পাগল শিব প্রমথেশ।

যোগমগন-হর

তাপস যত দিন,

তত দিন না ছিল ক্লেশ।।

[দশমহাবিদ্যা, সা. প. সং, ১৩৬০ পৃ. ৮]

কিন্তু কবি সর্বত্র স্বরাস্ত উচ্চারণে শব্দগুলি পড়তে নির্দেশ দেবার ফলে আলোচ্য ছন্দ

অনেকাংশেই কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।—এটি বাংলা উচ্চারণরীতি লঘু-গুরু উচ্চারণ সম্পর্কে কবির বিরোধী।

নির্দেশ সর্বত্র

ঠিক নয়

দশমহাবিদ্যা কাব্যে কবি নিজেই কোথায় মুক্ত স্বরের দীর্ঘ

উচ্চারণ হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বত্র এই নির্দেশ সুপ্রযুক্ত

হয়েছে বলা চলে না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কবির নির্দেশিত পাঠ হল,—

তা যিনি সুন্দর

উন্নত শোভাধর

ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।

গীণসুন্দরী বামা

প্রফুল্লা-ত্ৰিনয়না

প্রভাত আভা দেহে ইন্দুভাতি কিরীটে।। [দশমহাবিদ্যা পৃ. ৩৬]

উপরে রেখাচিহ্নিত দলগুলি গুরু উচ্চারণে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বভাবতই ‘শোভাধর’, ‘তাঁর’ ‘ত্ৰিনয়না’ ‘প্রভাত’ শব্দগুলির দীর্ঘ উচ্চারণে পাঠকের মনে দ্বিধা জাগে। মনে হয়, কবি নিম্নোক্ত পাঠে পড়তে নির্দেশ দিলে পাঠকের প্রতি সুবিচার করতেন,—

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি হের তাঁর নিকটে।
পীণস্তনী বামা প্রফুল্ল ত্ৰিনয়না

প্রভাত আভা দেহে ইন্দুভাতি কিরীটে ॥

এমনতর পাঠকের বিভ্রান্তির অবকাশ দশমহাবিদ্যা কাব্যের আরও অনেকগুলি ক্ষেত্রেই রয়েছে।

আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির রুদ্ধদলে দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সে যুগের কবিরা সুস্পষ্টভাবে

কলাবৃত্ত রীতির জানতেন না। হেমচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু লঘু-গুরু
উপযোগী রুদ্ধদলের উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ
দ্বিমাত্রক উচ্চারণ তাঁকে আনতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মুক্তদলে (গুরু স্বরধ্বনি) দীর্ঘ
উচ্চারণের দৃষ্টান্ত বিরল হয়ে এসেছে; এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর
প্রবর্তিত ‘লঘু-গুরু’ রীতির ছন্দে আধুনিক কলাবৃত্তের উচ্চারণ এসে পড়েছে। একটি
উদাহরণ তুলছি।—

চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইল চকিতে।
অঙ্গরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে ॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনু পেয়ে কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥

কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনু শ্রোতধারা তরসে ॥
পতঙ্গ কীট পশু পুনু পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে ॥

[দশমহাবিদ্যা পৃ. ৪০]

শুধু এই অংশ পড়লে মনে হবে কবি বুঝি আধুনিক কলাবৃত্তের উচ্চারণেই পদ্য রচনা করেছেন। এখানে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ-দৃষ্টান্ত একটিও নেই। সেই কারণেই আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির আভাস ফুটে উঠেছে।

‘বিবিধ’ কাব্যের অন্তর্গত গীতিমূলক কয়েকটি স্তোত্রে কবি ‘লঘু-গুরু’ উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অনেকক্ষেত্রে গীতিসুরাশ্রয়ী স্তোত্র পঠনে চমৎকার সংস্কৃত স্তোত্র পাঠের আমেজও ফুটে উঠেছে। তবু স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিচারে সেগুলি কৃত্রিম বলেই স্বীকার করতে হয়। বাহ্যল্যবোধে এখানে তার আর উদাহরণ তুললাম না।

‘গন্ধাস্ত্রোত্র’, ‘গন্ধেমাতর্গঙ্গে’ প্রভৃতি স্তোত্রগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হেমচন্দ্র ‘লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ’ গম্ভীর ভাবের কবিতায় ব্যবহার করেন নি। ইতিপূর্বেই নলিনীবসন্ত নাটকে লঘুচালের সংলাপে বা সংগীতে এ ছন্দের ব্যবহার আমরা

লক্ষ করেছি। সমকালীন বিষয় নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কবিতারচনায় এ-
লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের ছন্দ কবির হাতে যেন আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে
নাট্যসংলাপ তাঁকে গুপ্তকবির শিষ্য বলা চলে। তাঁর ‘হায় কি হলো’,
‘হতোমপাঁচার গান’, ‘বাজিমাৎ’ প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫-তে হেমচন্দ্র ‘নাকে খত’ নামে একটি হাস্যরসাত্মক নাট্যকাব্য লেখেন। সমগ্র নাট্যকাব্যের সংলাপ কবি লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে রচনা করে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ণ পংক্তি তের বা চোদ্দ দলে সাধারণত রচিত হয়েছে। মিলবিন্যাসে এবং প্রয়োজনমতো বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপে পংক্তি ভেঙ্গে কবি এ-ছন্দে আশ্চর্য নমনীয়তা দিয়েছেন। এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,—

বিদ্যেনিধি। (Solos স্বগত)

ঢের টাকা ! উঃ ঢের—heaps of ‘em;

জয় জয়কার রত্নসভার ! well that’s a name !

একাদশ বৃহস্পতি” বচনটা তো ঠিক !

গ্যাং ফলতি সর্বত্র—শাস্ত্র কি অলীক ?

এই পাঁচশো—বড়গিন্নির হাতে দেবো ফেলে:

বাগদানটা অনেক দিনের আর চলে না ঠেলে।

ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্টের কাছে,

শুভস্যা শীঘ্রং যুক্তি ; —কে ওখানে আছে

(বাপ্পা পাঁড়ের প্রবেশ)

এই জেরা ঠহরো—

(দুইখানি চিঠির মোড়কে শিরোনামা লিখিয়া)

দো খৎ লেতে যাও;

ইয়েঃঠো কাশ্মীরি ঠাকুর—লেও হাঁতমে উঠাও

ঠিকানা মালুম ? ইয়েঃ খাম উনহিকো দেনা ।—

দোসরা ইয়েঃঠো ভট্টজী (হায় তো পহচানা ?)—

লম্বাসা মুরদ, গোরা, বেলকা তৌঅর সীর—

উনকা পাশ লে জানা।

বাপ্পা।

হাঁ মালুম কিয়া, মীর।

(বাগ্মা পাঁড়ে চিঠি লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

বিদ্যোনিধি। ও সর্বরি ! আয় হেথা।—

(সর্বরীর প্রবেশ)

বিদ্যোনিধি।

বলি শোন সবি

বলো গে তো রাঙাবৌকে আমার ঘরে যেতে।

সর্বরী। কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেশ দিবি খেতে।

আমায় দেনা—

বিদ্যোনিধি।

দেবো এখন, আগে গিয়ে বল

লক্ষ্মী মেয়ে সবি আমার, চল মা ঘরে চল।

[বিবিধ নাকে খং ১।১, সা. প. সং. পৃ. ৭৬-৭৭]

সেই যুগে দলবৃত্ত রীতির ছন্দে সংলাপধর্মী উচ্চারণের এতটা সাবলীলতা আর কেউই আনতে পেরেছেন মনে হয় না। অবশ্য মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক সংলাপ ইতিপূর্বেই রাজকৃষ্ণ রায় বা গিরিশচন্দ্রের হাতে গড়ে উঠেছিল।

বাংলায় বিভিন্ন পংক্তিবন্ধ ও মিল-বৈচিত্র্যময় স্তবকবন্ধ রচনার পথিকৃৎ হলেন মধুসূদন। বস্তুত মধুসূদনের ন্যায় স্তবক রচনার এত বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উনবিংশ

স্তবক রচনার

দৃষ্টান্ত

শতকের আর কোনও কবিই দেখাতে পারেন নি। হেমচন্দ্র অল্পকিছু স্তবক রচনার প্রয়াস করেছেন। বৃত্তসংহার কাব্য থেকে দুটি উদাহরণ দিয়েছি। এখানে অন্যান্য কাব্য থেকে আরও দু'একটি

দৃষ্টান্ত তুলছি।—

মিল

- (১) বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা ক'রে যেতে পারে নরক ভিতরে,
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।

কা

খা

খা

কা

[চিত্তবিকাশ ধনবান সা. প. সং. পৃ. ৩৭]

মিল

- (২) উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়,
একে একে ঝিকিঝিকি, শুভ্র আলো ঝিকিঝিকি,
ফুটিল নীলিমা কোলে, ফুটে ফুটে যেন দোলে—
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়।

কা

খা

গা

কা

[ছায়াময়ী দ্বিতীয় পল্লব সা. প. সং. পৃ. ১১]

মিল :

- (৩) কে যায় কে যায় অই উকিঝুকি চেয়ে ? কা
 হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট, খা
 তাম্বুলে তামাকুরস—রাঙা রাঙা ঠোট, খা
 কপালে টিপের ফোঁটা, খোপা বাঁধা চুল, গা
 কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল, গা
 বালিহারি কিবা শাটি দুক্লে বাহার, ঘা
 কালাপেড়ে, শান্তিপূরে, কল্মে চুড়িদার, ঘা
 অহঙ্কারে ফেটে পড়ে চলে যেন ধেয়ে, কা
 হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে ! কা

[কবিতাবলী বাঙালীর মেয়ে সা. স. সং. পৃ. ২২৩]

তৃতীয় উদাহরণে দেখা যায়, স্তবকের প্রথম পংক্তির সঙ্গে শেষ দুটি পংক্তির মিল রেখেছেন। সমগ্র কবিতাটির প্রত্যেক স্তবকের শেষ পংক্তিটি এক রেখেছেন। পংক্তিটি বার বার ফিরিয়ে এনে সমগ্র কবিতার মূল ধূয়াটি পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

লিপিগত হরফ এবং ধ্বনিগত উচ্চারণের সম্পর্কটি আলোচ্য যুগের কবিদের কাছে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়নি। ইতিপূর্বেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুক্তবর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে

উচ্চারণ- তার কিছু নিদর্শন মিলেছে। হেমচন্দ্রের রচনায় অন্যপ্রকারের
 সঙ্কোচনে নিদর্শন মিলেছে। তিনি যেখানে স্বরধ্বনির পৃথক দল-উচ্চারণ
 বন্ধনী ব্যবহারের বিলোপ করতে চেয়েছেন সেখানেই অতিরিক্ত দলটিকে বন্ধনীভুক্ত
 প্রাচীন রীতি করে ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

(১) স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট দুয়ের(ই) কাছে। [চিত্তবিকাশ, জন্মভূমি, পৃ. ৩০]

(২) হল বহু দিন আজ(ও) ভুলি নাই। [ঐ, কি সুখের দিন, পৃ. ৩৩]

(৩) সুখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন। [ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩]

রবীন্দ্রযুগের কবিতায় উচ্চারণ-সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে এমন লিপিগত বন্ধনী ব্যবহার বাহ্যল্য বিবেচিত হয়েছে।

||গ||

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

এ যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি হলেন, নবীনচন্দ্র সেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা হেমচন্দ্র যেমন সচেতনভাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত ও আকৃতিগত নানারূপ পরীক্ষা করেছেন, নবীনচন্দ্র ছন্দের আঙ্গিক সম্পর্কে ততটা সচেতন ছিলেন মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে এবং পর্ব-পদ গঠনে সচেতনভাবেই নতুন পরীক্ষা চালিয়েছেন;—হেমচন্দ্র-মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়াররীতির পাশে সংস্কৃত ছন্দ,

প্রাচীন যুগ-প্রভাবিত যতিপ্রাস্তিক একাবলী, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন;—এবং সে সম্পর্কে বৃত্তসংহার কাব্য ও দশমহাবিদ্যা কাব্যের ভূমিকায় আলোচনাও করেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এতটা সচেতন ছন্দ প্রয়োগের পরিচয় মেলে না। তবে সাবলীল ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনায় তিনি স্বভাবদত্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যতিপ্রাস্তিক পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ এবং প্রবহমান পয়ার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন; ভাবানুগামী ভাষার উপর তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। মধুসূদন পাশ্চাত্য ক্লাসিক আদর্শের ভাব ও ছন্দ পরিস্ফুট করতে গিয়ে ভাষাকে অনেকাংশে দূর হ, সচেতন প্রয়াসলব্ধ করে তুলেছিলেন। হেমচন্দ্র অতিমাত্রায় ছন্দ-সচেতন হতে গিয়ে অনেক সময় ভাষাকে কুণ্ঠিত করে তুলেছেন। নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ সে তুলনায় স্বচ্ছ ও সহজ,—স্বতোৎসারিত ধারায় প্রবাহিত। সংলাপধর্মী ছন্দোবদ্ধ রচনায় নবীনচন্দ্র কাব্য ও নাটকের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন বলা চলে।

১৮৭১ থেকে ১৯০৯ এই ৩৯ বৎসর কবির সাহিত্যজীবন ধরা যেতে পারে। তাঁর প্রথম কাব্য, ‘অবকাশ রঞ্জিনী’ (১ম ভাগ, প্রকাশ ১৮৭১) থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ অসম্পূর্ণ রচনা ‘অমৃতভ’ (১৯০৯) পর্যন্ত সকল কাব্যেই মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তেমনি সেই যুগের অন্যান্য কবিদের আদর্শে যতিপ্রাস্তিক বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলির প্রকাশকাল নিম্নরূপ অবকাশরঞ্জিনী ১ম ১৮৭১, ২য় ১৮৭৮; পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫; ভারত উদ্ধাস : ১৮৭৫; রঙ্গমতী ১৮৮০; রৈবতক ১৮৮৭; মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১৮৮৯; শ্রীমদ্ভাগবতগীতা : ১৮৮৯; ত্রিষ্ট : ১৮৯১; কুরুক্ষেত্র : ১৮৯৩; অমিতাভ : ১৮৯৫; প্রভাস ১৮৯৬; অমৃতভ (অসম্পূর্ণ) ১৯০৯।

অবকাশরঞ্জিনী কাব্যেই কবির বিচিত্র স্তবক রচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বেই মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা কাব্যে (ব্রজাঙ্গনা কাব্য) পদ, পংক্তি এবং মিলের বিচিত্র বিন্যাসে স্তবক রচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনী এবং পলাশির যুদ্ধ কাব্যে অনেকাংশে সেই রীতি অনুসরণে, স্তবক বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি করেছেন। এখানে অবকাশরঞ্জিনী থেকে দু-একটি স্তবকের উদাহরণ তুলছি।—

(১) সে মধু-সুখারে আজি পাষণ পরাণে,

(কি বলিব, হায় !)

অত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,

ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায় !

[অবকাশরঞ্জিনী, ২য় ভাগ, ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত প্রতিধ্বনি, উষা, নিকুঞ্জবনে কবিতাত্রয়ীর স্তবক গঠনের আদর্শ এখানে আংশিকভাবে নবীনচন্দ্র গ্রহণ করেছেন।

(২) জীবন, যৌবন, আশা, কীর্তি, ধন, মান,—

তৃণবৎ ঠেলি পায়,

আসিনু উন্মাদপ্রায়

যা'র কাছে, হায় ! তাঁর মন বৃষ্টিবারে,

সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে ?

[অবকাশরঞ্জিনী, ২য় ভাগ, কেন ভালবাসি]

এখানে কবি প্রথম দ্বিপদী পংক্তিটি মিলহীন রেখেছেন। পরবর্তী চৌপদীপংক্তির প্রথম দুইপদে মিল দিয়েছেন। চতুর্থ পদের সঙ্গে পরবর্তী দ্বিপদী পংক্তির দ্বিতীয় পদের মিল দিয়েছেন। এই স্তবকবন্ধেও মধুসূদনের প্রভাব রয়েছে।

‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্য পাঁচ সর্গে রচিত। একমাত্র ৪র্থ সর্গের যুদ্ধবর্ণনাংশ এবং ২য় ও ৩য় সর্গের কয়েকটি গীতে লেখক যতিপ্রাপ্তিক ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, সমগ্র কাব্যটিই প্রবহমান পয়ারবন্ধে, সমিল দশপংক্তিক স্তবকে রচিত।^৬ মিলক্রম হল, কথকথগঘগঘঙঙ। দশপংক্তির স্তবক ইংরেজি কাব্যে পাওয়া যায়। ম্যাথু আর্নোল্ড The Scholar Gipsy এবং Thyrsis কবিতায়, কথকথগঘগঘঙঙঘ—পংক্তিমিলে দশপংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন। টমাস মুর তার Sent From Gipsy কবিতায় কথকথগঘগঘঙঙঘ—পংক্তি মিলে দশপংক্তিক স্তবক রচনা করেছেন। নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনুমিত হয়। এখানে একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি,—

এই ত কলির সন্ধ্যা; প্রগাঢ় ভিমিরে

এখনো বদ্বের মুখ হয় নি আবৃত।

এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,

নয়ন না পালটিতে হবে অন্তর্হিত।

এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে,

অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল;

এইরূপে চিত্তামেষ, ভীমবেশ ধরে,

ঢাকিবে সমস্ত বঙ্গ। দৌরাভ্যা কেবল

গভীর জলদনাদে করিবে গর্জন;—

কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ?

[পলাশির যুদ্ধ ১ সর্গ ৩তম স্তবক]

নবীনচন্দ্র অনেক সময় স্তবকগঠনে তার ভাবগত মর্যাদা রক্ষা করেন নি। স্তবক একটি ভাবমণ্ডলকে ছন্দের পূর্ণতা দেবে এটিই অভিপ্রেত। কিন্তু নবীনচন্দ্র একাধিক ক্ষেত্রে স্তবকে ছন্দোবন্ধ (পংক্তিক্রম ও মিলক্রম) ঠিক রেখে ভাবকে স্তবকান্তরে প্রবাহিত করেছেন। যেমন একটি দশপংক্তিক স্তবকের শেষ দুটি পংক্তিতে লিখেছেন,—

৬। কবি দশপংক্তিক স্তবকবন্ধে প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন বটে, তবু অনেক সময় পংক্তিগুলি যতিপ্রাপ্তিক হয়ে পড়েছে, তাতে ভাবের দিক থেকে গতির তীব্রতা ও স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা কমে গেছে মনে হয়।

না জানি কি মহাশক্তি অস্তুরে আমার
 আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার
 এই অপূর্ণ বাক্যের অংশ পরবর্তী স্তবকের প্রথম পংক্তিতে এনে শেষ করেছেন,—
 চলিতেছি ইচ্ছাধীন পুতুলের প্রায়।

[পলাশির যুদ্ধ ২য় সর্গ ৩০ - ৩১ স্তবক]
 এমন আরও উদাহরণ আছে। ভাবমণ্ডল পূর্ণ না হওয়াতে এখানে স্তবকগঠনের উদ্দেশ্য
 অনেকাংশে বিফল হয়েছে।

ছন্দের শিল্পকলায় নবীনচন্দ্র বেশী সতর্ক ছিলেন না মনে হয়। সেই কারণেই চতুর্দশ
 মাত্রক পয়ার-বন্ধের মাঝে কদাচিত কখনও পনের মাত্রার পংক্তি অনধিকার প্রবেশলাভ
 করেছে। যেমন,—

বঙ্গদেশ তুচ্ছকথা; সমস্ত ভারতে
 বৃটিশের তেজোরাজি, বল অতঃপর
 কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারিবে জগতে
 নিবারিতে সিদ্ধুচ্ছাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর !

[পলাশির যুদ্ধ ১ম সর্গ ৫৪ স্তবক]
 এখানে তৃতীয় পংক্তিটিতে একমাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ মাত্রা এসেছে। কবি সতর্ক ছিলেন
 না বলেই এমনটি ঘটেছে। এমন অসতর্কতার আরও পরিচয় আছে। দশপংক্তিক (একটি
 বিশিষ্ট মিলক্রমের) স্তবকের মাঝে আকস্মিকভাবে মিলবিহীন একটি পংক্তির আবির্ভাব
 ঘটেছে। যেমন,—

যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
 হইতেছে দিন দিন, অদৃশ্যে বসিয়া
 যেকপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
 ভারত অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
 কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূর্ণিত।
 দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্রপতি
 হতেছে বিক্রমশালী, কিছুদিন আর
 মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত-ভূপতি
 অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার।
 সার্ষপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
 আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।

[পলাশির যুদ্ধ : ১ম সর্গ ৫৫ স্তবক]
 পলাশির যুদ্ধ কাব্যের ১ম সর্গে ৬৭টি স্তবক রচনা করেছেন। কদাচিত কোনও স্তবকের
 প্রথমে বা মাঝে সঙ্গোপনসূচক অতিপর্বিক শব্দগুচ্ছ হয়ত এসেছে। তাছাড়া, সর্বত্রই
 পূর্বোক্ত মিলের দশপংক্তিক স্তবকবন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম এই ৫৫

সংখ্যক স্তবকটি। এখানে মিলহীন অতিরিক্ত পঞ্চম পংক্তিটি এসে স্তবকে ১১টি পংক্তির বিন্যাস ঘটেছে।

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের ৪র্থ সর্গে, যুদ্ধ বর্ণনায় কবি দ্বিপদী (৮ ॥ ৬ I) ও চৌপদীর (৮ ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ ৬ I) মিশ্রস্তবক ব্যবহার করেছেন। সংলাপধর্মী উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে এখানে তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

“দাঁড়ারে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া রে যবন !

দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !

যদি ভঙ্গ দেও রণ,”—

গর্জিলা মোহনলাল,—নিকট শমন ।

“আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,

মনেতে জানিও স্থির,

কারো না থাকিবে শির,

সবাক্ষবে যাবে সবে শমন ভবন।”

[পলাশির যুদ্ধ ৪র্থ সর্গ ২৩-২৪ স্তবক]

এখানে বাক্য রচনায় বিদেশী প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ মধুসূদনের কাছ থেকেই নবীনচন্দ্র এ-রীতি গ্রহণ করেছেন।

পলাশির যুদ্ধ কাব্যে অযুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদল শব্দের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রবৃত্তে দ্বিমাত্রকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘মিরজাফর’ এবং ‘মুর্শিদাবাদ’ শব্দ দুটি কবি বহুবারই পাঁচ এবং ছয় মাত্রায় ব্যবহার করেছেন; অনেক ক্ষেত্রেই তার ফলে ছন্দ শিথিল হয়েছে। যেমন,—

(১) মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন;

সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন।

[পলাশির যুদ্ধ ৫ম সর্গ ৮ম স্তবক]

(২) রে মিরজাফর মত্ত কামিনীকৌশলে !—

[পলাশির যুদ্ধ ৫ম সর্গ ১০ স্তবক]

(৩) মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,

নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে।

[পলাশির যুদ্ধ ৫ম সর্গ ১ম স্তবক]

(৪) দিল্লী মুরশিদাবাদে, হইবে এখন

যবনের গৌরবের সমাধি ভবন

[ঐ, ৪র্থ সর্গ ২০ স্তবক]

এই শব্দ দুটির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বিরলদৃষ্ট হলেও, একেবারে নেই এমন নয়।

যেমন,—

- (১) এ বয়সে ষড়যন্ত্র দস্তে কি ভীষণ
পড়িলাম আমি শিশু ! বৃদ্ধ মিরজাফর
একই রক্ষক মম, ভক্ষক এখন !

[ঐ, ৩য় সর্গ ৩৩ স্তবক]

- (২) কল্পনে ! মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া।

[ঐ, ৫ম সর্গ ৪র্থ স্তবক]

পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই উচ্চারণ-শৈথিল্য কিছুটা কমে এলেও শব্দের মাঝে অযুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক ব্যবহার বহুলভাবেই ঘটেছে, দেখা যায়।

পলাশির যুদ্ধের পর কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য হিসাবে ‘ত্রয়ী’ মহাকাব্য নামে সুপরিচিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসের নাম করতে হয়। রৈবতকের ২০ সর্গ, কুরুক্ষেত্রের ১৭ সর্গ এবং প্রভাসের ১৩ সর্গ, — মোট পঞ্চাশ সর্গে, আনুমানিক ১৫,০০০ পংক্তিতে এই বিপুল মহাকাব্যটি কবি রচনা করেছেন। হেমচন্দ্র যেমন বৃহৎসংহার কাব্য রচনায় প্রবহমান পয়ারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ‘মিত্রাক্ষর’-বন্ধ ব্যবহার করেছেন, নবীনচন্দ্রও এ কাব্যে সেই রীতি গ্রহণ করেছেন। মিলবিহীন প্রবহমান পয়ার অনেকগুলি সর্গে ব্যবহার করলেও, সেই সঙ্গে ‘মিত্রাক্ষর’ দ্বিপদী (পয়ার, বর্ধিতপয়ার), ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন।

মধুসূদন, হেমচন্দ্রের তুলনায় নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য রচনায় একটি উল্লেখযোগ্য নতুনত্ব হল, তিনি প্রয়োজনমতো পাত্র-পাত্রীর মুখে নাট্যাঙ্গিককে সংলাপ বসিয়েছেন। রৈবতকের সমালোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন,—

“তোমার এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তুমি যেরূপ জলের মত চলাইয়াছ, আমার বিশ্বাস যে, এতদিনে নাটক লিখিবার ভাষা সৃষ্ট হইল। তজ্জন্য আমি তোমাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছি।”

(নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী আমার জীবন, রৈবতক কাব্য, ব. সা. প. সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১)

এই মন্তব্য কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সম্পর্কেও করা যেতে পারত। অবশ্য রৈবতকের (১৮৮৭) ছয় বৎসর পর কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), এবং আরও তিন বৎসর পর প্রভাস (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। রৈবতকের প্রত্যেক সর্গেই কোনও না কোনও অংশে নাট্য-আঙ্গিকের সংলাপ বসানো হয়েছে। কুরুক্ষেত্রেও তিনটি সর্গ বাদে, বাকী চৌদ্দটি সর্গে কোথাও না কোথাও নাট্যরীতির ছন্দোবদ্ধ সংলাপ রয়েছে। প্রভাসে, অপেক্ষাকৃত কম, সাতটি সর্গে অনুরূপ প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেখানে বিশুদ্ধ নাট্য-সংলাপের আঙ্গিক ব্যবহার করেননি,—সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সংলাপের আমেজ সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধ নাট্যসংলাপ থেকে কাব্যে ব্যবহৃত এই সংলাপে স্বভাবতই কিছু পার্থক্য রয়েছে। নাটক অভিনয়-মাধ্যমে শ্রোতার সম্মুখে পরিবেশন করতে হয়। সে কারণে

আকর্ষণ রক্ষার জন্য নাট্যকার পাত্র-পাত্রীর মুখে দীর্ঘতর সংলাপ না দেবারই চেষ্টা করেন। কাব্যে পাত্র-পাত্রীর বক্তব্য দীর্ঘ হলেও রসের দিক থেকে তেমন ক্ষতি হয় না। সে কারণেই রৈবতকে কবি কৃষ্ণের মুখে ৪০০ পংক্তিরও দীর্ঘ বিবৃতি (৭ম সর্গ) বসিয়েছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য সংলাপ ছোট ছোট বাক্যাংশে ভেঙে নাট্য সংলাপের মতোই ব্যবহার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

অসুর। শুনিয়াছ তুমি কৃষ্ণ। দূরন্ত কংসের
অত্যাচার?

আমি। শুনিয়াছি।

অসুর। এস তবে মিলি
শাদুলের রক্ততৃষা করি নিবারণ।

আমি। কংস মথুরার পতি; গো রক্ষক আমি,—
পতঙ্গ হিমাঙ্গি কাছে।

অসুর। যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয় বক্ষে, অসুর হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

আমি। অসহায় আমি!
অসুর। হইব সহায়। হবে সহায় তোমার
গোপজাতি যথা তথা শত সংখ্যাতীত.
সমগ্র মথুরাবাসী।

আমি। বিনা দেবকীর
অষ্টম গর্ভের পুত্র, শুনেছি, অসুর,
অবধ্য অন্যের কংস।

অসুর। কোথায় সে শিশু?

আমি। শুনিয়াছ, নাগরাজ বাসুকী আপনি
রাখিয়াছে লুকাইয়া।

অসুর। তার পুত্র আমি!

(রৈবতক ৭ম সর্গ)

ফাল্গুণীর কাছে কৃষ্ণ যে ৬৫০ পংক্তির দীর্ঘ পূর্বস্মৃতি (৭ম সর্গ) বর্ণনা করেছেন, তারই মধ্যে কৃষ্ণের এবং অসুরের এই কথোপকথনটিও নাট্য-আঙ্গিকে কবি কল্পনা করেছেন। এখানে নাটকের ‘action’-সমৃদ্ধ বিষয়বোধও চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য উদাহরণটি মিলবিহীন প্রবহমান পয়ারবন্ধে লিখিত। নবীনচন্দ্র সমিল ত্রিপদী এবং চৌপদী বন্ধেও নাট্যসংলাপ রচনা করেছেন। যেমন,—

(১) ত্রিপদী (৮॥৮॥১০।)

সখী। হেন রবি, পারাবার কোথায় মিলিবে আর
নাহি তবে এই ধরাতলে।

জর। আছে।

নখী। সত্যকথা,

জর। সত্য, অন্যথা সৃষ্টির তত্ত্ব

নিষ্ফল কি অবনী মণ্ডলে? (রৈবতক ৮ম সর্গ)

(২) চৌপদী (৮ ॥ ৮॥ ৮॥ ৬।), দ্বিপদী (৮ ॥ ৬।)

সত্য। সত্য আমি রাগিয়াছি—

কৃষ্ণ। তাত চক্ষু দেখিতেছি।

সত্য। আবার? কেবল ঠাট্টা?

কৃষ্ণ। দোহাই তোমার

কহ ছাড়িলাম ব্যঙ্গ,

আজি কেন এই রঙ্গ?

সত্য। ভদ্রার বিবাহ দিব।

কৃষ্ণ। একথা? কি জ্বালা

আমি ভেবেছিন্ আজ কিস্কিন্দার পালা

কেন হলো এই সাধ?

সত্য। পাছে সাধে মম বাদ?

কৃষ্ণ। তাহা ত বাতাসে মাত্র পারে সাধিবারে;

তাতেও আদর্শ তুমি, অন্যে কি তা পারে?

(রৈবতক ১১ সর্গ)

এখানে ত্রিপদী এবং চৌপদী দুটি ছন্দোবন্ধেই সংলাপ ছোট ছোট বাক্যাংশে বিভক্ত হবার ফলে পদযতির উদ্দেশ্য সর্বাংশ সফল হতে পারে নি। ভাব এবং ছন্দের বিরোধ ঘটেছে।

যেখানে নাট্যাঙ্গিকের মতো পাত্রপাত্রীর নাম ছন্দোবন্ধের বাইরে রাখেন নি সেখানেও অনেক ক্ষেত্রেই রচনারীতি সংলাপ প্রধান হয়ে উঠেছে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ‘ত্রয়ী’ মহাকাব্যে ছড়িয়ে আছে। এখানে একটি উদাহরণ তুলছি,—

দু’হাতে সাপটি কেশরাশি ভার

ধরিলা মহিষী পুনঃ,—

“ছাড়! দিদি ছাড়! উহ বড় লাগে,

সত্য বলিতেছি শুন।”

মুগ্ধ হল কেশ, ধীরে সুলোচনা

বলিল ঈষৎ হাসি—

“সত্য সত্য দিদি, কাঁদিতেছিলাম,
 কান্না বড় ভালবাসি।”
 “কিসের রোদন?”— “মধুর প্রেমের।”
 “কার প্রেম?” “নাথ মম।”
 বালবিধবার নাথ কে আবার?”
 “হৃদয়েতে যেইজন।”
 “অসম্ভব কথা, বালিকা হৃদয়ে
 কেমনে রহিবে ছায়া?”
 “নাহি ছিল দিদি। কিন্তু তুমি হায়।
 জান না প্রেমের মায়া।”

(রৈবতক ৫ম সর্গ)

নবীনচন্দ্র, পয়ার ব্যতীত, ৮||৮ এবং ১০||১০ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী পংক্তি রচনা করেছেন। ১০||১০ মাত্রা-পংক্তির এখানে একটি উদাহরণ তুলছি।—

দুর্বাসা আমার নহে পতি,
 আমি পত্নী নহি দুর্বাসার
 উভয় উভয়ে মাত্র দেখি—
 উভয়ের সেতু আকাশ্চার।

(কুরুক্ষেত্র ৭ম সর্গ)

আরও দীর্ঘ ৬।৬।৬।৬। মাত্রাভাগের (১২ মাত্রা-পদভাগের) ২৪ মাত্রার দ্বিপদী পংক্তিও রচনা করেছেন,—

দেখি ক্ষত্রিয়েরা নেত্রে অনিমেষ
 অর্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর,
 রথ-চক্র মত মহা রণ-চক্র

করিছে চালন কি বিস্ময়কর! (প্রভাস ৫ম সর্গ)

নবীনচন্দ্র মিল-বিন্যাসকে ছন্দের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করতেন না বলে মনে হয়। সমিল প্রবহমান পয়ারে তিনি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—

“নীরেন্দ্র প্রতিম নীল নির্মল আকাশ,
 শরতের শেষ মেঘে উর্ধ্ব তরঙ্গিত,—
 নীরব, নিষ্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত,—
 চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
 গর্জিতেছে, রক্তসিক্ত মহাভারতের
 মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সাক্ষ্য রবিকরে
 দেখাইছে, রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার
 নীরব নিষ্পন্দ ভীত বিশ্বচরাচরে।

দুই প্রান্তে সংখ্যাতিত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত* বেলা যেন রণ-পয়োধির।”—

(৯ম সর্গ কুরুক্ষেত্র)

আলোচ্য সর্গে কবি একপংক্তি অন্তর মিল (কথকথ...) রেখে পংক্তি-অনুচ্ছেদের (verse-paragraph) শেষ দুটি পংক্তিতে এক মিল রেখেছেন। কিন্তু সেখানেও মাঝে মাঝে মিলবিহীন পংক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই অংশে প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম পংক্তি মিলহীন।^৭ অন্যদিকে শব্দের ধ্বনি-অনুপ্রাস কিন্তু এই অংশে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নীরেন্দ্র—নীল—নির্মল, নীরব-নিষ্পন্দ, তরঙ্গিত-ভীত-উদ্বেলিত, চতুরঙ্গে-রণরঙ্গে, প্রভৃতি শব্দের অনুপ্রাস-সৌন্দর্য মধুসূদনের রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিল সম্পর্কে কবির শৈথিল্যের আরও পরিচয় পাওয়া যায়, পংক্তিপ্রান্তিক দুর্বল মিলের (assonance) দৃষ্টান্তে। কথকথ পংক্ত্যান্তর মিলে স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—

একটি রমণী মূর্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ষণনয়ন,—
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,

শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্বিত বদন। (পলাশির যুদ্ধ, ১ম সর্গ, ১২ স্তবক)

‘নীরবে’ এবং ‘পটে’ শব্দ দুটিতে মিল দিয়েছেন। ব্যঞ্জনধ্বনির মিল না রেখে একমাত্র স্বরধ্বনি (এ-কার) দিয়ে এই মিলের প্রচেষ্টা নিতান্তই দুর্বল মিলের পরিচায়ক। এমনভাবে তিনি স্বচ্ছন্দে পান ও কাম, শরীর ও তাহার, আমি ও আনি শব্দে মিল দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

নবীনচন্দ্র মিশ্রবৃত্ত রীতির পদ গঠনে ও শব্দগ্রন্থনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। ‘বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ — জোড়ে গাঁথ জোড়’—শব্দ গ্রন্থনের এ রীতির কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটেছে। আটমাত্রার পদে ৩+২+৩ মাত্রার শব্দবিন্যাস-দৃষ্টান্ত খুবই কম। প্রবহমান পয়ারের পদগঠনে বিজোড় মাত্রায় যতিও প্রায় দেননি বলা চলে। একমাত্র শব্দের মাঝে অযুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদলের উচ্চারণে বিশিষ্টতা এনেছেন, সে বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভাষা ব্যবহারে কবি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রয়োজন মতো চলিত ভাষার ব্যবহার ছন্দোবদ্ধ সংলাপে বাকধর্মী স্বাভাবিকতা এনে দিয়েছে। তবে ভাষা কোথাও কোথাও গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট হয়েছে। ছন্দের ধ্বনি-গাষ্ঠীর্ঘও মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করেছেন।^৮ তবু নবীনচন্দ্রের কাব্য পাঠেই মিশ্রবৃত্ত ছন্দের বাকধর্মী প্রকাশশক্তি সম্পর্কে নতুনভাবে আমরা সচেতন হতে পারি। মধুসূদন এ ছন্দের গভীর মহিমাযুক্ত ক্লাসিক রীতির প্রকাশভঙ্গি

৭। অবশ্য চেষ্টা করে হয়ত পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম পংক্তিতে কিছুটা দুর্বল মিল দেখানো চলে,— কিন্তু কবির সে বিষয়ে আগ্রহ ছিল না বলেই মনে হয়।

৮। কুরুক্ষেত্র ৮ম সর্গ দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছিলেন, নবীনচন্দ্র আটপৌরে দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাও কত সাবলীলভাবে, সংলাপের আঙ্গিকে এ-ছন্দে ফুটিয়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। বাংলা ছন্দে তারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

।।ঘ।।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে বিহারীলাল বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন।—কিন্তু সে তুলনায় ছন্দবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁর মৌলিক দান সেরূপ উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সঙ্গীতশতক’ ১৮৬২-তে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ কবিতা ‘সাধের আসন’ ১৮৮৯-তে লিখিত হয়েছে। তার কাব্যগুলির মধ্যে বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), বাউলবিংশতি (১৮৮৭) এবং সাধের আসন (১৮৮৯) সমধিক খ্যাত। এ যুগের সমস্ত কবিই মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে কাব্যের প্রধান বাহন করেছিলেন। বিহারীলালও তার ব্যতিক্রম করেন নি। গীতিকবি বিহারীলাল যেমন মধুসূদনের আদর্শে মহাকাব্য লেখার চেষ্টা করেন নি, তেমনি মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারও ব্যবহার করেন নি। মিত্রাক্ষর পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পূর্বপ্রচলিত ছন্দোবদ্ধই ব্যবহার করেছেন।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিহারীলাল যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব পরিহার করে,— ছয় মাত্রার পর্বে (বারো বা এগার মাত্রার পদে) ললিত ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এই যুগে কোনও কবিই কলাবৃত্ত রীতির যুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ-রহস্য সঠিকভাবে ধরতে পারেননি ;— বিকল্প পথ হিসেবে, সম্ভবতঃ যুক্তবর্ণ পরিহার করে, ছন্দে কোমল ধ্বনি-আবেদন আনতে চেষ্টা করতেন। ইতিপূর্বে হেমচন্দ্র ‘বীরবাহু’ কাব্যে (১৮৬৪) এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে করেছেন।^৯ বিহারীলাল বঙ্গসুন্দরী কাব্যে সেই প্রয়াস আরও বেশী করেছেন বলা চলে। এখানে দু-একটি উদাহরণ তুলছি,—

(১) বিকশিত নীল-কমল আনন,

বিলোচন নীল-কমল হাসে;

আলো করে নীল-কমল-বরণ,

পুরেছে ভুবন কমল-বাসে।

(বঙ্গসুন্দরী ৩য় সর্গ, ২য় স্তবক)

৯। হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্য থেকে অনুরূপ একটি উদাহরণ তুলছি।—

অতিমনোহর শিশুশশধর, হৃদয় উপর রাখিয়া।

চপল নয়না, পলাতে বাসনা, দেখিছে ললনা চাহিয়া।।

হেরে হয় মনে, যেন বা মদনে, হৃদয়ে যতনে ধরিসা।

যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,

এক দুঃখী

(হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী)

ব. সা.প. সং পৃ ৬২)

এখানে বিবিধ বর্ণের ধ্বনি-অনুপ্রাসের সঙ্গে ‘ল’-ধ্বনির বহুল ব্যবহারে ছন্দের কোমলতা যেন বেশী পরিস্ফুট হয়েছে।

(২) পূর্ণিমা-চারু-চাঁদের কিরণ,

নিশার নীহার, উষার আলো,

প্রভাতের ধীর শীতল পবন,

গগনের নব নীরদমালা।

(বঙ্গসুন্দরী ২য় সর্গ, ২য় স্তবক)

(৩) ভাবুক যুবক জন-কলপনা

নবীন ললনা মুরতি ধরি;

বাড়াইল কিরে মনের বাসনা,

বিরলে তাহারে ছলনা করি।

(বঙ্গসুন্দরী ৩য় সর্গ ৫২ স্তবক)

এখানে বিশিষ্ট উচ্চারণ আনবার উদ্দেশ্যে কবি পূর্ণিমা, কল্পনা, মুর্তি—যুক্তবর্ণ-বিশিষ্ট শব্দগুলিকে ভেঙে বিযুক্ত বর্ণে লিখেছেন। ছন্দে যুক্তবর্ণ পরিহার করবার এই কৃত্রিম প্রয়াস সে যুগে অন্যান্য কবির রচনাতেও লক্ষ করা যায়।

বিহারীলাল যুক্তবর্ণ-বিরল ললিত ছন্দে তিনমাত্রার বিজোড় শব্দ ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্যে এ-ছন্দের কিছু নিদর্শন মেলে, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছন্দের মাত্রা’ প্রবন্ধে (ছন্দ : ২য় সং পৃ ৯৭ দ্র) এই তিন মাত্রার শব্দ-বিন্যাসে যে ‘অস্থির গতিবেগ’ প্রকাশ পায়,—ছন্দে এক চমৎকার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে, সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।^{১০} বিহারীলাল বঙ্গসুন্দরী এবং ‘দেবরাণী’ কাব্যে বহু স্তবকেই এই চঞ্চল অস্থির তিনমাত্রক শব্দের গতিবেগ প্রকাশ করেছেন; পূর্বাঙ্কিত উদাহরণে তার আংশিক পরিচয় রয়েছে। এখানে আরও দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

(১) শ্যামল বরণ বিমল আকাশ,

হৃদয় তোমার অমরাবতী;

নয়নে কমলা করেন নিবাস,

আননে কোমলা ভারতী সতী।

(বঙ্গসুন্দরী ৩য় সর্গ, ১৩ স্তবক)

১০। তিনমাত্রার চাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দ’ গ্রন্থের ‘ছন্দের অর্থ’ এবং ‘ছন্দের প্রকৃতি’ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। বিহারীলালের মতো রবীন্দ্রনাথও যে এক সময়ে তিনমাত্রার ছন্দে যুক্তবর্ণ বর্জন করতেন তার উল্লেখ করে লিখেছেন,—

“সেকালে অক্ষর-গণতি করা তিনমাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছতো। সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হোলো তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম।” (ছন্দ পৃ ১২৫)

কলাবৃত্তে এই যুক্তবর্ণের এক ব্যবহাররীতি বিহারীলাল বা সে যুগের অন্য কবির ধরতে পারেননি বলেই ছন্দের এই ‘অতি লালিত্য দোষ’ কাটাবার পথ খুঁজে পাননি।

- (২) সূঠাম শরীর পেলব-লতিকা,
 আনত সুষমা কুসুম ভরে,
 চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা,
 লুটায় পড়েছে ধরণী পরে।

(বঙ্গসুন্দরী ৬ষ্ঠ সর্গ ৩য় স্তবক)

স্তবক গঠন সম্পর্কে হেমচন্দ্র, ও নবীনচন্দ্রের মতো বিহারীলালও কিছুটা সচেতন ছিলেন। তবে মধুসূদনের বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্য তাঁদের কারও রচনায়ই লক্ষিত হয় না। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদীর মিশ্র স্তবক বিহারীলাল যথেষ্ট রচনা করেছেন। এখানে মিশ্র একপদী ও চৌপদী বন্ধের একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

ধায় তিমি ধরার সাগরে,
 মহাশূন্যে অনন্ত অগ্নরে,
 ধেয়ে ধেয়ে অবিরত,
 বল হে দেখিলে কত,
 মহান বাড়বানল প্রজ্জ্বলিছে দিগদিগন্তরে।

(ধুমকেতু ৩য় স্তবক)

মধুসূদন তাঁর শেষ দিকের কোনও কোনও কবিতায় মুক্তকাভাসিত স্তবক রচনা করেছেন, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। বিহারীলাল তার সর্বশেষ কাব্য ‘সাধের আসনে’র স্তবক রচনায় আংশিক মুক্তকাশ্রয়ী ছোট বড়ো পদ-পংক্তি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মধুসূদনের মতো দূরান্তিত মিলের অতটা বৈচিত্র্য এখানে নেই, এবং পদবন্ধের সুনির্দিষ্টতা এখানে বেশী। তবু মিলবিন্যাসে এবং পদ-পংক্তি গঠনে বিহারীলাল মাঝে মাঝে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। যেমন,—

- (১) আহা সেই স্বর্গের নিবাসী,
 চলে গেছে!
 রেখে গেছে
 সুহৃদ জনের মনে
 যাবার সময় সেই প্রাণফাটা বিষাদের হাসি!

(সাধের আসন ৯ম সর্গ, ১৩ স্তবক)

- (২) চাহিয়া উহার পানে
 কি যেন বাজিল প্রাণে,
 কতই স্মরণ করি স্মৃতিপটে ফোটেনা,
 অকারণ কি কারণ
 হৃদে কেঁদে ওঠে মন।

যে কি স্বপ্ন দেখে

চমকিয়া ঘুম থেকে

উঠিলাম ;

ভাবিলাম ;

হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না !

(সাধের আসন ৬ষ্ঠ সর্গ ৩য় স্তবক)

আলোচ্য যুগের অন্যান্য কবিদের মতো বিহারীলালও অনেক সময় বর্ণ (letter) গুণে ছন্দ্রের মাত্রা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তারই ফলে (এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় উচ্চারণ-বিশিষ্টতা আনবার জন্যে) স্বাভাবিক সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের যুক্তবর্ণের বানানকে বিযুক্তবর্ণে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপযোগী করে লিখেছেন। যেমন,—

মুখখানি ঢল ঢল

আলুথালু কুনতল

(সারদামঙ্গল ১ম সর্গ, ২য় স্তবক)

‘কুনতল’ শব্দকে কবি চারমাত্রায় ব্যবহার করতে চান বলেই ‘কুনতল’ চারবর্ণে সাজিয়ে লিখেছেন। আবার আর একটা উদাহরণে দেখি,—

বাণীর ভিতরে দেখি বিষম কারখানা

(বন্ধুবিরোগ ১ম সর্গ)

‘কারখানা’ চার বর্ণের শব্দকে লেখক ‘কারখানা’ লিখেছেন তিনমাত্রার হিসেব রেখে। অবশ্য সর্বত্র কবি এমন কৃত্রিম পথে চলেননি। অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—

(১) দ্বিতীয়া তেমন নয় বিষম কারখানা,

রূপে গর্বে ডবগা ছুঁড়ী ফেটে আটখানা।

(বন্ধুবিরোগ ২য় সর্গ)

(২) ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,

হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।

(বন্ধুবিরোগ ১ম সর্গ)

এখানে ‘কারখানা’ তিনমাত্রা, ‘ডবগাছুঁড়ী’ চারমাত্রা এবং ‘গামছাখানি’ চারমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে—, কিন্তু কবি যথাক্রমে চার, পাঁচ এবং পাঁচ বর্ণে শব্দগুলির বানান রেখেছেন। শব্দের মাত্রা এবং বর্ণ সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক তখনো পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট হয়নি, এখানে তারই সাক্ষ্য মিলছে।

সংস্কৃতের আদর্শে মুক্তদলের গুরু দ্বিমাত্রক উচ্চারণ বিহারীলাল কবিতা বা গানে কোথাও করেননি বলা যায়। তবে ‘নীল’ শব্দটির গুরু তিনমাত্রা উচ্চারণ কদাচিৎ দু একবার এনেছেন। যেমন,—

(১) হাসি হাসি ইন্দ্রধনু নীলগগনে ভায়, (সাধের আসন ১ম সর্গ, ৩য় স্তবক)

(২) নীল আকাশ মাঝে আধশশী শোভা পায় (কবিতা ও সঙ্গীত, গোধূলী)

(৩) নীল বসনে কিরে ঢেকেছে আননখানি। (”)

তবে এমন দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় একান্ত বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে।

গানে লৌকিক
দলবৃত্ত ব্যবহার

দলবৃত্ত ছন্দ এ-যুগে লৌকিক গীতিছন্দ-রূপেই বেশী
প্রচলিত ছিল। বিহারীলালও কদাচিৎ দু-একটি গানে এ-ছন্দ ব্যবহার
করেছেন। অতিপর্বিক স্পন্দন-সমৃদ্ধ একটি বাউল গান থেকে

উদাহরণ তুলছি।—

আর বাঁচিনে।
সে বিনে আর বাঁচিনে।
আমি যে কুলবালা এ কি জ্বালা,
জ্বলতে হল রাত্তি দিনে।
আমার দিবানিশি প্রাণ উদাসী
কঁদিয়ে আকুল,
সে জন ডুমুরের ফুল,
দেখি তার রূপরাশি মধুর হাসি,
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বাঁগে!

(বাউল বিংশতি, ১৫ সংখ্যক গান)

এ-যুগের অন্যান্য কবিদের বৈশিষ্ট্য এবং দোষ-গুণ বিহারীলালের ছন্দেও প্রকাশ
পেয়েছে দেখা গেল। রুদ্রদল-বহুল মিশ্রবৃত্ত ছন্দে বিহারীলালও উচ্চারণ-দৃঢ়তা এবং
ধ্বনির ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে হেম-নবীনের ন্যায়, তিনি মধুসূদন-প্রবর্তিত
প্রবহমান পয়ার রচনারীতি গ্রহণ করেননি। বরং কবিরকু দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো বিল্লিষ্ট
উচ্চারণে ছন্দে কোমলতা আনতে প্রয়াসী হয়েছেন। কলাবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্য তখনো
অজানা থাকায় এ রীতিতে পূর্ণাঙ্গভাবে সফল হতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের
আদর্শ গ্রহণ করতে মাঝে মাঝে রুদ্রদলের দ্বিমাত্রক ব্যবহারে সফল হয়েছেন, বিহারীলাল
ততটাও সফল হতে পারেননি। তবুও যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ বর্জন করে ছন্দে তিনি কোমলতা
আনতে চেষ্টা করেছেন। বিহারীলাল যুক্তবর্ণ-বিরল তিনমাত্রার শব্দে গ্রন্থিত ছন্দে যে
কোমলতা আনতে সফল হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তার উল্লেখ করেছেন (আধুনিক
সাহিত্য, বিহারীলাল প্রবন্ধ দৃষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)।

আলোচ্য যুগে নবছন্দ প্রবর্তকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজকৃষ্ণ
একাধারে কবি, নাট্যকার এবং সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কিছু পূর্বেই, তবে
কালীপ্রসন্ন সিংহের এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে, তিনি
১৮৭৮-৭৯ সালে (১২৮৫ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত ‘নিভৃত নিবাস’
কাব্যে মূলক
ব্যবহার
কাব্যে ‘ভান্ডা অমিত্রাক্ষর’ নামে মূলক (অমিল) ছন্দ ব্যবহার করেন।

‘হরধনুর্ভঙ্গ’ নাটকটিতেও তিনি মুক্তক সংলাপ দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের মুক্তক ছন্দে লিখিত প্রথম নাটক ‘রাবণবধ’ প্রকাশের বছরেই, ১৮৮১-৮২ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)-এর কিছু আগে বা পরে, হরধনুর্ভঙ্গ নাটকটি প্রকাশিত হয়। কবির ‘নিভৃত নিবাস’ কাব্যে ব্যবহৃত মুক্তক-নিদর্শন (তাঁর নিজের উদ্ধৃত পাঠ থেকে) এখানে তুলছি,—

প্রিয়তমে ! — মনোরমে !

উঠ উঠ, বেলা হল;

উঠ না হে,

উঠ না হে,

থাক শুয়ে থাক শুয়ে।

আমি কি নির্দয়,

হায়,

জাগাই তোমায় তাই,

থাক শুয়ে,

উঠিও না,

খুলনা খুলনা আঁখি.....

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫০) রাজকৃষ্ণ রায় ৩য় সং ১৩৫৫, পৃ. ৪৬)

কালীপ্রসন্ন সিংহের

এখানে তুলনাত্মক ভাবে বাংলা কবিতায় প্রথম

হতোমপ্যাঁচার নক্সা :

ব্যবহৃত মুক্তকের নিদর্শনটিও উদ্ধৃত করা যেতে পারে।^{১১} ‘হতোম-

মুক্তক ব্যবহার

প্যাঁচার নক্সা’য় (১৮৬২) ২য় ভাগের সূচনাতেই কালীপ্রসন্ন

লিখেছেন,—

হে সজ্জন ! স্বভাবের সুনির্মল পটে,

রহস্য রসের রঙ্গে,

চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে।

কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনামতে

যার যা অধিক আছে ‘তিরস্কার’ কিম্বা ‘পুরস্কার’

দিও তাহা মোরে—বহুমান্নে লব শির পাতি।

(হতোমপ্যাঁচার নক্সা সা. প. সং. দ্র.)

কালীপ্রসন্নের গভীর ভাবপ্রকাশক সর্বোচ্চ আঠারো মাত্রক পংক্তি-পরিসরের এই

হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের

মুক্তকের তুলনায় রাজকৃষ্ণের মুক্তক অনেক বেশী কোমল, ললিত

মুক্তক সংলাপ

ভাবপ্রকাশের উপযোগী। এ অংশে কবি সর্বোচ্চ মাত্র আট মাত্রার

পংক্তি ব্যবহার করেছেন। হরধনুর্ভঙ্গে রাজকৃষ্ণ সর্বোচ্চ চোদ্দমাত্রার

পংক্তি ব্যবহার করেছেন।

১১। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬২-তে ‘হতোমপ্যাঁচার নক্সায়’ সম্ভবত সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে মুক্তক ব্যবহার করেন। হেমচন্দ্র ১৮৬৮-তে প্রকাশিত ‘নলিনীবসন্ত নাটকে’ মুক্তক ব্যবহার করেছেন।

এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
 অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন
 সূর্য করে বিদগ্ধ ধরণী।
 ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
 রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
 প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাই আর
 মুহুঁত হইয়া যেন আকুল হৃদয়া।
 বহিছে গঙ্গার বারি ধীরি ধীরি গতি,
 নির্জন প্রদেশে।
 তরী নাহি একখানি
 কেমনে হবেন পার রাম রঘুমণি
 লক্ষ্মণের সনে?
 অয়ি গঙ্গে পতিত পাবনি।
 কর 'পার ভবসিন্ধু-পার কাণ্ডারীরে
 'স্বাময়ি!

(সা. সা. চ রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ. ৪৬-৪৭)

এখানে ছন্দে ভাবের প্রবহমানতা এলেও ভাবোদ্ধৃত ছোট-বড় পংক্তি গ্রন্থনে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য আনতে পারেননি। নাট্যসংলাপের উপযোগী ভাবের উত্থানপতন এ ছন্দে যে সার্থক ভাবেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব রাজকৃষ্ণ সে বিষয়ে অভিনেতা বা শ্রোতাকে নিঃসংশয় করতে পারেননি। সেই প্রতিভার পরিচয় প্রথম গিরিশচন্দ্রই দিয়েছেন।

হরধনুর্ভঙ্গের ভূমিকা
 মুক্তক সম্পর্কে
 নাট্যকারের মন্তব্য

রাজকৃষ্ণ নাটকের সংলাপে মুক্তক ব্যবহার সম্পর্কে
 হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন তার প্রাসঙ্গিক
 অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

রাজকৃষ্ণ রায়
 মধুসূদনের মেঘনাদবধ
 কাব্যের নাট্যরূপ ও
 অভিনয় দেখে মুক্তক
 সংলাপ ব্যবহারে
 উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

“এদেশে কবির মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা
 ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দশাঙ্করে মিত্রাক্ষরিক
 পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের
 অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই চতুর্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে
 উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাট্যাকারে সজ্জিত হইয়া,
 সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই
 বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয়

নাই।^{১২} সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেক্রপ শুনিয়াছিলাম তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগ আমরাও মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারীদের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দশাঙ্করাত্রক অমিত্রাঙ্কর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাকভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেমন মাইকেলের অমিত্রাঙ্কর ছন্দ হইতে নূতন আর এক প্রকার অমিত্রাঙ্কর ছন্দ প্রসূত হইত। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া আমি একসময়ে বঙ্গরঙ্গভূমির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ নটচূড়ামণি বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, এক্রপ ছন্দের নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি বলেন যে, “এখন মাইকেলের অমিত্রাঙ্করই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছুকাল পরে রঙ্গভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।” ইংলণ্ডেও এক্রপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়াছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনয় হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক “ভাঙ্গা অমিত্রাঙ্কর ছন্দ” বাঙ্গালায় হইত কিনা সন্দেহ।

(সা. সা. চ. (৫০) রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ. ৪৫)

১২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ ‘মধুসূদন’ গ্রন্থাবলী’র ভূমিকা থেকে (৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৫৮, পৃ. ১৮) জানা যায়, — “১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বঙ্গরঙ্গভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটারে) মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়। অমিত্রাঙ্কর ছন্দের কথাবার্তায় আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্বে অভিনীত হয় নাই।— ইহার দুই বৎসর পরে, — ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ্ লইয়া, উহার ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করিয়া, স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে অভিনয় শুরু করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক মেঘনাদবধ পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। মহাকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাঙ্কর ছন্দে নাট্যকাব্যে গ্রথিত করিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। ১৮৮৯ সনের জানুয়ারী মাসে এই নাট্যরূপ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুস্তকাকারে (পৃ. ৬৮) প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।”

এখানে লক্ষণীয়, পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহৃত মধুসূদনের প্রবহমান সংলাপ প্রসঙ্গে ‘রাজকৃষ্ণ রায়’ অথবা ‘মধুসূদন গ্রন্থাবলী’র সম্পাদকদ্বয় কেউই উল্লেখ করেননি।

পৃথকভাবে হলেও রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ — উভয়েই মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ থেকে ‘মুক্তক’ সংলাপে নাটক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কাব্যে এ-ছন্দ রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্বেই ব্যবহার করেন।— নাটকে প্রায় একই সময়ে দুজনে ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্র এ ছন্দের সম্ভাব্য শক্তির স্বকান পেয়েছিলেন বলেই বহুসংখ্যক নাটকে মুক্তক সংলাপের সার্থক প্রয়োগ করেন।

রাজকৃষ্ণও নিভৃত নিবাস কাব্য এবং হরধনুর্ভঙ্গ নাটক ছাড়া, রামের বনবাস (আগষ্ট ১৮৮২), যদুবংশ ধবংস (মার্চ ১৮৮৪), তরণীসেনবধ (জুলাই ১৮৮৪),— এই তিনটি নাটকেও মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

রাজকৃষ্ণের পদ্য
পৌণ্ডলিক
পদ্য-গদ্য
(গদ্য কবিতার
ছন্দ)

বাংলা ছন্দের নতুন রীতি উদ্ভাবনে রাজকৃষ্ণ রায় আরও কিছু কিছু সচেতন প্রয়াস করেছেন। ১৮৮৪-জুলাইতে তিনি ‘বর্ষার মেঘ’ নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন, এবং এই রচনারীতির নাম দেন ‘পদ্য পৌণ্ডলিক পদ্য-গদ্য’। পাদটিকায় মন্তব্য করেন,—

যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল পদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌণ্ডলিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

(আর্যদর্শন, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৭৬ পাদটিকা)

এখানে রচনাটি থেকে ‘পদ্যপৌণ্ডলিক পদ্য-গদ্য’র নমুনা-স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

আকাশ নীল — অনন্ত নীল,
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিকশোভিনী দিগন্তনার অঞ্জলি হ’তে
ধীরে ধীরে বায়ু স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ
সে কি বৃহৎ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তন্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,

আমি তাই।

আমি আকাশ কোলে

ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে

‘নাই’ বলিলেই হয়।

অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—

মহান কে?

তা কি জানিনা?— ঈশ্বর।

একই কথা — যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

[বর্ষার মেঘ (পদ্যপৌণ্ডলিক পদ্য-গদ্য), আর্য্যদর্শন,

শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৭৫]

রাজকৃষ্ণ রায় ‘গদ্য পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব’ উপলব্ধি করেই গদ্যভাষাকে ‘পদ্য পৌণ্ডলিক প্রণালীতে’ ছোট বড়ো ভাবগুচ্ছের আকারে সাজিয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইতিপূর্বেই (১৮৬১) অনুরূপ পংক্তিভাগে সাজিয়ে গদ্য কবিতা লিখেছেন, আমরা পূর্বে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তবে শব্দ-গ্রন্থন বা পংক্তিভাগ সেখানে সর্বাংশে সার্থক হয়নি, বাক্যগুলিতে ভাবস্পন্দও সুস্পষ্ট নয়। সে তুলনায় রাজকৃষ্ণ রায় অনেক বেশী সফল হয়েছেন। সুতরাং ‘পদ্য পৌণ্ডলিক’ গদ্য কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁকেই পথিকৃতির সম্মান দেওয়া যেতে পারে। গদ্য কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে (১৮৭৮) তাঁর কবিতাপুস্তকে (মেঘ, বৃষ্টি এবং খদ্যোত) প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ‘পদ্যপৌণ্ডলিক প্রণালী’তে সেখানে সাজিয়ে দেননি। এই পদ্যের মতো ছোটবড়ো পংক্তিভাগে সাজাতে রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রথম দ্বিধা ছিল। সে কারণেই ‘লিপিকায়’ (১৯২২) গদ্য-কবিতা বিশুদ্ধ গদ্য অনুচ্ছেদের আকারে সাজিয়েছিলেন।— এই দ্বিধা ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কাটিয়ে উঠেছেন।— এদিক থেকে রাজকৃষ্ণ রায় উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই গদ্য-কবিতার ‘পদ্যপৌণ্ডলিক’ বিন্যাসে যে সাহস দেখিয়েছেন তার গুরুত্ব কম নয়। রাজকৃষ্ণ রায় গদ্যকবিতায় বঙ্কিমী রীতির সাধু গদ্যভাষাই ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রায় একই রীতিতে কয়েকবছর পূর্বেই মেঘ, বৃষ্টি, খদ্যোত নামে তিনটি ‘গদ্য-পদ্য’ রচনা করেছিলেন।^{১৩} এবং কৈফিয়ৎ স্রুপ ভূমিকায় লিখেছিলেন,

১৩। বঙ্কিমের গদ্যকবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

চল নামি — আষাঢ় আসিয়াছে — চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যুপবিন্দু একা একজনে যুথিকা কলির শুদ্ধ মুখও ধুইতে পারি না — মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি — মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না — অর্থপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে — চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এক বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

‘এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা-আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা একপ্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য-কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

[গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক, বিজ্ঞাপন,
বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১)

২য় ভাগ, পৃ. ১০৩৬]

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যে গদ্যের উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে ‘পদ্য পৌণ্ডরিক’ রীতিতে ছোট বড়ো ভাব-গ্রন্থিত পংক্তিতে তাকে সাজাবার কথা ভাবেননি। রাজকৃষ্ণ রায় প্রথম সেই কাজ করলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের (বা বঙ্কিমচন্দ্রের) গদ্য কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার একটি প্রধান পার্থক্য হল, ভাষা বিষয়ক। রাজকৃষ্ণ নাটকে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও গদ্য কবিতায় সাধুরীতির গদ্যই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাকধর্মের আরও কাছাকাছি এগিয়ে গদ্যকবিতায় চলিত ভাষাই প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য উভয়ের এই রচনার মধ্যে ১৮৮৪ থেকে ১৯৩২ (‘পুনশ্চের’ প্রকাশকাল)^{১৪} — প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের ব্যবধান রয়েছে।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো সবে নামি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুল প্রসূতি! আয় মা দিম্বাগুল ব্যাপিনি; সৌর তেজঃ সংহারিণি! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সূচাকুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, নেচে নেচে, হেসে হেসে ভূতলে নামি।

[গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ ১৩৬১)

২য় ভাগ, পৃ. ৯৬২]

১৪। লিপিকার প্রকাশ কাল ধরলে ১৮৮৪ থেকে ১৯২২ অর্থাৎ ৩৭।৩৮ বছর। পুনশ্চের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “(লিপিকার) বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি বোধকরি ভীকুতাই তার কারণ।” — এই দ্বিধা অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বেই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাটিয়ে উঠেছিলেন, সেটি লক্ষণীয়।

রাজকৃষ্ণ রায় চলিত ভাষাতেই ছন্দের আর একটি নবরীতি চালাতে চেষ্টা করেছেন
 রাজকৃষ্ণের ১৮৮৪-তে প্রকাশিত তাঁর ‘বিক্রমাদিত্য’ নাটকে। এ ছন্দের
 আভিনয়িক নামকরণ করেছেন, ‘আভিনয়িক পদ্যপঞ্জিক গদ্য’। এখানে লেখক
 পদ্য-পঞ্জিক পূর্বোক্ত ‘বর্ষার মেঘ’ কবিতায় ব্যবহৃত ‘পদ্য পৌঞ্জিক পদ্য-
 গদ্য গদ্যের’ তুলনায় পঞ্জিকের আরও সম মাপের করতে চেষ্টা

করেছেন। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি,—

বিক্রম। ভর্তৃহরির ধন্য সংসার বিরাগ!

এই বিরাগের ফল “অমরুশতক” গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে রমণীপ্রেমের কুটিল চিত্র

এবং বিবেকের মূর্তি সুন্দর চিত্রিত হয়েছে।

যার লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা করেছে

তাকে পুনর্বীর সংসারী করা দুঃসাধ্য।

অনেক বল্লেম, অনেক বুঝলেম,

কিন্তু স্রোত কোন মতেই ফিরলো না।

থাক, আর বিরক্ত করব না।

মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে ভর্তৃহরিকে দেখে যাবো।

এখন আর এখানে বিলম্ব করবো না,

মহিষীকে বলে এসেছি শীঘ্রই ফিরবো

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো,

মহিষী না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন।

(সা. সা. চ. (৫০) রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ ৫১)

এ সম্পর্কে

কবির মন্তব্য

এখানেও লেখক পদ গঠনে কোনও সুনির্দিষ্ট মাত্রাভিভাগ
 রাখেননি। নাট্যসংলাপে এরূপ ছোট ছোট বাক্যগঠনের কারণ স্বরূপ
 তিনি বলেছেন,—

“সম্প্রতি এই ‘রাজা বিক্রমাদিত্য’ নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্তে নূতন ধরনের
 গদ্যে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পঞ্জিক গদ্য। দুই একস্থলে আভিনয়িক
 পদ্যচ্ছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্যন্ত এরূপ
 পদ্য-পঞ্জিক গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য
 যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যাস
 হইবার সুবিধার জন্য এই নতুন ধরনের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায়
 প্রচলিত ধরনের গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা
 সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগধৃতি বা বাকপূর্তির (Prompting) পক্ষে গদ্যপঞ্জিক
 যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য পঞ্জিকিতে তেমন হইতে
 পারে না।”

[সা. সা. চ (৫০), রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ. ৫০-৫১]

রাজকৃষ্ণ রায় নিজে একাধারে নাট্যকার, কবি এবং সুদক্ষ নট ছিলেন। অভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই অভিনেতা এবং প্রস্পটার-এর পক্ষে কি ধরনের বাক্যবিন্যাসে সুবিধা হতে পারে সে দিক থেকে চিন্তা করেই নতুনতর বাক্যগঠনের চেষ্টা করেছেন। তবে ভাবের আবেগ, এমন সুনিরূপিত মাত্রার হিসাব-বিহীন, ছোট ছোট প্রায় সম-মাপের পংক্তিতে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। লেখক সম্ভবতঃ মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের তুলনায় আরও কিছুটা ভাবমুক্তির আশায় এই পংক্তিবিন্যাস-রীতি চালাতে চেষ্টা করেছিলেন;— কিন্তু আবেগবিহীন, সীমায়িত পংক্তিশৃঙ্খলে রচিত বাক্যগুলি তাঁর উদ্দেশ্যকে তেমন সফল হতে দেয়নি। তবু বাংলাছন্দের নতুন পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই বাকধর্মী চলিত ভাষা নিয়ে ভাব-মুক্তি প্রচেষ্টার মূল্য রয়েছে।

রাজকৃষ্ণ ১৮৭২-এ মধুসূদনের আদর্শে ‘বঙ্গভূষণ’ নামে একশত বাঙালী মনীষীর সম্পর্কে একশতটি সনেট লিখেছিলেন। সনেটগুলি মুখ্যত পেত্রার্কী বা সেকসপীয়ারের সনেট-মিলে, মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ারবন্ধে রচিত। তাছাড়া, লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতে কয়েকটি কাহিনীধর্মী দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন। ছন্দের ক্ষেত্রে এত বিচিত্রমুখী পরীক্ষা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে এই স্নায়ু কবি সেযুগে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেননি।

॥ ছ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

এই যুগে নাট্যসংলাপের উপযোগী মুক্তক রচনায় গিরিশচন্দ্রের দান উল্লেখযোগ্য।^{১২} ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭-এ তিনি

১৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৭৫-মার্চে বেঙ্গল থিয়েটারে ‘মেঘনাদবধ’-এর প্রথম নাট্যাভিনয় হয়েছিল। সে অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বলেই মধুসূদনের কাব্যের মূল ভাষাছন্দ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে পুনর্বীর নাট্যরূপ দিয়ে, তিনি স্বয়ং মেঘনাদ ও রামের দ্বৈত ভূমিকায় ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। উক্ত নাটকের তিনি যে ‘প্রস্তাবনা’ কবিতাকারে রচনা করেছিলেন তার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

সবিনয়ে কহে ভূতা, নহে বারাদনা-নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জন ; —
রুণুধনু নাহি আর, কঙ্কণের ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন!
তুলিয়া গভীর তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য-পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু ;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায়, যতি-বিভাগের-হেতু।
হলে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন অপরাধে যতি কবির বর্জন?

মেঘনাদ-বধ কাব্যটির নাট্যরূপ দেন। সংলাপ প্রবহমান পয়ারেই রেখেছিলেন। নাটকটি এই সময়ে তিনি স্নায় নাট্যদলের সহায়তায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় রাজকৃষ্ণ রায়কে মুক্তকধর্মী কাব্য ও নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, পূর্বে উল্লেখ করেছি। গিরিশচন্দ্রও মেঘনাদবধ কাব্যের এই নাট্যরূপান্তর এবং অভিনয় করতে গিয়ে মুক্তক-সংলাপধর্মী নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৮২, জুলাইতে (ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় ৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮) লিখিত ‘রাবণবধ’ নাটকে তিনি সর্বপ্রথম মুক্তক-সংলাপ ব্যবহার করেন। এরপর থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বহু নাটকেই মুক্তক-সংলাপ ব্যবহার করেছেন।^{১২}

পদ্মাবতী নাটক রচনাকালে (১৮৫৯) মধুসূদন নাট্যসংলাপে ক্রমান্বয়ে, ধীরে ধীরে প্রবহমান ছন্দ ব্যবহারের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে স্বচ্ছন্দ প্রবহমান বাক্যাংশে গদ্য-বাক্যভঙ্গির আভাসযুক্ত, কিন্তু কাব্যছন্দের সংগীত-মাধুর্যময়, অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন একটি চিঠিতে এ কথাও স্পষ্টভাবে

পাষণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যত্নে বলিদান,
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন!
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য আমি করিব এখন!

(মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ)-এর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা)

গিরিশের মুক্তক-
সংলাপে
লিখিত নাটক

১৬। গিরিশচন্দ্রের মুক্তক-সংলাপ ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি (বঙ্গাব্দ রচনাকাল-সহ) হল
(১) রাবণ বধ ১২৮৮, (২) সীতার বনবাস ১২৮৮, (৩) অতিমন্যু বধ : ১২৮৮, (৪) সীতার বিবাহ : ১২৮৯, (৫) রামের বনবাস : ১২৮৯, (৬) সীতার হরণ ১২৮৯, (৭) দক্ষযজ্ঞ ১২৯০, (৮) নল-দময়ন্তী ১২৯০, (৯) বৃষকেতু ১২৯১, (১০) প্রহ্লাদ চরিত্র ১২৯১, (১১) বিশ্বমঙ্গল ১২৯৩, (১২) বুদ্ধদেব চরিত ১২৯৪, (১৩) রূপসনাতন : ১২৯৪, (১৪) নসীরাম : ১২৯৫, (১৫) ন্যাকবেথ : ১২৯৯ (১৬) জনা ১৩০০, (১৭) কালাপাহাড় : ১৩০৩, (১৮) পাণ্ডবগৌরব : ১৩০৬, (১৯) মণি হরণ : ১৩০৭, (২০) ভ্রান্তি : ১৩০৯, (২১) সংনাম : ১৩১১, (২২) সিরাজদৌল্লা : ১৩১২, (২৩) মীরকাসিম : ১৩১৩, (২৪) শঙ্করাচার্য ১৩১৬, (২৫) অশোক : ১৩১৭, (২৬) তপোবল : ১৩১৮, (২৭) রাণা প্রতাপ অসমাপ্ত — ১৩১০।

এ ছাড়া তিনি একাধিক নাটকে সমিল ও স্নায় প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে মুকুলমঞ্জরা (১২৯৯), কালাপাহাড় (১৩০৩), চণ্ড (১২৯৭) নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। ‘মিত্রাক্ষর’ বিভিন্ন রীতির ছন্দও তিনি কয়েকটি নাটক-গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। ‘পারস্যপ্রস্ন’ গীতিনাট্যটি (১৩০৪) এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ করেন যে, বাংলা পয়ারকে ইংরেজি heroic measure-এর বিকল্পরূপে গণ্য করা চলে।— এই মাপ কাব্য রচনার পক্ষে উপযুক্ত হলেও ‘too long and pompous for dramatic purposes’। নাট্যসংলাপের উপযোগী ছন্দ পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, তবে পয়ার-পংক্তিমাপই প্রাধান্য পেয়েছে,—মুক্তকের আভাস থাকলেও স্পষ্টরূপ তখনো ফুটে ওঠেনি। সে বিষয়ে ইতিপূর্বে (পৃ ৯০-৯২) বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মধুসূদন নাট্যসংলাপে ব্যবহৃত প্রবহমান পয়ারে যথাসম্ভব ধ্বনি-অলঙ্কারএবং দুরূহ বাক্যগঠনরীতি পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কারণ সাধারণ শ্রোতার অনভ্যস্ততার জন্য ভাষা ও ছন্দের জটিলতা অপছন্দ করবে। মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে যে মুক্তকাক্ষরী প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন তার ভাষা কাব্যশুলিতে ব্যবহৃত প্রবহমান পয়ারের তুলনায় অনেক সহজ।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য একাধিক লেখক নাটকে মুক্তক ব্যবহার করেছেন। হেমচন্দ্রের ‘নলিনীবসন্ত’ নাটক থেকে, রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘হরধনুর্ভঙ্গ’ নাটক থেকে ইতিপূর্বে আমরা মুক্তকের নিদর্শন তুলেছি। ডাঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ ৩৪৪-৪৫ দ্র) ব্রজমোহন রায়ের ‘দানব বিজয়’ নাটক থেকেও উদাহরণ তুলেছেন। তবে একথা স্বীকার্য, এঁদের কারও রচনায় মুক্তক সংলাপ তেমন সফল হতে পারেনি। সে তুলনায় গিরিশচন্দ্রের চব্বিশ বৎসর পূর্বে লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হতোমপ্যাচার নক্সা’ (১৮৬২)-তে মাত্র ছয়টি মুক্তক পংক্তি রচনায় উৎকর্ষের

গিরিশের উপর
মধুসূদনের এবং
কালীপ্রসন্নের
প্রভাব

বিশেষ পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গিরিশচন্দ্র তাঁর লক্ষণ বর্জন নাটকের উৎসর্গপত্রে এই কাব্যাংশটিই দ্বিষৎ পরিবর্তিত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘গিরিশচন্দ্র’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, গিরিশচন্দ্র কালীপ্রসন্নের এই

রচনাটির আদর্শে তাঁর নাটকে ‘ভাঙা অমিত্রাক্ষর’ (মুক্তক) ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন। অবশ্য মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ নাট্যরূপান্তর করে অভিনয় করতে গিয়েও যে গিরিশ প্রবহমান ছন্দের অন্তঃশক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন আমাদের সে অনুমানের পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। ব্রজমোহন রায়ের ‘দানববিজয়’ নাটক বা রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘নিভৃত নিবাস’ কাব্য ও ‘হরধনুর্ভঙ্গ’ নাটক গিরিশের মুক্তক সংলাপধর্মী প্রথম নাটক ‘রাবণবধের’ পূর্ববর্তী রচনা হলেও, গিরিশচন্দ্রের রচনায় তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রভাব পড়েছিল মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাঁরা কাব্য বা নাটকে মুক্তক ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর ‘তারকার আত্মহত্যা’ নামক সমিল মুক্তক ছন্দে লিখিত কবিতাটি ‘রাবণবধ’ নাটক অভিনয়ের পূর্বেই (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৮২ মে-জুন) ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মধুসূদন কাব্যরচনার উপযোগী যে ‘heroic measure’ অর্থাৎ প্রবহমান পয়ারবন্ধ রচনা করেছিলেন, নাট্যসংলাপের পক্ষে সেটি ‘too long and pompous’ বলে মন্তব্য করেছিলেন।^{১৭} প্রবহমান পয়ারের চোদ্দমাত্রার সুনির্দিষ্ট পংক্তিতে রচিত Verse-paragraph বা পংক্তি-অনুচ্ছেদে একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ ছন্দের বুননি রচিত হয়। নাট্যসংলাপে ভাবের উত্থান-পতনে (অর্থাৎ action সৃষ্টিতে) এমন দৃঢ় ছন্দবন্ধ সর্বাংশে উপযুক্ত নয়। ছোট-বড়ো ভাবধর্মী বাক্যাংশে অসমান পংক্তিবিন্যাসের সাহায্যে নাট্যকার এই ‘action’ অনেক সহজে ফুটিয়ে তুলতে সফল হন। মধুসূদনের বীরাস্ত্রনা কাব্যের অন্তর্গত ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ পত্রিকার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ নাটকটির ভাবগত মিল রয়েছে। এখানে উক্ত কাব্য এবং নাটক থেকে পাশাপাশি কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাতে কাব্যের উপযোগী দৃঢ়বন্ধ প্রবহমান পয়ারের পংক্তি-অনুচ্ছেদের সঙ্গে নাট্যসংলাপের উপযোগী মূল্লকের পার্থক্য উপলব্ধি করা যাবে।

মধুসূদন তাঁর কাব্যে লিখেছেন,—

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নতকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু — মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে!—

যাও চলি, মহাবল যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র কুলবালা আমি ক্ষত্রকুলবধু ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়াপ্রাণ জাহ্নবীর জলে
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে ! যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি
নরেশ্বর, “কোথা জনা” বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা” বলি।

(বীরাস্ত্রনা কাব্য নীলধ্বজের প্রতি জনা)

দুটি পংক্তি-অনুচ্ছেদেই কবি ভাবপ্রবহমানতার সঙ্গে পংক্তি-পরিসরের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিতে ভাবের পূর্ণতা রাখতে হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ নাটক থেকে এবারে উদ্ধৃত করছি,—

জনা। শান্ত !

অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি?

পুত্রশোকাতুরা

উন্মাদিনী করালিনী আমি।

শান্ত? শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?

ধরা যদি পশে রসাতলে,

কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা, নিভে দিনকর,

প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি’

জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,

অষ্টবজ্র চলে, বিশ্বচূর্ণ পরমাণুরূপে,

শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা!

যাই রাজা কাল বয়ে যায়,

প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,

চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।

(জনা ৪।৩)

ভাবাত্মক বাক্যাংশকে নাট্যকার এখানে কিছুটা বেশী স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন। পংক্তিমাাত্রা দুই থেকে ষোলমাাত্রা পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। গিরিশচন্দ্র সাধারণত পংক্তির সর্বোচ্চ মাপ চৌদ্দমাত্রাই রেখেছেন। তবে প্রয়োজন মতো ষোল আঠারো বা বিশ মাত্রার পংক্তিও ব্যবহার করেছেন।

নাটকে ‘গৈরিশ ছন্দ’ প্রবর্তন প্রসঙ্গে প্রবীণ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,—

পল্লীর দর্শকরা সুর চায়, ধ্বনি চায় গান চায়, নাচ চায়। ভারতের গৌরবময় যুগে ভারতীয় নাট্যরসিকরাও তাই চাইতেন। ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজরা তা চাইতেন না, কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজরা চাইতেন। মাইকেল, দীনবন্ধু, এমনকি রামনারায়ণও এলিজাবেথীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করলেন না। গিরিশ বুঝলেন তাই করতে হবে, কাব্যকে নাটকের বাহন করতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে মাইকেল তখন ছন্দকে মুক্তি দিয়ে নূতন ছন্দ গড়ে গেছেন। কাব্যসৃষ্টিতে তিনি সেই ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নাটক সৃষ্টিতে করেননি। তাঁর অমিত্রাক্ষর মিলটনের অনুসরণে সৃষ্ট, শেকস্পীয়রের অনুসরণে নয়। মাইকেল অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু গিরিশ বুঝলেন মাইকেলকে অনুসরণ করে তাঁর ছন্দে নাটককে রূপ দেওয়া যাবে না। শেকস্পীয়রের

ছন্দকেও বাংলায় রূপ দেওয়া গিরিশ সহজসাধ্য বলে মনে করলেন না। আর শুধু ত রূপ দিলেই হবে না, ছন্দের আবেদন দিয়ে শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করতেও হবে। একটা সিন্থিসিসের প্রয়োজন গিরিশ অনুভব করলেন। জন্মলাভ করল গৈরিশ ছন্দ। অনেক দূরূহ বিষয় ওই ছন্দের সহায়তায় তিনি বর্ণাঢ্য করে তুললেন। বাঙালীর অন্তর যে ছন্দে নেচে উঠত তারই অনুরূপ ছন্দ তিনি ব্যবহার করলেন।

(বাংলার নাটক ও নাট্যশালা শচীন সেনগুপ্ত পৃ ১৩)

সমালোচক দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষভাবে নাট্যশালা ও নাটক রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তাঁর এই মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি এখানে কার্যতই উল্লেখ করেছেন, এ ছন্দ সেকস্পীয়রের ‘Blank-verse’ ছন্দ নয়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দও নয়। বাঙালীর অন্তর যে ছন্দে নেচে উঠত তার সঙ্গে প্রবহমান পয়ারের মিশ্রণ ঘটিয়ে গৈরিশছন্দ রচিত হয়েছে। অনুমিত হয়, শচীন সেনগুপ্ত এখানে ‘ধ্বনি-অনুপ্রাস’ মূলক ছন্দের কথা বলতে চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ মুক্তক-সংলাপে শব্দের অনুপ্রাস বহু পরিমাণে রেখেছেন। অনেক সময় পংক্তি-প্রান্তিক শিথিল মিলও এসে পড়েছে। অনুপ্রাস-মিলে অভ্যস্ত বাঙালী শ্রোতার প্রত্যাশাবোধকে তিনি অনেকাংশে তৃপ্ত করেছেন; যে কোনও মুক্তক-সংলাপধর্মী নাটক থেকেই তার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। এখানে একটি নিদর্শন তুলছি।—

সরমা।

পূর্বে নৃপবর,

ব্যথিত হলেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে।...

এবে যেন শিক্ষার কারণ,

শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,

অবিচল কটাক্ষ ঈক্ষণ করে।

অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ

পুরুষ উচিত নহে আগ্রহ কখন,

মুঞ্চচিত নহে সুরাপানে।

আসক্তি বিহীন

কামিনীর গর্ব হয় লীন,

শত নারী ঈর্ষাহীন প্রভাবে রাজার।

লয়ে কুলবতী গোপিনী যুবতী,

শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,

নারীসনে বিহার রাজায়।

জনে জনে মামি পরাজয়

ঈর্ষা নেত্রে না চায় যুবতী

পরম্পর প্রতি,

পূর্ণ মনোঃস্থ সবো রাজার সেবায়। (শঙ্করাচার্য ৪।৪)

গিরিশচন্দ্র একাধিক নাটকে প্রবহমান পয়ার-সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পয়ারবন্ধের পংক্তিরচনা সর্বত্র সফল হয়নি। অনেক সময় পংক্তি-প্রান্তিক লঘু বা লঘুতর যতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন।^{১৮} তিনি কোন কোন নাটকে সমিল প্রবহমান পয়ার রীতিতে সংলাপ দিয়েছেন।^{১৯} নাট্যসংলাপে বিচিত্র বন্ধের দলবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। প্রধানত স্ত্রীচরিত্রে বা নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে লঘু ভাব পরিস্ফুটনে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন।^{২০} নাট্যসংলাপে চলিত গদ্য উচ্চারণের স্বাভাবিকতা আনতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র দু-একস্থানে দলমাত্রার-উচ্চারণে কিছুটা শৈথিল্য এনেছেন। যেমন,—

আয়াসা। একি অনাসৃষ্টি,

গায়ে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি,

এমন গুষ্টিছাড়া ছেলে কি আর হবে।

যেটি মানা করবে,

সেটি আগে ধরবে,

বারে বারে মিনসে কত সবে।

মেনে পীর, হয়েছে বড় উজির,

তাইত তাকে নবাব হকুম দিলে;

আনলে বাদী,

নবাব করবে সাদি,

হতচ্ছাড়া ছোঁড়া তারে নিলে।

চারিদিকে দুশমন

ছোট উজীর নয় যেমন, তেমন,

নবাবকে কি আর বলতে বাকী করবে!

পড়লে নবাবের রাগে,

জল খায় গরু বাঘে,

সব্বাইকে মেরে ছোঁড়া মরবে।

(পারস্য প্রসূন ১।৩)

এ সংলাপে মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত উভয় রীতির উচ্চারণগত মিশ্রণ ঘটেছে। ভাষা যথাসম্ভব অনুপ্রাসধর্মী করেছেন।

গীতিনাট্যগুলিতে গিরিশচন্দ্র দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী মিলের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। লৌকিক গীতিছন্দের মতো সে ছন্দেও বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর নাটকে বহুসংখ্যক গান রয়েছে। কোনও কোনও গানে সংস্কৃত-প্রভাবিত গুরু উচ্চারণ রেখেছেন। গিরিশচন্দ্র কিছু গীতিকবিতাও লিখেছিলেন। ১৩১৮, আশ্বিনে ‘প্রতিধ্বনি’ নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ-সকল কবিতায় মিশ্রবৃত্ত (মিত্রাক্ষর) এবং লৌকিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অনেক কবিতায় শব্দক বিন্যাস করেছেন। কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-রহস্য এ-যুগের অধিকাংশ কবির মতো গিরিশচন্দ্রও ধরতে পারেননি।

১৮। নাট্যকারের ‘কালাপাহাড়’ নাটক এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১৯। ‘মুকুল মুঞ্জরা’ নাটকটি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২০। সীতাহরণ (১।২), ম্যাকবেথ (১।১), মুকুলমুঞ্জরা (১।৩) নাটক দ্রষ্টব্য।

॥ জ ॥

রবীন্দ্রনাথ (মানসী-পূর্ব পর্ব ১৮৯০ পর্যন্ত)

আলোচ্য যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ‘মানসী’ (১৮৯০)-পূর্ববর্তী কাব্য এবং
কৈশোর ও প্রথম ছন্দোবদ্ধ নাটকগুলি এই যুগ-পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। কবিতার
যৌবনের রচনা মূল্যবিচারের দিক থেকে এই প্রস্তুতিপর্বের অধিকাংশ রচনা কবি
নিজেই অপ্রকাশযোগ্য বলে গণ্য করেছিলেন। তবে ছন্দের বিবর্তনের

দিক থেকে তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেকগুলি রচনারই গুরুত্ব রয়েছে।

কবির জীবনী পাঠে জানা যায়, মাত্র সাত বছর বয়সে ভাগিনেয় জ্যোতিপ্রকাশের
কাছে তিনি চোদ্দমাত্রার পয়ার রচনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের,
অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় ‘দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা’ পরিচয়ে তাঁর প্রথম
কবিতা ‘অভিলাষ’ প্রকাশিত হয়। কবিতাটি হেমচন্দ্রের রচনাদর্শে যতিপ্রাস্তিক পয়ারে
(মিলহীন), চতুষ্পংক্তিক দীর্ঘ ৩৯টি শ্লোকবন্ধে রচিত।^{১১}

রবীন্দ্রনাথের এই যুগের ছন্দোবদ্ধ রচনার মধ্যে ম্যাকবেথ অনুবাদের অংশবিশেষ,^{১২}
তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বালক বয়সের কয়েকটি রচনা, ‘হিন্দুমেলার
উপহার’ কবিতাটি (হেমচন্দ্রের ‘বাজরে শিক্ষা বাজ্ এইরবে’ সঙ্গীতের
আদর্শে লিখিত), বনফুল, কবি-কাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,
হেমচন্দ্রের প্রভাব শৈশব সঙ্গীত, ভগ্নহৃদয়, বাম্বিকী প্রতিভা, কালমৃগয়া, সন্ধ্যাসংগীত,
প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, এবং কড়ি ও কোমলের নাম
করা যেতে পারে।^{১৩}

-
- এই যুগের রবীন্দ্র রচনাবলীর তালিকা
- ২১। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রজীবনী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১ম খণ্ড
২য় সংস্করণ পৃ ৪০।
- ২২। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ (১৮৮০), আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত।
- ২৩। এই যুগে রচিত কবির ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল
নিম্নরূপ — বনফুল (এবং ‘প্রলাপ’) ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৮৭৫-৭৬) জ্ঞানাস্কুর
পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। কবিকাহিনী ১২৮৪ বঙ্গাব্দের, কার্তিকমাসে
(১৮৭৭ অক্টোবর) লিখিত এবং ওই বৎসরে পৌষ-চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে
প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।
‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র বেশীরভাগ কবিতা কবির ১৬ বছর বয়সের
রচনা, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪-৮৫)। শৈশব
সংগীত : রচনা ১২৮৪ আশ্বিনে এবং প্রথম আংশিক ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ
১২৮৫-তে, পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ। এ গ্রন্থে কবির ১০
থেকে ১৮ বছরের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, কবি ভূমিকায়
জানিয়েছেন।
ভগ্নহৃদয় নাট্যকাব্য : ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১-৮২) গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

সমগ্র ঊনবিংশ শতকেই বাংলা কাব্যের মুখ্য বাহনরূপে মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের রচনায় এই ছন্দোবীতিরই বহল ও বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত যতিপ্রান্তিক সমিল পয়ার-মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার ত্রিপদী-চৌপদী ছাড়াও যতিপ্রান্তিক মিলহীন পয়ার (হেমচন্দ্রের আদর্শে রচিত), প্রবহমান পয়ার (কাব্যে ও নাটকে ব্যবহৃত), ষোল, (চা||চা||), আঠার (চা||১০||) এবং বিশ (১০||১০||) মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী, হ্রস্ব এবং দীর্ঘ পংক্তিমাপের মুক্তকাভাসিত ছন্দোবন্ধ^{১৪}, বিচিত্র পদ-পংক্তিমাপে বিন্যস্ত স্ববকবন্ধ ইত্যাদি রচনায় তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই ভাবমুক্তির ও ধ্বনি-অলঙ্করণের নানা পরীক্ষা করেছেন।

বান্ধিকী প্রতিভা ১২৮৭ বঙ্গাব্দে, ফাল্গুনে (১৮৮১) প্রকাশিত।

কালমৃগয়া গীতিনাট্য : ১২৮৯ বঙ্গাব্দ : অগ্রহায়ণে (১৮৮২) প্রকাশিত।

সন্ধ্যাসঙ্গীত ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮২) প্রকাশিত।

প্রভাত সঙ্গীত : ১২৯০ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩) প্রকাশিত।

ছবি ও গান ১২৯০ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪) প্রকাশিত।

প্রবৃত্তির প্রতিশোধ ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪) প্রকাশিত।

নলিনী ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬-৮৭) প্রকাশিত।

কড়ি ও কোমল ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬) প্রকাশিত।

কবির বহুশ্রুত মিলখাতা, স্টেটস ডায়েরী এবং মালতীপুথি নামক তিনটি সাহিত্য-খসড়া খাতার তৃতীয়টি অর্থাৎ মালতীপুথি খাতাটি রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথমখণ্ডে, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কবির পাঠ্যভঙ্গীমূলক সংস্কৃত ও ইংরেজি নানা রচনার পদ্যানুবাদ, পৃথিরাজের পরাজয় (কাব্যকাহিনী), রক্তচন্দ্র (কাব্যনাটিকা), শৈশবসংগীত, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, তানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের কিছু কিছু অংশের প্রাথমিক খসড়া-নিদর্শন মিলছে। এগুলি কবির ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৪ এর মধ্যে লিখিত কবিতা-গান-নাটকের নিদর্শন বলা যেতে পারে। ছন্দের দিক থেকে এ রচনাসমূহে আলোচ্য যুগের সব বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়।

২৪ সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি কবির বিশ বৎসর বয়সের রচনা।

মুক্তকের

আভাস

অধিকাংশ কবিতাই ১২৮৮-তে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতাটিতে (সন্ধ্যা) মুক্তকের ক্ষীণ আভাস প্রকাশ পায়। যেমন,—
অয়ি সন্ধ্যো,

অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,

কেশ এলাইয়া

মৃদু মৃদু একি কথা কহিস আপন মনে

গান গেয়ে গেয়ে,

নিখিলের মুখপানে চেয়ে।

চোখে লাগে ঘুমঘোর,

প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।

হৃদয়ের অতি দূর দূরান্তরে

মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে

www.amarboi.com

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার পর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই আবার বাংলা সনেট লিখতে শুরু করেন। সতের বছর বয়সে তিনি দান্তে এবং পেত্রার্কাসম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তাঁদের সনেটের অনুবাদ করেছিলেন। ১২৮৫ ভাদ্র-সনেট রচনা আশ্বিন (১৮৭৮) সংখ্যার ভারতীতে কবির সেই সনেট-অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পেত্রার্কাসম্পর্কে তিনি কথকথ, গঘগঘ, গুচগুচ, ছছ—শেকস্পীয়রের এই সনেটমিল দিয়েছিলেন।^{২৫} যতিপ্রান্তিক পয়ারবন্ধে

উদাসী প্রবাসী যেন

তোর সাথে তোরি গান করে।

(র. র. ১ম খণ্ড সঙ্ক্যাসংগীত সঙ্ক্যা পৃ. ১)

এরপর তৃতীয় কবিতা ‘তারকার আত্মহত্যা’য় লিখলেন,

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে

ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,

একেবারে উন্মাদের পারা।

চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া

অবাক হইয়া

এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে

মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া। (এ তারকার আত্মহত্যা পৃ. ৬)

এখানে মুক্তকের ক্রম পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘মানসী’ কাব্যে (১৮৯০) এই ছন্দই আরও পরিণত হয়ে ‘নিষ্ফল কামনা’র নয় সার্থক কবিতার জন্ম দিয়েছে।

কিশোরকালে লিখিত

পেত্রার্কীয় আদর্শের

সনেট

২৫। রবীন্দ্রনাথের কিশোরকালের রচনার (এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত কবির

প্রথম সনেট) নিদর্শন-হিসাবে পেত্রার্কের অনুবাদ সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন

সুখঋতু অবসানে গাহিছিস গীত!

ফুরাইছে গ্রীষ্মঋতু ফুরাইছে দিন

আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!

ওরে বিহঙ্গম তুই দুখ-গান গাস

যদি জানিতিস কি যে দহিছে এ-প্রাণ

তাহলে এ বক্ষে আসি করিতিস বাস

এর সাথে মিশাতিস বিষাদের গান।

কিন্তু জানি না তোর কিসের বিষাদ,

ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,

হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,

কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!

সুখ দুঃখ চিন্তা আশ যা’ কিছু অতীত,

তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত।

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৭২)

সনেট রচনা করেছিলেন। কড়ি ও কোমলে কবি ৫৮টি সনেট লিখেছেন। তার মধ্যে বিনুনী মিলের (Interlace rhyme) বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। তিনি এখানে ৪০টি সনেটেই শেষ দুটি পংক্তিতে এক মিল দিয়েছেন। এটা পেন্তাক্সি রীতি-বিরোধী। ১৪টি সনেটে তিনি পূর্বোক্ত শেকসপীয়রীয় আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ফরাসী সনেটের মিলবিন্যাস-রীতি ইতালীয় সনেট থেকে পৃথক। সেখানে চার পংক্তির দুটি স্তবকের পর একটি দ্বিপংক্তিক মিলবন্ধ (couplet) দিয়ে তারপর আবার চতুষ্পংক্তিক একটি স্তবক বসানো হয়। এই ফরাসী রীতিতে রবীন্দ্রনাথ ‘কড়ি ও কোমলে’র তিনটি সনেট (চরণ, হাসি, চিরদিন-৩) রচনা করেছেন। তার মধ্যে ‘চরণ’ কবিতাটির স্তবক-বিভাগে মিল কথকথ, গথগথ ঘঘ, খঙখঙ) বিশুদ্ধ ফরাসী রীতি প্রকাশ পেয়েছে। উত্তরকালে এই রীতিতে প্রমথ চৌধুরী অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন। কড়ি ও কোমলের তিনটি সনেটে (যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিকমিলন, সন্ধ্যার বিদায়) রবীন্দ্রনাথ বিশমাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। কোথাও ৮||৬||৬|| (যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন), কোথাও ১০||১০|| মাত্রায় যতি (সন্ধ্যার বিদায়) রেখেছেন। পাঁচটি সনেটে ৮||১০|| মাত্রাভাগে, আঠারো মাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন তার চতুর্দশপদী কবিতাবলীর পংক্তি-বিন্যাসে প্রবহমানতা রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যতিপ্রাস্তিক পংক্তিবিন্যাস-রীতিই গ্রহণ করেছেন।

‘কড়ি ও কোমলে’র একটি কবিতায় (‘শান্তি’ কবিতা দ্র) কবি ছন্দের কিছু নতুন পরীক্ষা করেছেন। ১০||১০|| বা ৮||১০|| মাত্রার দ্বিপদীবন্ধে রচিত এই কবিতায় মিশ্রবৃত্ত রীতিই প্রয়োগ করেছেন। ঐ রীতিতে শব্দের মাঝে রুদ্ধদলের এককলা এবং শব্দ শেষে মিশ্রবৃত্ত হ্রস্ব রুদ্ধদলের দুইকলা উচ্চারণই স্বাভাবিক নিয়ম। এই কবিতাটির প্রথম রুদ্ধদলের শব্দপ্রাস্তিক চার পংক্তিতে এমন দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে কবি শব্দশেষের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ রুদ্ধদল সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এক কলারূপে ব্যবহার করেছেন। — অন্যদিকে, একটি শব্দমধ্য যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদলকে এবং একটি একদল শব্দকে (mono-syllabic word) বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রক রূপে ব্যবহার করেছেন। এমন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ কলাবৃত্তে চলে বটে, কিন্তু মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ-রীতি বিরোধী। দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করছি,—

থাক থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।

$\begin{array}{ccccccc} \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \text{আবার য} & \text{দি} & \text{জেগে} & \text{ওঠে} & \text{বাছা} & \text{কা} & \text{না দেখে কান্না পাবে যে।} \end{array}$

কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধারা।

$\begin{array}{ccccccc} \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & & & \\ \text{হেসে কেঁদে} & \text{আজ} & \text{ঘু} & \text{মা} & \text{ল,} & \text{ওরে} & \text{তোরা কাদাসনে আর।} \end{array}$

(রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড কড়ি ও কোমল শান্তি)

এখানে, একদিকে কবি ‘আবার যদি’ এবং ‘আজঘুমাল’ শব্দগুচ্ছকে পাঁচ মাত্রার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট চার মাত্রায় উচ্চারণ করেছেন, — অন্যদিকে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম ‘কান্না’ শব্দটি সংশ্লিষ্ট দ্বিকল উচ্চারণ করে, দ্বিতীয় ‘কান্না’কে বিশ্লিষ্ট ত্রিকলার গুরুত্ব দিয়েছেন। তৃতীয় পংক্তিতেও দশমাত্রক পদ ‘কত হাসি হেসে গেছে ও’-অংশে ‘ও’ একদল শব্দকে বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারণ করেছেন। এমন শিথিল মিশ্ররীতির উচ্চারণ মধ্যযুগে রচিত কবিতা গানে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালও এমন মিশ্ররীতির কিছু পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এমন মিশ্র উচ্চারণের ছন্দ বাংলাকাব্যে চলবে না বুঝেই — এ যুগে বা পরবর্তী যুগে রচিত আর কোনও পদোই এমন পরীক্ষা করেননি।

কলাবৃত্ত ছন্দের রুদ্ধদলে (বিশেষ করে যুক্তবর্ণ-লিপির রুদ্ধদলে) দ্বিমাত্রক উচ্চারণ এ যুগের কোনও কবিই সুনির্দিষ্টভাবে ধরতে পারেননি। যখনই কবিরা ছন্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কোমলতা আনতে চেয়েছেন, যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদল পরিহার করে শব্দ নির্বাচন করেছেন, — উচ্চারণে মুক্তদলের প্রাধান্য রেখেছেন। এই কোমল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে কদাচিত যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদল এসে পড়লে কবিরা কলাবৃত্ত রীতিতে সংশয়ে পড়েছেন,—কোথাও বা কানকে প্রসন্ন করে তার দ্বিকলা ব্যবহারে কবির দ্বিধা উচ্চারণ মেনে নিয়েছেন, কোথাও বা চোখকে প্রসন্ন করে এককলা ও অনিশ্চয়তাবোধ রূপে ব্যবহার করছেন। রুদ্ধদলের, মাত্রা নির্ধারণ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। — আলোচ্য যুগে রবীন্দ্রনাথও সেই একই দ্বিধায় পড়েছেন দেখা যায়। সেই কারণেই ‘বনফুল’ কাব্যে ‘গল্প’ শব্দটি ত্রিমাত্রক রূপে ব্যবহার করতে গিয়ে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখেছেন,

কাছে বসি নিজে ‘গলপ’ কত যে

করিতেন আহা তখন মাতা।

(র. র, অচ. সং ১ম খণ্ড ‘বনফুল’ ৩য় সর্গ, পৃ. ৬৭)

‘ফুলবালা’ কাব্যে পাঁচ, ছয় এবং সাতমাত্রার পর্বভাগে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ বর্জন করে কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট কোমল উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ফোটাতে চেয়েছেন। ছয়মাত্রার আদর্শে শব্দমধ্য-পর্ব মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও এইযুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তবে পাঁচ বা রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক সাত মাত্রার (বিজোড় মাত্রক) পর্বভাগে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার বর্ণ উচ্চারণই আনতে চেয়েছেন। যুক্তবর্ণবিহীন ছয়মাত্রা বা সাত মাত্রার পর্বভাগের কবিতায় কদাচিত যখন দু-একটি পংক্তিতে দেখি,—

। । । ॥ ।

(১) ওই দেখা হেথা র জ নী গ দ্বা

বিকাশে বিশদ বিভা।

(ঐ ফুলবালা পৃ. ৪৪৩)

অথবা (২) সরসী আশ্রয় মধুর করেছে

॥ । । । ।
সৌ র ভ রা শি রাশি

(ঐ, ঐ, পৃ. ৪৪২)

অথবা (৩) $\frac{\text{বি}}{\text{বি}} \frac{\text{ব্র}}{\text{ব্র}} \frac{\text{ত}}{\text{ত}} \frac{\text{স}}{\text{স}} \frac{\text{র}}{\text{র}} \frac{\text{মে}}{\text{মে}}$ হরষিত মরমে
 আনত আননে বালা ফুলদল গুনিছে

(ঐ, ঐ, পৃ. ৪৩৬)

তখন সন্দেহ থাকে না, কবির কান এরূপ উচ্চারণে সায় দিয়েছে বলেই দ্বিধাহীনভাবে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একই কবিতায় (বিরলদৃষ্ট হলেও) যখন দেখি,—

(১) $\frac{\text{হোথায়}}{\text{হোথায়}} \frac{\text{দেখেছ}}{\text{দেখেছ}} \frac{\text{'ল}}{\text{'ল}} \frac{\text{জ্জা}}{\text{জ্জা}} \frac{\text{ব}}{\text{ব}} \frac{\text{তী}}{\text{তী}} \frac{\text{ল}}{\text{ল}} \frac{\text{তা}}{\text{তা}}$
 লুটায় ধরণী পরে (ঐ পৃ. ৪৪২)

অথবা— (২) কতনা মধুপ রাজি
 এক ঠাই কাননে

কাটাইছে সুখরাতি

$\frac{\text{ন}}{\text{ন}} \frac{\text{তা-}}{\text{তা-}} \frac{\text{গী}}{\text{গী}} \frac{\text{ত}}{\text{ত}} \frac{\text{বা}}{\text{বা}} \frac{\text{দ}}{\text{দ}} \frac{\text{নে}}{\text{নে}}$ (ঐ পৃ. ৪৩৫)

প্রভৃতি পংক্তিতে নয়নকে প্রসন্ন করে এবং শ্রাবণকে উপেক্ষা করে এমন রুদ্ধদলের একমাত্রক উচ্চারণ আনছেন তখনই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথও এইযুগে কলাবৃত্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

কিন্তু ‘কড়ি ও কোমল’ (১২৯৩) কাব্যগ্রন্থে কবি কলাবৃত্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণে অনেকটা সুনির্দিষ্টতা আনতে পেরেছেন। আলোচ্য কাব্যের দুটি কবিতায় মাত্র (বিরহ, গান, দ্র) কলাবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রার পর্বভাগ রেখেছেন। ‘বিরহ’ কবিতাটিতে তিনটি ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ ব্যবহার করেছেন, ‘গান’ কবিতায় যুক্তবর্ণ প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত মাত্র একটি আছে। কিন্তু এই চারটি উদাহরণেই^{২৬} কবি রুদ্ধদলের দ্বিকলা কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণ এনেছেন।— রুদ্ধদলে এক কলা উচ্চারণের দৃষ্টান্ত একটিও নেই। অপরপক্ষে বলা যায়, এ কাব্যগ্রন্থের যে কবিতায় যুক্তবর্ণ-উচ্চারণে সুনির্দিষ্টতা রুদ্ধদল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এক কলারূপে ব্যবহার করেছেন, — সেখানে কলাবৃত্ত রীতির দ্বিকলা উচ্চারণ একটিও আসেনি। সুতরাং ‘কড়ি ও কোমল’ের কবিতাগুলি রচনার সময়ে কলাবৃত্ত রীতির রুদ্ধদল উচ্চারণ

২৬। যেমন — (ক) কত শারদ যামিনী হইবে বিফল

‘বসন্ত যাবে’ চলিয়া।

(কড়ি ও কোমল বিরহ)

(খ) এই ‘যৌবন কত’ রাখিব বাঁধিয়া

মরিব কাঁদিয়া রে।

(ঐ)

সম্পর্কে কবির কান তৈরী হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত নয়। — তবে একথা স্বীকার্য, এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে কলাবৃত্ত রীতির যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত কম। মানসীতে কবি দ্বিধাহীনভাবে কলাবৃত্ত রীতির রুদ্ধদল প্রয়োগে আরও স্নাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য ছন্দপ্রকৃতি হল, কলাবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দোরীতির স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ রূপকার। আলোচ্য যুগে তাঁর সেই সৃষ্টি সম্ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকেও বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য-গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।^{২৭}

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দকে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের ছন্দ ব’লে প্রথম থেকেই গণ্য করতেন। ১২৯০-শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে (অর্থাৎ ‘ছবি ও গান’-এর কবিতা রচনার সমকালে) একটি কাব্যের সমালোচনা দলবৃত্ত সম্পর্কে কবির মন্তব্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হবে।”^{২৮} প্রাচীনকালে লোচনদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এবং ছড়াগান ও লোকগীতির নাম না জানা অসংখ্য কবি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক যুগের কবিরাও লঘু কবিতা-গানে এ ছন্দ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গভীর ভাবমূলক কথ্যধর্মী স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের কাব্যেও যে এ ছন্দ কতটা উপযোগী হতে পারে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সে বিষয়ে পাঠকদের সচেতন করেছেন। উত্তরজীবনে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ ছন্দে তিনি বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেছেন। আলোচ্য যুগেই সেই গভীর ভাবাত্মক, অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণধর্মী দলবৃত্ত ছন্দের প্রাথমিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ যুগেই আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, স্বাভাবিক কথ্যধর্মী উচ্চারণে তিনি দলবৃত্ত ছন্দের যে ত্রিপদীবন্ধ রচনা করেছেন তার একটি উদাহরণ তুলছি।—

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়

বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,

(গ) এই হৃদয় আসন ‘শূন্য যে থাকে’

কেন্দে মরে শুধু বাসনা

(ঐ)

(ঘ) সারা বিভাবরী কার পূজা করি

‘যৌবন ডালা’ সাজায়ে।

(কড়ি ও কোমল গান)

২৭। ‘কড়ি ও কোমল’ — কাব্যগ্রন্থের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন-রচিত এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কড়ি ও কোমলের ছন্দ পরিচয়’ প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য।

২৮। এ প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র সেনের ‘রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ’ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।

বনের হরিণ কাছে আসে, সাথে সাথে ফিরে পাশে
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় দেহছায়।
পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড়ো বড়ো নয়ন দুটি
তুলে তুলে মুখের পানে চায়।

(র. র. ১ম খণ্ড ছবি ও গান পাগল পৃ. ১২৫)

আলোচ্য যুগে ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রভাবিত মুক্তদলের আংশিক বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রক উচ্চারণের সার্থক পরীক্ষা করেছেন। সংস্কৃত-প্রভাবিত ছন্দ প্রাচীন যুগের বৈষ্ণব ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে, ভারতচন্দ্রের রচনায়,— আধুনিক যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের রচনায় লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী মূলত সুরাশ্রয়ী গান।— এখানে ‘লঘু-গুরু’ উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু সে যুগে ভারতচন্দ্র বা এ বৈষ্ণব ছন্দের যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ-হেমচন্দ্র পাঠ্যকাব্যে এ ছন্দের স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যকাব্যে এ ছন্দ কোথাও প্রয়োগ করেননি। আলোচ্য যুগে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে গান রচনা করতে গিয়ে সেখানে এ ছন্দ বহুলাংশে সফলভাবেই ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণবগানে যেমন জয়দেবের ছন্দের প্রভাব আছে, রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য পদাবলীতেও জয়দেবের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি,—

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।।

(র. র. ২য় খণ্ড ভা. ঠা. প. পদসংখ্যা ৯ পৃ. ১৩)

পদবিন্যাসে, মাত্রানির্ধারণে, — সর্বোপরি ধ্বনিবন্ধারে এ গীতটি জয়দেবের প্রখ্যাত ‘রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং’ (গীতগোবিন্দ : ১১ সংখ্যক) গীতটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে এ ছন্দ সংগীতে ব্যবহার করলেও, পাঠ্য কবিতায় এমন কৃত্রিম সুরাশ্রয়ী উচ্চারণ যে স্বাভাবিক নয় এই প্রস্তুতিযুগ থেকেই কবি তা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন।

দেখা গেল, আলোচ্য প্রস্তুতি পর্বেই রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দে যতি-প্রাস্তিক (অমিল) পয়ার-মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক এবং নানা মাপের স্তবকবন্ধ রচনায় ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সূচনা করেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সনেট রচনায় বিচিত্রমুখী পরীক্ষা করেছেন।

কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক ব্যবহার এ যুগে সুনির্দিষ্ট না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কড়ি ও কোমলে’র একাধিক কবিতায় উচ্চারণ রীতির নির্ভুল প্রয়োগ করে পরবর্তী যুগে এ ছন্দের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। দলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণে বিশ্লিষ্টতা কমিয়ে সংশ্লিষ্ট রীতির উদ্ভাবন করেছেন। দলবৃত্ত ছন্দই যে ভবিষ্যত কথ্যধর্মী বাংলা কাব্যের উপযুক্ত ছন্দ যে বিষয়ে নিঃসংশয়িত অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ভাবীকালের ছন্দ-সম্ভাবনার সূচনা নানাদিক থেকে হয়েছে।

॥ ঝ ॥

অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে বলদেব বলদেব পালিত পালিতের (১৮৩৫-১৯০০) নামোল্লেখ করতে হয়। বাংলা সংস্কৃত ছন্দ রচনার পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করতে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন কৃত্রিম চেষ্টা বলদেব পালিত তাঁদের অন্যতম। ১৮৭০-এ প্রকাশিত ‘ললিত কবিতাবলী’ কাব্যের সমস্ত কবিতাতেই তিনি কৃত্রিম লঘুগুরু উচ্চারণের সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগে গ্রন্থকারকে প্রশংসা করে লিখেছিলেন,—

“উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা কত কঠিন, তাহা সকলেই জানেন। লেখক সে দুরূহ ব্যাপারে যে অনেকদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মন্দ পরিচয় নহে।”

(বঙ্গদর্শন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, পৌষসংখ্যা দ্র)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, হেমচন্দ্রের ‘দশমহাবিদ্যা’ কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দের মতো এ ছন্দও বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতার বিচারে নিতান্তই কৃত্রিম বলে গণ্য হবে। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘ভর্তৃহরি কাব্যে’ও কবি আদ্যোপান্ত সংস্কৃত কৃত্রিম উচ্চারণের ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন। ভূমিকায় সংস্কৃত ছন্দের প্রশংসা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দ যে মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতির তুলনায় মনোহরী হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র “সুকবিজন-মনোজ্ঞা মালিনী, উপজাতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ছন্দের মধ্যে একটিরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন না” বলে দৃঃখ জানিয়েছেন। মধুসূদন “ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার” লিখে সংস্কৃত ছন্দের অগ্রগতির ধারা রোধ করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (১২৭৯ বঙ্গাব্দ, পৌষ) ভর্তৃহরি কাব্যেরও বিশেষ প্রশংসা করেছেন। তবে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, “বঙ্গালা-ভাষার যেরূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতছন্দ ভালো বসেনা।” এখানে ‘ভর্তৃহরি কাব্য’ থেকে কবির কৃত্রিম উচ্চারণের উদাহরণস্বরূপ মালিনী ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

() () () () () () — — — — —
 “ফু ল স ম সু কু মা রী, দী র্ঘ কে শা কৃ শা দ্বী,
 অ চ প ল-ত ডি তা ভা সুন্দরী গৌরকান্তি,
 ম ধু র ন ব ব য স্কা, পদ্মিনী, অগ্রগণ্যা,
 যু ব ক-ন য ন-লো ভা “কামিনী কামশোভা।”^{২৯}

কর্ণার্জুন কাব্য (১২৮২ বঙ্গাব্দ) লিখবার সময়ে কিন্তু কবি বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের বাধা কোথায় আংশিকভাবে তা উপলব্ধি করেছেন। এ কাব্যের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,—

সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা
 পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু
 না কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব
 এবং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে
 ঐ সকল ছন্দ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার ‘ভর্তৃহরি
 কাব্য’ই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায়
 আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা ২য় খণ্ড (২৫)

বলদেব পালিত পৃ. ৬১-৬২]

এই যুগে মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার পাঠে যে কাব্যরসিক সমাজে আগ্রহ বাড়ছিল এই কাব্যের ভূমিকায় তারও ইঙ্গিত রয়েছে। কবি মন্তব্য করেছেন,—

কেহ কেহ কহেন, ‘এই কাব্যের ২।৪ সর্গ অমিত্রাক্ষর পদ্যে
 লিখিলে ভালো হইত।’ কিন্তু এই প্রণালী কোন ভাষায় কোন
 প্রসিদ্ধ কাব্যেই লক্ষিত হয় না; সেইজন্য আমি উক্ত মতের
 অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কিন্তু ৪র্থ এবং ৫ম সর্গে দূরে
 মিল রাখিয়া অমিত্রাক্ষরপ্রিয় পাঠকবর্গকে তুষ্ট রাখিতে যত্ন
 করিয়াছি। (ঐ পৃ. ৬১)

কবির দূর্বাসিত মিলের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।—

২৯। ননমযযযুতেয়ং ‘মালিনী’ ভৌগিলৌকিকঃ। (ছন্দোমঞ্জরী, ১৩৪ সূত্র)

প্রতিপাদে যথাক্রমে ন (— — —), ন (— — —), ম (— — —), য (— — —),
 য (— — —), গণ থাকলে এবং অষ্টম ও সপ্তম দলে যতি পড়লে তাকে মালিনী ছন্দ বলে।

পংক্তিমিল

নিদ্রাবেশে কোন যোদ্ধা দেখিছে স্বপন,	ক
বহুদিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে।	খ
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া,	গ
অশ্রুজলে করিতেছে পদ প্রক্ষালন;	ক
এলাইয়া বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে	খ
মুছিতেছে সেই জল কেশপাশ দিয়া।	গ
আহ্লাদে সৈনিকবর কোলেতে যেমন	ঘ
লইবে সর্বস্বধন সন্তান সকলে,	ঙ
শিবর চীৎকারে তার স্বপ্ন পায় লয়।	চ
কোথা বা সে প্রিয়া ! কোথা প্রিয় পুত্রগণ!	ঘ
ভাসিল নয়ন তার বদনের জলে;	ঙ
দীর্ঘশ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয়।	চ

[সা. সা. চ. ২য় খণ্ড (২৫)

বলদেব পালিত পৃ. ৬২-৬৩]

“কোন ভাষায় কোন প্রসিদ্ধ কাব্যেই ‘অমিত্রাক্ষর’ পদ্য, ব্যবহৃত হয়নি”— এ মন্তব্য করতে গিয়ে কবি মিলটনের ‘প্যারাডাইস লষ্ট’ কাব্যকে প্রসিদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। দান্তের ‘ডিভাইনা কমেডিয়া’ ত্রিপংক্তিক ‘তেজারিমা’ মিলবন্ধে রচিত। কবি হয়তো সে আদর্শের কথা মনে রেখে ত্রিপংক্তিক মিল দিয়েছেন। তবে ‘তেজারিমা’ ছন্দের বিনুনি মিল (যেমন কথক, খগখ, গঘগ,...) কবি এখানে আনেননি।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) নাট্যকার এবং নট হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। নাট্যখ্যাতির আড়ালে তাঁর কবিত্বাতি ঢাকা পড়লেও, শিশুপাঠ্য কবিতায় এক

সময়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার পদ্য মালাকে (১ম — ৩য়

মনোমোহন ভাগ ১৮৭০, ১৮৮২, ১৮৯৪) ঊনবিংশ শতকের

বসু রালকপাঠ্য শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যেতে পারে। মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে ছোট

ছোট পরিমিত যতি দিয়ে, সুনির্বাচিত অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ সমমাত্রক

শব্দ গ্রন্থনে, শিশুপাঠ্য ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। দু-একটি উদাহরণ তুলছি।—

(১) হড় হড়, দুড় দুড়, মেঘ ডাকিছে;

মাঠ পথ ছেড়ে লোক বাড়ী আসিছে।

কড় কড়, হড় হড়, বাজ পড়িছে;
কান যায়, প্রাণ যায়, বুক কাঁপিছে।

টপ্ টপ্ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িছে;
চট চট শিল, যেন খই ফুটিছে।

[সা. সা. চ., ৪র্থ খণ্ড (৫১)

মনোমোহন বসু ঝড় ও বৃষ্টি পৃ. ৫৬]

ষতিভাগ

(২) সদাই ধায় নদীর ঢেউ;
রাখিতে তায় পারে না কেউ;
সময় যায় তাহারি প্রায়;
কাহারো মুখে চাহেনা হয়।
চলিছে দিন চলিছে রাত,
ধরিতে তায় কাহার হাত?
ধরিতে তায় সে পারে ভাই;
আলস্য যার শরীরে নাই

৩:২ | ৩:২।

(ঐ নদী ও সময় পৃ. ৬২)

এখানে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে লক্ষণীয়, কবি বিজোড় পাঁচমাত্রার পর্ব গঠন করেছেন। মিশ্রবৃত্তে লঘু, বিজোড় পাঁচমাত্রার পর্ব স্বাভাবিক নয়। বোধ হয় সে কারণেই আটলাইনের কবিতাটিতেও ‘যার’ শব্দটির প্রান্তিক ‘ব’ প্রায় অনুচ্চারিত। ফলে, কলাবৃত্তের উচ্চারণভঙ্গিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সচেতনভাবে কলাবৃত্তের ব্যবহার তখনো কোন কবির রচনাতেই দেখা দেয়নি।

মনোমোহন অনেকগুলি লৌকিক ছন্দের ছড়াগান, আখড়াই গান, সখীসম্বাদ গান ইত্যাদি লিখেছেন। সেখানে দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) বাংলা কাব্যে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ নামেই বেশী

প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ‘কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী’তে হরিনাথ মজুমদার বা রামপ্রসাদী দলমাত্রিক রীতির অনেকগুলি বাউল গান সংকলিত হয়েছে। ১৮৬২-তে প্রকাশিত তাঁর ‘পদ্যপুণ্ডরীক’ গ্রন্থে কিছু কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ নীতিমূলক কিশোর-পাঠ্য কবিতা আছে। সে যুগের লোকসংগীত

অনুপ্রাসেব ধ্বনিসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হত। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গানগুলিতেও তার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এখানে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় দুটি গান থেকে যথাক্রমে লৌকিক দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের উদাহরণ তুলছি।—

- (i) ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, ॥ পার কর আমারে ॥ I
 তুমি) পারের কর্তা, শুনে বার্তা ॥ ডাকছি হে, তোমারে ॥ I
 আমি) আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে ॥ I
 (ওহে, আমায় কি পার করবে না হে, ॥ আমায় অধম বলে ॥ I
 যারা) পাছে এল, আগে গেল, ॥ আমি রইলাম পড়ে ॥ I
 (সা. সা. চ. তৃতীয় খণ্ড হরিনাথ মজুমদার)

- (ii) আগেও উলঙ্গ দেখ, ॥ শেষেও উলঙ্গ ॥ I
 মধ্যে দিন দুই কাল ॥ বস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥ I
 মরণের দিন দেখ ॥ সব কঙ্কিকার ॥ I
 তবে কেন মূঢ় মন ॥ কর অহঙ্কার ॥ I (ঐ)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে ‘নীলদর্পণের’ নাট্যকার রূপেই দীনবন্ধু মিত্র সুপরিচিত। কিন্তু পদ্যলেখক রূপেই তিনি প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন।^{৩০} তিনি সুপ্রচলিত ‘মিত্রাক্ষর’ পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পংক্তিবন্ধই ব্যবহার করতেন। মধুসূদন-হেমচন্দ্রের আদর্শে কিছু কিছু স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত মেলে। দলমাত্রক রীতির ছড়া জাতীয় কবিতা রচনায় তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি,—

রাত পোহালো ফরসা হলো
 ফুটলো কত ফুল।
 কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা,
 জুটলো অলিকুল ॥
 পূর্বভাগে নবীন রাগে,
 উঠলো দিবাকর।
 সোনার বরণ, তরুণ তপন,
 দেখতে মনোহর ॥

(দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড : ব.সা.প. সং. গদ্যপদ্য : বিবিধ : প্রভাত : পৃ. ১০৪)
 কবিতাটিতে লৌকিক ভাষা এবং গ্রাম্যশব্দ কবি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন।
 ছন্দে চতুর্দল পর্বভাগের মাঝে মাঝে পঞ্চদল পর্বও স্থান পেয়েছে।^{৩১} ছড়ার শিথিল
 ছন্দোবন্ধের প্রভাবে এমন হতে পেরেছে।

৩০। গ্রন্থাকারে দীনবন্ধু মিত্রের কাব্যগুলির তালিকা নিম্নরূপ

(ক) সুরধুনি কাব্য ১ম ভাগ ১৮৭১, ঐ ২য় ভাগ ১৮৭৬। (খ) দ্বাদশ কবিতা ১৮৭২।

৩১। যেমন, গেল রজনী, হাসলো ধনী,
 পতির পানে চায়।

মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,

যাচ্ছে উষার বায় ॥

(ঐ, প্রভাত)

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৩৮-১৮৯৪) কাব্য রচনা দিয়ে সাহিত্য

জীবন সুরু করেছিলেন। ইতিপূর্বেই তাঁর গদ্য কবিতা সম্পর্কে

বঙ্কিমচন্দ্র

উল্লেখ করেছি। তিনি তৎকালীন প্রচলিত ‘মিত্রাক্ষর’ বিভিন্ন

ছন্দোবন্ধেও অনেকগুলি পদ্য রচনা করেছেন।^{৩২} রচিত কবিতার উপরে পয়ার, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, চৌপদী, লঘু ললিত (৬।৬।৬।৫) প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের নামোল্লেখ, এবং গ্রাম্য ভাষা ও ইংরেজি বুকনিকে ছন্দোবন্ধ করাতে তাঁর ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় মেলে। স্তবক রচনাক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন (সংযুক্তা, আকাশা, আদর, বায়ু কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য)। শিথিল উদাহরণের কবিতা অনেক সময় সচেতনভাবেই (যেমন, রাজার উপর রাজা) লিখেছেন।^{৩৩} এখানে তাঁর একটি বৈচিত্র্যময় স্তবকবন্ধের উদাহরণ তুলছি।—

কেননা হইনু আমি, চন্দ্রকর লেখা,

রাধার বরণ।

রাধার শরীর থেকে রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,

ভূলাতাম রাধাক্রূপে, অন্যজনমন —

পর ভুলান কেমন?

(গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক আকাঙ্ক্ষা সুন্দর)

বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের একজন বিদগ্ধ ছন্দ-সমালোচক ছিলেন। বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনায় একাধিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় আছে। বলদেব পালিতের সংস্কৃতছন্দ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আমরা এ গ্রন্থেই পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

এই যুগের অন্যতম কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এবং অন্যত্র উল্লেখ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ

মজুমদার

সুরেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দে শব্দগ্রন্থনে, দৃঢ়সংহত রুদ্ধদলের

ধ্বনিস্পন্দনে, প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায় সে-যুগে পাঠকদের জনপ্রিয়তা

অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবির এই রচনারীতির দ্বারা বাল্যকালেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘মহিলা’ (১ম ও ২য় অংশ) কবির মৃত্যুর পর ১৮৮৩-তে প্রকাশিত হয়। তাঁর গাঢ়বদ্ধ ধ্বনিস্পন্দিত ছন্দের নিদর্শন হিসাবে উক্ত কাব্য থেকে একটি স্তবকবন্ধ উদ্ধৃত করছি।—

সেই দেশ সভা, যথা ললনা পূজিতা,

কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী-বর্ণনায়,

৩২। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের তালিকা: (ক) ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস। ১৮৫৬, (খ) কবিতাপুস্তক ১৮৭৮ ১৮৯১-তে প্রকাশিত ২য় সংস্করণে নাম দেন গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক।

৩৩। ‘রাজার উপর রাজা’ কবিতার পাদটিকায় লিখেছেন “যথার্থ গদ্য-পদ্য। কেননা, পদ্যের কোন ছন্দ নাই।”

সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিता,
 পরিবার, নারী তুষ্টা যায়;
 অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
 রীতি জ্ঞান ললনার;
 নারী কর্ম ধর্ম এ সংসারে;
 সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে।

[মহিলা, অবতরণিকা, ব.সা.প. সংস্করণ (১৩৫৭), পৃ ২৭]

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) এই যুগে কবিতা ও গান রচনায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর তিনখণ্ড গীতিকবিতা ১৮৮২-৮৩-তে গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন পাঠক-সমাজে তাঁর ‘ভারত-বিলাপ’ এবং ‘যমুনালহরী’ গান দুটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এখানে লঘু-গুরু ‘তোটক’ ছন্দে রচিত ‘ভারতবিলাপ’ থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।—

ক ত কাল প রে, ব ল ভা র ত রে
 দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
 অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
 ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
 নিজ বাসভূমে, পরবাসি হ’লে
 পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
 পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
 বহু লৌহবিনির্মিত হার বৃকে।
 পর ভাসন আসন, আনন রে
 পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে
 পর দীপশিখা, নগরে নগরে
 তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।

[সা. সা, চ, ৩য় খণ্ড (৪২), গোবিন্দচন্দ্র রায়, পৃ. ১০-১১]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) প্রবন্ধকার রূপেই বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তৎকালীন কবিতার আসরেও তাঁর একটি আসন ছিল। তাঁর যৌবনোদ্যান (১৮৬৮), মিত্র বিলাপ (১৮৬৯), কাব্যকলাপ (১৮৭০), কবিতামালা (১৮৭৭), মেঘদূত (১৮৮২)

রাজকৃষ্ণ
 মুখোপাধ্যায়

— কাব্যগুলিতেও এই কবিপ্রকৃতির নিদর্শন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মধুসূদন যেমন বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য আদর্শের ছন্দোবদ্ধ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, রাজকৃষ্ণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। ‘যৌবনোদ্যান’ কাব্যটি মধুসূদনের নামে উৎসর্গ

করতে গিয়ে সেকথা উল্লেখ করেছেন। এখানে পাশ্চাত্য আদর্শে লিখিত কবির একটি নতুন স্তবকবন্ধের দৃষ্টান্ত তুলছি।

	মিল	যতিভাগ
হেরিয়া দ্বারের মাঝে রতন আসনে,	ক	৮ ৬I
চিস্তাকুল মৌনভাবে বসিয়া রূপসী;	খ	
খরতর রবি করে জ্বলে সে বদনে;	ক	
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসি;	খ	
সৌদামিনী রাশি রাশি পড়িয়াছে খসি?	খ	
কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশস্ত, অঙ্কিত,	গ	
ভাবনা লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চসি;	খ	
বজ্রগ্র নাসিকা; ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত;	গ	
দৃঢ় গ্রীবা, অন্য অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত।	গ	৮ ১০I

[সা. সা. চ. ৪র্থ খণ্ড (৪৮)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যৌবনোদ্যান পৃ. ৯]

কবিতাটি নয়পংক্তিতে স্পেনসরীয় স্তবকাদর্শে রচিত। স্পেনসরীয় স্তবকের মিল কথকথখগখগগ। প্রথম আটপংক্তি আয়াস্বিক পঞ্চ-দ্বিদলপর্বিক, নবম পংক্তি আয়াস্বিক ষট্-দ্বিদলপর্বিক। রাজকৃষ্ণ এখানে একই পংক্তিমিল রেখে প্রথম আটপংক্তি পয়ারবন্ধে (৮||৬I) এবং নবম পংক্তি মহাপয়ারবন্ধে (৮||১০I) রচনা করেছেন। ‘মিত্রবিলাপ’ কাব্যে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্যে’র স্তবকাদর্শে কয়েকটি স্তবক রচনা করেছেন। তিনি ছন্দসচেতন কবি ছিলেন। হেমচন্দ্রের (এবং এ-যুগের অন্যান্য অনেক কবির) ন্যায় নামোল্লেখ করে, পয়ার, ত্রিপদী, মিশ্র-ত্রিপদী, একাবলী, দ্বাদশাক্ষরা, পজ্ঝাটিকা, মালঝাঁপ, তুণক প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত ছন্দাবন্ধ রচনা করেছেন। স্বদেশী গানের ছন্দাবন্ধেও (দ্র কবিতামালা ভারতমাতা) রাজকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২২) মুখ্যত গদ্যশিল্পী ছিলেন। তবে মিশ্রবৃত্ত মীর মশাররফ এবং লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতে তিনি কিছু কবিতা গানও হোসেন লিখেছিলেন। এখানে লৌকিক দলবৃত্তে রচিত তাঁর একটি কৌতুকধর্মী গান থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি।—

আর বাঁচিনা প্রাণ সহরে, || পোড়া শীতে মজাইল; I

অভাগার ভাগ্যেতে বিধি || বুঝি এই লিখেছিল ।I

কাঁপে অঙ্গ থর থর, ||

বুঝি গায়ে এল জ্বর, ||

কালে বলি ধর ধর, || ভাগ্যে কেহ না জুটিল ।I

(সঙ্গীত লহরী)

অক্ষয়চন্দ্র
চৌধুরী

যতিভাগ

পলকে পলকে বিজলী দলকে	৬।৬।
অধরে মধুর হাসির ছটা,	৬।৫।
রূপের সাগরে অমৃতের ডেউ	৬।৬।
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা। ^{১১}	৬।৫।

১ম সং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, পৃ. ১৫]

দীনেশচরণ
বসু

ছয়মাত্রার পর্ব এবং বারো মাত্রার পদবিণ্যাসে রচিত তাঁর একটি স্তবক-উদাহরণ তুলছি।—

তবু আবির্ভাব, ভুবন মোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি,
ধরণীতলে।

শুয়ে থাকিতাম দুপুর বেলায়
 তাহাদের কোলে রাখিয়া মাথা,
 কাছে বসি নিজে ‘গল্প’ কত যে
 করিতেন আহা তখন মাতা।

১ম খণ্ড (১ম সং) বনফুল ৩য় সর্গ পৃ. ৬৭।

আঁধার আকাশে হিমাংশু কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন
সুখ সলিলে।

(সা. সা. চ. ৩য় খণ্ড (৪২) দীনেশচরণ বসু ২য় সং. পৃ. ৪১)
‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’ (১৮৭৫-৭৭) এবং ‘সিন্ধুদূত’ (১৮৮৩) কাব্যের লেখক
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২), ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্ম
মুখোপাধ্যায় নামে, সে যুগের পাঠক সমাজে কিছুটা আলোড়ন এনেছিলেন। এ
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন।
‘জ্ঞানাস্কুর’ (১৩৮৩) পত্রে রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের প্রশংসাসূচক আলোচনা
করেছিলেন। কবির রচনা-নিদর্শন কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

কখন সরস সুধার লহরী প্রলয় সাগরে ঢালিয়া দেহ,
—গাইব সুরচি মধুর মধুর, মাতাব তাহাতে বিরহ বিধুর,
মাতাব তাহাতে প্রণয় বাউর, — অথবা যদিও না মাতে কেহ —
নাই বা মাতিল। নিজেই মাতিব,
নিজেই সুখের সাগরে ভাসিব,
দিব না অপরে সুখের ভাগ।

এই কণ্ঠবব, হবে না নীরব, নাই বা হইল বীণা বেণু বব,
নাইবা হইল ললিত, ভৈরব, নাইবা হইল বেহাগ রাগ।
হাসিবে বঙ্গ? হাসুক! তাহাতে হইবে না মোর হৃদয়ে দাগ!

[সা. সা. চ. ৩য় খণ্ড (৪৪) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভুবনমোহিনী প্রতিভা ২য় সং, ১৩৫১ পৃ. ২১]

এ কবিতার ত্রিমাত্রক শব্দগুহিত ছন্দোবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাত সঙ্গীত (১২৯০)
কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ‘নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতার কিছু মিল রয়েছে।

আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩) এই যুগে মধুসূদনের আদর্শে মহাকাব্য রচনার
প্রয়াস করেছেন (দ্র হেলেনা কাব্য ১৮৭৬-১৮৭৮)। যুগ-
আনন্দচন্দ্র প্রবর্তক রামমোহনের জীবনী অবলম্বনে (ভারতমঙ্গল পূর্বাভাস
মিত্র ১৮৯৪) তিনি একটি জীবনী কাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

উভয়-কাব্যেই কবি প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন, তবে মধুসূদনের ধ্বনিম্পন্দ
এবং মহিমাব্যঞ্জক ভাব-প্রকাশরীতি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। ‘মিত্রকাব্যে’ (১৮৭৪,
১৮৭৭) কবি দলবৃত্ত রীতির ছন্দ অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবাত্মক
গভীর ভাবের কবিতায় ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রক ‘ছড়ার ছন্দ’কে
কবিতায় দলমাত্রক যে কৌলীনা দিয়েছেন তার আংশিক পরিচয় এ যুগের রচনাতেই
হুন্দ ব্যবহার পেয়েছি। সেই প্রচেষ্টায় অন্যান্য যাঁরা সহায়তা করেছেন আনন্দচন্দ্র

তাদের অন্যতম। এখানে তাঁর দলবৃত্ত রীতির রচনা-নিদর্শন কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

অনেক দিনের পরে প্রিয়ে
সেদিন তোমায় দেখেছি,
নয়ন জলে বক্ষস্থলে
পদচিহ্ন এঁকেছি,
প্রেম নয়নে মুখের পানে
সেই যে তুমি চেয়েছিলে,
কোথা হতে নয়ন পথে
না জানি কি ঢেলে দিলে;

দূর থেকে চোখের দেখা
দেখেই যদি এমন হয়,
স্পর্শ হলে কি যে হতো,
ভেবেই আমার হচ্ছে ভয়।

[সা. সা. চ. ৪র্থ খণ্ড (৫৩) আনন্দচন্দ্র মিত্র মিত্রকাব্য
চোখের দেখা পৃ. ২৭-২৮]

প্রচলিত কথ্য ভাষাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক উচ্চারণে কবি ব্যবহার করেছেন। ছন্দের অগ্রগতির দিক থেকে তার গুরুত্ব রয়েছে।

শ্রবী অধরলাল সেন (১৮৫৫-১৮৮৫) মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্বল্পায়ু জীবনে
অধরলাল সেন কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ (ললিতা সুন্দরী ১৮৭৪, মেনকা ১৮৭৪।
নলিনী ১৮৭৭, কুসুম কানন ১৮৭৭-৭৮) রচনা করেছেন
স্ববকবন্ধ রচনায় তাঁর কিছু কিছু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) এই যুগে
ঈশানচন্দ্র কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন (চিত্তমুকুর ১৮৭৮, বাসন্তী
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮০, যোগেশ ১৮৮১, চিন্তা ১৮৮৭)। এ যুগের অন্যান্য কবির
মতো তিনিও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয়, আট, দশ মাত্রার পদবিন্যাসে,
পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদীবন্ধে অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন।

অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের রচনাতেও এই যুগের প্রধানতম প্রত্যেকটি লক্ষণ
অপ্রধান কবিদের পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঁরাও মিশ্রবৃত্ত রীতিকে কাব্য-রচনায় প্রধানতম
রচনা বৈশিষ্ট্য হৃদবাহন রূপে গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণে
প্রবহমান পয়ারবন্ধ কেউ কেউ লিখলেও যতিপ্রান্তিক (সমিল ও
অমিল) ছন্দের প্রতিই বেশী আনুগত্য দেখিয়েছেন। স্ববক রচনা সম্পর্কে অধিকাংশ কবিই
সচেতন হয়েছেন। মধুসূদনের আদর্শে পাশ্চাত্য রীতির স্ববক রচনায়
মিশ্রবৃত্ত রীতি কেউ কেউ অগ্রসর হয়েছেন। মিশ্রবৃত্তের দ্বিপদী ৮||৬I, ৮||১০I

মাত্রাভাগই স্বাভাবিক রীতি। এই যুগের কবির কিস্তি স্বচ্ছন্দে ৮||৮, বা ৬||৬। মাত্রার পদ বা পর্ব রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে ধীরে ধীরে এই রীতির পরিবর্তন ঘটেছে।

দলবৃত্তের লৌকিক রূপ লোকগীতি এবং ছড়াগানের মাধ্যমে এ যুগেও যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। আধুনিক কবিরা এই ছন্দে লঘু ছড়াজাতীয় (প্রধানত সাম্প্রতিক ঘটনাবলস্বনে ব্যঙ্গাত্মক রচনা) কবিতা লিখেছেন। কদাচিত দৃ-একজন এ ছন্দের স্বাভাবিক কথা

দলবৃত্ত রীতি

বাচনভঙ্গীতে গভীর ভাবের কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এই প্রচেষ্টা পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতেই পরিপূর্ণতা লাভ

করেছিল।

কলাবৃত্তের রুদ্ধদল উচ্চারণ-রহস্য এ যুগের কবিরা ধরতে পারেননি। মিশ্রবৃত্তেই রুদ্ধদল (যুক্তলিপি) যথাসম্ভব পরিহার করে, এবং বিজোড় মাত্রার পর্ব গঠনের দ্বারা

বিল্লিষ্ট উচ্চারণের
ছন্দ

পদ্যে বিল্লিষ্ট উচ্চারণের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। যুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক ব্যবহারের সচেতন প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের হাতেই হয়েছে। এ যুগের ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যে তার সূচনা,

— পরবর্তী যুগের একাধিক কাব্যগ্রন্থে তার পূর্ণ রূপায়ণ লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রয়োগের সচেতন প্রচেষ্টা এ যুগের খ্যাত-অখ্যাত অধিকাংশ

সংস্কৃত প্রভাবিত
ছন্দ

কবিই করেছেন। গুরু স্বরধ্বনিকে দ্বিকলার মর্যাদা দিয়ে এবং বিশুদ্ধ বাংলা রুদ্ধদল-প্রান্তিক শব্দে স্বরান্ত উচ্চারণের দ্বারা তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের আমেজ আনতে চেয়েছেন। দৃ-একজন বাংলা মিশ্রবৃত্তের

উচ্চারণে সংস্কৃত যতিভাগ চালাতেও চেষ্টা করেছেন। তবে এমন প্রচেষ্টা যে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিরোধী, ক্রমান্বয়ে কবি ও কাব্য-রসিকরা (বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম) সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন। সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় ব্যবহারের চেষ্টা পরবর্তী কালেও চলেছে, এবং অধুনা জীবিত কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ কৃত্রিম ধারায় সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সে সম্পর্কে গ্রন্থের পরবর্তী পর্বে, যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে

এবারে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলি

আলোচিত প্রধান
প্রধান বৈশিষ্ট্য

সূত্রাকারে পুনরুল্লেখ করে গ্রন্থের প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

(১) উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে, নব ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে এবং প্রাচীন সুরধর্মী বাংলাছন্দের প্রতি অনুরাগের জন্য রঙ্গলাল-মধুসূদন-যুগের তুলনায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগে বাংলা ছন্দের গতি-প্রকৃতির আবার কিছুটা সনাতন মিত্রাক্ষর-মুখীন পরিবর্তন ঘটেছিল।

(২) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণে, সংস্কৃত যতিবিভাগের আদর্শে ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টায় অনেক সময় কলাবৃত্ত রীতির অর্থাৎ

রুদ্ধদলে দ্বিমাত্রক উচ্চারণের আমেজ পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য সচেতনভাবে এ যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও কবি আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেননি।

(৩) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইযুগে মিশ্রবৃত্তরীতিতে সমিল প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধ রচনা করেছেন।

(৪) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যসংলাপে মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহারের পরীক্ষা করেছেন, তবে সফল হতে পারেননি।

(৫) তিনি মিলবিহীন যতিপ্রাস্তিক পয়ারবন্ধে, সংস্কৃত শ্লোকের আদর্শে চতুষ্পংক্তিক শ্লোক রচনা করেছেন। মধুসূদন প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারের বিকল্পরূপে তিনি এ ছন্দ রচনা করেন। মধুসূদনের আদর্শে প্রবহমান পয়ারও রচনা করেছেন, তবে উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

(৬) তিনি কৃত্রিম লঘুগুরু উচ্চারণে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রয়োগের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

(৭) তিনি ছড়াজাতীয় লঘুভাবের কবিতায় দলবৃত্ত ছন্দ সার্থক ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

(৮) নবীনচন্দ্র সেন মিশ্রবৃত্ত ছন্দে সংলাপের উপযোগী নমনীয়তা এনেছেন। হেমচন্দ্রের আদর্শে যতিপ্রাস্তিক পয়ার (মিলহীন) রচনা করেছেন। সমিল প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। বিদেশী আদর্শে স্তবকবন্ধ রচনায় এবং মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছেন।

(৯) বিহারীলাল চক্রবর্তী মিশ্রবৃত্ত ছন্দে একদিকে যেমন যুক্তবর্ণ ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ এনেছেন, আবার প্রয়োজনে যুক্তবর্ণ বর্জন করে ছন্দে কোমল গীতিমাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। তিন মাত্রার শব্দে যে অস্থির গতিবেগ ছন্দকে চঞ্চল করে তোলে বিহারীলাল তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন। তিনি কিছু কিছু স্তবক রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় কচিৎ কখনও মুক্তকের আভাস লক্ষ করা যায়।

(১০) রাজকৃষ্ণ রায় একাধারে কবি, নাট্যকার এবং নট ছিলেন। তাই ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষায় তাঁর এই তিন বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় মেলে। কবিতায় তিনি লঘু যতিভাগের মুক্তক ব্যবহার করেছেন। নাটকে মুক্তক সংলাপ ব্যবহার করেছেন। গদ্য কবিতার ছন্দের মৌলিক পরীক্ষা করেছেন। নাট্য অভিনয় এবং প্রম্পটিং-এর উপযোগী অভিনয়িক পদ্যপংক্তিক গদ্য রচনার চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের আদর্শে সনেট লিখেছেন। উপযুক্ত প্রতিভা এবং স্থায়ী নিবিষ্টতার অভাবে সকল পরীক্ষাই সূচনায় শেষ হয়েছে।

(১১) গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর বহুসংখ্যক নাটকে মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা বাংলা নাটকে গৈরিশ মুক্তক ছন্দকে স্থায়ী আসন দিয়েছেন। তাঁর নাট্য-সংলাপী মুক্তক কাব্যে ব্যবহৃত দীর্ঘ প্রবহমান মুক্তক থেকে ভিন্নধর্মী। প্রবহমান পয়ার সংলাপ ব্যবহারে তিনি সফল হতে পারেননি। লঘু ভাব পরিস্ফুটনে দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বহুসংখ্যক গান রচনায় ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দ ব্যবহার করেছেন; সেখানে

লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দও প্রয়োগ করেছেন। কবিতা রচনায় মিশ্রবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। স্তবক ভাগ করেছেন।

(১২) রবীন্দ্রনাথের বারো থেকে ছাব্বিশ বছরের রচনা এই পর্যায়ে আলোচ্য। এই যুগে কবি প্রধানতঃ মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ ছন্দে প্রচলিত যতি, প্রান্তিক সমিল পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদী প্রভৃতি ছাড়াও যতিপ্রান্তিক অমিল পয়ার প্রবহমান পয়ার (কাব্য ও নাট্যসংলাপে), ১৬, ১৮ অথবা ২০ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী, মুক্তাকাভাসিত ছন্দ, বিচিত্র স্তবকবন্ধ ইত্যাদি রচনায় কবির বৈচিত্র্যমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১৩) এ যুগেই রবীন্দ্রনাথ সনেট লিখতে শুরু করেন। সতের বছর বয়সে তার সনেট রচনার হাতেখড়ি। কবির সমগ্র জীবনে রচিত কম বেশী পৌনে চারশ সনেটের মধ্যে এই সময়ে ৬০টি সনেট লিখেছিলেন। এই সময়েই তিনি পেত্রার্কার রীতি পরিত্যাগ করেন, এবং আংশিকভাবে শেকসপীয়রের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। এ সময়ে ফরাসী রীতির সনেটও লিখেছেন। মধুসূদন সনেটে প্রবহমান পয়ার পংক্তি ব্যবহার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে লিখিত সনেটে যতিপ্রান্তিক পয়ার ও বর্ধিত পয়ার পংক্তি ব্যবহার করেছেন।

(১৪) কড়ি ও কোমলের একটি কবিতায় (শান্তি) রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট, মিশ্র উচ্চারণ-রীতির নতুন পরীক্ষা করেছেন।

(১৫) কলাবৃত্তের যুক্তবর্ণের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ-রহস্য এ যুগের কবিদের অজানা ছিল। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথও এ-ছন্দের উচ্চারণ-রহস্য ঠিক ধরতে পারেননি। কিন্তু ‘কড়ি ও কোমলের’ (১২৯৩) কয়েকটি কবিতা গান রচনাকালে যুক্তবর্ণের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সম্পর্কে অনেকাংশে নিঃসংশয় হয়েছিলেন মনে হয়। পরবর্তী যুগের মানসী কাব্যে তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ লক্ষিত হয়।

(১৬) দলবৃত্ত ছন্দ যে বাকধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত এ যুগেই রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এবং গভীর ভাবমূলক কবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষণীয়।

(১৭) ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’তে রবীন্দ্রনাথ লঘু-গুরু উচ্চারণধর্মী প্রাচীন কলাবৃত্ত রীতির বৈষ্ণব কবিতার ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। জয়দেবের ছন্দের প্রভাবও এখানে লক্ষ করা যায়।

(১৮) ভাবীযুগের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার এ-যুগেই রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করেছিলেন,— কিন্তু তৎকালীন পাঠক বা রসজ্ঞের দৃষ্টি তখনো সেদিকে ততটা আকৃষ্ট হতে পারেনি।

(১৯) এ-যুগের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের মধ্যে (ক) বলদেব পালিতের কাব্যে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। (খ) হরিনাথ মজুমদারের কবিতা-গানে মিশ্রবৃত্ত এবং লৌকিক ভঙ্গির দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (গ) মনোমোহন বসু

মিশ্রবৃত্তরীতিতে শিশুপাঠ্য কবিতা রচনায় পরিমিত যতিভাগ ও মিলের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র স্তবক রচনায় এবং দলমাত্রক ছড়াজাতীয় কবিতা রচনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। (ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য কবিতা রচনায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন; ‘মিত্রাক্ষর’ পদ্যে স্তবকবন্ধ রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন, (চ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্তবক বিভাগে এবং যুক্ত বর্ণের গাঢ়বদ্ধ ধ্বনিবাক্যের সৃষ্টিতে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন, (ছ) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদেশী স্তবকাদর্শ অনুসরণে বাংলা ছন্দের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন, (জ) গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রাচীন রীতির লঘুগুরু কলাবৃত্ত রীতিতে সঙ্গীত রচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।, (ঝ) মীর মশাররফ হোসেন লৌকিক দলবৃত্তে ও মিশ্রবৃত্তে কিছু কবিতা-গান লিখেছিলেন, (ঞ) অক্ষয় চৌধুরী পদ-পংক্তি বিভাগে বৈচিত্র্য এনে রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিলেন, (ট) দীনেশচরণ বসু তৎকালীন প্রচলিত স্তবক বিভাগে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছয়-মাত্রা পর্বভাগে কবিতা রচনায় সে যুগের রসজ্ঞ সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন, (ঠ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘ভুবন মোহিনী দেবী’ ছদ্মনামে ‘ভুবন মোহিনী প্রতিভা’ এবং ‘সিন্ধুদূত’ নামে দুটি কলাবৃত্ত-প্রভাবিত কাব্যগ্রন্থ রচনা করে সে যুগে পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। (ড) আনন্দচন্দ্র মিত্র, অধরলাল সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিদের রচনাতেও এ যুগের দোষগুণ অধিকাংশই লক্ষ করা যায়।

মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার রচনারীতির একটি তলনামূলক তথ্য-বিবরণী।

[illegible]

॥

নির্দেশিকা

(উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থ ও রচনার নাম নির্দেশ করা গেল।
তারকা চিহ্নিত পৃষ্ঠাঙ্ক পাদটীকা-সূচক)

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৮১, ১৮৭

‘উদাসিনী’ ১৮১

‘সাগর সঙ্গমে’ ১৮১

অক্ষর ১*

অক্ষরবৃত্ত ৪*

অটোভারিমা (Ottava Rima) ১০৩,
১১২

অতিপর্ব ৩

অধরলাল সেন ১৮৩, ১৮৭

‘কুসুম কানন’ ১৮৩

‘নলিনী’ ১৮৩

‘ললিতা সুন্দরী’ ১৮৩

অনুপ্রাস ৮৭

‘অন্নদামঙ্গল’ (ভারতচন্দ্র) ২৩-২৫

‘অবকাশরঞ্জিনী’ (নবীনচন্দ্র সেন)

১৩৭

অবনীন্দ্রনাথ ৪২, ৫০

‘অভিমন্যু বধ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯*

‘অমিতাভ’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ৬৪-৯২

অর্ধযতি (পদযতি) ৩

‘অশোক’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯*

আখড়াই ৪২

আখ্যায়িকা-কাব্যের ছন্দ ১৯

‘আত্মবিলাপ’ (মধুসূদন)

আনন্দচন্দ্র মিত্র ১৮২-৮৩, ১৮৭

‘ভারতমঙ্গল’ ১৮২

‘হেলেনা কাব্য’ ১৮২

আবদুল কাদির ১১৪*

আভিনয়িক পদ্যপংক্তিক গদ্য ১৫৭

আর্য্যাহুন্দ ১১৪*

আলাওল ২২

‘আলালের ঘরের দুলাল’ (প্যারীচাঁদ মিত্র)

৭২

আশ্রিতান্ত্র ধ্বনি (রুদ্রদলে) ২

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩, ১৮৭

‘চিত্তমুকুর’ ১৮৩

‘চিত্তা’ ১৮৩

‘বাসন্তী’ ১৮৩

‘যোগেশ’ ১৮৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩২-৪৩, ৪৯, ৫০, ৫১,

৫৩, ৫৪, ৫৯

অনুপ্রাসধর্মী গদ্য ৪২

কলাবৃত্ত ৩৮

গ্রাম্য ছড়াগান ৪০

পঞ্চকলপার্বিক ছন্দ ৩৯

পয়ার ৩৩

‘বোধেন্দুবিকাশ’ ৩৬-৩৭, ৪২

ললিত মিল ৫৪

স্বরক-বৈচিত্র্য ৩৫

‘উদাসিনী’ (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) ১৮৯

উপপর্ব ৩

উপযতি ৩

একাবলী ১৭

ওজঃশক্তি (প্রবহমান পয়ার) ৮৬

ওড (Ode) ১০২-০৩

‘কড়ি ও কোমল’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৭০-৭১

‘কথামালা’ (বিদ্যাসাগর) ৫৩

কবিওয়ালা ২৭, ৩০

‘কবিকাহিনী’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫

কবিগান ৪২

‘কবিতামালা’ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) ১৭৯

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪৭, ৪৯, ৫০

‘কর্মদেবী’ (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ৫২

কলা (Mora) ২

কলাবৃত্ত ২, ৪, ৩৮

সরল কলাবৃত্ত ৪

মিশ্র কলাবৃত্ত ৪*, ৫

কলামাত্রা (moric unit) ২

কাল্পাল ফিকিরচাঁদ

(দ্র. হরিনাথ মজুমদার) ১৭৬-৭৭

‘কাল্পাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের

গীতাবলী’ ১৭৭

‘কাক্ষীকাবেরী’ (রঙ্গলাল) ৫২

‘কাব্যকলাপ’ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) ১৭৯

‘কাব্যমালা’ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১১৯

‘কালমুগয়া’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৬

‘কালাপাহাড়’ (গিরিশচন্দ্র) ১৬৪*

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(হুঁতোমপাঁচার নক্সা) ১৫১, ১৬০

কাশীরাম দাস ২২

‘কুমারসম্ভব’ (রঙ্গলাল) ৫২

‘কুরুক্ষেত্র’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৪৪-৪৫

কৃত্তিবাস ১৯, ২০

‘কৃত্তিবাসী-রামায়ণ’ ১৯, ২০

মিশ্রবৃত্ত ১৯

দলবৃত্ত ২০

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ৪৭, ৪৮, ৫০

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১১৩-১৫, ১১৬

‘সম্ভাবশতক’ ১১৩-১৫

গদ্য কবিতার আভাস ১১৪

কেচ্ছা ১৩

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৬৬

খেউড় ৪২*

‘খ্রীষ্টি’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭

গঙ্গাদাস ২*

গদ্য ১

গদ্য কবিতা ৭

‘গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক’

(বঙ্কিমচন্দ্র) ১৫৫, ১৭৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১১৭, ১৫৯-৬৩

মধুসূদনের প্রভাব ১৫৩, ১৫৮,

১৫৯-৬০

নাট্যসংলাপে দলবৃত্ত মুক্তক ১৬৪

‘গীত ও ছড়া’ ২১

‘গীতগোবিন্দ’ (জয়দেব) ১১, ১৫, ২৯

গৈরিশ মুক্তক ১৫৯-৬৩

গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৭৯, ১৮৭

‘ভারত বিলাপ’ ১৭৯

‘যমুনা লহরী’ ১৭৯

তোটক ১৭৯

গোবিন্দ দাস ১৫, ১৬, ৩০

গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১*

গ্রীণ (Greene) ৫২, ৫৩

চউপইআ ৯, ১০

চণ্ডীদাস ১৭, ৩০

‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’

(মধুসূদন) ৯২-১০২

চতুষ্কল পর্ব ৪

চতুষ্কল পর্বক দ্বিপদী ও ত্রিপদী ১১

‘চরিতাবলী’ (বিদ্যাসাগর) ৫৩*

‘চর্যাগীতি’ ৯, ১০, ১১, ২৯

‘চিত্ততরঙ্গিনী’ (হেমচন্দ্র) ১২৪

চৈতন্য জীবনী কাব্য ১৩,

২১, ৩০

চৌপদী শ্লোক (সংস্কৃতাদর্শে) ১২৭

ছড়াগান ২৯

ছত্র ৩

ছন্দ ১

‘ছন্দ’ (রবীন্দ্রনাথ) ৫*

ছন্দবোধ ১

‘ছন্দ সরস্বতী’ (সত্যেন্দ্রনাথ) ১*

‘ছন্দের হসন্ত হলন্ত’

(রবীন্দ্রনাথ) ৫*

‘ছন্দোঙ্কর রবীন্দ্রনাথ’

(প্রবোধচন্দ্র সেন) ৫*, ৮৩-৮৪

ছন্দোবন্ধ ৭

‘ছন্দোমঞ্জরী’ (গঙ্গাদাস) ১*, ২*

ছন্দোবীতি ৪

‘ছবি ও গান’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৩৬

‘ছায়াময়ী’ (হেমচন্দ্র) ১২৫

জগদানন্দ ১৫, ১৬, ৩০

‘জনা’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯, ১৬২

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ২২*, ৪৪,

৪৫, ৫০

‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ ৪৪

‘কাশীদাসী মহাভারত’ ২২*, ৪৪

জয়দেব ১১, ১৫, ২৯

‘গীতগোবিন্দ’ ১১, ১৫, ২৯

জর্জ সেন্টসবেরী ৫২, ৬৭, ৬৮,

৯৫, ১০৮

জ্ঞানদাস ১৬, ৩০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৯

‘জীবনস্মৃতি’ ৭৯

ঝুলনা ১৪*

টপ্পা ৪২

টমাস মুর ১৩৮

ট্যাসো ১১২*

অটোভারিমা ১১২

ট্রিয়োলেট ৮

ডি. জি. রসেটি ৯৫

‘ডিভাইনা কমেডিয়া’ (দান্তে) ১৭৫

‘তপোবন’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯*

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ১৬৫

‘তারকার আত্মহত্যা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬০,

১৬৭*

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ (মধুসূদন) ৮৪-৮৫

তণক ২৫

তেজারিমা ৮, ১৭৫
তেটক ১৭৯

থিওডোর ওয়াট্‌স ডানটন
(সনেটের সংজ্ঞা) ৯৫

‘দক্ষযজ্ঞ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯*

দল (syllable) ১, ২

মুক্তদল (open syllable) ১

রুদ্ধদল (closed syllable) ১

দলবৃত্ত ২, ৪, ৬, ১৮, ৩০

লৌকিক দলবৃত্ত ৪, ৬, ১৮, ৩০

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ৪, ৬

দলবৃত্ত নাট্যসংলাপ ১৩৪, ১৬৪

দলমাত্রা ২

‘দশমহাবিদ্যা’ (হেমচন্দ্র) ১৩১-৩৩

‘দানববিজয়’ (ব্রজমোহন রায়) ১৬০

দাস্তে (‘ডিভাইনা কমেডিয়া’) ১৭৫

দাশরথি রায় ৩০, ৪৭, ৫০

দীনবন্ধু মিত্র ১৭৭

‘দ্বাদশ কবিতা’ ১৭৭*

‘সুরধুনি কাব্য’ ১৭৭*

দীনেশচন্দ্র সেন ৪৭, ৪৮

‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ৪৭

‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’ ৪৮

দীনেশচরণ বসু ১৮১, ১৮৭

‘মানসবিকাশ’ ১৮১

‘কবিকাহিনী’ ১৮১

দুর্বল মিল (নবীনচন্দ্র) ১৪৫

দোহা ৯

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৮-২৪,

১৮৪, ১৮৫

‘কাব্যমালা’ ১১৯

‘মেঘদূত’ ১১৮

‘রেখাঙ্কর বর্ণমালা’ ১১৯

সংস্কৃত ছন্দ ১১৯-২৩

সমিল প্রবহমান মহাপয়ার ১২৩

‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ ১১৯-২৩

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪*

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ৪*

দ্বিপংক্তিক মিল (Couplet) ১০০

নগেন্দ্রনাথ সোম ৬৩-৬৪

‘মধুস্মৃতি’ ৬৩-৬৪

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(ভুবনমোহিনী দেবী) ১৮২

‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’ ১৮২

‘সিন্ধুদূত’ ১৮২

নবীনচন্দ্র সেন ১৩৬-৪৬, ১৮৫

‘অবকাশরঞ্জিনী’ ১৩৭-৩৮

‘অমিতাভ’ ১৩৭

‘অমৃতভ’ ১৩৭

‘আমার জীবন’ ১৪৯

‘কুরুক্ষেত্র’ ১৩৭, ১৪৪-৪৫

‘ত্রীস্ট’ ১৩৭

‘ত্রয়ীকাব্য’ ১৪১-৪৫

দশপংক্তিক স্তবক ১৩৮

নাট্যসংলাপে পয়ার, ত্রিপদী

১৪২-৪৪

‘পলাশীর যুদ্ধ’ ১৩৭, ১৩৮-৪১

‘প্রভাস’ ১৩৭, ১৪৪

‘ভারতউচ্ছ্বাস’ ১৩৭

‘মার্কণ্ডেয় চণ্ডী’ ১৩৭

মিল শৈথিল্য ১৪১

‘রৈবতক’ ১৪১-৪৪

‘শ্রীমদ্ভাগবত গীতা’ ১৩৭

স্তবক ১৩৭-৩৮

হেমচন্দ্রের মন্তব্য ১৪১

- ‘নল দময়ন্তী’ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ১৫৯
 ‘নলিনী’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৬
 ‘নলিনী’ (অধরলাল সেন) ১৮৩
 ‘নলিনী বসন্ত’ (হেমচন্দ্র) ১২৪-২৬
 ‘নসীরাম’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 নাট্যসংলাপে প্রবহমান ছন্দ ১৪২-৪৪
 নাট্যসংলাপে মুক্তকাভাস ৯১-৯২
 নিতাই বৈরাগী ২৭, ৩০
 ‘নিভৃত নিবাস’ (রাজকৃষ্ণ রায়) ১৫০
 ‘নীতিকুসুমাজ্জলি’ (রঙ্গলাল) ৫২
 ‘নীলধবজের প্রতি জনা’ (মধুসূদন) ১৬১

পংক্তি ৩, ৮

- পংক্তি-অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯২, ১১৬
 পঞ্চকল পর্ব ৪, ১১
 পদ ৩, ৭
 পদাবলী গীত ১৬
 পদাবলীর লৌকিক দলবৃত্ত ১৮, ৩০
 ‘পদ্মাবতী নাটক’ (মধুসূদন) ৮৮,
 ৯২, ১১৬
 ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (রঙ্গলাল) ৫২, ৫৪
 পদ্য ১, ৮
 পদ্য পৌণ্ডরিক পদ্য-গদ্য ১৫৪-৫৫
 ‘পদ্যমালা’ (মনোমোহন বসু) ১৭৫-৭৬
 পয়ার ১৯, ২৮
 পয়ার-ত্রিপদী নাট্যসংলাপ ১৪২-৪৪
 পরিশিষ্ট ১৮৮
 পর্ব ৩, ৭
 ‘পলাশির যুদ্ধ’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৮
 পল্লীগীতিকা ১৩
 পাঁচালী ৪২
 ‘পাণ্ডব গৌরব’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 পাদাকুলক ৯, ১০

পান্তুম্ (Pantoum) ৮

- পাপড়ি গৌনা ছন্দ ১
 ‘পারস্য প্রসূন’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 পিঙ্গলাচার্য ২*, ৯
 পীল (Peele) ৫২, ৫৬
 পূর্ণ্যতি ৩
 ‘পূর্ববঙ্গগীতিকা’ ২৮, ৩১
 পেত্রার্ক ৯৪-৯৫
 পেত্রার্কীয় সনেট ৯৪-৯৫
 ‘প্যারাডাইস লস্ট’ (মিলটন) ১৭৫
 প্যারীচাঁদ মিত্র ৭২
 ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ৭২
 ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৬
 প্রবহমান পয়ার (অমিত্রাক্ষর) ৬২,
 ৬৪-৬৭, ৮৫-৮৬
 প্রবহমান পয়ার সংলাপ ৯০-৯২
 প্রবোধচন্দ্র সেন ১*, ৪*, ৫*,
 ৮৩-৮৪
 ‘প্রভাত সংগীত’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫-৬৬
 ‘প্রভাস’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭,
 ১৩৮-৪১
 প্রথম চৌধুরী ৯৫
 প্রসঙ্গ ধর্ম (Accentuation) ৮৬
 ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ (পিঙ্গলাচার্য) ৯
 প্রিয়ংবদা ১২২
 প্রেমগীতিকা ৪২

ফণীন্দ্র দ্র. পিঙ্গলাচার্য ২*, ৯

বঙ্কিমচন্দ্র ১৫৫-৫৬, ১৭৮, ১৮৭

‘কবিতাপুস্তক’ ১৭৮*

গদ্য কবিতা ১৫৫-৫৬

‘পদ্য-গদ্য বা কবিতা-পুস্তক’
 ১৫৫*, ১৭৮*
 ‘খদ্যোত’ ১৫৫
 ‘বৃষ্টি’ ১৫৫
 ‘মেঘ’ ১৫৫
 মিত্রাক্ষর স্তবকবন্ধ ১৭৮
 ‘ললিতা । পুরাকালিক গল্প ।
 তথা মানস ।’ ১৭৮*
 ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ (মধুসূদন) ১০৯
 ‘বঙ্গভূষণ’ (রাজকৃষ্ণ রায়) ১৫৮
 ‘বঙ্গসুন্দরী’ (বিহারীলাল) ১৪৬-৪৭
 বড়ু চণ্ডীদাস ১২-১৩
 ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ১২
 একাবলী ১৩
 ‘পয়ার ১২
 দীর্ঘ ত্রিপদী ১২
 লঘু ত্রিপদী ১২
 মিশ্রবন্ধ ১২
 মিশ্রবৃত্ত (প্রাথমিক রূপ) ১৩
 ‘বনফুল’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫
 বলদেব পালিত ১৭৩-৭৫
 তেজরিমার আদর্শ ১৭৫
 দূরান্বিত মিলের ছন্দ ১৭৪-৭৫
 ‘ভর্তৃহরি কাব্য’ ১৭৩-৭৪
 ‘ললিত কবিতাবলী’ ১৭৩
 সংস্কৃত ছন্দ ১৭৩-৭৪
 বলপ্রসন্ন ৫
 বসন্ততিলক ১২৯
 ‘বাউল বিংশতি’ (বিহারীলাল)
 ১৪৬, ১৫০
 বাইশ মাত্রার পংক্তিবন্ধ (বঙ্গলাল) ৬০
 ‘বাংলা কবিতার ছন্দ’ (মোহিতলাল) ১০৩
 ‘বাংলাছন্দের নূতন সম্ভবনা’ (প্রবোধচন্দ্র) ৫*
 বাংলা পদাবলীর মিশ্রবৃত্ত ১৬-১৮

একাবলী ১৭
 পয়ার ১৭
 দীর্ঘ ত্রিপদী ১৮
 লঘু ত্রিপদী ১৭
 মিশ্রবন্ধ ১৮
 ‘বাণ্মিকী প্রতিভা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৬
 ‘বিক্রমাদিত্য নাটক’ (রাজকৃষ্ণ রায়) ১৫৭
 বিজোড়মাত্রক পদ (মধুসূদন) ৭৬-৮৪
 বিদ্যাপতি ১৪, ১৫, ১৬, ১৭*
 ব্রজবলিগীতের কলাবৃত্ত ১৪
 ব্রজবলিগীতের মিশ্রবৃত্ত ১৭
 একাবলী ১৭
 লঘু ত্রিপদী ১৭
 বিদ্যাসাগর ৫৩
 বাংলা গদ্যে ছন্দস্পন্দ ৫৩
 বিনুনী মিল ৮, ১৬৮
 ‘বিবিধ’ (হেমচন্দ্র) ১৩৩-৩৪
 ‘বিবিধ কাব্য’ (মধুসূদন) ১০৮-১১
 ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ৫২*
 ‘বিল্বমঙ্গল’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 বিশিষ্ট উচ্চারণের ছন্দ
 (রবীন্দ্রনাথ) ১৯৯-২০০
 বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৪৬-৫০, ১৮৫
 ‘বঙ্গসুন্দরী’ ১৪৬-৪৭
 ‘সারদামঙ্গল’ ১৪৬, ১৪৮-৪৯
 ‘বাউল বিংশতি’ ১৪৬-৫০
 ‘সাধের আসন’ ১৪৬, ১৪৮
 তিনমাত্রার চাল ১৪৭
 লৌকিক দলবৃত্ত ১৫৩
 ‘বীরঙ্গনা কাব্য’ (মধুসূদন) ৬৩
 ‘বুদ্ধদেব চরিত’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘বৃত্তসংহার’ (হেমচন্দ্র) ১২৪, ১২৭-৩১
 ‘ব্যকেতু’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (বিদ্যাসাগর) ৫৩*

- বৈষ্ণবগীত ৩০
 বৈষ্ণব জীবনী-কাব্য ৩০
 বৈষ্ণব পদাবলী ১৩-১৬, ৩০
 ব্রজবুলি কলাবৃত্তে চতুষ্কল, পঞ্চকল,
 ষট্‌কল ও সপ্তকল
 পর্ব ১৫-১৬, ৩০
 নরেন্দ্র ছন্দ ১৬
 ব্রজবুলি মিশ্রবৃত্তে একাবলী,
 লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার,
 বর্ণবৃত্ত ১৭-১৮
 লৌকিক দলবৃত্ত ১৯
 ব্রজমোহন রায় ১৬০
 ‘দানববিজয়’ ১৬০
 ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ (মধুসূদন) ১০২-০৮
 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
 ব্লাঙ্ক ভার্স ৬২, ৬৭-৯২, ১১৫, ১১৭
 ‘ভগ্নহৃদয়’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৪
 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ৫০
 ‘নববাবুবিলাস’ ৪৬
 ‘দুর্ভাবিলাস’ ৪৬
 ‘ভর্তৃহরি কাব্য’ (বলদেব পালিত)
 ১৭৩-৭৪
 ভাস্কর্য অমিত্রাক্ষর ১৫৩
 ভাগবত ১৩
 ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’
 (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫, ১৭২, ১৮৬
 ‘ভারত উজ্জ্বাস’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭
 ভারতচন্দ্র ২৩-২৫, ৩০, ৪২, ৪৯
 ‘অন্নদামঙ্গল’ ২৩-২৫
 একাবলী ২৪
 কলাবৃত্ত ২৪
 চৌপদী ২৪
 ত্রিপদী ২৪
 দ্বিপদী ২৩
 পয়ার ২৩
 পাঁচমাত্রা পর্ব ২৪
 মিশ্রবন্ধ ২৪
 মিশ্রবৃত্ত ২৩
 লৌকিক দলবৃত্ত ২৫
 সংস্কৃত ছন্দ ২৫
 সাতমাত্রা পর্ব ২৪
 ‘ভারত বিলাপ’ (গোবিন্দচন্দ্র রায়) ১৭১
 ভিলানেল ৮
 ভুজঙ্গপ্রয়াত ২৫
 ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’
 (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ১৮২
 ‘ভ্রান্তি’ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ১৫৯
 মঙ্গলকাব্য ১৩, ২০, ২১, ৩০
 একাবলী ২১
 মিশ্রবৃত্ত (সপ্তকলপর্বিক) ২১
 দীর্ঘত্রিপদী ২০
 ‘মণিহরণ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৪৪
 ‘স্বপ্ন বাদবদন্তা’ ৪৪
 ‘শিশুশিক্ষা’ ৪৪
 মধুসূদন দত্ত ৫০, ৫৬,
 ৬২-১১৩, ১১৫-১৬
 অটাভারিমা (Ottava Rima)
 ১০৩, ১১২, ১১৬
 অনুপ্রাস ৮৭
 অমিত্রাক্ষর ৬২, ৬৪-৬৭,
 ৭৪, ৮৫-৮৬, ১১৫
 ‘আত্মবিলাপ’ ১০৯-১০
 ওজঃশক্তি ৮৬
 ওড্ (Ode) ১০২-০৩

কবির বক্তব্য
 (অমিত্রাক্ষর প্রসঙ্গে) ৭৯-৮০
 ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ ৬৩,
 ৯২-১০২
 কাব্য ও নাটকের
 অমিত্রাক্ষর ৬৬-৬৭
 ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ ৬৩,
 ৯২-১০২
 জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য
 বিচার ১০২-০৩*
 জ্যোতিবিন্দনাথ অমিত্রাক্ষর
 প্রসঙ্গে ৭৯-৮০
 ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ ৫২, ৬৩,
 ৬৪*, ৮৪-৮৫
 তুলনামূলক তথ্যতালিকা
 পরিশিষ্ট ১৯৮
 দুরাশয় ও বন্ধনী ৮৯-৯০
 নাট্যসংলাপের প্রবহমান
 ছন্দ ৯০-৯২
 পংক্তি-অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯২, ১১৬
 ‘পদ্মাবতী নাটক’ ৬৩-৬৫*, ৬৭,
 ৯১-৯২, ১১৬
 পয়াররচনারীতির তথ্য-বিবরণী
 পরিশিষ্ট ১৮৮
 পেত্রাকীয়া সনেট ৯৪
 প্রবহমান পয়ার দ্র. অমিত্রাক্ষর
 প্রবোধচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর
 প্রসঙ্গে ৮৩-৮৪
 প্রাশ্নরিক স্পন্দন ৮৬
 বিজোড়মাত্রক পদ গঠন
 প্রসঙ্গ ৭৬-৮৪
 ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ৬৩
 ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ ৬৩, ১০২-০৮, ১১৬
 ব্লাঙ্ক ভার্স : দ্র. অমিত্রাক্ষর
 মিত্রাক্ষর সম্পর্কে কবির
 অভিমত ৭৩
 মিলটন (ব্লাঙ্ক ভার্স) ৬৭-৭১

মুক্তকভাস ৯১-৯২, ১১০-১১১
 ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ৬৩, ৭৫-৯০
 রঙ্গলালের প্রভাব ৬২, ৭৩
 রবীন্দ্র-মন্তব্য ৭৮
 রাজেন্দ্রলাল মিত্র অমিত্রাক্ষর
 প্রসঙ্গে ৮০-৮১
 ‘শমিষ্ঠা’ ৬৩
 শেকসপীয়র ও মিলটন
 ব্লাঙ্ক ভার্স ৬৭-৭১
 শেকসপীয়রীয় সনেট ৯৫
 সংস্কৃত শব্দের প্রভাব ৭২
 সনেট দ্র. ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’
 সনেট-পরম্পরা ১০১, ১১৬
 সনেট-মিলের তালিকা ৯৬-৯৯
 সনেটে মিলটনের প্রভাব ১০১
 সনেটে পেত্রাকীয়া আদর্শ ৯৪-৯৫,
 ৯৯-১০০
 সনেটে শেকসপীয়রীয় আদর্শ ৯৫,
 ১০০
 স্তবকবন্ধ ১০৩-০৮
 স্তবকবন্ধ তালিকা ১০৪-০৬
 হেমচন্দ্রের সমালোচনা ৭৭-৭৮
 ‘মধুমুতি’ (নগেন্দ্রনাথ সোম) ৬৩-৬৪
 মনোমোহন বসু ১৭৫-৭৬
 ‘পদ্যমালা’ ১৭৫-৭৬
 মন্দাক্রান্ত ১২০
 মহাপয়ার ৫৭, ১২৩
 মহাভারত ১৩, ৩০
 ‘মহিলা’ (সুরেন্দ্রনাথ
 মজুমদার) ১৭৮-৭৯
 মাত্রা ১
 মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) ৪*
 ‘মানসবিকাশ’ (দীনেশচরণ বসু) ১৮১
 ‘মার্কণ্ডেয় চণ্ডী’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭

মালৌ ৫২, ৫৬

মালঝাঁপ ৫৮

মালিনী ১২৩, ১৭৩-৭৪

‘মাসিকপত্রিকা’ (প্যারীচাঁদ মিত্র) ৭২

‘মিত্রকাব্য’ (আনন্দচন্দ্র মিত্র)

১৮২

‘মিত্র বিলাপ’ (রাজকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়) ১৭৯

মিত্রাক্ষর ছন্দ ৭৩

মিত্রাক্ষর স্তবক ১৩৫

মিল ৮

মিলটন ৫৬, ১৭৫

ব্লাঙ্কভার্স ৫৬

সনোট ১০১-০২

সনোট-পরম্পরা ১০১

মিশ্র কলাবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত) ১২৪

মিশ্রবৃত্তে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ১২৪

‘মীরকাসিম’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯

মীর মশাররফ হোসেন ১৮০, ১৮৭

সঙ্গীতলহরী ১৮০

মুক্তক ১৩৪, ১৪৮, ১৫০

মুক্তক নাট্যসংলাপ ১৩৪

মুক্তকাভাস ১২৪

মুসলিম কবির পদাবলী ২২

মূলধ্বনি (রুদ্ধদলে) ২

‘মেঘদূত’ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১৮

‘মেঘদূত’ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

১৭৯

‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (মধুসূদন) ৬০,

৭৫-৯০

মোহিতলাল মজুমদার ১০৩*

‘ম্যাকবেথ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯

ম্যাথু আর্নোল্ড ১৩৮

যতি ১-৩

অর্ধযতি ৩

উপযতি ৩

ছন্দযতি ২

পূর্ণযতি ৩

ভাবযতি ২

লঘু যতি ৩

শ্বাস যতি ২

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৬৪

‘যমুনালহরী’ (গোবিন্দচন্দ্র রায়) ১৭৯

যাত্রাগান ৪২

‘যৌবনোদ্যান’ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) ১৭৯

‘রঙ্গমতী’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, ৫১-৬১, ১১৫

‘কর্মদেবী’, ৫২

‘কাক্ষী কাবেরী’, ৫২

‘কুমারসম্ভব’, ৫২

গুপ্তকবির সঙ্গে মিল-

অমিল ৫৩-৫৪

ছন্দে ভাবমুক্তির প্রয়াস ৫৫

‘নীতি কুসুমাঞ্জলি’ ৫২

‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ ৫২, ৫৪, ৬০

প্রবহমান পয়ার-প্রসঙ্গ ৬০-৬১

বাইশমাত্রার পংক্তি ৬০

মহাপয়ার রচনা ৫৬, ৫৭

‘শ্রুসুন্দরী’ ৫২

স্তবক রচনা ৫৮

রজনীকান্ত সেন ১৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬, ৫৮, ১৬৫-৭৩,

১৮৬

‘কড়ি ও কোমল’ ৩৮, ১৬৫, ১৬৮,

১৭০-৭১, ১৮৬

‘কবি কাহিনী’ ১৬৫	কাব্যে মূলক (ভাঙা
কলাবৃত্তের সূচনা ১৬৯-৭১	অমিত্রাক্ষর) ১৫০
‘কাল মৃগয়া’ ১৬৬	নাট্যসংলাপে মূলক ১৫১
গদ্যকবিতা ১৫৬	পদ্য পৌঙ্ক্তিক পদ্য-গদ্য
‘ছবি ও গান’ ১৬৬	(গদ্য-কবিতা) ১৫৪-৫৫
‘তারকার আত্মহত্যা’ ১৬০,	‘বঙ্গভূষণ’ ১৫৮
১৬৭*	‘বিক্রমাদিত্য নাটক’ ১৫৭
তিনমাত্রার চাল ১৪৭*	ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ১৫০
দলবৃত্তের ব্যবহার ১৭১-৭২	সনেট ১৫৮
নবরীতির ছন্দ ১৬৮	‘হরধনুর্ভঙ্গ’ ১৫১-৫৩, ১৬০
‘নলিনী’ ১৬৬	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৭৯-৮০, ১৮৭
‘নীলখাতা’ ১৬৬	‘কবিতামালা’ ১৭৯
পদাবলীর লঘু-গুরু ছন্দ ১৬৫	‘কাব্যকলাপ’ ১৭৯
‘পুনশ্চ’ ১৫৫	‘মিত্রবিলাপ’ ১৭৯
‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ ১৬৬	‘মেঘদূত’ ১৭৯
‘প্রভাতসঙ্গীত’ ১৬৫, ১৬৬	‘যৌবনোদ্যান’ ১৭৯
‘ফুলবালা’ ১৬৯-৭০	স্পেনসেরীয় স্তবক ১৮০
‘বনফুল’ ১৬৫	রাজনারায়ণ বসু ৬৫
‘বাল্মিকী প্রতিভা’ ১৬৬	‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’
‘ভগ্নহৃদয়’ ১৬৫	(রামরাম বসু) ৪৩
‘ভানুসিংহ ঠাকুরের	রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৫২*
পদাবলী’ ১৬৫, ১৭২, ১৮৬	‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ ৫২*
‘মানসী’ ১১৭	‘রানা প্রতাপ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
‘মালতীপুথি’ ১৬৬	রাধামোহন সেন ৪৪, ৪৫, ৫০
মূলকের আভাস ১৬৬-৬৭	‘সঙ্গীত তরঙ্গ’ ৪৪
‘লিপিকা’ ১৫৫, ১৫৬*	‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’ ৪৪
‘লেটস ডায়েরী’ ১৬৬	‘রাবণ বধ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
‘শৈশব সঙ্গীত’ ১৬৫	রামগতি ন্যায়রত্ন ৫২*
সনেট ১৬৭	রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৪৬, ৫০
‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ ১৬৬	পঞ্চাবলী ছন্দ ৪৬
‘হিন্দুমেলা’ উপহার ১৬৫	রামনারায়ণ তর্করত্ন ৪৫, ৫০
রাজকৃষ্ণ রায় ১৫০-৫৮, ১৮৫	‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ ৪৫
আভিনয়িক পদ্য পঙ্ক্তিক	রামপ্রসাদ সেন ২৬-২৭, ৩০, ৪৮, ৪৯
গদ্য ১৫৭	কলাবৃত্ত ২৭, ৩০

দলবৃত্ত ২৬
 মিশ্রবৃত্ত ২৬
 সংস্কৃত ছন্দ ২৭
 রামপ্রসাদী গীত ২৬-২৭
 রাম বসু ২৭, ৩০
 রামমোহন রায় ১* ৪৩, ৫০
 ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ ১*
 ব্রহ্মসঙ্গীত ৪৩
 রামরাম বসু ৪৩, ৫০
 রামায়ণ গান ১৩, ৩০, ৪২
 ‘রামের বনবাস’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘রূপ সনাতন’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘রৈবতক’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৪১
 ‘রোমিও জুলিয়েট’ (হেমচন্দ্র) ১২৪

লঘুগুরু ছন্দ ১৩০-৩৩

লঘুযতি ৩
 ‘ললিত কবিতাবলী’ (বলদেব
 পালিত) ১৭৩
 ‘ললিতা । পুরাকালিক গল্প । তথা মানস’।
 (বঙ্কিমচন্দ্র) ১৭৮
 ‘লিপিমাল্য পুষ্টক’ (রামরাম বসু) ৪৩
 লোচনদাস ১৮, ৩০
 পদাবলীর দলবৃত্ত ১৮
 লৌকিক গান ও ছড়া ২৯, ৩১
 লৌকিক দলবৃত্ত ৬, ১৮, ১৯, ৩০

‘শাক্তুল্লা’ (বিদ্যাসাগর) ৫৩*

‘শঙ্করাচার্য’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 শচীন সেনগুপ্ত ১৬২
 শশিশেখর ১৬, ৩০
 পদাবলীর কলাবৃত্ত ১৬
 ‘শর্মিষ্ঠা’ (মধুসূদন) ৬০

শিখরিণী ১২০
 শিষ্টকাব্য ৫০
 ‘শ্রুসুন্দরী’ (রঙ্গলাল) ৫২
 শেকস্পীয়র ৬৭-৭১, ৯৫-৯৬, ১০০
 ব্রাহ্মভার্স ৬৭-৭১
 সনেট ৯৫-৯৬, ১০০
 ‘শৈশব সঙ্গীত’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫
 ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ (বড়ু চণ্ডীদাস) ৩০
 ‘শ্রীমদ্ভাগবত গীতা’ (নবীনচন্দ্র সেন) ১৩৭

যটকল পর্ব ৫

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ৬

সংস্কৃত ছন্দ ৬, ১৬, ২৫, ১১৯-২৩,
 ১২৭, ১৩০-৩৩, ১৭৩, ১৭৪,
 ১৭৯, ১৮৪
 উপজাতি ১৭৩
 চৌপদী শ্লোক ১২৭
 তৃণক ২৫
 তোটক ১৭৯
 দুর্মিল ২৫
 প্রিয়ংবদা ১২২
 বসন্ততিলক ১
 ভূজঙ্গপ্রয়াত ২৫
 মন্দাক্রান্ত ১১৯-২০
 মালিনী ১২৩, ১৭৪
 শিখরিণী ১২০
 হরনর্তন ১৬

সংস্কৃত লঘু-গুরু ছন্দ ১৩০-৩৩

‘বৃহৎসংহারের লঘু-গুরু ছন্দ ১৩০
 ‘দশমহাবিদ্যা’ লঘু-গুরু ছন্দ ১৩২
 সজনীকান্ত দাস ৬৪
 ‘সৎনাম’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘সম্ভাবশতক’ (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) ১১৩-১৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১*
 সনেট ৯২-১০২, ১৫৮, ১৩৭
 সনেট পরম্পরা ১০১
 ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৬
 সমিল প্রবহমান ছন্দ ১০৯
 সমিল প্রবহমান মহাপয়ার
 (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ১২৩
 সপ্তকল পর্ব ৫
 সরল কলাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) ৪
 ‘সাগর সঙ্গমে’ (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) ১৮১
 ‘সাধের আসন’ (বিহারীলাল) ১৪৬, ১৪৮
 সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯
 ‘সারদামঙ্গল’ (বিহারীলাল) ১৪৮-৪৯
 ‘সিন্ধুদূত’ (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ১৮২
 ‘সিরাজদ্দৌলা’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 সিলেবল্ (দল) ১*
 ‘সীতার বনবাস’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘সীতার বিবাহ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 ‘সীতা হরণ’ (গিরিশচন্দ্র) ১৫৯
 সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৭৮-৭৯
 মহিলা ১৭৮-৭৯
 সেন্টস্বেরী ৫২, ৬৭-৬৮, ৭২,
 ৯৫, ১০১
 সেস্টিনা ৮
 স্তবক ৮
 স্পেনসেরীয় স্তবক ১৮০
 ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)
 ১১৯-২৩
 স্বরবৃত্ত (দলবৃত্ত) ৪*
 স্যাকভিল (গরবোডাক) ৫২
 ‘হরধনুর্ভঙ্গ’ (রাজকৃষ্ণ রায়) ১৫২
 হরনর্তন ১৬*

হরিনাথ মজুমদার (কাক্সাল
 ফিকিরচাঁদ) ১৭৬-৭৭, ১৮৬
 হরুঠাকুর ২৭, ৩০
 ‘হিন্দুমেলা’ উপহার’
 (রবীন্দ্রনাথ) ১৬৫
 হিরোইক ব্লাঙ্কভার্স ৮৬
 হিরোইক্ ভার্স ৮৬
 ‘হতোমর্প্যাচার নক্সা’
 (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ১৫১
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪-৩৬, ১৮৫
 কলাবৃত্তের আভাস ১৩৩
 ‘চিত্তবিকাশ’ ১২৪
 ‘চিত্ততরঙ্গিনী’ ১২৪
 ‘ছায়াময়ী’ ১২৪
 ‘দশমহাবিদ্যা’ ১৩১-৩৩
 ‘নলিনী বসন্ত’ ১২৪-২৬, ১৬০
 প্রবহমান পয়ার ১২৯
 ‘বিবিধ’ ১২৪, ১৩৩-৩৪
 ‘বীরবাহু কাব্য’ ১৪৬*
 ‘বৃত্তসংহার’ ১২৪, ১২৭-৩১
 ‘রোমিও-জুলিয়েট’ ১২৪
 লঘুগুরু ছন্দ ১৩০-৩৩
 লৌকিক দলবৃত্ত সংলাপ ১৩৪-৩৫
 সংস্কৃত-প্রভাবিত ছন্দ ১৩১-৩৩
 স্তবক রচনা ১৩৫
 ‘হেলেনা কাব্য’ (আনন্দচন্দ্র মিত্র) ১৮২

A History of English
 Prosody (Saintsbury) ৫২,
 ৬৭-৬৮, ৭২, ৯৫, ১০১

Acephalous ৭০

Alexandrine ৯১

Anapaest ৭০

Anglo-Saxon Words ৬৮, ৭২

Couplet ১০০

D. G. Rosetti ৯৫

Doggrel ৬৮

G. Saintsbury দ্র. সেন্টস্বেরী

Gorboduc ৫২

Heroic measure ৬৬, ৯১,

১৫৯, ১৬০

Heroic Verse দ্র. হিরোইক্

ভার্স ৮৬

Heroic Blank Verse

দ্র. হিরোইক ব্লাঙ্কভার্স ৮৬

Hexometer ৯১

Iambic ৭০

I. A. Richards ১*

Lord Buckhurst (Gorboduc)

(Sackville) ৬৬

Principles of Literary Criticism

(I. A. Richards) ৫*

Pyrrhic ৭০

Rhyme ৮

Rich ৮

Feminine ৮

Inverse ৮

Cross ৮

Interlace ৮

Sonnet sequence দ্র. সনেট

পরম্পরা ১০১

Spencer ৬৮

Spondee ৭০

Theodore Watts Dunton

(Sonnet) ৯৫

The House of Life (Rosetti) ৯৫

Timothy Penpoem

(মধুসূদন) ৯৩

আধুনিক বাংলা ছন্দ দ্বিতীয় পর্ব

নিবেদন

‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ গ্রন্থটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৭৯-৮০) পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখে, দে’জ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে (১৯৬২) শ্রী: ১৮৫৮ থেকে ১৯৫৮ — এই একশ বছরের বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৭৯) এই কালসীমা শ্রী ১৮৩১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। ইচ্ছা ছিল, বর্তমান সংস্করণে বাংলার সাম্প্রতিক কবিদের (১৯৫০-১৯৯০) সম্পর্কে আরও একটু বিশদ করে দুটি প্রবন্ধ লিখে, যোগ করব। কিন্তু লিখতে বসে মনে হল, এ-কালের ছন্দমনস্ক বিশিষ্ট কবিদের প্রতি সুবিচার করতে হলে দুটির বেশি প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। সুতরাং এঁদের সম্পর্কে গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব রূপে আর একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্র-ছন্দ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনারও পরিকল্পনা রয়েছে। বস্তুতঃ, এ-দুটি গ্রন্থ রচিত হবার পরই আধুনিক বাংলা ছন্দের ইতিহাস রচনা-পর্ব সম্পূর্ণ হবে। আলোচ্য গ্রন্থের ‘পরিশিষ্ট খ’ হিসাবে এখানে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দ-মনস্কতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ যোগ করা হল।

পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায়, এবারেও গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে ‘বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপ’ এবং ‘বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ’ সংক্ষেপে সূত্রাকারে আলোচনা করে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ (১৮৩১-১৮৫৮) থেকে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগ (১৮৭৩-১৮৯০) আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রযুগ-আদিপর্ব (১৮৯০-১৯০০) থেকে সাম্প্রতিক যুগ (১৯৫৮-১৯৭৮) পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ের পর একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) বাংলা কাব্যছন্দের বিবর্তন ও ভাবী সম্ভাবনা আলোচিত হয়েছে।

এবারে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে, কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত আমার ছন্দশিক্ষার গুরু, ছন্দাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের (১৮৯৭-১৯৮৬) অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছি। পূর্ববর্তী দুটি সংস্করণের সববিধ পরিকল্পনায় তাঁর সম্মেহ উপদেশ লাভ করছি। এবারে সেই দুর্লভ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল। এই সংস্করণেও তাঁরই প্রবর্তিত সর্বাধুনিক ছন্দ-পরিভাষা ব্যবহার করা গেল। যাঁরা এককালে তাঁরই দ্বারা প্রবর্তিত এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত, বাংলা ছন্দরীতির মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত, — এই তিন নামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা ওই তিন নামের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত নাম তিনটি মনে রাখলেই এ-গ্রন্থ পাঠে অসুবিধা বোধ করবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি,

গ্রন্থটির বর্তমানে দে'জ-সংস্করণ প্রকাশে শ্রীসুধাংশুশেখর দে আন্তরিক আগ্রহ না দেখালে,
বইটির এত তাড়াতাড়ি পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হত না।

অনবধানতা বশত: দু'একটি, মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। তবে সেগুলি
এমন কিছু মারাত্মক নয়। পাঠক নিজেই সংশোধন করে পড়তে পারবেন।

১৫ আগস্ট, ১৯৯৫

নীলরতন সেন

বি ১০/২৪৭,

কল্যাণী, নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ। ৭৪১২৩৫

ছন্দ-মনস্ক কবি কবিরুল ইসলাম
এবং
কবি-ছান্দসিক উত্তম দাশ
প্রীতিভাজনেষু

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাকবিন্যাসের নাম ছন্দ। আমাদের নিত্যকথিত বা গঠিত গদ্যভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত রূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।

পদ্যছন্দও সংগীতের ন্যায় একটি ধ্বনিশিল্প। কিন্তু সংগীত মূলত: বাক নির্ভর নয়। যন্ত্রসংগীতই তার প্রমাণ। উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীতও অনেকাংশেই বাকনিরপেক্ষ। কিন্তু পদ্যছন্দ একান্তভাবেই বাকনির্ভর। আমাদের নিত্যকথিত ও পঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শ্রুতিই পদ্যছন্দের মূল আশ্রয়।

(প্রবোধচন্দ্র সেন, নূতন ছন্দ-পরিক্রমা, প্রথম অধ্যায়)

পদ্যছন্দকে কখনো-কখনো আমরা ভেবেছি জীবনমুখিতার পথে মস্ত বাধা। ভেবেছি যে, কবিতাকে সত্যে ও ব্যাপ্তিতে পৌঁছে দেবার জন্য খুলে দেওয়া চাই এই বাধা, পদ্যছন্দের ঘব থেকে তাকে এনে দেওয়া চাই একেবারে গদ্যছন্দের পথে। ভেবেছি, এরই নাম মুক্তি।

কিন্তু কেবল এইটুকুই নয়। হয়তো আরও একরকম প্রাচুর্য মুক্তি সম্ভব। ছন্দ থেকে নয়, ছন্দের মধ্যেই আছে সেই মুক্তি: ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও। কখনো-বা চলে আসা যায় সেই বারান্দায়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো ভেঙে দেওয়া যায় তার শুকনো নিয়ম, মিটিয়ে দেওয়া যায় গদ্যপদ্যের পরোক্ষ বিরোধ। এক হিসেবে, আধুনিক ছন্দের ইতিহাস হলো বিরোধমীমাংসারই ইতিহাস।

(শঙ্খ ঘোষ, ছন্দের বারান্দা, ভূমিকা)

রবীন্দ্র যুগ আদি পর্ব (১৮৯০-১৯০০)
রবীন্দ্রনাথ (১৯০০ পর্যন্ত) দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় কুমার
স্বর্ণকুমারী মানকুমারী কামিনী রায়

॥ ক ॥

১৮৯০ থেকে কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা কাব্য-আসরে রবীন্দ্রনাথ একছত্র অধিপতির সম্মান লাভ করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও মৌলিক প্রতিভার দানে সমকালীন অন্যান্য কবি তাঁর পাশে লান হয়ে পড়েছেন। ‘ছন্দোক্তরু রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ঐশ্বর্যদীপ্তির নিপুণ এবং বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। সে কারণে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্র ছন্দের অপরিহার্য মূল সূত্রটুকু উল্লেখ করে, — তার পাশে অপেক্ষাকৃত লান, বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত অন্যান্য কবিদের ছন্দোবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

আলোচ্য পর্বকে রবীন্দ্র-ছন্দের আদি পর্ব বলা যেতে পারে। এই পর্বেই কবি কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত, — আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি ফসলে কবিতার সাজি পূর্ণ করে কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন। ছন্দ বিচারে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্য ও নাটকগুলি হল : রাজা ও রাণী, মানসী (১৮৯০), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদ (১৮৯২), সোনার তরী (১৮৯৪), বিদায় অভিষাপ (১৮৯৪), মালিনী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), কথা ও কাহিনী (১৯০০), কল্পনা (১৮৯০)।^১ প্রস্তুতি পর্বের (১৮৭৩-১৮৯০) শিক্ষানবিশী পর্যায় শেষ করে এই সময় থেকে তিনি বাংলা ছন্দে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার এনে দিলেন। এই পর্বের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মানসী’তেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী যুগে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতায় (বিরহ, গান)

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ছন্দোবদ্ধ নাটকগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ধরে আদি, মধ্য এবং অন্ত্য পর্বভাগে ভাগ করা হল। প্রকৃত রচনাকাল ধরলে এই তারিখের সামান্য অদলবদলের সম্ভাবনা আছে। তাঁর সমস্ত কবিতার সঠিক রচনাকাল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হল না, — সে কারণেই সম্ভ্রিত রক্ষার জন্যে সর্বত্রই গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরা হল। আমাদের আলোচনার পক্ষে তাতে বেশী কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটেনি বলেই অনুমান করি।

কলাবৃত্ত ছন্দের
ব্যবহার

কলাবৃত্ত রীতির সার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এই রীতির ব্যাপক স্বীকৃতি মানসীর কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল। ১৮৮৭ তে (বৈশাখ) লেখা ‘ভুলভাঙ্গা’ কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে কবি লিখলেন,—

চেয়ে আছে আঁখি নাই ও আঁখিতে
 প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু ‘বন্ধন পাশ’
 বাহতে মোর।

*

‘বসন্ত নাই’ এ ধরায় আর
 আগের মতো,
‘জ্যোৎস্না যামিনী’ ‘যৌবন হারা’
 জীবনহত।

* * * *

মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
‘মর্মে মর্মে’ হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
 হৃদয়ে তোর।

(মানসী ভুলভাঙ্গা)

সমগ্র কবিতাটিতে ‘বন্ধনপাশ’, ‘বসন্ত নাই’, ‘জ্যোৎস্না যামিনী’, ‘যৌবন হারা’ এবং ‘মর্মে মর্মে’ এই পাঁচটি পর্বে যুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন,— সর্বত্রই কবি এই রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ করেছেন।

পাঁচমাত্রা পর্বভাগের কলাবৃত্ত ইতিপূর্বেই কবি ব্যবহার করেছেন। মানসীতে যুক্তবর্ণ-বহুল রুদ্ধদলের উপলভঙ্গে সে ছন্দে অপূর্ব ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হল। ১৮৮৮, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত ‘অপেক্ষা’ কবিতাটি তার প্রথম সার্থক নিদর্শন। সেখানে কবি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—

পাঁচমাত্রা পর্বের
কলাবৃত্ত
ছন্দ

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
 এল না ছায়া তবু।
কুলস ঘায়ে উর্মি টুটে’,
‘রশ্মি রাশি’ ‘চূর্ণি উঠে’,
‘শ্রান্ত বায়ু’, ‘প্রান্ত নীর’
 ‘চুপ্তি যায়’ কভু।

(মানসী অপেক্ষা)

এখানে ‘উর্মি টুটে’, ‘রশ্মি রাশি’, ‘চূর্ণি উঠে’, ‘শ্রান্ত বায়ু’, ‘প্রান্ত নীর’, এবং ‘চুপ্তি যায়’ পর্বগুলিতে যুক্তাক্ষর দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করেছেন। এই সময়ে (জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮) ছয়মাত্রার পর্বেও কবি যুক্তবর্ণ দ্বিমাত্রক রূপে বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন।

কলাবৃত্ত রীতিতে আট, ছয় বা দশ মাত্রার (৩+৩+৪) দীর্ঘ পদযতি তেমন সফল হয় না। লঘু পর্বযতিতে বিভক্ত না করলে এই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ-রীতি সুস্পষ্ট হতে পারে

না। রবীন্দ্রনাথ অল্পস্বল্প হলেও পয়ার-ত্রিপদী বন্ধে, ও ছন্দের পরীক্ষা
কলাবৃত্ত মানসীর দু একটি কবিতায় করেছেন। ত্রিপদী সর্বাংশে নিখুঁত না
পয়ার-ত্রিপদী হলেও পয়ারবন্ধ অনেকাংশে সফল হয়েছে। যেমন—
নিম্নে যমুনা বহে সচ্ছ শীতল।
উর্ধ্বে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহুর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার।

(মানসী নিষ্ফল উপহার)

চোদ্দমাত্রা-পংক্তির কলাবৃত্তে ৮||৬ I মাত্রাভাগের তুলনায় ৬||৮ I মাত্রাভাগ কবি বেশী ব্যবহার করেছেন। তার কারণ, ৬||৮ I ভাগকে ৬||৬২ I পর্বভাগে উচ্চারণ করে কলাবৃত্ত রীতির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ সহজে রক্ষা করা যায়।

সাত মাত্রার পর্বভাগে কবি যুক্তবর্ণ কম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পর্বের কলাবৃত্তে সাতমাত্রার শব্দ-বিন্যাসে এবং অনুপ্রাস ধ্বনি-সৌন্দর্যে বৈচিত্র্য এনেছেন।

(৩+৪)-পর্ব যেমন,—

নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সেতো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদি মাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে।

(মানসী বিরহানন্দ)

পর পর দুটি সাত মাত্রার পর্বে যথাক্রমে ৩+৪ এবং ৪+৩ মাত্রার শব্দবিন্যাস এবং সেই সঙ্গে দুই পর্বের দুটি চতুমাত্রক শব্দে মিলবিন্যাস ছন্দে নতুনতর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে।

২। ১৮৯০তে প্রকাশিত ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ৬৮টি কবিতার মধ্যে ৩০টি কলাবৃত্ত ছন্দে লিখিত। তার মধ্যে প্রাথমিক চারটি কবিতা (ভুলে, ‘বিরহানন্দ’, ক্ষণিকমিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা) যুক্তবর্ণহীন। বাকি সবই যুক্তবর্ণবহুল। ত্রিপদী (কবির প্রতি নিবেদন) ও চৌপদী (নব বঙ্গদম্পতির প্রেমলাপ)-বন্ধ রচনায় দুটি কবিতায় উচ্চারণের দুর্বলতা লক্ষিত হয়। পদপ্রধান (৮, ৬ ও ১০ মাত্রা) ছন্দে এই রীতির ব্যবহার সম্পর্কে কবির দ্বিধা এখনও কাটেনি।

তিন মাত্রার শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কলাবৃত্ত ছন্দে তিন বিহারীলালের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে, উল্লেখ করেছি।^৩ তিন মাত্রার মাত্রার শব্দ প্রয়োগ শব্দ কলাবৃত্ত ছন্দে যে অস্থির গতিবেগ সৃষ্টি করে আলোচ্য যুগের কল্পনা কাব্যগ্রন্থের ‘ভ্রষ্টলগ্ন’ কবিতাটিতে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে। প্রসঙ্গতি পর্বের কবিতা থেকেও আমরা ইতিপূর্বে উদাহরণ তুলেছি।

এ যুগে মিলবিন্যাসে, পর্ব ও পদের গঠনবৈচিত্র্য এবং রুদ্ধদলের তরঙ্গ-ভঙ্গে মিশ্র কলাবৃত্তের রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেও ঐশ্বর্যপুষ্ট করে তুলেছেন। এই সময়ে ঐশ্বর্য রচিত অনেকগুলি প্রখ্যাত কবিতায় (যেমন, ‘মানসী’র মেঘদূত বা ‘সোনার তরী’র বসুন্ধরা ও মানসসুন্দরী প্রভৃতি), রাজা ও রাণী (১৮৮৯) এবং বিসর্জন (১৮৯০) নাটকে, চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) এবং মালিনী (১৮৯৬) গীতিনাট্যে, বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), গান্ধারীর আবেদন এবং কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০ : কাহিনীর অন্তর্গত) নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার (সমিল ও মিলহীন) ব্যবহার করেছেন। রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন নাটকে এই ছন্দপ্রয়োগ সর্বাংশে সৃষ্ট হয়নি। পংক্তিপ্রান্তিক উপযতি বা লঘুযতি অনেকসময় মধুসূদনের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। চিত্রাঙ্গদা বা মালিনীতে এ দুর্বলতা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছেন। নাট্যসংলাপ এবং কাব্যের প্রবহমান পয়ার কিছুটা ভিন্নধর্মী হওয়াই অভিপ্রেত। রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে এই পার্থক্য রেখেছেন মনে হয় না। তবে তুলনাত্মকভাবে বলা যায়, সংলাপধর্মী বাক্যাংশে কাব্যধর্মী বাক্যাংশের তুলনায় যতিভাগ কিছুটা হ্রস্বমাপে রেখেছেন। দীর্ঘতর বাক্যাংশে ভাবপ্রবহমানতা কত সংহত, ধ্বনিগঞ্জীর গতে পারে ‘মেঘদূত’, ‘বসুন্ধরা’, ‘সমুদ্রের প্রতি’ (দ্র. মানসী ও চিত্রা কাব্য ১৬ এবং ১৮ মাত্রার পংক্তি) প্রভৃতি কবিতায় তার পরিচয় মেলে। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মধুসূদন

মিলটনের আদর্শে ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ রচনায় Miltonic Blank-verse এর ধ্বনিগত বিস্কৃদ্ধতা এবং তরঙ্গায়িত উত্থানপতন পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। কাব্যের বিষয়বস্তুর ন্যায় ছন্দেও অনেক বেশী বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই বিজোড় মাত্রায় যতিস্থাপনে বা পংক্তিপ্রান্তিক লঘুযতি বিলোপে মধুসূদন দ্বিধাবোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ভাবের দিক থেকে বিদ্রোহের এমন বিপুল উচ্ছ্বাস যেমন আনতে চাননি, ছন্দেও এতটা বিপ্লবী মনোভাব পছন্দ করেননি। সে কারণেই তাঁর পরিণত প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ছন্দোবন্ধে অনেক বেশী সুনির্দিষ্টতা লক্ষিত হয়। মিশ্রবৃত্তের সংযত সৃষ্ট প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার ছন্দকে অনেকাংশে নমনীয় করে তুলেছেন। দুই

কবির ক্লাসিক এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য তাঁদের কাব্যের ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও পৃথক শিল্পীমনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে। মধুসূদন ঘটনাবলী ও চরিত্রচিত্রণে উচ্ছ্বাসময় আকস্মিক উত্থানপতনের মহিমান্বিত অভিব্যক্তি বা Grandeur প্রকাশ করতে গিয়ে অপ্রচলিত যুক্তাক্ষরবহুল, ধ্বনিবন্ধুর শব্দ প্রয়োগ করেছেন, বাক্যগঠনে দূরত্ব এনেছেন, উচ্ছ্বাস-প্রকাশক চিহ্ন (প্রশ্ন, বিস্ময়, ক্ষোভ, মুগ্ধতা-সূচক) বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এমনতর কৌশল আদৌ পছন্দ করেননি। কেবলমাত্র মননধর্মী কবিত্বময় ভাবপ্রবাহী ধ্বনিতরঙ্গকে পংক্তি অতিক্রম করে চলবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। পংক্তিপ্রান্তে লঘুযতি, অন্ততঃপক্ষে উপযতি প্রায় সর্বত্রই রক্ষা করেছেন। সে কারণেই পংক্তিপ্রান্তে মিল রেখে তাঁর প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার রচনার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। এখানে ‘মেঘদূত’ (এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা) কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নব বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষণ
নব বৃষ্টি বারিধারা, করিয়া বিস্তার
নব ঘন স্নিগ্ধছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দের,
স্বীতি করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিনীসম॥

কত কাল ধরে
কত সঙ্গিহীন জন প্রিয়াহীন ঘরে
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত তারা শশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে॥

(মানসী মেঘদূত)

প্রবহমান পয়ারে পংক্তি-অনুচ্ছেদ রচনায় মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। মধুসূদন পংক্তির মাঝে অনুচ্ছেদ শেষ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবহমানতার দিক থেকে এ-রীতিই স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছেন এবং চৌদ্দপংক্তিক সনেট রচনায়ও এ-রীতি প্রয়োগ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, মধুসূদন-

প্রবর্তিত ক্লাসিক রচনাভঙ্গী এবং তার উপযোগী প্রবহমান পয়ার-রীতি পরবর্তী কবিরা আর পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। এত উঁচু পর্দার কাব্য বা তদুপযোগী ছন্দ হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র — কেউই পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের রোমান্টিক কবিদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত নীচু পর্দার ভাষা ও ছন্দ প্রবহমান রীতিতেই সৃষ্টি করলেন। বস্তুতঃ এ-যুগে এবং পরবর্তী যুগে কবিরা প্রবহমান পয়ার ব্যবহারে রবীন্দ্র-রীতিরই অনুসরণ করেছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই মুক্তক রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। নাট্যসংলাপের উপযোগী গৈরিশ মুক্তকের পাশে কবিতা রচনার উপযোগী রবীন্দ্র মুক্তকের নিদর্শন হিসেবে এ-যুগে রচিত মানসীর অন্তর্গত ‘নিষ্ফল কামনা’ (১৮৮৮, নভেম্বর) কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।^৪ গৈরিশ নাট্যসংলাপী মুক্তকের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যবহৃত মুক্তকের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নাট্যসংলাপে ‘action’ সৃষ্টির জন্য, বিচিত্র নর-নারীর চরিত্রগত ভাব পরিস্ফুটনের জন্য নাট্যকার যতিস্থাপনে যে আকস্মিকতা এনেছেন, কবির কাব্যে বর্ণনাত্মক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুটনে যতির সেই আকস্মিকতা বিশেষ নেই। সংলাপী মুক্তকে গদ্য ভাষার বাকধর্ম যতো স্পষ্ট, সে তুলনায় কাব্যের মুক্তকে ছন্দোময় ধ্বনিপ্রবহমানতাই বেশী পরিস্ফুট হয়। একটিতে, নাট্যকার স্বয়ং নেপথ্য থেকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে মর্তমানবের জীবন-সংঘাত পরিস্ফুট করতে চান বলে বাক্যগুলি ছোটবড়ো যতিভাগে বিভক্ত হয়ে আলাপে অভিব্যক্তি নিয়ে ফুটে ওঠে; অপরটিতে, কবি তার কাব্য-জগতের তন্ময় ভাবনাকে গভীর উপলব্ধির ছন্দোময় প্রকাশনায় পরিস্ফুট করতে চান বলেই শব্দচয়নে, শব্দগ্রহণে, যতিসংস্থাপনে অনেকাংশে মসৃণ ধ্বনি-তরঙ্গের অনুভূতি জাগে। নাট্যসংলাপে নাট্যকার অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচ্চারণ-মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি জানেন, অভিনয়কারীদের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে সংলাপী অভিনয়-মাধ্যমে পরিবেশন করতে হবে। সেখানে ঋজু, বলিষ্ঠ, সহজ অর্থবাহী, ছোট ছোট আবেগমুখর বাক্যাংশে গ্রহিত ছন্দোময় ধ্বনিতরঙ্গই বেশী কার্যকরী হবে। — নাট্যকার তাঁর রচনায় এই ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন থাকেন। সে তুলনায় কবি একান্তভাবে আপন ভাবনাশ্রিত প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শব্দ, ছন্দ ও যতির সংমিশ্রণে একটি সামগ্রিক সৃষ্টিকে পাঠকের কাছে উপহার দেন। সে কারণেই কবির অন্তরস্থিত সমস্যা বোধ নাট্যকারের তুলনায় অনেকটা অবচেতন এবং সূক্ষ্মতর হয়ে থাকে। বাইরের ঘটনাগত সংঘাতের তুলনায় অন্তরের গভীর সূক্ষ্ম সুর-তরঙ্গ সেখানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

৪। ১৮৮২-তে রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রথম মুক্তক সংলাপ ব্যবহার করেন। এই ছয় বছরে নাট্যকার অন্ততঃ ১০খনি নাটকে মুক্তক সংলাপ ব্যবহারের দ্বারা সংলাপধর্মী মুক্তকের একটি আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন।

সবদিক বিচারে একথাই বলা চলে, গিরিশচন্দ্র নাট্যকার ছিলেন বলেই তাঁর মূল্যকে একটু বেশী ধ্বনির উচ্ছ্বাস, যতির আকস্মিকতা, শব্দ উচ্চারণে কিছু আড়ম্বর লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রমূল্যকে ধ্বনি নমনীয় হয়েছে, তরঙ্গায়িত হয়েছে, যতিবোধে আকস্মিকতার চমক নেই, শব্দ উচ্চারণে সুরের সূক্ষ্ম সঙ্গতি রয়েছে।—এ মন্তব্য শুধু এই পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের দু-একটি মূল্যকবিতা সম্পর্কে নয়,—পরবর্তী পর্বে রচিত বলাকার কবিতা সম্পর্কে সমধিক প্রযোজ্য। গৈরিশ মূল্যকের উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি। এখানে ‘নিষ্ফল কামনা’ কবিতা থেকে রবীন্দ্র-মূল্যকের কিছুটা নিদর্শন তুলছি।—

খুঁজিতেছি—কোথা তুমি

কোথা তুমি।

যে-অমৃত লুকানো তোমায়

সে কোথায়।

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে

বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন

স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,

ওই নয়নের

নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি

আত্মার রহস্য শিখা।

তাই চেয়ে আছি।

প্রাণমন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি

অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে।

(মানসী নিষ্ফল কামনা)

প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনা শুরু করেছিলেন এবং ‘কড়ি ও

কোমলে’ বিভিন্ন আঙ্গিকের অনেকগুলি সনেট রচনা করেছিলেন।

সনেট আলোচ্য পর্বেও তিনি শতাধিক সনেট রচনা করেছেন। তার মধ্যে

রচনা ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৬৭টি সনেট উল্লেখযোগ্য। পূর্বযুগের

তুলনায় এ যুগের সনেটে কবি গতানুগতিক পাশ্চাত্য (পেত্রার্কীয়, ফরাসী বা শেকসপীয়রীয়)

আঙ্গিক বহুলাংশে বর্জন করেছেন। ‘A sonnet is a wave of melody’ অথবা ‘a

moment’s monument’ ওয়াটস বা রসেটির এই ভাবসূত্রটুকু গ্রহণ করে, চৌদ্দ পংক্তির

পরিমাপ রক্ষা করে,—বহিরঙ্গের আর সমস্ত আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ এ যুগে বর্জন করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গঠনের দৃঢ়তায়, ভাবের স্পন্দমান প্রগাঢ়তায় বহুল-শাসিত শকুন্তলার

পিণ্ড যৌবন-চিত্রটিই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়। অষ্টক-ষট্ঠক স্তবকভাগ বা মিলের

বিশিষ্ট রীতি এই পর্বে রচিত প্রায় কোনও সনেটেই কবি রাখেননি। স্তবক গঠনে

স্তবক গঠনে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃন্দের তুলনায় এই পর্বের মিশ্রবৃত্তে কিছু বেশী

বৈচিত্র্য ঐশ্বর্যই এনেছেন দেখা যায়। শুধু কয়েকটি নামোল্লেখ করেই আমরা

এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করছি। এ-প্রসঙ্গে কবির ‘প্রকৃতির প্রতি’ (মানসী), ‘উর্বশী’ (চিত্রা), ‘উৎসব’ (চৈতালি), ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’ (কথা ও কাহিনী) কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য।

গভীর ভাবের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দ গভীর ভাবাত্মক কবিতায়ও কবিতায় দলবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। কথা ও কাহিনীর ‘নকলগড়’ এবং ছন্দ ব্যবহার ‘হোরিখেলা’, কল্পনার ‘হতভাগ্যের গান’ প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হোরিখেলা কবিতায় দীর্ঘ দ্বিপদী (১০||১০ I) এবং দীর্ঘ চৌপদী (১০||১০||১০||১০ I) পংক্তিসমন্বে ত্রিপংক্তিক স্ববক রচনাতেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আলোচিত পর্বের রবীন্দ্র-ছন্দ বিশ্লেষণ দেখা গেল, তিনি কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের সার্থক প্রয়োগ করে ছন্দের একটি নবীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করলেন; মিশ্রবৃত্তেও নবরীতির প্রবহমান পয়ার এবং মুক্তক রচনায় সফল হয়েছেন। দলবৃত্তেও গভীর ভাবের কবিতা রচনা করে এ ছন্দের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। লক্ষ করবার বিষয় হল, তাঁর এই সকল নতুন ছন্দরীতির পরীক্ষা সম্পর্কে সমকালীন অধিকাংশ কবিই ঊনবিংশ শতকে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দেননি। প্রায় প্রত্যেকেই গতানুগতিক ভাবে মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন, কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমে পৌঁছে তাঁরা ছন্দের দিক থেকে মুখ্যত রবীন্দ্রনাথকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

॥ খ ॥

রবীন্দ্রনাথের পাশে আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী এ যুগের দাসী (১৮৫৮-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), অন্যান্য কবিগণ মানকুমারী বসু, (১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯), এবং প্রমীলা নাগের (১৮৭৬-১৮৯১) নাম উল্লেখযোগ্য। কবিত্বের দিক থেকে উল্লিখিত প্রায় প্রত্যেক কবিই স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।—কিন্তু ছন্দের দিকে তেমন মৌলিকত্ব দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে কলাবৃত্ত ছন্দে যে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণরীতি প্রয়োগ করেছিলেন,—অধিকাংশ কবিই বিংশ শতকে না পৌঁছে সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারেননি। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ নাট্যসংলাপ থেকে স্বতন্ত্র, কবিতার উপযোগী যে মুক্তক ব্যবহার করেছেন, এ যুগে কোন কবিই সে ছন্দ ব্যবহারে উদ্যোগী হননি।—অবশ্য গিরিশচন্দ্র (এবং তাঁর আদর্শে অন্যান্য নাট্যকারেরা) নাটকে মুক্তক সংলাপ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই ব্যবহার করছিলেন।—পরবর্তী যুগেও গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মুক্তক-সংলাপ-ধর্মী নাটক লিখিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থে মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। সেখানে অনেকে মধুসূদনের আদর্শে যতিপ্রাপ্তিক

(সমিল ও অমিল) পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ কবির পদ্যবন্ধে পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্যগুলিই লক্ষিত হয়। দলবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণের বিশ্লিষ্টতা কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা এবং কথাকাহিনী কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। লৌকিক দলবৃত্তের এই পরিমার্জিত রূপ অধিকাংশ কবিই আলোচ্য যুগে উপলব্ধি করতে পারেননি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ-যুগে কবিগোষ্ঠী তাদের রচনায় পূর্ববর্তী যুগের উত্তরাধিকারই বহন করেছেন,—রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দের দিক থেকে যে নতুন ধারা প্রবর্তিত হল অধিকাংশ কবিই তাঁদের কাব্যে সে-ছন্দোন্নতি প্রয়োগ করেননি। যাঁরা করেছেন, সেও এই যুগ অতিক্রম করে বিংশ শতকের প্রারম্ভে এসে।—অবশ্য রবীন্দ্র ছন্দোন্নতির পাশে দ্বিজেন্দ্রলাল যে মৌলিক ছন্দোন্নতি প্রবর্তন করেছিলেন, তার প্রথম সূচনা এ-যুগেই (আর্যগাথা ২য় ভাগ, ১৮৯৩) হয়েছিল। তবে তাঁর এই রীতির শ্রেষ্ঠ ফসল আমরা পরবর্তী যুগে পেয়েছি বলেই দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হল।

নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪) কয়েকটি নবীনচন্দ্র দাস গীতি কবিতা লিখেছেন এবং রঘুবংশ, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুন এবং চারুচর্যাশতকের (ক্ষেমেন্দ্র) বাংলা অনুবাদ করেছেন। তিনি মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে পয়ারবন্ধের ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর দুটি যতিপ্রাস্তিক পয়ার-স্তবক এবং একটি সমিল প্রবহমান পয়ারের নিদর্শন তুলছি,—

(১) যতিপ্রাস্তিক পয়ার-স্তবক (ক খ খ ক — মিল)

তব রক্তধরনিভ প্রবাল উপরে,
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কণ্টকমুখে ফুটিয়া আকুল;
ক্লেশে মূড়ে হয়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে।

(রঘুবংশ ১৩ সর্গ সা. সা. চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস পৃ. ১৩)

(২) যতিপ্রাস্তিক পয়ার স্তবক (ক খ খ ক—মিল)

দূর হতে হেরি ওই পম্পা সরোবর
পথশ্রমে যেন নেত্র পিপাসু আমার,
মঞ্জুল বজ্রুল পুঞ্জ পূর্ণ চারিধার,
ঈষৎ নড়িছে মাঝে সারস নিকর। (ঐ পৃ. ১৬)

(৩) সমিল প্রবহমান পয়ার (ক খ ক খ — মিল)

বধূসহ চক্রবাক মিলন আশায়
থাকে বসি, নিশিযোগে তাদের মিলন
না ঘটে নিয়তি বশে, বিরহ ব্যথায়
কাঁদে তারা, দুর্নিবার দৈবের লিখন।

(কিরাতার্জুন ৯ম সর্গ সা. সা. চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস, পৃ. ৩৫)
নবীনচন্দ্র প্রবহমান পয়ার এবং অন্যান্য ছন্দোবন্ধ রচনায় মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের

দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনুমিত হয়।

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮) আলোচ্য যুগের সমস্ত কবির থেকেই স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর গ্রাম্য কবিত্বে যেমন স্বতোৎসারিত, গোবিন্দচন্দ্র
দাস
কিছুটা অমার্জিত, কিন্তু বলিষ্ঠ সরল প্রকাশভঙ্গি ছিল,— ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রথম

কাব্যগ্রন্থ ‘প্রসূন’ (১৮৭০) প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘বৈজয়ন্তী’র প্রকাশকাল ১৯০৫। অবশ্য জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কবির লেখনী সজীব ছিল ; — বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রখ্যাত কবিতা ছড়ানো রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে (১৯৪৮) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় গোবিন্দ চরনিকা নামে বাছাই কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রধানত মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখেছেন। এই যুগে দলবৃত্তের এত বহুল এবং সার্থক ব্যবহার আর কারও কবিতায়ই লক্ষিত হয় না। অধিকাংশ কবি দলবৃত্ত ছন্দকে লঘু কবিতায় বা সংগীতে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবমূলক কবিতায় এ-ছন্দের সার্থক ব্যবহার করলেও এত ব্যাপক ব্যবহার ‘ক্ষণিকা’ (১৯০০) লিখবার পূর্বে সুরু করেননি। তবে কথ্যভাষায় মার্জিতরুচির কবিতা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রথম তাঁরই কবিতা-মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্র দাস পল্লীকবি। পল্লীর মানুষ অকৃত্রিম যে ভাষায় কথা বলে, ছন্দের বাঁধনে সেই ভাষাতে তাদেরই মনের কথা (কিছুটা হয়তো অমার্জিত ভাবেই) আশ্চর্য স্নাচ্ছন্দ্যর সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেছেন। ভাষায় বা প্রকাশভঙ্গিতে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই,— সে কারণেই এ ছন্দ তাঁর হাতে এত স্বাভাবিক এবং সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর দলবৃত্ত রীতির কবিতা পড়লে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায় যে বাংলার কথ্য বাচনভঙ্গির পক্ষে এ-ছন্দ কত স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দময় হয়ে উঠতে পারে। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই এই ছন্দের এত সুষ্ঠু সার্বজনীন প্রয়োগ করেননি। বাংলা ছন্দের ক্রম অগ্রগতির ধারায় সেদিক থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাসের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আলোচ্য যুগে অধিকাংশ কবি রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতায় মধুসূদন-হেমচন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দধারার অনুসরণ করেছেন,—কদাচিৎ দু-একজন কবি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে অগ্রসর হয়েছেন। কোনও কোনও কবি (সম্ভবত রবীন্দ্র-প্রভাবেই) প্রাচীন বৈষ্ণব পদের আদর্শে লঘু-গুরু উচ্চারণে পদ রচনা করেছেন; ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্রের আদর্শে অনেকে কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কৃত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে পর্বযতির স্পন্দিত নৃত্যভঙ্গি এবং কলা-প্রসারণ জনিত গীতিসুর-প্রাধান্য কমিয়ে এ-ছন্দে যে স্বাভাবিক কথ্যভাষার আবেদন পরিস্ফুট করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সেটি উপলব্ধি করেন। তবে তিনি মার্জিত রুচির ভাষায় পরিচ্ছন্নভাবে এ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর স্বভাব কবিত্বের গ্রাম্য রুচিতে তাঁকে যেন আরও সাবলীল, আরও কথ্য বাচনভঙ্গির কাছাকাছি এনে একান্তই পল্লীর মানুষের প্রাণের সামগ্রী করে তুলেছেন। কবির অকৃত্রিম, হয়তো বা কিছুটা অবাস্তবিক রুচিবোধ এ-ছন্দে আরও বলিষ্ঠতা,—প্রকাশের স্বাভাবিকতা এনে দিয়েছে।

দলবৃত্তের স্বাভাবিক
বাক্ধর্মী প্রকাশভঙ্গি

এখানে তাঁর দলবৃত্ত রীতির কবিতা থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত
তুলছি।—

(১) আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা !

“না ভাই তুমি দুষ্ট বড়,

আঁচল টেনে আকুল কর,

তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদলা করে ফেলা!”

চূপ চূপ চূপ, কসনে করে এই এক নূতন খেলা।

[কস্তুরী (১৮৯৫): এই এক নূতন খেলা]

(২) স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয় ;—

এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,

পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?

গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি,

সাগর সৈঁচে মুন্ডা বেছে পরে কেন লয়?

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়!

[নব্যভারত (১৩১৪) পৌষ জন্মভূমি]

(৩) ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

আজ যে আমি উপাস করি,

না খেয়ে শুকায়ে মরি,

হাহাকারে দিবানিশি

ক্ষুধায় করি ছুটফট...

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

(গোবিন্দ চয়নিকা আমার চিতায় দিবে মঠ, পৃ. ৮৮)

স্তবক রচনা

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিগাষ্ঠীর্থ এবং রুদ্ধদলের স্পন্দন
সৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্ব এনেছেন। এখানে তারও একটি উদাহরণ
দিচ্ছি।—

(৪) দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্তবকবন্ধ

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,

শিরোপরে শতবজ্র গর্জিবে গর্জুক!

রহ হিমাদ্রির মত,

হইও না অবনত,

পতঙ্গের পদাঘাতে তুণ অধোমুখ।

হলে হও খণ্ড খণ্ড,

সৃষ্টি করি লগুভণ্ড

ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।

গম্ভীর গৌরব ভরা,

মহাদণ্ডে ভেঙ্গে পড়া

কি আনন্দ কি প্রচণ্ড সুখ।

[গোবিন্দ চয়নিকা কর্তব্য (১৩১০) পৃ. ৩১]

গোবিন্দচন্দ্র দাস মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন। মিলবিন্যাস

সনেট রচনা এবং স্তবক বিভাগে তিনি প্রধানত শেক্সপীয়রীয় সনেটের আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। এখানে কবির একটি সনেট উদ্ধৃত করছি।—

সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর করিয়া,

আদরে যতনে বিধি রচিলা তোমায়,

সমস্ত বিশ্বের শোভা-সারভাগ নিয়া,

যৌবন ফুটায়ৈ দিলা পুষ্প-পূর্ণিমায়!

নীল নেত্র, রক্ত ওষ্ঠ, চারুচন্দ্রানন,

ও পীন উন্নত বক্ষ কতই বিশাল,

ব্যাপিয়া রয়েছে কত স্বপ্ন-জাগরণ,

কত যে জীবনমৃত্যু — ইহ পরকাল!

কিন্তু রে রচিতে তোর তনু অতুলন,

ফুরাইয়া ছিল বৃষ্টি শোভার ভাণ্ডার,

তাই কি দেহের মত হয় নাই মন,

কোমল সৌন্দর্য বৃষ্টি নাই ছিল আর?

দিয়েছে অপূর্ণপ্রাণ পুরিয়া পাশাণে,

শত অশ্রুপাতে তাই গলিতে না জানে!

[গোবিন্দ চয়নিকা প্রেম-গীতি-প্রণয়

নারীর প্রাণ (১২৯৬) পৃ. ৯৮]

গোবিন্দদাস কোথাও বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেননি। এমন কি সাতমাত্রা পর্বের যে ছন্দ লিখেছেন সেখানেও মিশ্রবৃত্ত রীতির আদর্শই রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ থেকে ছয় বৎসরের বড়ো ছিলেন। ১৮৯৫-তে (১৩০২ কার্তিক) তাঁর ‘কবিতা ও গান’ প্রকাশিত

স্বর্ণকুমারী দেবী হয়েছে ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী কাব্যগ্রন্থ এবং বিদায়-অভিশাপ, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী,—

প্রবহমান পয়ারবন্ধে রচিত নাট্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানতম তিনটি আধুনিক

ছন্দোবীতিই ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণঙ্গতা লাভ করেছে। লক্ষ করবার বিষয় হল, ছন্দে পূর্ববর্তী স্বর্ণকুমারীর পদ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব প্রায় কিছুই পড়েনি। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে রুদ্রদল ব্যবহারে সেই পূর্বযুগের দ্বিধা তাঁর কবিতায়ও রয়ে গেছে। কখনও নির্ভুল কলাবৃত্তের উচ্চারণে লিখেছেন,

উছলে সরোবর, প-ত্র মরমর,
ক-ম্পে থরথর পা-ছু নিরাশ ;

(কবিতা ও গান শ্রাবণ মল্লার পৃ. ২১৩)

কোথাও মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতিতে লিখেছেন,—
রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীরস্থির

গাথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়

(ঐ, বিরহ কারে কয় পৃ. ৮)

পূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য-বিচারে দেখেছি, কবিরা ছন্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কোমলতা (কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণের আমেজ) আনতে হলে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ পরিহার করে ছন্দ রচনা করতেন। স্বর্ণকুমারীও সেই রীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন,—

এ হেন বরষায় কাহার ভরসায়
দিবস যাপি?

কাহার প্রেমগুণে সযতনে
হৃদয় তাপি?

কাহার আঁখিতারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর?

কাহার সুধা চুমে এক ঘূমে
জীবন করি ভোর?

(কবিতা ও গান গান পৃ. ২১২)

এখানে কবি একটিও যুক্তবর্ণ ব্যবহার করেননি। পর্ববিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য রেখেছেন ;—কোথাও ৭।৭।৫ I, কোথাও ৭।৪।৫ I, কোথাও বা ৭।৪।৭ I-মাত্রার যতি দিয়েছেন।^২

কলাবৃত্ত রীতির
কবিতা

৫। স্বর্ণকুমারীর বিংশ শতকে রচিত একাধিক কবিতা-গানে অবশ্য কলাবৃত্তে রুদ্রদল দ্বিমাত্রকরূপে ব্যবহারের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একটি নিদর্শন দিচ্ছি এখানে,—

ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,

স্বর্ণকুমারী মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই (সমিল যতিপ্রান্তিক ছন্দোবন্ধে) অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। তবে সেখানে শব্দচয়নে, ভাবের প্রকাশনায় সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ছয়মাত্রা পর্বভাগের মিশ্রবৃত্ত রীতির একটি উদাহরণ তুলছি,—

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ;
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত !
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি ;
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি'
বৃথা এ সৌন্দর্য, নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তুষিত !

(কবিতা ও গান যামিনী)

ছয়মাত্রার পূর্ণপদ ঠিক রেখে প্রয়োজন মতো কবি ছোটবড়ো অপূর্ণপদ বা অতিপর্ব এনে ছন্দের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী লঘুভাবের কবিতায় ছাড়া দলবৃত্তের ব্যবহার করেননি। এখানে হাস্যরসাত্মক একটি কবিতা থেকে এ-ছন্দে তাঁর নৈপুণ্যের একটি উদাহরণ তুলছি।—

দলবৃত্তের
ব্যবহার

তুমি আমার—

পান্ত্র ভাতে বেগুন পোড়া, ফ্যানসা ভাতে ঘি,
কেমন করে বলব বঁধু, তুমি আমার কি!
তুমি আমার জরি জরাও, তুমি আমার কোটা,

তোমারি পর্বে অর্ঘ রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।

আমি না চাহি অন্য বিভব স্বাক্ষি,
চাহি না মুক্তি, চাহিনা সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃত বাণী

[সা. সা. চ. (২য় খণ্ড) স্বর্ণকুমারী দেবী পৃ. ৩২ দ্র]

অনুজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি এমন বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির কবিতা লিখেছিলেন কিনা, সেটি অনুমানের বিষয়।

সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা!

(কবিতা ও গান ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল পৃ ১৮৫)

আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। ১৮৮০ থেকে ১৯১৩,—দীর্ঘ তেত্রিশ বছরে তিনি কুড়িটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে একটি স্বকীয় রীতি প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র প্রভাবে অনেকাংশে অতিক্রম করে ভাব এবং ছন্দের দিক থেকে মৌলিক ধারা রক্ষা করতে তিনি সফল হয়েছেন। অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, “আমি পুরাতন স্কুলের,—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।... আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু।... সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবও আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন।” [সা. সা. চ. (৫ম খণ্ড) দেবেন্দ্রনাথ সেন পৃ ২০-২১,] ১৯১১-তে কবিকৃত এই মন্তব্যের আলোকে তাঁর কবিতার ভাব এবং আঙ্গিক উভয়েরই বিচার চলতে পারে।

মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মতো (এবং ঊনবিংশ শতকের অন্যান্য অধিকাংশ কবির মতো) দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। পূর্বোক্ত উভয় প্রধানত মিশ্রবৃত্ত কবির আদর্শেই তিনি প্রবহমান পয়ার, যতিপ্রান্তিক দ্বিপদী, ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধ বেশী ব্যবহার করেছেন। আবার এই যুগের (এবং পূর্বযুগের) বহু কবির আদর্শেই (হেমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম) মেঘদূতের অনুবাদে, হরিমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত দেবদেবীর স্তোত্র রচনায় কৃত্রিম সংস্কৃত উচ্চারণের (লঘু-গুরু) ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকে এসে কবি রুদ্রদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণে রবীন্দ্র-আদর্শে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতিতেও কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির কিছু সনেট রচনায় এবং মিত্রাক্ষর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষিত হয়।

মধুসূদনের সনেট প্রবর্তনের পর এই যুগে রবীন্দ্রনাথই আবার সনেট লিখতে সুরু করেছিলেন, পূর্বে উল্লেখ করেছি।— এই যুগে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে অনেক কবিই সনেট রচনা সুরু করেন। ভাব ও ছন্দের সংবন্ধতায় রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য যুগে দেবেন্দ্রনাথই সনেট রচনায় শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট লেখক দেবেন্দ্রনাথ দেড়শতাব্দিক সনেট লিখেছেন। মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কার আদর্শ গ্রহণ করেননি। প্রধানত শেক্সপীয়রের এবং অংশত মিলটনের অনুসরণ করেছেন। শেক্সপীয়রের আদর্শে তিনটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক শেষে একটি দ্বিপংক্তিক মিলবন্ধে (couplet) তিনি অধিকাংশ সনেট রচনা করেছেন। এখানে সম্ভবত কবি আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও

কোমলে'র শেকস্পীয়রীয় মিলের সনেটাদর্শ গ্রহণ করেছেন। অনেকগুলি সনেটে মিলটনের আদর্শে অষ্টক-ষট্‌ক স্তবক-বিভাগ রাখেননি,—এবং কয়েকটি সনেট মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। এখানে সনেটগুলি একটি পূর্ণ কবিতার কয়েকটি পংক্তি-অনুচ্ছেদ (verse paragraph) হয়ে উঠেছে।—এ-রীতি মধুসূদনও গ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি সনেটে মহাপয়ার পংক্তি ব্যবহার করলেও অধিকাংশ সনেটে প্রবহমানপয়ার ব্যবহার করেছেন।^৬ এখানে কবির প্রখ্যাত দু-একটি সনেটের উদাহরণ-সহ, অন্যান্য পদ্যবন্ধেরও কিছু কিছু উদাহরণ তুলছি।—

মিল

(১)	তবু ভরিলনা চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া	ক
	কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দি পুলকে,	খ
	বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া	ক
	কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;	খ
	হেরিনু বিদ্যাবাসিনী বিস্মে আরোহিয়া;	ক
	করিলাম পুণ্যস্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে ;	গ
	“জয় বিশ্বেশ্বর” বলি বৈভবে বেড়িয়া,	ক
	করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে	গ
	রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,	ঘ
	গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া	ক
	ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে, পাণ্ডুরা আসিয়া	ক
	গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ মালা।	ঘ
	তবু ভরিলনা চিত্ত! সর্বতীর্থ সার,	ঙ
	তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।	ঙ

(অশোক গুচ্ছ মা পৃ. ২৯)

কবিতাটির মিল-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সমগ্র কবিতায় একটি ভাবগ্রন্থি দিয়েছেন। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ রাখেননি।

রবীন্দ্র-সনেটের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ যে আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে অনুমান অমূলক নয়। একটি সনেটে কবি রবীন্দ্র-সনেট প্রশস্তি গেয়েছেন।^৭ সনেটটিতে সনেট রচনাদর্শ সম্পর্কে কবির মনোভাবও সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।—

সনেটকার
রবীন্দ্রনাথ
ও দেবেন্দ্রনাথ

৬। এ প্রসঙ্গে-উল্লেখ করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যেই এম. এ. ডিগ্রি নিয়েছিলেন। পদ্যবন্ধ রচনায় মধুসূদনের মতো ইংরেজি ছন্দের প্রভাব তাঁর রচনায়ও পড়েছে। তবে প্রধানত মধুসূদন-হেমচন্দ্রের আদর্শেই তিনি বাংলা ছন্দের কাঠামো তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

৭। প্রায় একই ভঙ্গীতে পরবর্তীকালে মোহিতলাল সনেটের মাধ্যমে অনুরূপ দেবেন্দ্র-সনেট প্রশস্তি গেয়েছিলেন। (স্বপনপসারী দেবেন্দ্রবাবুর সনেট ১৩২৮ (১ম সং) পৃ ৮৬ দ্র)

মিল

(২)	হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট	ক
	কি সরস ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,	খ
	মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,	ক
	ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে !	খ
	আধেক নগন তনু বাকল ভূষণে	গ
	মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী ;	ঘ
	সলিলে কাঁপিছে শশী চঞ্চল নয়নে	গ
	কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরুগুরু করি !	ঘ
	নব-বলয়িতা লতা বালিকা যৌবন	ঙ
	শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,	চ
	লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে	চ
	ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !	ঙ
	পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে	ছ
	প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে।	ছ

(পারিজাত গুচ্ছ রবীন্দ্রবাবুর সনেট পৃ. ২৯)

এখানে বিশুদ্ধ শেকসপীয়রীয় রীতিতে কবি সনেটে স্তবকগুচ্ছ সাজিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সনেটের ভাগবত একটি সাদৃশ্যও রয়েছে। উভয়েই আঙ্গিক-বৈচিত্রের তুলনায় ভাবের প্রগাঢ়তার প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ‘কড়ি ও কোমলে’র সনেটগুলিতে বিচিত্র আঙ্গিক-মিলের পরীক্ষা করেছেন বটে,— কিন্তু পরবর্তী প্রায় সমস্ত সনেটেই একমাত্র চতুর্দশ পংক্তি-পরিসর ছাড়া সনেটের প্রচলিত আর সমস্ত আঙ্গিকের বাঁধাবাঁধি ত্যাগ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সনেটে এতটা আঙ্গিকগত নিরাভরণতা দেখা দেয়নি।

অন্যান্য ছন্দোবন্ধ এবারে কবির অন্যান্য ছন্দোবন্ধের দু-একটি উদাহরণ তুলছি।...

- (৩) মধুসূদনের আদর্শে রচিত প্রবহমান পয়ার,—
 বঙ্গাকাশে শুক্রতারা যে মধুসূদন
 মহাপ্রাণ মহাকবি, যে মহাজনের
 প্রাণসিংহাসনে বসি, হে আনন্দময়ি,
 বাজাইলে যেই বীণা অপূর্ব ঝঙ্কারে,
 চমকিয়া, হরষিয়া, বিশ্ববাসীজনে,
 সেই বীণা লয়ে করে অয়ি বীণাপাণি
 উর আসি (জানি তব অনন্ত করুণা)

উর আসি এ দাসের চিত্তপদ্মাসনে।

(পারিজাতগুচ্ছ দশানন বধ কাব্য পৃ. ১৪৮)

এখানে ভাষা ও ছন্দে (এবং বন্ধনী ব্যবহারে) কবি বহুলাংশে মধুসূদনের অনুসরণ করেছেন। তবু স্বীকার করতে হয়, সেই বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফূরণ এ-কাব্যে ঘটেনি।

(৪) মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী (৮||১০||১০ I)

জীবনের মত কভু সুনবিড় আহ্লাদকারিণী

রবিকরে পূর্ণ প্রকাশিতা!

মরণের মত কভু সুগভীর মর্মপরশিনী

রহস্য কুজ্জাটি বিজড়িতা।

(অপূর্ব নৈবেদ্য অপূর্ব কবিতা)

রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’ (চিত্রা) কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির মিল রয়েছে। উর্বশী ১৩০২তে লেখা হয়, এ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৯; রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মহুয়াতেও (‘মিলন’ কবিতা দ্র.) এই ছন্দোবদ্ধ ব্যবহার করেছেন। ভাব-গাভীরের দিক থেকে এমন দীর্ঘপদী মিশ্রবৃত্ত রীতির একটি বিশেষ আবেদন আছে।

(৫) ছয়মাত্রা পর্বভাগের কলাবৃত্ত

বাঞ্ছিত সনে চির বিচ্ছেদ

সজল, জলদ সম,

ধীরে ধীরে যবে ঢাকিয়া ফেলিবে

মানস আকাশ মম।

[হরিমঙ্গল যাচঞা (১৯০৫ সং) পৃ. ৬]

কবির বিংশ শতকের পূর্বকার কোনও কাব্যে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(৬) সংস্কৃত উচ্চারণের (মন্দাক্রান্ত) ছন্দ

রৌ দে ক্লা স্তা । বি ক ল কু মু দী । ক স্পি তা দে হ শা খে, I

বাণে বিদ্বা বিভল হরিণী — আকুলা, স্নাননেত্রা!

নৃত্যোন্মত্তা মুখর যমুনা শিজ্জিতা কুঞ্জে,

ক্ষোভে যাপে দিবসরজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা।

(অপূর্ব মেঘদূত ১ম স্তবক)

৮। “মন্দাক্রান্তা” যুধিরসনগৈমো ভনৌযযুগ্মম্।

(ছন্দোমঞ্জরী ১৬৪ শ্লোক)

যাহার পাদগুলি যথাক্রমে ম ঙ ন গ গ য য — গণে গঠিত হয় এবং যথাক্রমে চতুর্থ ষষ্ঠ ও সপ্তমাক্ষরে (syllable) যতি থাকে তাকে মন্দাক্রান্তা ছন্দ বলে।

(৭) দলবৃত্ত পয়ার

মিল

ফুলের আদর, চাঁদের আদর, কবিতা নয়, বাতিক। ক

বাতিল যাহা, বাতিল তাহা, ওরে আমার মানিক! ক

তারার আদর, পাখির আদর, কেবল ভাঁড়াভাঁড়ি! খ

মতির জেল্লা, উষার হাসি, তোর উপমায় বেঠিক,— ক

সাত রাজার ধন মানিক আমার, সাত রাজার ধন মানিক! ক

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল সাত রাজার ধন মানিক পৃ. ৪৬)

এখানে স্তবকের তৃতীয় পংক্তিটি মিলবিহীন রেখেছেন, বাতিক মানিক বেঠিক এ-মিলও শিথিল মিলের নিদর্শন।

কবি শিথিল পদবন্ধেও (মুক্তক আভাসযুক্ত) কবিতা লিখেছেন (দ্র. অপূর্ব দৈবেদ্য শোভা পৃ ৪৮)। সরল সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে স্তোত্ররচনা করেছেন। (দ্র হরিশঙ্কর দুর্গাষ্টকম, সরস্বতী স্তোত্রম প্রভৃতি)। রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র-প্রবর্তিত,—উভয় ছন্দোবন্ধ সম্পর্কেই কবি সচেতন ছিলেন। তবে তাঁর আকর্ষণ ছিল মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ছন্দের প্রতি। সেকথা তিনি স্বীকারও করেছেন।

এই যুগে যে কয়জন মহিলা কবি বাংলা সাহিত্যে যশের অধিকারী হয়েছিলেন,

গিরীন্দ্রমোহিনী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২০) তাঁদের অন্যতম। ১৮৭৩

দাসী থেকে ১৯০৭,—সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসরকালে নয়টি কবিতা গ্রন্থ রচনা

করে তিনি বাংলা কবিতাকে সঞ্চয়-সমৃদ্ধ করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর

কবিতায় একটি স্বভাবসুন্দর কোমল কবিমনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভাষা, ছন্দ, শব্দগ্রন্থি,—তার কবিতায় ভাবের সূষ্ঠ প্রকাশনার জন্যে একান্ত স্বাভাবিক রূপেই বিকাশ লাভ করেছে। রীতিগত দিকে তিনি আলোচ্য যুগের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রধানত মিশ্রবৃত্ত (পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি পদবন্ধে) অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। বহু বিচিত্র মাপের পংক্তি ও স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। নাটক রচনায় সমিল ও অমিল মুক্তক এবং প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন। কাব্যে প্রবহমান (অমিল) মহাপয়ার ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ তাঁর বিংশ শতকে রচিত কাব্য গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়।— তবে আলোচ্য যুগ-পরিসরে তিনি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির প্রকৃত উচ্চারণ-রহস্য ধরতে পারেননি।— এখানেও লেখিকা সমকালীন কবিদের সগোত্রী। দলবৃত্ত ছন্দ শিশুপাঠ্য কবিতায় বা লঘু কবিতায় চমৎকার ব্যবহার করেছেন। অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবের কবিতায় এ ছন্দ চালাতে চেষ্টা করেননি। বৈষ্ণব ব্রজবুলি গানের ছন্দ কবিকে আকৃষ্ট করেছিল।— এ-ছন্দে একাধিক সার্থক কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-যুগের অধিকাংশ কবি কম-বেশী কিছু সনেট রচনা করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী ছোট পরিসরের অসংখ্য কবিতা লিখলেও সনেট রচনায় আকৃষ্ট হননি এটি লক্ষণীয়। এখানে কবির কয়েকটি ছন্দবৈচিত্র্যময় পদ্য রচনার

দৃষ্টান্ত তুলছি।—

- (১) মিশ্রবৃত্ত রীতির দ্বিপদী ৮॥৮ I
 আঁকা বাঁকা গিরিপথে, উঁচু নীচু অসমান,
 চলেছে পথিক দুটি, গাহিয়া স্বপন-গান !
 সপ্তমে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ-কায়,
 চকিতে আকুল আঁখি উভে চারিদিকে চায়।
 ধীরে ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
 আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।
 সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
 আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয়ে উভয়ে চায়।

[আভাষ পথিক (১৮৯০)]

৮॥৮ I-মাত্রার দ্বিপদী পংক্তি ঊনবিংশ শতকের পদ্যবন্ধে সুপ্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও তখন এমন রীতির কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ৮ মাত্রার পর ৬, বা ১০ মাত্রার পদ অধিকতর সুপ্রযুক্ত উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ এ-রীতি ত্যাগ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কবিতায় এমন দ্বিপদীবন্ধ বিরল।

- (২) শব্দমধ্য-রুদ্ধদলের একমাত্রক সংলিষ্ট ও দ্বিমাত্রক বিলিষ্ট উচ্চারণের মিশ্র হৃন্দ

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
 তপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
 ভুক্ত সেথায় কোটি বসুন্ধরা,
 মুক্ত সেথায় শত সরিদিরা,
 দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা

বিকীরিত জ্যোতি দশদিশ ;

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,

তপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

[অর্ঘ্য প্রভেদ (১৯০২)]

বিংশ শতকের প্রথমে লিখিত এ-কবিতাতেও কবি কলাবৃত্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হননি। মিশ্রবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত — এই দুই রীতির উচ্চারণগত পার্থক্য সম্পর্কে কবি এখনও সচেতন নন। তাই কখনও শব্দের মাঝে রুদ্ধদল একমাত্রায় রীতি অনুসারে) কখনও দুই মাত্রায় (কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে) ব্যবহৃত হয়েছেন।

অবশ্য আরও পরে (১৯০৬) কবি যুক্তবর্ণে দুই মাত্রা দিয়ে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির কবিতাও লিখেছেন। যেমন,—

(৩) শুধু মৃদুগীতি মধুর ছন্দে
জাগেরে অলস কামনা ;
প্রলয়ের তালে আর বাজাইয়া
গুরুগভীর বাজনা।

[স্বদেশিনী আহ্বানগীত (১৯০৬)]

যুক্তবর্ণ-বিহীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের পাঁচমাত্রার (তিন-দুই) পর্বমিলের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

(৪) বিমল নিশি, প্লক দিশি, রজত হাসি হাসিছে,
আপন হারা বিবশ ধরা সুরভি বাস শ্বাসিছে।
ললিত কায় হেলিত ছায়া দোদুল ফুল লতিকা,
সমীর চূমে, তটিনী ঘূমে, উরসে তারা মালিকা!

[আভাস বাসন্তী যামিনী (১৮৯০)]

এখানে কবি কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-আমেজ আনতে চেয়েছেন, যুক্তবর্ণ-রুদ্ধদলের ব্যবহার বর্জন করে। ঊনবিংশ শতকে প্রায় কোনও কবিই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত রীতির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেননি। গিরীন্দ্রমোহিনী তার কিছু ব্যতিক্রম নন।

বৈষ্ণব পদাবলীর (লঘু-গুরু) ছন্দের একটি উদাহরণ দিই।—

(৫) নওল জলধর ছাওল অমর,
নিবিড় তিমির ঘোর ;
সঘন দুরদুর গগন গুরুগুরু
দাদুরী করত সোর।
তড়িৎ চমকন, নিকষ ঘনঘন,
ঝরণ বরষণ নীর ;
অনিল স্ননস্নন, বজর নিপতন,
তিমির দিকে দিকে চির।

(অর্থ্য আষাঢ়ে)

পদটি বিদ্যাপতির প্রখ্যাত ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর’ পদের সঙ্গে তুলনীয়। বৈষ্ণব পদের সংগীতধর্মী লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দ কবির বিশেষ প্রিয় ছিল। আভাস (১৮৯০), সন্যাসিনী (১৮৯২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও কবি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

কবির নাট্যসংলাপে ব্যবহৃত মুক্তকের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি

(৬) রাণাকুন্ত। হায়,
আসিয়াছি নির্জনেতে বিশ্রামের আশে,
সিঁধিবারে শান্তিবারি অবসন্ন প্রাণে,

কিন্তু ঘোর আত্মপ্রতারণা,
সতাই কি করিতেছি শান্তি ভোগ আমি?
এর চেয়ে কার্যে লিপ্ত থাকা,
সে বরং ছিল ভাল ; ছিলাম ভুলিয়ে।
এই শান্ত নিরজনে মনোরম স্থানে,
হৃদয় ব্যাকুল আরো পাইতে তাহারে!
মনে হইতেছে,
সমগ্র ধরণী খুঁজে ধরে আনি গিয়ে।

(সন্ন্যাসিনী ৩।১)

গিরীন্দ্রমোহিনী নাট্যসংলাপের মুক্তকে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় পূর্ণ পয়ার পংক্তি বেশী ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর মুক্তকে সংলাপধর্মী ভাবমুক্তির স্বচ্ছন্দ্যও কম প্রকাশ পেয়েছে।

এই যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), ১৮৮৪ থেকে ১৯১২,—এই ২৮ বছরে পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা কাব্যআসরে স্থায়ী

অক্ষয়কুমার আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার মূলত মিশ্রবৃত্ত ছন্দই
বড়াল ব্যবহার করেছেন। সে যুগে সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
কবিকে ‘নিপুণ শব্দশিল্পী’ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বড়াল কবি

এই ছন্দের শব্দ-গ্রন্থে, ধ্বনি-তরঙ্গিত সুনিপুণ দলবিন্যাসে, পদবিভাগে এবং পংক্তি ও স্তবক গঠনে যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন,—কবিত্বের ভাব প্রকাশে তা বিশেষ সহায়ক হতে পেরেছে। অক্ষয়কুমার দলবৃত্ত ছন্দ বিশেষ ব্যবহার করেননি,—তবে এ ছন্দ যে তাঁর অজানা ছিলনা, ২।১টি লঘু কবিতায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। কবি এ-যুগে অন্যান্য কবিদের মতোই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই অনুমান করা যায়। কদাচিত্ত ছন্দে বিশিষ্ট উচ্চারণের আমেজ আনতে হলে তিনি যুক্তবর্ণ পরিহার করবারই চেষ্টা করেছেন। সনেট রচনা (সম্ভবত রবীন্দ্র-প্রভাবেই) এ-যুগে আবার সুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন ; তিনি পেত্রার্কীয় আদর্শই নিয়েছিলেন। এখানে কবির কয়েকটি ছন্দ-নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।

(১) মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী বন্ধ ৮॥৬॥৬ I

নমি আমি প্রতিজনে, — আদ্বিজ-চণ্ডাল,

প্রভু ক্রীতদাস !

সিন্ধুমূলে জনবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,

সমগ্রে প্রকাশ!

নমি, কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষণ,

কর্ম-চর্ম-কার!

অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহু অদ্রিভার!

[প্রদীপ (১৮৮৪) মানববন্দনা]

এখানে ধ্বনি-গাঙ্গীর্থ, শব্দের সূক্ষ্ম অনুপ্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন কবিতার ভাব-গাঙ্গীর্থকে আরও মহিমাম্বিত করে তুলেছে।

(২) মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘচৌপদী (ডাডাডাডাডাডাচ I) ও দীর্ঘদ্বিপদী (ডাডাচ I)-মিশ্র
স্তবকবন্ধ

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্মী — গর্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

[কনকাজলি (১৮৮৫) উৎসর্গ]

এখানে কবি ছয়মাত্রার দুটি পর্ব নিয়ে দীর্ঘ বারোমাত্রার পদ গঠন করেছেন। সাধারণত ছয়, আট এবং দশ মাত্রায় পদ গঠিত হয়। কবি ভাবগাঙ্গীর্থ পরিস্ফুটনে দীর্ঘতর বারোমাত্রার পদ রচনা করেছেন।— এ রীতি ঊনবিংশ শতকের কবিদের রচনাতেই দেখা যায়। রবীন্দ্রযুগের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মিশ্রবৃত্ত রীতির বারো মাত্রার পদগঠন দৃষ্টান্ত বিরল হয়ে এসেছে।

(৩) মিশ্রবৃত্ত কথখক, গগ—পংক্তিমিলের স্তবক বন্ধ
ফুটিছে হিমাদ্রি-শঙ্গে হিরণ্য-কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গঙ্গীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটির—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অধনিদ্রা জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি!

[শঙ্খ (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ]

কথখক—মিলে পয়ার বন্ধের (যতিপ্রান্তিক) স্তবক কবি আরও রচনা করেছেন।

(৪) মিশ্রবৃত্ত ১০||১০ I — দীর্ঘ দ্বিপদী মাত্রাভাগ মিল
কাঁপিতেছে ক্ষুধা অন্ধকার ১০|| কা||
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির; ১০ I খ I
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বারবার — ১০|| কা||
এ কি খেলা মুক্কা প্রকৃতির! ১০ I খ I

(শঙ্খ প্রতিভার উদ্বোধন)

এই রীতির কবিতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু কবিই ঊনবিংশ শতকে রচনা করতেন।

(৫) মিশ্রবৃত্ত ৮||৬। মাত্রার পয়ার মিল ককথক
নদীকূলে তরুতলে দুর্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি শুধু চেয়ে রব মন্দির আলসে—
সেই স্বর্ণ ওঠে যাহে দেবত্ব বিকাশি।

(শঙ্খ পাত্ত)

ফার্সি ‘রুবাই’ নামক চতুষ্পংক্তিক স্বরকের মিল (ককথক) কবি এখানে গ্রহণ করেছেন।

(৬) যুক্তবর্ণ-বিহীন বিশিষ্ট উচ্চারণের ছন্দ	মাত্রাভাগ	মিল
আজি মধু-যামিনী!	৪ ৩।	ক।
জোছনা আকুল,	৬।	খ।
ঝরিছে বকুল,	৬।	খ।
তটিনী দোদুল-গামিনী ;	৬ ৩।	ক।
দূরে ডাকে পিক,	৬।	গ।
ফুলে ছায় দিক	৬।	গ।
আঁখি অনিমিক কামিনী।	৬ ৩।	ক।

(প্রদীপ মধুযামিনী)

এ-যুগে ৮||৮। মাত্রার দ্বিপদী যথেষ্ট লেখা হত। অক্ষয়কুমার এই রীতিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। ঐতিহাসিক রীতির সনট লিখেছেন। লৌকিক রীতির দলমাত্রিক ছন্দও ব্যবহার করেছেন। বাহ্যিক বোধে আর দৃষ্টান্ত তুললাম না। অক্ষয়কুমার মূলত মিশ্রবৃত্ত রীতির দীর্ঘ পদভাগের ছন্দেই চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। এ-ছন্দের ধ্বনিগত ও ভাবগত শক্তি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে,— এখানেই কবির সাফল্য।

বাংলা সাহিত্যে এই যুগে কয়েকজন প্রখ্যাত মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল।

মানকুমারী বসু মানকুমারী বসু (১৮৬১-১৯৪১), মধুসূদনের ভ্রাতৃপুত্রী, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মাত্র ১২।১৩ বৎসর বয়সেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দে’ বীররসপূর্ণ একটি কবিতা লিখে স্বামীকে উপহার দিয়েছিলেন,— কবি নিজের আত্মকথায় এ-তথ্য জানিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। সমগ্র জীবনভোর বহুবিধ কবিতা রচনা করেছেন।

মানকুমারী পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ‘কাব্যকুসুমাজলি’ (১৮৯৩) ও ‘কনকাজলি’ (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ দুটি সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে। ‘বীরকুমারবধ কাব্য’ (১৯০৪) নামে প্রবহমান পয়ার ছন্দে মধুসূদনের আদর্শে তিনি একটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘সোনার সাথি’ ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয়েছে। কবি

মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখেছেন। তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না। বিবিধ ছন্দোবন্ধে সুললিত সহজ আড়ম্বরবিহীন প্রকাশভঙ্গি মানকুমারীর কবিতার একটি বিশেষ আকর্ষণ। কবি মিলবিন্যাসে, পর্ব-পদ গঠনে এবং স্তবক রচনার বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর কয়েকটি বৈচিত্র্যময় ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি করছি।—

(১) মিশ্রবৃত্ত ৬৫ I মাত্রাভাগের পংক্তি মিল—কককথ গগগথ।

কুজনিল বনে বিহগপুঞ্জ
গুঞ্জরিল ভুঙ্গ মধুরগুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কাননকুঞ্জ,
সে ললিত শোভা নিখিলপূজা
হিমাঙ্গি শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য। (বিভূতি বাণীবন্দনা)

(২) মিশ্রবৃত্ত স্তবক বন্ধ ১০ মাত্রা-একপদী ও ১৪ মাত্রা-(৮||৬ I) দ্বিপদী পংক্তি

এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি ভিক্ষা দাও বলে
ঘর নাই, বেতে তাই থাকি তরু তলে,
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল!

(কাব্যকুসুমাজলি ভিখারিণী মেয়ে)

(৩) মিশ্রবৃত্ত স্তবকবন্ধ ত্রিপদী (৮||৬||৬ I) ও চৌপদী (৮||৮||৬||৬ I)।

কিসের কামনা তোর বল প্রকাশিয়া
শুনি একবার,
আমি তো বৃথিলা হায়!
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠহার?

(কনকাজলি পতঙ্গের প্রতি)

(৪) প্রবহমান পয়ার

নব আষাঢ়ের আজি নব কাদম্বিনী
গরজিছে গুরু গুরু, পড়িছে উছলি
কার এ প্রাণের ব্যাথা বারিধারাক্রমে?

কার এ সুদীর্ঘশ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
 নীরব শোকের ভরা আকুল পবনে?
 সুখের স্বপন কার ভঙ্গিয়া অকালে
 আঁধার করিয়া দেছে ধরণী মাধুরী?
 কি শুনিবে ভাই পান্থ! প্রাণান্ত বেদনা?
 অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইল হেথা
 ভারত-গৌরব পুত্র শ্রীমধুসূদনে!—
 আসে তাই খুঁজিবারে বরষে বরষে
 সে অমূল্য মহারত্ন — কাঙালের ধন!

(বিভূতি স্মৃতিপূজা)

মানকুমারী বিচিত্র পদ-পংক্তিবন্ধে নানাপ্রকারের স্তবক রচনা করেছেন। আট, ছয় এবং দশমাত্রার পদভাগে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী-বন্ধই সেখানে বেশী ব্যবহার করেছেন। ১০||১০ I মাত্রাভাগে বিশমাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী এ-যুগের অন্যান্য কবির মতো তিনিও রচনা করেছেন। প্রবহমান পয়ারে মধুসূদনের প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটলেও ভাবের উদাত্ত মহিমা অনেকাংশে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেও কবি পূর্ণ ছয়, আট বা দশমাত্রার পদবিভাগই পছন্দ করেছেন। চার বা দুই মাত্রার লঘু যতি বা বিজোড়মাত্রার পদবিন্যাস তাঁর রচিত প্রবহমান পয়ারে বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পংক্তি শেষে অর্ধযতি বা পূর্ণযতি দিয়েছেন। সুতরাং মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের সর্ব সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহের ভাব এ ছন্দে পরিস্ফুট হতে পারেনি।

উনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। স্তাবদন্ত প্রতিভা এবং উচ্চশিক্ষার মার্জিত রুচিবোধ তাঁর কবিতায় ভাবগত এবং শিল্পগত বিশেষ সৌষ্ঠব দান করেছে। সেইযুগে তাঁর কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মাত্র আট বছর বয়স থেকে তিনি কবিতা রচনা অভ্যাস করেন এবং মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৩০-এ তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘জীবনপথে’ প্রকাশিত হয়। এ-যুগের অন্যান্য কবিদের মতো কামিনী রায়ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দাবন্ধের প্রতিই তাঁর আনুগত্য দেখা যায়। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ যে একটি নতুন পদ্যরচনারীতি প্রবর্তন করছিলেন সে সম্পর্কে কবি দেবেন্দ্রনাথের মতো কামিনী রায়ও সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই রচনারীতির প্রশংসা করলেও হেমচন্দ্রের রীতিকেই কবি পছন্দ করেছেন।^১ এখানেও

৭। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রশংসা করে একটি চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন

“হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি।... আজকাল রবীন্দ্রযুগ — এ যুগে ‘আর্টের’ দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্র আর্টের

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। আলোচ্য যুগের কবিদের অনেকে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের প্রকাশরীতি, মিলের ধ্বনিমাধুর্য, বিচিত্র পর্ব-পদ বিভাগের চমৎকারিত্বকে অনেকাংশে রীতিসর্বস্ব মনে করেছেন,— সম্ভবত সে কারণেই এ-ছন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের রীতিকেই বেশী পছন্দ করেছেন। কোমল ছন্দের প্রতি যাঁদের অনুরাগ তাঁরা কেউ কেউ বৈষ্ণবপদের লঘু-গুরু উচ্চারণের অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কৃত্রিম উচ্চারণরীতিকে কেউ বা চালাতে চেষ্টা করেছেন। কামিনী রায় ‘পিতৃপ্রতিম ভক্তভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’কে বাল্যকাল থেকেই অনুসরণ করেছেন বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই অনুসৃতির ক্ষেত্রেও অবশ্য হেমচন্দ্রের দলমাত্রক লঘু ছড়াজাতীয় কবিতার প্রতি বা কৃত্রিম সংস্কৃত উচ্চারণের কবিতার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি। প্রবহমান এবং যতিপ্রাস্তিক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পংক্তিবদ্ধ, বিভিন্ন স্তবকবদ্ধ স্বচ্ছন্দগতি মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই তিনি রচনা করেছেন। বস্তুত অকৃত্রিম

দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কিনা কেহ দেখে না।... সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে তৈলিয়া

হেমচন্দ্রের প্রতি
কামিনী রায়ের
শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাহির করিতে চেষ্টা করিত। আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধাবুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেইজন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষু কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের

ভিতরে গভীর সাদা পাওয়া যায় না।... কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্বোত্তমুখী প্রতিভা, গীত রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।... কিন্তু গীত রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে স্কুলের প্রবর্তক তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরিশোভের কলকলধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ — এইসব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানব-জীবন তাহারও একটা জাগ্রত অস্তিত্ব আছে — এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।...

(সাহিত্যসাধক চরিতমালা ; কামিনী রায় (৫৮) পত্রাবলী পৃ ১৯-২১)

কামিনী রায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আলোছায়া’ (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আলোচ্য চিঠিটি তিনি লেখেন ১৯২৩-এ। রবীন্দ্রনাথ তখন কবিখ্যাতির চরম শীর্ষে উঠেছেন।— এখানেই সে যুগের রবীন্দ্র-পূর্ব আদর্শধর্মী কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

অনাড়ম্বর সহজ ভাব প্রকাশের দিক থেকে কামিনী রায়ের হাতে এ ছন্দ অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে। এখানে কবির সনেট এবং অন্যান্য রচনাবন্ধের কয়েকটি নিদর্শন তুলছি।

(১) বল ছিন্ন বাঁণে, বল উচ্চ স্বরে,

—না, —না, —না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

(আলো ও ছায়া সুখ)

এই কবিতাটি ১৮৮০-তে কবির চোদ্দ বছর বয়সের রচনা। তখনই ছন্দের উপর কবির কি চমৎকার হাত এসেছে। ‘—না, —না, —না’ উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতা ভাবপ্রকাশে কতটা উপযোগী হয়ে উঠেছে কবিতাটি পাঠ করতে গেলে উপলব্ধি করা যায়।

(২) ৮||৮ I যতি ভাগের দ্বিপদী

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,— মা আমার, মা আমার।

(আলো ও ছায়া মা আমার)

কবি এখানে আটমাত্রা পদের চারমাত্রার পর্বযতিও অনেকাংশে সুস্পষ্ট রেখেছেন।

(৩) স্তবকবন্ধ ১০||১০||১০ I মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী

মৃত্যু মোহ অই ভেঙ্গে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
এক দৃষ্টে কাদস্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
“এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।”

(আলো ও ছায়া চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ)

(৪) স্তবকবন্ধ (চৌপদী ও দ্বিপদী মিশ্রস্তবক)

	মাত্রাভাগ	মিল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার ফুরায়েছে আঁখিজল,	৮ ৮	— ক
ভালবাসা তপস্বিনী কাঁদে নাকো আর	৮ ৬ I	— খ I
বিষাদ সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,	৮ ৮	— ক
শারদ গগন-ভরা কৌমুদীর ভার ;	৮ ৬ I	— খ I
নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্যবায়,	৮ ৮	— গ
দেখিতেছে ভালবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।	৮ ৮ I	— গ I
(আলো ও ছায়া ভালবাসার ইতিহাস)		

(৫) সমিল প্রবহমান পয়ার :

দেখি কর্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া
নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া,
চাহি দূর লক্ষ্য — দূর? সকলেরি নয় ;
চলিছে সবাই ; পথ চলিতেই হয়।
শ্রোতোমুখে শূন্য তরী সে তো নাহি ভাবে
কোথা গিয়া পাবে তীর কতদূর যাবে।

(দ্বীপ ও ধূপ অমৃতের পথে)

এই প্রবহমান পয়ার মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ থেকে ভিন্নতর। কবি পংক্তি-প্রান্তে মিল শুধু নয়, পূর্ণযতি বা অর্ধযতিও দিয়েছেন। তাতে প্রবহমানতা তেমন স্ভাবিক হতে পারেনি। মধুসূদন যে মনোভাব নিয়ে ‘মিত্রাক্ষর’-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এ ছন্দে সে বিদ্রোহ একান্তই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে।

(৬) সনেট

	মিল
পড়িতে চাহিনা বাঁধা বাসনার পাশে,	ক
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত সধীন,	খ
তবুও হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন	খ
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।	ক
আজ থাক। কাল তপ্ত উদাস বাতাসে	ক
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন,	খ
বাহির হইব আমি, বাধাবন্ধ হীন	খ
সংসারের রাজপথে আপন তল্লাসে।	ক
কেন এসেছিন্ হেথা, শুনে কার ডাক?	গ
সে কি দাঁড়াইবে কাল তপ্ত অশ্রু দিয়া	ঘ
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ,	ঙ
অথবা বসি— সদি এহে যাক	গ

ভুল করে একদিন এসেছি ডাকিয়া,
হায়রে সংসারে কোথা পুরে মনোরথ?

ঘ
ঙ

[জীবন পথে সহযাত্রা (১৯)]

কামিনী রায় শতাধিক সনেট লিখেছেন। উদ্ধৃত সনেটটি বিশুদ্ধ পেত্রাকীয় আদর্শে রচিত। সনেটের মিলবিন্যাসে কামিনী রায় মূলত পেত্রাকীকেই অনুসরণ করেছেন। তবু ভাবগত অষ্টক-যটক বিভাগ সর্বত্র সুস্পষ্ট রাখেননি। ভাবের প্রগাঢ়তায় তাঁর অধিকাংশ সনেটই সার্থক হতে পেরেছে। অধিকাংশ সনেটেই প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন।

এবারে যে কয়েকজন কবির উল্লেখ করছি, এরা সকলেই তরুণ বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) একটি মাত্র কবিতা গ্রন্থ (মায়াবিনী ১৮৮৬) রচনা করেছেন। ‘সাহিত্য’ পত্রে তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর দু-একটি রচনা-নিদর্শন দিচ্ছি।—

- (১) একপদী (১০ মাত্রা) ও ত্রিপদী (৮||৮||১০ I) মিশ্র-স্তবক
নিশীথের শুভ্রমেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে ;
কিরণ-বসনপরা,
শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

[‘সাহিত্য’-তে ১৩০৯-এ প্রকাশিত

সা. সা. চ. (৭৭) ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১ দ্র.]

- (২) সমিল প্রবহমান পয়ার
অয়ি গঙ্গে ! আজি এই সরস শ্রাবণে
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তুরণে
কি অপূর্ব শোভা তোর! বরষা বিভবে
পরিপূর্ণ বরতনুখানি, কি গৌরবে
যৌবন তরঙ্গ পরে’ তুলি আন্দোলন,
রাজ রাজেন্দ্রানী সম মহিমা আপন
প্রতি সৌম্য পদক্ষেপে করিছে প্রচার।

(সা. সা. চ. ৭ম খণ্ড নিত্যকৃষ্ণ বসু পৃ. ২৬-২৭)

কবির রচনায় ছন্দের মৌলিকতা না থাকলেও প্রবহমান পয়ারের বা মিত্রাক্ষর ছন্দের শব্দ-গ্রন্থনে, মিলবিন্যাসে নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। দীর্ঘ জীবন পেলে কবি অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিতেন অনুমিত হয়।

কবি প্রমীলা নাগ (১৮৭১-১৮৯৬) মাত্র ২৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন।

প্রমীলা নাগ ইতিমধ্যেই তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ (প্রমীলা ১৮৯০, তটিনী ১৮৯২)

প্রকাশিত হয়েছিল। কবি মিশ্রবৃত্ত রীতির যতিপ্রাস্তিক ছন্দ ব্যবহার করতেন। এখানে তৎকালীন প্রচলিত ১০||১০ I মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীর একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

একদিন বরষার বৃকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী।

ঢেকে গেল বিষাদ জলদে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী
সংসারের কুটিল কটাক্ষে
মিশে গেল হরষের হাসি।
চিনিলাম কেন এ ধরণী?
কেন হায়, ভাঙিল স্বপন?
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
কল্পনার নন্দন কানন।

[সা. সা. চ. (৯ম খণ্ড), প্রমীলা নাগ পৃ. ১১-১২]

শব্দ-গ্রন্থনে, ভাব পরিস্ফুটনে, ধ্বনি ঝংকারে ও মিলবিন্যাসে এই তরুণ জীবনেই কবি সফল হতে পেরেছিলেন। তাঁর অকাল বিয়োগে বাংলা কাব্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, কবি বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) মাত্র ২৯ বৎসরের স্নায়ু জীবনে বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মাধবিকা (১৮৯৬)

এবং শ্রাবণী (১৮৯৭) কাব্যগ্রন্থ দুটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর বালেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে যতিপ্রাস্তিক পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি পংক্তিবদ্ধ এবং প্রবহমান পয়ারবদ্ধ ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর রচিত একটি সনেট উদ্ধৃতি করছি।—

(১) পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে,
সরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায় দিতেছে তার সুষমা সুবাস।
কোন শুভ দিবসের চুসনের স্মৃতি

মিল
ক
খ
ক
খ
গ

অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন ;	ঘ
কোন সুখ রজনীর চাঁদের কিরণ,	ঙ
অধর পরশে এসে আপনা বিহীন।	ঘ
দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্ররশ্মিরেখা,	চ
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।	ছ
দুটি সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া	ছ
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।	ছ
পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে	ক
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।	ছ
(মাধবিকা হাসি)	

কবি পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম পংক্তি মিলহীন রেখেছেন। প্রথম ও ত্রয়োদশ পংক্তি অভিন্ন রেখেছেন। অন্যান্য পংক্তি মিলেও বৈচিত্র্য রয়েছে। বালেন্দ্রনাথ দ্বিপংক্তিক মিলে (Couplet) এবং পেন্তাক্সীয় মিলে — উভয় রীতিতেই সনেট লিখেছেন। সহজ দ্বিপংক্তিক মিল বোধ হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সনেটের পংক্তি রচনায় কখনও প্রবহমান, কখনও যতিপ্রাস্তিক রীতি নিয়েছেন। প্রিয়নাথ সেন বালেন্দ্রনাথের রচনারীতি, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। (দ্র. সা. সা. চ.—৫ম খণ্ড, বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭-২৩)। তাঁর অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মহিলা কবিদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬), নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী (১৮৭৮-১৯০৬), বিনয়কুমারী ধর (১৮৭২-?), হিরন্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫), মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-?) প্রভৃতি প্রায় সকলেই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এ-যুগে কবিতা রচনা করেছেন। নূতনত্ব না থাকলেও ছন্দের সৃষ্টি প্রয়োগে অপর কবিগণ তাঁরা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯), হরিশচন্দ্র নিয়োগী, রমণীমোহন ঘোষ, ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কবি ভূজঙ্গধর এই যুগে লঘুগুরু উচ্চারণে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে অনেকগুলি গান লিখেছেন। কিছু সনেটও লিখেছেন। এখান তাঁর লঘুগুরু উচ্চারণের বৈষ্ণব গানের একটি উদাহরণ তুলছি—

(২)	শীত সুরভি বহ	নৈশ সমীরণ
	নাচত মন্দ	তরঙ্গে
	রহি রহি মুহ মুহ	কো কিল কুহ কুহ
	ভাসত পঞ্চম	র দ্বে।

(মঞ্জীর তিমিরা (১৮৯০)

‘‘নে শুধু গুরু দলের চিহ্ন দেওয়া হল, চিহ্নবিহীন দলগুলি লঘু

এই যুগে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত হৃন্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছাড়া কদাচিত দৃষ্ট হয়। সেই বিরলদৃষ্ট কবিদের মধ্যে রমণীমোহন ঘোষ অন্যতম। ১৮৯৯তে প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি করছি।

(৩) আর কত বল ভুলাবে আমারে

মানসকুঞ্জবাসিনী !

নবীন শোভায় নিত্য বিকশি,

চিত্ত গগনে পূর্ণিমা শশী,

একি গো রঙ্গে খেলা কর বসি'

সুন্দর শুভ হাসিনি!

নব নব সাধ জাগাও পরাগে

নীরব মঞ্জুভাষিনি!

(‘প্রদীপ’ পত্রিকা মানসী আষাঢ় ১৩০৬)

ভাষায়, ভাবে এবং হৃন্দে কবি মূলত রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বনৃত্য’, ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ — সোনার তরী, ‘চিত্রা’ এবং ‘নগরসংগীত’ — চিত্রা)। এই অনুসরণের দৃষ্টান্তও সে যুগে বিরল ছিল।

আলোচিত যুগের এবারে এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে আর বৈশিষ্ট্য একবার স্মরণ করা যেতে পারে।—

(১) রবীন্দ্রনাথ এ-যুগেই কলাবৃত্ত হৃন্দে যুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসংশয় হয়েছেন এবং স্বচ্ছন্দ বহুল প্রয়োগ আরম্ভ করেছেন।

(২) মিশ্রবৃত্ত রীতির সমিল এবং মিলহীন প্রবহমান পয়ার তিনি নাটক, কাব্যনাট্য এবং কবিতায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবহমান পয়ারের রচনারীতি কিছুটা ভিন্নতর।

(৩) এই যুগে রবীন্দ্রনাথ একটি সার্থক মুক্তক হৃন্দের কবিতা (মানসী : নিশ্ফল কামনা) লিখেছেন। নাট্য-সংলাপী গৈরিশ-মুক্তক থেকে কাব্যে ব্যবহৃত রবীন্দ্র-মুক্তকের গঠনরীতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

(৪) পূর্ববর্তী যুগের ধারানুসরণে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে শতাধিক সনেট লিখেছেন। গঠনের দৃঢ়তার এবং ভাবের প্রগাঢ়তায় তাঁর অনেকগুলিই বিশেষ ভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

(৫) তিনি এ-যুগের বিচিত্রধর্মী গভীর ও লঘুভাবাত্মক বহু কবিতায় দলবৃত্ত হৃন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-হৃন্দ স্বাভাবিক বাকধর্মী ভাবপ্রকাশের পক্ষে কত অনুকূল হতে পারে এ-যুগের নানা কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত (বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট) — প্রধান সকল শ্রেণীর হৃন্দেই কবি পর্ব-পদ গঠনে, স্তবক রচনায়, মিল বিন্যাসে এবং সর্বোপরি রুদ্ধমুক্ত দলের

তরঙ্গায়িত ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিতে অপূর্ব ঐশ্বর্য এনে দিয়েছেন।

(৭) আলোচ্য যুগের অন্যান্য কবিরা, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারাই (মধুসূদন-হেম-নবীন) বেশী প্রভাবিত হয়েছেন।

(৮) নবীনচন্দ্র দাস অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেছেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যতিপ্রান্তিক পয়ার স্তবক এবং সমিল প্রবহমান পয়ার রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

(৯) স্ভাবকবি গোবিন্দদাস দলবৃত্ত ছন্দে বাক্ধর্মী প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন; মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্তবক রচনায়, সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

(১০) স্নগকুমারী দেবী মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্ছ এবং বৈচিত্র্যধর্মী প্রকাশভঙ্গিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন; লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে লঘুভাবের কবিতা লিখেছেন; বিংশ শতকে লিখিত একাধিক কবিতা-গানে কলাবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন।

(১১) দেবেন্দ্রনাথ সেন মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। সনেট রচনায় এ-যুগে তিনি রবীন্দ্রনাথের পর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। রবীন্দ্র আদর্শে তিনি বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির কবিতা লিখেছেন। সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

(১২) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রধানত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকে এসে তিনি কলাবৃত্ত রীতির কবিতাও লিখেছেন। লঘু-গুরু ব্রজবুলি ছন্দে বৈষ্ণবপদ লিখেছেন। নাট্যসংলাপে মিশ্রবৃত্ত রীতির মূলক ব্যবহার করেছেন।

(১৩) অক্ষয়কুমার বড়াল প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ গ্রন্থনে, ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে, পদ বিভাগে এবং পংক্তি ও স্তবক রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে।

(১৪) মানকুমারী বসুর কবিতায় পিতৃব্য মধুসূদনের যেমন প্রভাব পড়েছে বিংশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব পড়েছে। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন এবং ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দে বিচিত্র স্তবকবন্ধের ব্যবহার করেছেন।

(১৫) এ-যুগের প্রখ্যাত মহিলা কবি কমিনী রায় সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ কবির মতো রবীন্দ্র-রচনারীতির তুলনায় হেমচন্দ্রের রচনাদর্শকেই বেশী পছন্দ করতেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে প্রধানত প্রবহমান এবং যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ব্যবহার করেছেন। ছন্দ ও ভাবের স্বচ্ছতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। তিনি পেত্রার্কীয় আদর্শে শতাধিক সনেট লিখেছেন।

(১৬) নিত্যকৃষ্ণ বসু, প্রমীলা নাগ, বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি কবিরা মিশ্রবৃত্ত রীতির যতিপ্রান্তিক সমিল পয়ারবন্ধে বেশী কবিতা লিখেছেন। ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে লঘুগুরু উচ্চারণে অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। কবি রমণীমোহন ঘোষ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলাবৃত্ত ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ মধ্যপর্ব (১৯০০-১৯১৮)

রবীন্দ্রনাথ (১৯১৮ পর্যন্ত) দ্বিজেন্দ্রলাল বিজয়চন্দ্র

সত্যেন্দ্রনাথ সুকুমার রায় প্রমথ চৌধুরী যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি

॥ ক ॥

আলোচ্য যুগ প্রধানত রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তিতে সমৃদ্ধ। এই যুগে ভাবগত দিকে তিনি যেমন প্রেম, প্রকৃতিচেতনা এবং ভগবৎ আত্মলীনতার স্তর একে একে অতিক্রম করে এক নতুন গতিময় জীবনচেতনার স্তরে পৌঁছেছেন, হৃন্দের দিক থেকেও তেমনি প্রতিটি বিবর্তনস্তর নবীনতর প্রকাশভঙ্গিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ক্ষণিকা

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), স্মরণ (১৯০২-৩), শিশু (১৯০৩),
রচিত উৎসর্গ (১৯০৩), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০),
উল্লেখযোগ্য কাব্য গীতিমালা (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬) এবং
পলাতকা (১৯১৮) কাব্যগ্রন্থগুলি ভাব ও হৃন্দে সেই বৈচিত্র্যের

অর্ধরূপে কবি পাঠক-সমাজকে উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের খরদীপ্ত প্রতিভার পাশেই এই যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এক মৌলিক রীতির হৃন্দ প্রবর্তনের দ্বারা বাংলা হৃন্দের আসরে তাঁর বিশিষ্ট আসনটি অধিকার করে নিয়েছেন।

এই যুগের অন্যান্য রবীন্দ্রানুগ কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)
কবি ঐশ্বর্যময় হৃন্দের অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যে ‘হৃন্দ সরস্বতী’ বা ‘হৃন্দ যাদুকর’

নামে ভূষিত হয়েছেন। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রবীন্দ্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেও বাংলা হৃন্দে প্রত্যেকেই স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। এঁরা সকলেই নতুন উপকরণের দ্বারা বাংলা হৃন্দের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার গুরুত্ব বিচারে বাংলা হৃন্দের এই পর্বকে আমরা রবীন্দ্রযুগের মধ্যপর্ব (১৯০০-১৯১৮) নামে অভিহিত করছি।

‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থে কবি যেমন কলাবৃত্ত হৃন্দের বিচিত্র ব্যবহারে সে হৃন্দের আন্তর্জালিকার পরিচয় দিয়েছেন, আলোচ্য পর্বের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থে তেমনি দলবৃত্ত হৃন্দের দলবৃত্ত হৃন্দের বহুমুখী প্রকাশশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ হৃন্দে নমনীয়তা (flexibility) কত বেশী হতে পারে একাধিক কবিতায় (দ্র. কুলে, প্রকাশ-বৈচিত্র্য যথাস্থান প্রভৃতি কবিতা) তারও নিদর্শন রয়েছে। পর্ব-পদে মিলের

ফুলঝুরি, রুদ্ধদলের স্পন্দন-মাধুর্য ক্ষণিকার অনেকগুলি কবিতায় লঘুচঞ্চল এক ঐশ্বর্যময় গতিচ্ছন্দ দান করেছে। উৎকৃষ্ট অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লোভ সংবরণ করে একটি দৃষ্টান্ত তোলা গেল।—

আমি নাবব মহাকাব্য
.....
সংরচনে
.....
ছিল মনে—
.....
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
.....
কিংকিণীতে
.....
কল্লনাটি গেলফাটি
.....
হাজার গীতে।
.....
মহাকাব্য সেই অভাব্য
.....
দুর্ঘটনায়
.....
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
.....
কণায় কণায়
.....

(ক্ষণিকা ক্ষতিপূরণ)

এখানে শুধু পর্বমিল নয়, অধিকাংশ দলবিন্যাসেই কবি অনুপ্রাস-ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। পর্ব, পদ, পংক্তি, স্ববক গঠন-বৈচিত্র্যে, অতিপর্বিক স্পন্দনদোলায় ক্ষণিকার অনেকগুলি কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে (দ্র. উৎসৃষ্ট, ভীরুতা, সেকাল, কৃষ্ণকলি)। ধ্বনিস্পন্দ এবং মিলের বৈচিত্র্য ক্ষণিকা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কলাবৃত্ত রীতির কয়েকটি কবিতায়ও (দ্র. আষাঢ়, আবির্ভাব, উদাসীন) লক্ষ করা যায়। এই স্পন্দন ও মিলের বৈচিত্র্য এই যুগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সুকুমার রায়ের কবিতায়ও লক্ষিত হয়। তাঁরা মূলত রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনুমিত হয়।

পূর্বেই লক্ষিত হয়েছে, সনেটের মিলবিন্যাসে বা স্ববকবিভাগে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকা বা শেকসপীয়রের আনুগত্য স্বীকার করেননি। তিনি একমাত্র চোদ্দ পংক্তির সীমা-শাসনটুকু মেনে চলেছেন। নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৭৮টি এই যুগের সনেট সনেটেই তিনি দ্বিপংক্তিক মিল (couplet) দিয়েছেন। কোনও কোনও সনেটে ভাবগত আবর্তনও উপেক্ষা করেছেন। কোথাও সে আবর্তন রক্ষিত হলেও সুনির্দিষ্ট অষ্টক-ষট্‌ক স্ববক-ভাগের বাঁধাবাঁধি তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি সনেটে এই ভাবাবর্তন দুবারের বেশীও এসেছে।^১ তবে চোদ্দপংক্তির দৃঢ় বন্ধন-বাঁধনে সনেট-

রবীন্দ্র-সনেটের
পূর্ণ তালিকা

১। কবি অনেক সময় প্রবহমান পয়ার পংক্তিতে রচিত সনেটগুলিতে পংক্তির মাঝেই নতুন স্ববক শুরু করেছেন। স্ববক-বিভাগের অপূর্ণ দুই ছত্র মিলিয়ে পূর্ণ চোদ্দমাত্রা হয়েছে। একমাত্র নৈবেদ্যের ৫৩ সংখ্যক সনেটে অনুরূপ দুটি ছত্র মিলিয়ে ষোলমাত্রা হয়েছে, কিন্তু অন্য পংক্তিগুলিতে চোদ্দমাত্রাই রয়েছে। এটি কবির অলক্ষিতেই হয়েছে মনে হয়।

সুন্দরীর লাভগোচ্ছল সংহত আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সেদিক থেকে (এবং সম্ভবত রচনার সংখ্যাগত পরিমাণ বিচারের দিক থেকেও^২) তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সনেটকারের গৌরব দাবী করতে পারেন। মধুসূদনের মত রবীন্দ্রনাথও সনেট-পরম্পরা (sonnet-sequence) রচনা করেছেন (দ্র ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের ৬৪-৬৫-৬৬-৬৭, এবং ৯৩-৯৪-৯৫ সংখ্যক সনেটগুচ্ছ)। এ-কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলিতে দেশপ্রেম, বিশ্ব প্রেম, ভাগবত প্রেম এবং জীবনমৃত্যু-বিষয়ক দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। ‘স্মরণ’ কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি সনেটে (৭, ১৪, ১৫ এবং ২২ সংখ্যক কবিতা দ্র.) প্রেমবিরহের প্রগাঢ় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। উভয় কাব্যেরই অধিকাংশ সনেটে কবি প্রবহমান হৃন্দ ব্যবহার করেছেন। ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থে প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধের কয়েকটি সনেট আছে।

‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি সুললিত কবিতায় দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত হৃন্দের সার্থক শিশুপাঠ্য কবিতার প্রয়োগ লক্ষিত হয়। মাঝে মাঝে শিশুমনের ললিত ধ্বনি-হৃন্দ-বৈচিত্র্য তরঙ্গে কবি যেন পৃথক দুই রীতির সীমারেখা মুছে দিয়েছেন।
যেমন,—

২। এখানে কবি-রচিত সনেটগুলির একটি পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল

কাব্যগ্রন্থের বা কবিতার নাম	সনেটের সংখ্যা	গ্রন্থ বা কবিতার প্রকাশ-কাল
পেত্রার্কার অনুবাদ	—	— ১৮৭৮ (দ্র. রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ ৭২)
কড়ি ও কোমল	— ৫৮	— ১৮৮৬
মানসী	— ৪	— ১৮৯০
সোনার তরী	— ৮	— ১৮৯৪
চিত্রা	— ৪	— ১৮৯৬
চৈতালি	— ৬৭	— ১৮৯৬
কল্লনা	—	— ১৯০০
নৈবেদ্য	— ৭৮	— ১৯০১
স্মরণ	— ১৮	— ১৯০২-৩
উৎসর্গ	— ১৮	— ১৯০৩
গীতালি	— ২	— ১৯১৪
মহুয়া	— ৫	— ১৯২৯
বনবাণী	— ১	— ১৯৩১
পরিশেষ	— ১১	— ১৯৩২
ছড়ার ছবি	— ১	— ১৯৩৭
প্রান্তিক	— ৪	— ১৯৩৮
সেঁজুতি	— ১	— ১৯৩৮
আরোগ্য	— ১	— ১৯৪১

তাই তাই তাই তালি দিয়ে
 দুলে দুলে নড়ে
 চুলগুলি সব কালো কালো
 মুখে এসে পড়ে
 চলি চলি পা পা
 টলি টলি যায়,
 গরবিনী হেসে হেসে

আড়ে আড়ে চায়।

(শিশু হাসিরাসি)

প্রথম দুটি পংক্তিতে দলবৃত্তের উচ্চারণ সুস্পষ্ট। পরবর্তী দুটি পংক্তিতে রুদ্ধদল-বিরলতায় কলাবৃত্তের উচ্চারণ-প্রবণতা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানেও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি মূলদলে গঠিত ‘পা পা’ পর্বে কবি চতুষ্কল (দলবৃত্তের হিসাবে ষট্‌কল) প্রসারণ এনে টলায়মান শিশু পদক্ষেপের চিত্রটি যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন। আলোচ্য প্রয়োগরীতিও এ-যুগের অন্যান্য কবিদের শিশুপাঠ্য কবিতার ললিত ছন্দ ব্যবহারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে লক্ষ করা যায়।

শিথিল ক্ষেত্রে ‘শীতের বিদায়’ কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এ কবিতায়
 মিশ্ররীতির ছন্দের কবি ডা||ডা||চ I মাত্রাভাগের ত্রিপদীবন্ধে নতুনতর উচ্চারণের
 পরীক্ষা পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

বসন্ত বালক ‘মুখ’ ভরা হাসিটি

‘বাতাস’ বয়ে ওড়ে চুল

শীত ঢলে যায় মারে তার গায়

মোটা মোটা গোটা ফুল।

‘আঁচল’ ভরে গেছে শত ‘ফুলের’ মেলা,

‘গোলাপ’ ছুঁড়ে মারে ‘টগর’ চাঁপা বেলা,

শীত বলে, ভাই এ কেমন খেলা,

‘যাবার’ বেলা হল আসি!

(শিশু শীতের বিদায়)

শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ মিশ্রবৃত্তের রীতিবিরোধী। এ কবিতায় ইচ্ছা করেই কবি তেমন উচ্চারণ এনেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে এই মিশ্র উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছিলেন এ-অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্র-ছন্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার বিশদ আলোচনা করা গেল। তবে এমন উচ্চারণ যে উপপর্বের যতিস্পন্দন ক্ষুণ্ণ করে, কবিতাটি পড়তে গেলে তা ধরা পড়ে। সম্ভবত, বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতির বিরোধী বলেই কবি এমন শিথিল উচ্চারণরীতির আর পরীক্ষা করেননি।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তিন + দুই মাত্রার পঞ্চমাত্রক (কলাবৃত্তের)

বিসম চলনের ছন্দ: পর্ববিন্যাসকে ‘বিসম চলনের ছন্দ’ বলেছেন এবং এই শব্দবিন্যাসরীতির বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।^৩ উৎসর্গের একটি কবিতায় কবি এই ছন্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন। যেমন—

৩+২ মাত্রার

উপযুক্তিভাগ

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও—
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষা ঝুলি ভাসায়ে দাও।
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না।

(উৎসর্গ, ৪নং কবিতা)

‘উৎসর্গ’ কাব্যগ্রন্থে কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত কয়েকটি কবিতায় অতিপর্ব-স্পন্দন এবং যতিবৈচিত্র্যের সার্থক নিদর্শন মেলে (৮, ৯, ৪৫ নং কবিতা দ্র)। অনেক ক্ষেত্রে স্তবকগঠনেও বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের

দলবৃত্ত ছন্দ

খেয়া কাব্যগ্রন্থের ‘দিঘি’ এবং ‘প্রতীক্ষা’ কবিতা দুটিতে রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

শ্যাওলা পিছল বৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

৩। এ বিষয়ে কবি লিখেছেন,—

“ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিসম-চলনের ছন্দ। দুইমাত্রার চলনকে বলি সম-মাত্রার চলন, তিনমাত্রার চলনকে বলি অসম-মাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

‘বিসম চলন’

...বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল — য়ামি বল — য়াদি মণি — ভূষণ

হরি বিরহ — দহন বহ — নেন বহ — দূষণ॥

তিন মাত্রার ‘অহহ’ যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার ‘কল’ তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে— আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হোত, তা হলে ছন্দই হোত না।— এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরও উন্মিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এই জন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে আরও বেশী যেন অনুভব করা যায়।

(ছন্দ ১ম সং, পৃ ১৫, ২০-২১)

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।

(খেয়া দিঘি)

পর্বযতি লুপ্ত করে কবি এখানে চ||ডা||ড I মাত্রাভাগে ত্রিপদীর চাল এনেছেন। তবু এ ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আলেখ্য’ কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ছন্দের মতো অতটা দৃঢ়বদ্ধ নয়, পর্বযতির ক্ষীণ স্পন্দন এখানে রয়ে গেছে।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির অধিকাংশ গানে কবি কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। দলবৃত্তের প্রয়োগে মাঝে মাঝে অতিপর্বিক দোলার ধ্বনিমাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে। কলাবৃত্ত রীতির কোন কোন কবিতায় রুদ্ধ-মুক্তদলের সুনিপুণ প্রয়োগে নতুন ধ্বনিতরঙ্গ পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন,—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।

(গীতিমাল্য ১০২)

এখানে প্রত্যেক পর্বের প্রথম দলটি রুদ্ধ এবং পরবর্তী দলগুলি মুক্ত হিসাবে ব্যবহারের ফলে চমৎকার ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। এমন প্রয়োগে সংস্কৃত আদর্শের সুনির্দিষ্ট লঘু-গুরু দলবিন্যাস-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই রীতিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ (১৯১৬) কাব্যটি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বলাকার মুক্তক গ্রন্থ। মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ইতিপূর্বেই নাটকে এবং কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মানসীপূর্ব যুগে ‘তারকার আত্মহত্যা’ (১৮৮১) কবিতায় এবং আদিপূর্বেই মানসী কাব্যগ্রন্থের ‘নিষ্ফল কামনা’ (১৮৮৭)

কবিতায় এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তখনও এ ছন্দের বহুল মিশ্রবৃত্ত সমিল প্রয়োগে কবির দ্বিধা ছিল। বলাকার কবিতা লিখতে গিয়ে কবি সেই মুক্তকের উদাহরণ দ্বিধা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠলেন। সেদিক থেকে বিচারে, সমিল মুক্তকে লেখা এই পর্বের প্রথম কবিতা হিসাবে ‘ছবি’ কবিতাটি (১৯১৪ অক্টোবর ৩রা কার্তিক, ১৩২১) উল্লেখযোগ্য। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।—

তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা।

ওই যে সুদূর নীহারিকা

যারা করে আছে ভিড়

আকাশের নীড়,

ওই যারা দিনরাত্রি

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি,

তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

একদিন এইপথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিঃশ্বাসে—
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল—
সে যে আজ হল কতকাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে!
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তালিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।।

(বলাকা ৬ নং কবিতা)

মিল-অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবি লঘুতম উপপর্বিক যতিতেও ছত্রবিন্যাস করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ‘মন্দ’ কাব্যের (১৯০২) সমিল মুক্তকে যেমন মিল রাখতে গিয়ে ছত্রশেষের উপযতিকেও অঙ্গীকার করেছেন, আলোচ্য যুগের রবীন্দ্র-মুক্তকে সেরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তবে একথা স্বীকার করতে হয়, সমিল মুক্তকের মিলের দিকে লক্ষ রাখতে গিয়ে সর্বত্র ছত্রশেষে ভাবযতির উপযুক্ত গুরুত্ব রাখেননি। পরবর্তীকালে কবি মিলবিহীন মুক্তকে ভাবগুচ্ছকে আরও সুষ্ঠুতর পংক্তিবিন্যাসে সাজিয়েছেন।

দলবৃত্ত মুক্তকও কবি এই পর্বে লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর

দলবৃত্ত (সমিল)

মুক্তক

প্রথম রচিত সমিল দলবৃত্ত মুক্তক হিসাবে ‘বলাকা’র ২২ সংখ্যক
কবিতাটি (মুক্তি : রচনা ১৯১৫, ফেব্রুয়ারী ১৯ মাঘ ১৩২১)

উল্লেখযোগ্য। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি,—

যখন আমায় হাতে ধরে

আদর করে

ডাকলে তুমি আপন পাশে,

রাত্রি দিবস ছিলাম ত্রাসে

পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
 চলতে গিয়ে নিজের পথে
 যদি আপন ইচ্ছামতে
 কোনো দিকে এক পা বাড়াই
 পাছে বিরাগ কুশাক্ষরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।।

(বলাকা ২২ নং কবিতা)

এখানেও ছত্র সাজাতে গিয়ে কবি ভাবযতির তুলনায় মিলের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে কবি যে দু-একটি মিলহীন দলমাত্রক মুক্তক লিখেছেন, সেখানে ভাবযতির মর্যাদা আরও বেশী রক্ষা করেছেন। মুক্তকে ব্যবহৃত এই দলবৃত্ত ছন্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণেই পাঠ করতে হয়ে বটে, তবু পর্বের স্পন্দন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক রীতি থেকে এর জাত যে পৃথক সে বিষয়ে পাঠকের সংশয় থাকে না। উভয় কবির ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক রীতির পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হল। ‘পলাতকা’র (১৯১৮) কাহিনীমূলক কবিতাগুলিতেও কবি এই একই রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

তাহলে দেখা গেল, মধ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে পর্ব-পদ-পংক্তি-স্তবক গঠনে যেমন নতুন অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন, অন্যদিকে ভাবমুক্তির ধারায় মিশ্রবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ছন্দে নবীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। সনেট রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী পর্বে অনুসৃত ধারারই আরও পরিণতি লক্ষিত হয়। মিল এবং স্তবক বিন্যাসের গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে তিনি সহজ প্রবহমান পয়ারবন্ধকেই দ্বিপংক্তিক মিলে ব্যবহার করেছেন। একদিকে ছন্দোবন্ধের অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, অপরদিকে ছন্দে বন্ধনমুক্তির নতুন পথের সন্ধান, — উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পর্বের ন্যায়) নবীন কবিদের পক্ষে দিশারীরূপে কাজ করেছেন। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত এ-যুগের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সমস্ত কবিই ছন্দের ক্ষেত্রে কমবেশী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

॥ থ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৬৬৩-১৯১৩)

রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল পর্বের প্রারম্ভেই, তাঁর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যছন্দে এক মৌলিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আলোচ্যযুগ মুখ্যতঃ রবীন্দ্রযুগ,—রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিদের যুগ। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিমান কবি নব নব ছন্দের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেও— কেউই

দ্বিজেন্দ্র-প্রবর্তিত
 ছন্দে স্বকীয়তা
 রবীন্দ্রপ্রভাব
 মুক্তি

রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। পূর্ববর্তী পর্বের অধিকাংশ কবি যেমন রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা ছন্দরীতির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নতুন রীতিগুলি গ্রহণ করতে কুণ্ঠা দেখিয়েছেন,— এ-যুগে ঠিক বিপরীত ভাবেই বলা যায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যেক কবিই রবীন্দ্রছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কেউই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। এমনকি পূর্ববর্তী পর্বের রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত অনেক কবি এ-যুগে পৌঁছে রবীন্দ্রছন্দের অনুসরণ করেছেন। তার বিশ্বয়কর ব্যতিক্রম দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ছন্দ সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন একাধিক ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে নতুন নতুন ছন্দের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন। বারো বছর দ্বিজেন্দ্রলালের বয়সে বালক কবি যে গান রচনা করেছেন (নক্ষত্র আর্ঘ্যগাথা ১ম প্রাথমিক রচনায় ভাগ)^১ সেখানে মিশ্রবৃত্ত রীতির চৌপদী (৮||৮||৮||৭) বা দ্বিপদী-হেমচন্দ্রের প্রভাব (৮||৭) বন্ধে হেমচন্দ্রের যুগের রচনাধারাকেই অনুসরণ করেছেন। বস্তুত 'আর্ঘ্যগাথা' প্রথম ভাগের (কবির ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের রচনা)^২ সকল কবিতাগানেই সেই যুগের পরিচয় সুস্পষ্ট। সংস্কৃত-প্রভাবিত উচ্চারণের গান লিখেছেন (নীল গগন : আর্ঘ্যগাথা ১ম ভাগ দ্র.) ; পাঁচমাত্রা পর্বভাগে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ বর্জন করে (বন প্রবাহিনী নদী আর্ঘ্যগাথা ১ম ভাগ এ-কবিতায় যুক্তবর্ণ একটি আছে, দুমাত্রায় উচ্চারিত হয়েছে) কলাবৃত্তের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি ফোটাতে চেয়েছেন। হেমচন্দ্র এবং সে যুগের অন্যান্য স্বদেশী সংগীত লেখকদের মতোই গেয়েছেন,—

(১) এই অন্ধকারে বীণা একবার

বাজরে গম্ভীর বাজরে আবার

(আর্ঘ্যগাথা ১ম ভাগ বীণা বাজিবে কি আর)

অথবা (২) মেল রে নয়ন

ভারত সন্তান উঠ ; উঠ রে এখন (ঐ মেল রে নয়ন)

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রার পর্বভাগ এবং ষোলমাত্রার (৮||৮) পংক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল 'হেম-নবীন' যুগের কবিদের আদর্শেই রচনা করেছিলেন। 'আর্ঘ্যগাথা' ১ম ভাগের কবিতা-গান রচনাকালে ভাব, ভাষা ও ছন্দে তিনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের কবিদের দ্বারা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্রের রচনারীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই যুগের রচনায় সবচেয়ে লক্ষ করবার বিষয় হল, যে দলবৃত্ত ছন্দকে কবি পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দের একটি নতুন রীতি প্রবর্তন

৪। দ্র সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬ষ্ঠ খণ্ড (৬৯) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৃ. ২০।

৫। দ্র ঐ পৃ. ২০।

করলেন, ‘আর্যগাথা’ ১ম ভাগ-এর একটিও গান বা কবিতায় সে ছন্দের লৌকিক ছড়াগানের রূপটিও ব্যবহার করেননি। বস্তুত কিশোর কবির সঙ্গে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। ‘আর্যগাথা’ ২য় ভাগ (১৮৯৪) রচনাকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগানে ভাব ও ছন্দের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। দীর্ঘ দশ এগারো বছরের ব্যবধানে শিক্ষা এবং রুচি, ভাষা এবং ছন্দে কবির কি আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ‘আর্যগাথা’ ১ম ভাগের সঙ্গে কবির পরবর্তী কাব্যগুলির তুলনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

কালানুক্রমিক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল নিম্নরূপ
 আর্যগাথা ১ম ভাগ : ১৮৮২, আর্যগাথা ২য় ভাগ ১৮৯৩, আষাঢ়ে : ১৮৯৯, হাসির গান ১৯০০, মন্দ্র ১৯০২, আলেক্সা ১৯০৭ এবং ত্রিবেণী ১৯১২। কবির রচিত গানগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর ১৯১৫তে। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক নাটকে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন। প্রবহমান পয়ার সংলাপের দিক থেকে তাঁর তারাবাদি (১৯০৩) এবং সীতা (১৯০৮) নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের ও কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগে,— ‘আর্যগাথা’
 (ছন্দোবন্ধ) ১ম ভাগ সেই যুগের রচনা। রবীন্দ্র-যুগের আদিপর্বে ‘আর্যগাথা ২য়
 নাটকের ভাগ, ‘আষাঢ়ে’ এবং ‘হাসির গান’ রচিত হয়েছে। বাংলা ছন্দে কবির
 প্রকাশকাল মৌলিকতার দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘মন্দ্র’, ‘আলেক্সা’
 এবং ‘ত্রিবেণী’র কবিতাগুলি রবীন্দ্রযুগের মধ্যপর্বেই রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচারে
 দ্বিজেন্দ্রলালকে আলোচ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণকে দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করে দ্বিজেন্দ্রলাল ‘হাসির গানে’র (১৯০০) কয়েকটি গীত রচনা করেছেন।^৬ তবে ‘আর্যগাথা’, ১ম ভাগ বা ২য় ভাগ রচনাকালেও এ ছন্দে প্রাচীন (সংস্কৃত-প্রভাবিত) উচ্চারণরীতির প্রভাব রয়ে গিয়েছে। ‘আর্যগাথা’ ১ম ভাগে পঞ্চমাত্রাপর্বিক ‘বন প্রবাহিনী নদী’ কবিতাটিতে একটিমাত্র যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকপংক্তি উদ্ধৃত করছি,—

বিজন বনে গাহিয়া তুমি তুষরে বনবাসী;
 বিতর সবে বিমল তব সলিল সুধারাসি

৬। ‘হাসির গানে’র নন্দলাল, বিলাতফের্তা, আমরা ও তোমরা প্রভৃতি কবিতা-গান দ্রষ্টব্য। ‘হাসির গান’ ৪র্থ সংস্করণ (১৯১০) থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলীতে যে পাঠ গ্রহণ করেছেন আমরা সেটাই দেখেছি। ১ম সংস্করণে এই গানগুলি ছিল কিনা এবং এরূপ নির্ভুল পাঠ ছিল কিনা জানিনা। ১ম সংস্করণেও একই পাঠ থাকলে স্বীকার করতে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগেই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত ছন্দের আধুনিক উচ্চারণরীতি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। ‘আমরা ও তোমরা’ কবিতাটি স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’র অন্তর্গত ‘আমরা ও তোমরা’ কবিতার ভাব ও ছন্দ অনুসরণে লিখিত।

ষাওরে পুরবাহিনী নদী সখী সন্নিধানে ;
শুনাতে তায় বিজন বনবাসী সুখগানে

(আর্যগাথা ১ম ভাগ বনপ্রবাহিনী নদী

দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (সা. প. সং) পৃ. ২৩)

এখানে যেমন তৃতীয় পংক্তিতে ‘সন্নিধানে’ শব্দের যুক্তবর্ণে ব্যবহৃত রুদ্রদল কবি দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করেছেন, আবার চতুর্থ পংক্তিতে প্রাচীন কলাবৃত্তের আদর্শে ‘বনবাসী’ শব্দে পাঁচমাত্রা ব্যবহার করেছেন। ‘আর্যগাথা’ ২য় ভাগের একটি গানে অবশ্য কলাবৃত্তে যুক্তবর্ণের নির্ভুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন,—

ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শাস্তি অতুল গরিমা ভাসি ;

তার কপালে সরম, নয়নে প্রণয়,

অধরে মধুর হাসি।

(আর্যগাথা ২য় ভাগ কীর্তন ঐ পৃ. ৭৮)

গানটির সর্বত্র এমন নির্ভুল উচ্চারণ কবি রক্ষা করেননি। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কৃত-প্রভাবিত দীর্ঘ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ যেমন এনেছেন, তেমনি কোথাও কোথাও আবার মিশ্রবৃত্ত উচ্চারণ রীতিতে স্চ্ছন্দে লিখেছেন,—

(১) পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,

সোহাগ, সরম, স্নেহ।

(ঐ পৃ. ৭৯)

অথবা (২) যেন জীবন্ত কুসুম কনক ভাতি সুমিলিত, সমতান।

(ঐ পৃ. ৭৯)

বস্তুত ঊনবিংশ শতকে রবীন্দ্র-আদর্শে আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের নির্ভুল প্রয়োগ প্রায় কোন কবিই করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালও ব্যতিক্রম নন। ‘হাসির গানে’র পূর্বে রচিত তাঁর কোন কবিতাতেই কলাবৃত্ত রীতির আধুনিক পূর্ণাঙ্গরূপ লক্ষিত হয় না। ‘হাসির গান’ ছাড়া প্রখ্যাত অনেকগুলি স্বদেশী গানেও (যেমন, ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের

কলাবৃত্ত রীতিতে ঘোর, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, বাজ ভেরী আজ উচ্চনিলাদে ইত্যাদি) কবি নিখুঁতভাবে আধুনিক কলাবৃত্ত রীতি প্রয়োগ করেছেন।

সেগুলি সবই বিংশ শতকের রচনা। ‘মন্দ্র’ কাব্যের কয়েকটি কবিতা-গানে দ্বিজেন্দ্রলাল কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। পঞ্চমাত্রিক পর্বে লিখিত ‘নববধু’ কবিতায় ছন্দ মাঝে মাঝে প্রবহমান হয়ে উঠেছে। যেমন,—

কহেন পিতা — “এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে?”

কহেন মাতা — “তুমি কি জানো — তুমি কি দেখ চেয়ে?

সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,

আমিই ব’সে পাহারা দেই,” কহেন তবে বাবা—

“সে কি গৃহিণী? মেয়ে ত মোটে পড়েছে এই দশে ;

কাহার ক্ষতি করিছে? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
 থাক না কেন বছর দুই।” জননী ক্রোধে তবে
 শয্যা ছাড়ি, গাত্র ঝাড়ি, কহেন ঘোর রবে
 ঝঙ্কারিয়া, “তোমার মেয়ে—আচ্ছা, বেশ থাকো ;
 কাটিতে হয় কাটো, কিন্না রাখিতে হয় রাখো ;
 আমার ভারি দায়টি। আমি সহিতে নারি তবে
 লোকের এই গঞ্জনাটি ; তা যা হবার হবে
 আমি ত হেথা টিকিতে নাই পারিব, যথা তথা
 চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।”

(মন্দ্র নববধু দ্বি. গ্র. পৃ. ৩৭৯)

এমন ছন্দ রচনায় অভিনবত্ব থাকলে কবি সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা চলে না। সংলাপের ভাবযতি অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দযতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কলাবৃত্ত অথবা লৌকিক দলবৃত্ত রীতির প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনায় সর্বাংশে সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শেষোক্ত দুটি ছন্দরীতিই লঘু যতিভাগে লিখিত হয়। লঘু যতি প্রবহমান ছন্দ রচনার অনুপযোগী। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও বোধহয় একথা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, কবিতাটির পরবর্তী অংশবিশেষ, আরও সংলাপধর্মী করলেও সেখানে ‘পংক্তি ডিঙানো’ প্রবহমানতা আনেননি। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে নাট্যসংলাপ কত নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

কলাবৃত্ত কেহবা বলে “ময়দা কৈ?” কেহবা ডাকে “শশী!”
 রীতির সংলাপ কেহবা বলে “কোথায় জল? “কোথায় বারানসী?”
 প্রধান বাক্তভঙ্গি “সিঁদূর?”— “আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বল রাজু”
 কেহবা বলে “তাবিজ কই? জসম কৈ? বাজু?”
 বাহিরে গোল — “গেলাস কৈ?” “কর্তা কৈ?” “কেন?”
 “করো না চুপ!” “মিষ্টি কৈ?” “বৃষ্টি হবে যেন!”
 “আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে!” “চেচাও কেন দাদা?”
 “ফরাস বিছা ;” “সরিয়ে রাখ পাতার এই গাদা ;”
 “তামাক কৈ?” “আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে ;”
 “এখনো বর এলো না!” “আহা এই যে এলো ব’লে!”

(মন্দ্র নববধু পৃ. ৩৮০)

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ‘আর্যগাথা’ ১ম ভাগে কিছুটা গতানুগতিক প্রাচীন (মিত্রাক্ষর) ঢঙে
 মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ব্যবহার করলেও, পরবর্তী কাব্যগুলিতে এ-ছন্দের ব্যবহারে কবি
 মৌলিকতা দেখিয়েছেন। ‘আর্যগাথা’ ২য় ভাগেই (১৮৯৩) কবি
 দূরান্বিত মিলে মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

আহা—	মিল
যদি কোন মন্তবলে সুন্দর ধরণী	ক
হইত আবদ্ধ একস্বরে ;	খ
যদি অঙ্গরার সংমিলিত গীতধ্বনি	ক
হত সত্য নৈশ নীলাম্বরে	খ
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর	গ
হইত ; অথবা যদি হেম	ঘ
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ;	ঙ
হইত আশ্চর্য তাহা।	চ
কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সংগীত ও	ঙ
যেমতি মধুর	গ
স্বপ্নময়, কুহুময় ‘প্রেম’।	ছ

(আর্য্যাগাথা উৎসর্গ দ্বি. গ্র. পৃ. ৭৬)

ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই কবিতাটিই ‘মন্দ্র’কাব্যে ‘উদ্বোধন’ নামে সংকলিত হয়েছে। ‘মন্দ্র’ কাব্যে কবি আরও একটি সমিল মুক্তক লিখেছেন। তারও কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

আজ এই কোলাহলে ;
 এ উৎসব এ আনন্দ রবে; এই পুষ্প পরিমলে
 এ মঙ্গল বাদ্যে ; এই চন্দ্রাতপতলে,
 পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দির বিমলে।
 পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফলে
 —আজি শাস্তিজলে
 পবিত্রে! দাঁড়াও, নারাজীবনের এই সন্ধিস্থলে ;
 আমি আশীর্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
 থাক পরিণীতে! পতি সখী ও সচিব হও — আর সুমঙ্গলে
 ধন্য হও নিজ পুণ্যবলে।

(মন্দ্র আশীর্বাদ ঐ পৃ. ৩৭৫)

আশীর্বাদ কবিতাটিতে দুটি স্তবক আছে। একটি স্তবক উদ্ধৃত করেছি। প্রতি স্তবকের সমস্ত পংক্তিগুলিতে একমিল রাখা হয়েছে। প্রত্যেক স্তবকে ১০ পংক্তি করে রয়েছে। এই কবিতা দুটি সম্পর্কে ১৩০৯, কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে (পরে ‘আধুনিক সাহিত্য’

গ্রন্থে সংকলিত) ‘মন্দ্র’ কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, “তঁহার ‘আশীর্বাদ’ ও ‘উদ্বোধন’ কবিতায়

ছন্দকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। তিনি সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন— কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারে

না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।”

(আধুনিক সাহিত্য মন্ড্র র. র. (বিশ্ব. সং) পৃ ৪৯০)

রবীন্দ্রনাথ নিজে ইতিপূর্বেই (মানসী : নিষ্ফল কামনা, ১৮৮৭) সফলভাবে মুক্তক ব্যবহার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত মুক্তক তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমালোচক দ্বিজেন্দ্র-মুক্তকে মন্তব্য করেছেন ‘কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পংক্তি-প্রান্তিক যতির পারি না।’— দ্বিজেন্দ্রলাল আলোচ্য দুটি কবিতাতেই মিলের মর্যাদা সর্বত্র অনুরোধে মাঝে মাঝে পংক্তি-শেষের ভাবযতি ক্ষুণ্ণ করেছেন,— রক্ষিত হয়নি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এখানে তারই উল্লেখ করেছেন। ‘উৎসর্গ’ কবিতায় উদ্ধৃতাংশে কবি ‘সুর হইত’ কথাটিকে বিশ্লিষ্ট করে দুটি পংক্তিতে সাজিয়েছেন। ‘আশীর্বাদ’ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে এক জায়গায় পংক্তিবিন্যাস করেছেন, যে কামনা যে অর্চনা যে ধ্যান-নিরত

ছিলি;— শত

উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশা আকাশকুসুম, শিশু জীবনে শত

সাধ, ভাঙ্গাগড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত

এখানে নিরত ছিলি’, ‘শত উদ্বেগ’, এবং ‘শতসাধ’—শব্দগুচ্ছ তিনটির প্রত্যেকটিকেই ভেঙে দুই পংক্তিতে সাজিয়েছেন। প্রবহমান পয়ারের তুলনায় মুক্তকে অধিকতর ভাবমুক্তির মূল উদ্দেশ্যই এখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মুক্তকে বাক্যাংশের ভাবগত পূর্ণতা দেবার জন্যই পংক্তি ভাবানুযায়ী ছোট বড়ো হয়, ছন্দযতি এখানে ভাবযতির সম্পূর্ণ অনুগামী হয়। কবি পংক্তি রচনায় সেই ভাবের পূর্ণতাকে উপেক্ষা করেছেন।— এই বিপদের কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন অনূমিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ‘আর্যগাথা’ ২য় ভাগের অন্তর্গত কবিতাগুলি লিখবার সময় থেকেই ছন্দে সাবলীল কথা ভঙ্গী প্রকাশের নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দও তাঁর হাতে মন্ড্রকাব্যে মিশ্রবৃত্ত এক নতুন গতিবেগ লাভ করেছে। ‘মন্ড্র’ কাব্যে এই ছন্দের বাকধর্মী ব্যবহারে তিনি যে বিদ্রোহী চেতনা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের সমালোচনায় যে মন্তব্য করেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে।—

মন্ড্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপক্লপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত এবং তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে কি ছন্দোপচয় কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদের বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে।— আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

‘মন্ড্র’ কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য

করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই; ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার হৃন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্তনশীল নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে ‘মন্দ্র’ কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময় সমস্তই পুরুষের — তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে।...

দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্য-ভাষার বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমস্তুর আবেগভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

হৃন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।...

(আধুনিক সাহিত্য মন্দ্র র. র. ৯, পৃ. ৪৮৯-৪৯০)

এ কাব্যগ্রন্থে কবি মাত্র দুটি পদ্য (নববধু এবং জাতীয় সংগীত) কলাবৃত্ত রীতিতে লিখেছেন। বাকী সমস্ত কবিতাই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লিখিত। এখানে বিভিন্ন হৃন্দোবন্ধের কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে কবির বাকধর্মী রচনাদর্শের নিদর্শন দিচ্ছি।—

(১) প্রবহমান পয়ার

কি গো ! তুমি কে আবার ! বলি কোথা হতে?
কি চাও? — কি মনে করে এ বিশ্ব জগতে?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যাকথা,
এই ঈর্ষা-দেষ-ভরা নীচ মর্তভূমি
মায়াক্ষানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?

[মন্দ্র আগন্তুক দ্বি. গ্র. (সা. প. সং) পৃ. ৩৩৭]

বাকধর্মী উচ্চারণের খাতিরে বাক্যাংশকে কবি এখানে ইচ্ছামতো ছোট বড়ো করেছেন।

(২) প্রবহমান স্তবকবন্ধ

আমি তরঙ্গিত আবর্তসঙ্কুল উন্মত্ত জনধি,
উচ্ছৃঙ্খল ;— করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী!—নীরব
সহ্য কর বক্ষ প্রসারিয়া, সব

প্রবহমান
পংক্তিবন্ধে
রচিত স্তবক

লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
‘দহ নিরবধি।

(মন্দ্র দাঁড়াও ঐ পৃ. ৩৪৮)

অনুরূপ পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি রচিত। এখানে পংক্তি-মিল এবং সেই সঙ্গে ভাবের প্রবহমানতা একসঙ্গে রাখতে গিয়ে পংক্তিপ্রান্তের ছন্দযতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

(৩) দশ পংক্তিক (স্পেনসেরীয় স্তবক-প্রভাবিত?) স্তবক পয়ার + মহাপয়ার প্রবহমান

দশ পংক্তিক স্তবক : ‘খাসা’! ‘বেশ’! ‘চমৎকার’! ‘কেয়াবাং’! ‘তোফা’!—
কহিয়াছে নানাবিধ— সকলেই বটে,
দেখিয়াছে, তাজ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবন অভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি “বিশ্ব পরীভূমি”;
কেহ কহে, “অষ্টম বিশ্বয়”; কেহ কহে
“মর্মের গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,”
আজি জানি, তুমি তার একটিও নহ;
আমি কহি, না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

[মন্দ্র তাজমহল (আগ্রায়) ঐ পৃ. ৩৮৯]

অনুরূপ দশটি দশপংক্তিক স্তবকে কবি ‘তাজমহল’ কবিতাটি রচনা করেছেন। অত্যাধিক সংলাপপ্রধান করাতে, এবং মাত্র ১৪ মাত্রার পংক্তির মধ্যে একাধিকবার ভাবযতি পড়াতে ধ্বনিগাঙ্গীর্ষ অনেকাংশে শিথিল হয়েছে। পাঠকদের পক্ষ থেকে এই ভাব-ও-ছন্দ-গাঙ্গীর্ষের অভাব সম্পর্কে যে আপত্তি উঠতে পারে কবি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন মনে হয়। ‘সমুদ্রের প্রতি (পুরীতে)’ কবিতায় ছন্দোবন্ধেই কবি লিখেছেন।—

‘সমুদ্রের প্রতি’ (৪) — না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসে হে!
ভারি অর্থপূর্ণ;—নয় ? হে সমুদ্র! বোলা ভাই বোলা,
মাফ করো কথাগুলো; অলীলটা না হলেই হল;

১৮ মাত্রার মহাপয়ার,

রবীন্দ্রনাথের ‘সমুদ্রের প্রতি’

কবিতার সঙ্গে তুলনীয়

৭। স্পেনসেরীয় স্তবক নয় পংক্তিতে রচিত হয়। প্রথম আয়াসিক (দ্বিদল দ্বিতীয় দলে প্রসন্ন) পঞ্চপর্বিক আটটি পংক্তির মিল যথাক্রমে : কখকখ, খগখগ; নবম আয়াসিক ষট্পর্বিক পংক্তির মিল : গ। দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে দশপংক্তি স্তবক রচনা করেছেন, মিল যথাক্রমে : কখকখ, গঘগঘ, ঙঙ, স্পেনসেরীয় স্তবক-মিল থেকে অনেকাংশে পৃথক। প্রথম নয় পংক্তি ১৪ মাত্রার পয়ারবন্ধে রচিত, দশম পংক্তিটি আঠার মাত্রার মহাপয়ার। খাঁটি স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শের একটি উদাহরণ আমরা এ গ্রন্থের প্রথম পর্বে, পঞ্চম-অধ্যায়ে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে দিয়েছি (পৃ ১৮০ দ্র)।

তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি;—

যার যেটা দেয় — সেটা—রত্নাকর! আমি বেশ জানি।^৮

(মন্দ্র সমুদ্রের প্রতি (পুরীতে), ঐ পৃ. ৩৬১-৬২)

১৮ মাত্রার পংক্তিতে (প্রয়োজনে প্রবহমানতা রেখে), ছয় পংক্তির স্ববকবন্ধে লিখিত কবিতাটির কোথাও কিন্তু কবি ছন্দগাষ্ঠীর্থ (বা ভাবগাষ্ঠীর্থ) আনেননি। রত্নাকরকে তার প্রাপ্য কবি পরিহাস-তরল গ্রামাভাষার ‘লাগসৈ’ প্রকাশ ভঙ্গিতেই উপহার দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ‘সোনার তরী’র অন্তর্গত ১৮৯৩-তে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধে রচিত ‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতাটি তুলনীয়। একই ছন্দ, কিন্তু ভাব ও ধ্বনির পার্থক্যে উভয় কবির হাতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি কবিতার জন্ম দিয়েছে।

(৫) প্রবহমান দীর্ঘ বাইশমাত্রা পংক্তির ছন্দ

বাইশ মাত্রার
পংক্তিবন্ধ

তোমার কবিত্ত্বরাজ্য সমুদ্রের মতো।— তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ; কভু ব্যঙ্গ; কভু ঘৃণা ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস
কভু; কভু অনুতাপ; গম্ভীর গর্জন কভু; কভু তিরস্কার;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করেছ উদগার;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায়;
পরের দেশের জন্য জুলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম বেদনায়।

(মন্দ্র বাইরণের উদ্দেশ্যে ঐ পৃ. ৩৮৬)

প্রয়োজনে কবি এখানে একটি পংক্তির মধ্যে চারটি পূর্ণ ভাবযতিও এনেছেন। মিলের অনুরোধে এখানেও কবি পংক্তিপ্রান্তিক স্নগ্নতম যতির মর্যাদা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করেছেন। — কিন্তু ভাবের যতি ঠিক রেখে পাঠ করলে এই মিল পাঠকের কান এড়িয়ে যায়। এত দীর্ঘ পংক্তিক সমিল প্রবহমান ছন্দকে কবি সচ্ছন্দে ভেঙে মুক্তক পংক্তিক লিখতে পারতেন।

(৬) ৬।৬।৬।৩ পর্বভাগের ২১ মাত্রা-পংক্তিক প্রবহমান ছন্দ

একুশ মাত্রার
পংক্তিবন্ধ
প্রবহমানতা
সংলাপভঙ্গি

এ কি ঘুম বাপ! শুনিয়াছিলাম কুস্কর্গ নামে ভীষণ
রক্ষঃ ছিল এক; ছ’মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ ফি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো!— শুধু একবার — হে কুড়ের বাদশাহ!
দেখিনা; অন্তত: একবার ভুলে নয়ন মেলিয়া চাহ।

(মন্দ্র হিমালয় দর্শনে ঐ পৃ. ১৪৫)

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বেই নবীনচন্দ্র দশপংক্তিক একই মিলের স্ববক রচনা করেছেন; তবে সেখানে প্রত্যেকপংক্তি ১৪ মাত্রার পয়ারবন্ধে রচিত। দশম পংক্তিটি এমন ১৮ মাত্রায় বর্ধিত নয়।

৮। কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি শেষে ‘ঐ হে’ ‘লাগসৈ হে’ — শব্দের উচ্চারণে মিশ্রবৃত্ত রীতিবিরোধী মাত্রা-সংকোচন ঘটেছে।

এখানে ছন্দের এবং ভাবের যতিতে পদে পদে বিরোধ ঘটেছে। তবু স্বাভাবিক বাকভঙ্গি প্রবর্তনের এ প্রচেষ্টার মধ্যে কবির দুঃসাহসিক নতুন পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

‘আর্যগাথা ২য় ভাগে’ ‘পিউ’ নাম দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে স্কচ, ইংরেজী এবং আইরিশ গানের অনুবাদ করেছেন সেখানেই প্রথম দলবৃত্ত ছন্দের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ আর্যগাথা ২য় সম্পর্কে নানা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখানে তিনি, (ক) মিশ্রবৃত্ত ভাগের অনুবাদ রীতির সঙ্গে দলবৃত্তের সংমিশ্রণে নতুন মিশ্র উচ্চারণরীতির পরীক্ষা কবিতায় করেছেন। (খ) লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণ সংশ্লেষণের দ্বারা ছন্দের বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত দৃঢ় উচ্চারণ-ভঙ্গীর দলবৃত্ত ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছেন; (গ) সর্বোপরি, পাশ্চাত্য দলভিত্তিক দীর্ঘযতি ভিত্তিক (Caesuric) ছন্দের আদর্শে বাংলা পদযতি-প্রধান ছন্দে সংশ্লিষ্ট দল উচ্চারণের নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন।— এই পরীক্ষার পরিণত ফসল আরও পরে ‘আলেখ্য’ এবং ‘ত্রিবেণী’ কাব্যগ্রন্থে মিলেছে।

ছন্দে যথাসম্ভব ভাবমুক্তি এবং গদ্য বাচনভঙ্গির স্বাভাবিকতা আনতে এই সময় থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছেন। তিনি একাধিক কবিতায় মিশ্র কলাবৃত্ত উচ্চারণরীতির সঙ্গে প্রয়োজন মতো শব্দশেষের রুদ্ধ মিশ্র উচ্চারণের ছন্দ দলকে সঙ্কুচিত একমাত্রায় উচ্চারণ করে ছন্দে বাকধর্মী সংশ্লিষ্টতা আনতে চেয়েছেন। যেমন—

মাত্রাভাগ

জেনো যদি তোমার চারু ॥ যৌবনের ও রূপরাশি ॥ ৮॥৮॥
দেখি যাহে প্রেমভরে কত; I ১০ I

কাল আমার আলিঙ্গনে ॥ মিলাইয়া যায় আসি ॥
স্বপ্নলব্ধ ঐশ্বর্যের মত, I
তবু তুমি পূজা রবে ॥ তেমতি, এখন যথা ॥
—যাক চলে মাধুরী তোমার ;

রবে প্রাণের প্রতি বাঞ্ছা ॥ জড়িয়ে শ্যামলতায় ॥
সেই প্রিয় ধবংসের চারিধার।I

(আর্যগাথা ২য় ভাগ Believe me if all এই পৃ ১৬৩)

৮॥৮॥১০ I মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীতে কবি প্রয়োজন মতো শব্দশেষের রুদ্ধদলকে দুই মাত্রায় বা এক মাত্রায় উচ্চারণ করেছেন। এই মিশ্র রীতির পরীক্ষা কবি তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘আষাঢ়ে’ এবং ‘হাসির গানে’ও করেছেন। আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এই জন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমত কোথাও টানিয়া রবীন্দ্রনাথের কোথাও ঠাসিয়া কমবেশী করিয়া চলিতে হয়। অমন করিয়া বরঞ্চ মন্তব্য মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।... আষাঢ়ের অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা বশত: আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই।

(আধুনিক সাহিত্য আষাঢ়ে)

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও আলোচ্য কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,— “এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবদ্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল পদ্য কবিতা নামেই অভিহিত করা সঙ্গত।

(আষাঢ়ে ভূমিকা ঐ পৃ. ১৬৬)

এখানে আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থ থেকে মিশ্র উচ্চারণ রীতিতে লিখিত কবিতার একটি স্বকবন্ধ উদ্ধৃত করছি,—

হরিনাথ দত্ত চড়ে সকাল বেলার ট্রেন,
দুর্গাপূজার ছুটি শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।

এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দত্ত
পাটনায় চাকরী করেন; কিন্তু সে চাকরীর অর্থ
বলা কিছু শব্দ; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর ত্যক্ত
কর্তেন টাকার জন্য ; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে করে, অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃমাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

(আষাঢ়ে হরিনাথ দত্তের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ঐ পৃ. ২১২)

এই কবিতাটির মিশ্ররীতি এবং কথাভাষা সম্পর্কে কবি আরও মন্তব্য করেছেন,
— “যেকোন বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদের দুন্দুভিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?” (আষাঢ়ে : ভূমিকা দ্র.) ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে মিশ্ররীতির উচ্চারণে, প্রবহমান পংক্তিবন্ধে, চমৎকার পদ-পংক্তি-মিলের স্বক-সজ্জায় এমন একটি সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব ছিল না। তবে এ কথা স্বীকার্য, মিশ্ররীতির উচ্চারণে পাঠক কবিকে ঠিকমত অনুসরণ করতে, প্রয়োজনমত মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অথবা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পদযতিপ্রধান দলবৃত্ত রীতিতে পাঠভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে যথেষ্ট দ্বিধায় পড়েন।

হাসির গানের মিশ্র
ছন্দের কবিতা
ইংরেজী শব্দ-বহুল
একটি উদাহরণ

‘হাসির গানে’ও দ্বিজেন্দ্রলাল মিশ্রছন্দের অনেকগুলি গান
লিখেছেন। সেখানে কোনও কোনও গানে ইংরেজী শব্দের বহুল
প্রয়োগ ছন্দকে আরও শিথিলবদ্ধ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত
তুলছি,—

যদি জানতে চাও আমরা কে,

আমরা Reformed Hindoos

আমাদের চেনে নাক যে,

Surely he is an awful goose;

কেননা, আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterodox আমাদের food ;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে ‘এটা’ ‘ওটা’ ‘সেটা’ যখন

we choose

—কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think

তালে you are an awful goose.

(হাসির গান Reformed Hindoos ঐ পৃ. ২৭০-৭১)

কবিতাটি বিশুদ্ধভাবে মিশ্রবৃত্ত, সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত বা অন্য কোন প্রচলিত রীতির ছন্দেই
লিখিত হয়নি, তবু পদবন্ধন বা যতিভাগ স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। কবি একমাত্র লক্ষ
রেখেছেন, পদ্যের কাঠামোতে স্বচ্ছন্দভাবে গদ্য উচ্চারণ-ধর্মী স্বাভাবিক বাকপর্ব
ব্যবহারের প্রতি। প্রয়োজনমত কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ রীতিও এখানে এনেছেন। তবে
হাসির গানের অন্তর্গত এই কবিতা আসলে গান হিসাবে রচিত; গানের সুরারোপে ছন্দের
উচ্চারণ-শিথিলতা ঢেকে যায়। বিশুদ্ধ পাঠ্য কবিতা এমন মিশ্ররীতির পাঠ করতে হলে
কিছুটা বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে।

ছড়াগানে ব্যবহৃত লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক কবিতা-গানে
লৌকিক দলবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। এই রীতিতে, কিছুটা শিথিল ছন্দোবন্ধে, তিনি
ব্যবহার সর্বপ্রথম আর্যগাথা ২য় ভাগের কয়েকটি গান লিখেছেন।
এখানে তার থেকে দু-একটি উদাহরণ তুলছি।—

(১) লয়ে তার প্রাণের কথা

প্রাণের ব্যথা,

গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে;

কভু বা মনের দুখে,

অথো মুখে,

ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

(আর্যগাথা ২য় ভাগ ঐ পৃ. ৯০)

- (২) উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাসরে চলে
পাষণ ভাঙা নিব্বিরিণী — ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে;—
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ— চুলগুলি তার দোলে;
—যাসরে কোথা — আয়রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।

(ঐ পৃ. ১১০-১১)

অতিপর্বিক
স্পন্দন

‘হাসির গানে’ও কবি এই ছন্দে অতিপর্বিক অপূর্ব ধ্বনিস্পন্দ
ফুটিয়েছেন এমন নিদর্শন মিলছে। যেমন,—
কৃষ্ণ বলে, “আমার রাধে বদন তুলে চাও”
আর—রাধা বলে, “কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়।”
কৃষ্ণ বলে, “রাধে দুটো প্রাণের কথা কই”
আর—রাধা বলে, “এখন তাতে মোটেই রাজী নই—
সবো — ধোঁয়ায় মরি।”

(হাসির গান কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ ঐ পৃ. ২৬৯)

ইংরেজি ট্রোকে ছন্দের (↗↘) ঝাঁকসহ সুরাশ্রয়ী উচ্চারণে ভাবগত আমেজ কত
সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে পারে হাসির গানের একটি রচনায় কবি তারও পরীক্ষা
করেছেন। যেমন,—

হ’লকি! এ | হ’ল কি! | —এত ভারি | আশ্চর্য্যি! |
বিলাত-ফের্তা | টানছে হক্কা, | সিগারেট খাচ্ছে | ভশ্চার্য্যি! |
হোটেল ফের্তা মুসেফ ডাকছেন “মধুসূদন কংসারি!”
চট্ট চট্টির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারি!

(হাসির গান হ’ল কি ঐ পৃ. ২৭৬)

এখানে প্রত্যেকটি পর্ব সমান গুরুত্ব পেয়েছে। শিথিল লয়ের উচ্চারণে প্রতিপর্বের
প্রথমাংশে প্রসঙ্গ ব্যবহারের ফলে ‘সিগারেট খাচ্ছে’ এবং ‘মুসেফ ডাকছেন’ পর্বদুটিতে
কলাবৃত্তের গুরুভারও সমতা পেয়েছে। দল এবং কলার পরিমাপের দিক থেকে এ-
ছন্দকে লৌকিক উচ্চারণ-প্রকৃতির দলবৃত্ত রূপে গণ্য করতে হয়।*

৯। ইংরেজী রীতিতে ট্রোকে (trochee) উচ্চারণে ছন্দটির পাঠ হল

হল কি এ | হল কি! | এত ভারি | আশ্ চর্য্যি,— I

বিলাত্ ফেরতা | টান্ ছেন্ হক্ কা | সিগা রেট খাচ্ ছে |

ভশ্ চার্য্যি,— I

লৌকিক দলবৃত্তে
কলা-সঙ্কোচন

আর্যগাথার ‘পিউ’ অংশভুক্ত একশ্রেণীর অনুবাদ কবিতায়
দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম এই লৌকিক কলাবৃত্তে উচ্চারণের সঙ্কোচন
ঘটিয়ে তাকে বহুলাংশে গভীর ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে

তুলেছেন। যেমন,—

যখন দেখবে । চারিধারে ॥
শীতের পাতা । গ্যাছে বরে ॥
আমায় একবার । মনে কোরো; I
দেখবে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—

আমায় একবার মনে কোরো।
যখন শুনবে প্রেমগানে,
ঢালিবে সে মধু কানে,
হয়তো ডেকে দিবে এনে,
একটি অশ্রু আঁখি’পর;
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে,
আমায় একবার মনে কোরো।

(আর্যগাথা ২য় ভাগ Go where glory waits thee

ঐ পৃ. ১৬০)

‘হাসির গানে’ও লেখক লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির পরীক্ষা
করেছেন। যেমন

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার;
এই তিনি হিন্দুধর্মের কর্তন মর্ম ব্যক্ত;—
দিনের মত জিনিষ হত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হত ইঁটের মত শক্ত।

(হাসির গান চণ্ডীচরণ ঐ পৃ. ২৯০)

অথবা

বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপোর নয়;
তার আকাশেতে সূর্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়;
তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কচ্ছ নাক মোটে;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি, এ সব সত্যি কথা ভাই;
তোমরাও যদি দেখতে, তা’লে তোমরাও বলতে তাই।

(হাসির গান বিলেত ঐ পৃ. ৩১১-১২)

এখানে কবি দলের উচ্চারণ-প্রসারণ এবং পর্বযতিস্পন্দন যথাসম্ভব কমিয়ে পদযতির দীর্ঘ চাল এনেছেন। তবু এ-সব উদাহরণে প্রাচীন ছড়ার ছন্দকেই বাকধর্মী সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের স্বাভাবিকতা দিয়ে নতুন রীতিতে চালাবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা সুষ্ঠুতরভাবে রবীন্দ্রনাথও করেছেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে অনমনীয় উচ্চারণ-দৃঢ়তা এবং বাকধর্মী স্বাভাবিকতা ছন্দের বিশুদ্ধ পদভাগের কাঠামোতে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন এমন লৌকিক পর্বযতিপ্রধান ছন্দোবন্ধে উচ্চারণ সঙ্কোচনের দ্বারা তা প্রকাশ করা পুরোপুরি সম্ভব নয় বুঝেই আরও দূঃসাহসিক নতুনতর রীতির পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর এই রীতিকে বলা চলে পদপ্রধান দীর্ঘ যতিভাগের ছন্দের দলমাত্রিক রূপ। আট, ছয় বা দশ মাত্রার পদভাগে তিনি এখানে রুদ্ধ-মুক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেক দলে এককলা উচ্চারণ রেখেছেন। তার ফলে ছন্দ বিস্ময়কর রূপে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়তা পেয়েছে। আর্যগাথা ২য় ভাগে এ-ছন্দ রচনার প্রাথমিক সূচনা কিভাবে হয়েছিল তার উদাহরণ তুলছি।—

তোমার ভক্ত অনুরাগী ॥ চলে যাবে যখন শুধু— ॥

অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি? I

যখন তারা দুখবে জীবন অপিত যা তোমার পদে

ঝরবে কি গো তোমার দুটি আঁখি—

কেঁদো; যতই দুখক শত্রু, তোমার চোখের জলে প্রিয়ে

ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—

জানেন যিনি অন্তর্যামী তাদের কাছে দোষী হ'লেও

ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

(আর্যগাথা ২য় ভাগ When he who adores thee : ঐ পৃ. ১৫৮-৫৯)
এখানে ৮||৮||১০ I দলমাত্রা-ভাগে দীর্ঘ পদযতির ছন্দ রচিত হয়েছে। দীর্ঘত্রিপদী বন্ধের কাঠামোতে কবি মিশ্রবৃত্ত রীতি প্রয়োগের পরিবর্তে প্রতিমাত্রায় এক একটি রুদ্ধ বা মুক্ত দল বিন্যাস করে গেছেন।— সে কারণেই লঘু পর্বযতির স্পন্দন এখানে অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে। একটু শিথিল ভঙ্গিতে হলেও, এই পদযতিপ্রধান সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলমাত্রিক ছন্দ কবি আর্যগাথার ‘পিউ’ অংশে সংকলিত আরও কয়েকটি কবিতায় এবং আশাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি গানে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে তবে এই ছন্দের গভীর ভাবাত্মক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনার দিক থেকে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের ‘আলেখ্য’ (১৩০৭) কাব্য গ্রন্থটির গুরুত্ব সর্বাধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণবিকাশ নিজেও যে এ বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন, গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত ছন্দ বিষয়ক আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ভূমিকায় কবি লিখেছেন,—

এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic) ; ‘অক্ষর হিসাবে’ ছন্দ নয়। দাশরথি

কবি ‘মাত্রিক’ বলতে এখানে দলমাত্রিক এবং অক্ষর হিসাবের ছন্দ বলতে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ বোঝাতে চেয়েছেন। পূর্ব যুগেও বাংলা কবিতায় যে ‘মাত্রিক ছন্দ’ অর্থাৎ দলমাত্রিক (লৌকিক ছড়া গানের) ছন্দ প্রচলিত ছিল কবি তার উল্লেখ করেছেন। সে ছন্দে উচ্চারণ-শিথিলতা ছিল (সম্ভবত এখানে কবি দলমাত্রিক কলাপ্রসারণের কথাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন)। এ-কাব্যগ্রন্থে কবি দলমাত্রিক ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার (অর্থাৎ একদলে এককলামাত্রিক উচ্চারণের) এবং তালের অধীন করতে চেয়েছেন। লৌকিক ছড়া-গানে প্রচলিত দলবৃত্ত ছন্দ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত দলমাত্রিক ছন্দে পার্থক্য কোথায় এই মন্তব্যে কবি সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।^{১০} লৌকিক দলবৃত্তে এতকাল পর্য্যন্ত এবং

১ম উদাহরণ

প্রাতরাশে	ব্যস্ত	ছিলাম	আমি
প্রাফে,	একা	বাড়ীর	মধ্যে

নীচে,

২য় উদাহরণ

কথায়	কথায়	যাচ্ছে	শুধু	কথা বেড়ে
গানে	গানে	ছেয়ে	পড়ল	দেশটা।

৩য় উদাহরণ	কাব্য	নয়ক	ছন্দোবন্ধ	
	মিষ্ট	শব্দের	কথার	হার

৪র্থ উদাহরণ

সহে	নাক	কিছুই	বেশী	সহে	নাক	রাজাধিরাজ
অতি	দম্ভী	অত্যাচারী	পেতে	হবে	সাজা।	

বলপ্রসঙ্গ (stress accent) দিয়ে প্রসারিত উচ্চারণে সুরধর্মী ভাবে পাঠ করা হত। দ্বিজেন্দ্রলাল লঘুযতি এবং বলপ্রসঙ্গ তুলে দিলেন; পদযতির দীর্ঘচাল এবং উচ্চারণের সংশ্লিষ্টতা এনে দলবৃত্ত ছন্দ স্বাভাবিক বাকধর্ম পরিস্ফুটনে কতটা উপযোগী তা প্রমাণ করলেন। বাংলা ছন্দে এটিই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যেতে পারে।

আলেখ্যের ছন্দ আলেখ্য কাব্যে ব্যবহৃত এই সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত ছন্দ
সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন তার অংশ
সেনের মন্তব্য বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য (এবং অন্যান্য) কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেকস্থলেই আমরা যাকে স্রবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই একটি syllabic রূপ দিতে। আমার মনে হয়, এই তথ্যটি ভালো করে উপলব্ধি না করলে তাঁর আলেখ্য গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটিই ধরা পড়বে না। যা হোক, এই জন্যই দেখতে পাই তাঁর এই syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্রবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয়নি। এমন কি, তাঁর এই syllabic ছন্দে স্রবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোকসাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্রবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত সাহিত্যে স্থান দিতে চাননি। তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জন্যই তার এই অভিনব syllabic ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-

এখানে মাত্রা আনুক্রমিক ষোল ও চৌদ্দ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

তাল বিভাগ করে আরও বাড়ানো যায়; তবে তাতে ছন্দ রচনা করা একটু অধিক দুর্লভ হয়। অনেক সময় তাল ঠিক কোন জায়গায় পড়বে, তা অর্থের উপর নির্ভর করে।

আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই বোধ হয়। একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে। আর এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা সঙ্গীত ও শক্তি লক্ষিত হবে।

এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “কোমল তরল জল” কেহ “কো-ম-ল ত-র-ল জ-ল” পড়েনা, “কোমল তরল জল” এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, সেইরকম উচ্চারণ) করতে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ করলে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।”

(ঐ ভূমিকা পৃ. ৪০৫-৬)

দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে যে তাল বা ঝাঁকের কথা বলেছেন এবং উদাহরণ তুলেছেন, আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের একাধিক দীর্ঘ পদভাগের কবিতায় এত ঘন ঘন ঝাঁক আসেনি,— অনেক ক্ষেত্রে ‘পংক্তি ডিঙানো’ প্রবহমানতা এসেছে, এবং তাতেই উচ্চারণে সংহত দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে। ঝাঁক বা stress accent-এর দিকে যেখানে কবি আদৌ গুরুত্ব দেননি সেখানেই এই ছন্দ সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উচ্চারণের শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ করেছে।

বিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সুর ও ধ্বনিগাঙ্গীর্ষ ফুটে উঠেছে অথচ ছন্দটা syllabic বলে তাতে যৌগিক ছন্দে দুষ্প্রাপ্য একটা অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্যও দেখা যায়।... তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে যৌগিক ছন্দের শ্লথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই... অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্য-পরায়ণতাও নেই।... এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও যৌগিকের অলস একটানা সুর বর্জিত হয়ে একটি অভিনব পৌরুষশক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি Iambic ছন্দের কবিতায়। আর দ্বিজেন্দ্রলালের এই syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

(দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্তছন্দ উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন, পৃ. ৬৪৭-৬২)^{১১}

(১) ষোল মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী মাত্রাভাগ ৮ || ৮ I

কবিতা এটা খারাপ !— কিসে খারাপ || — এতে শরীর খারাপ করে? I
উদাহরণ রাত্রি জাগাও খারাপ তবে || যাত্রায় কিসা থিয়েটারে। I
যে জন রাত্রি জাগে তাকে নিন্দা কর হেন ভাবে?
আমি যদি উচ্ছন্ন যাই, উচ্ছন্ন তো সেও যাবে।

...

ক্রমাগত সন্দেশ কিসা ইলিশ মৎস্য খেলে পরে,
উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে;
'সর্বমত্যন্তগর্হিতম' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ যদি একটু আধটু ব্রাণ্ডি টানি।

(আলেখ্য দ্বাদশ চিত্র (মদ্যপ) ঐ পৃ. ৪৫৬)

কথোপকথনের ভঙ্গিতে, চোট বড় বাক্যে, চলতি ভাষায়, এখানে কবি দীর্ঘ দ্বিপদীবন্ধের দলবৃত্ত ছন্দে যে স্বাভাবিক বলিষ্ঠ উচ্চারণ ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সম্ভব ছিল মনে হয় না।

(২) দীর্ঘ ত্রিপদী মাত্রাভাগ ৮ || ৮ || ১০ I

একখানি তার তরী ছিল || বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা;— ||
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে; I
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে;— পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।

(ঐ নবম চিত্র (হতভাগ্য) পৃ. ৪৩৮)

১১। দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে লেখক এ-প্রবন্ধে যথাক্রমে স্বরবৃত্ত এবং যৌগিক ছন্দ নামে পরিচিত করেছিলেন।

বিষাদ-ভাব পরিস্ফুটনে কথা ভাষায় যে দীর্ঘ ত্রিপদী চালের ছন্দ পদান্তেও অনেক সময় প্রবহমানতা রেখে ব্যবহার করেছেন কবির বন্দব্য তাতে চমৎকার স্বাভাবিকতা পেয়েছে।

(৩) দীর্ঘ ত্রিপদী মাত্রাভাগ ৮||৮||৮||৬ I

গভীরা তামসী রাত্রি ; ॥ বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ; ॥
আকাশ জুড়ে চতুর্দিকে ॥ ঘিরে আছে মেঘে ; I
মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ে; শূন্য প্রান্তরেতে কেবল,
হ হ করে বহে যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে ;
নাইক আলোক, নাইক শব্দ ;— কেবল আকাশ দীর্ণ করে
মুহূর্মুহ পূর্বভাগে খেলে বিদ্যুচ্ছটা ;
কেবল দূরে অতি দূরে— ‘গুরু গুরু’ গুরু শব্দে
মুহূর্মুহ বজ্র হানে কৃষ্ণ ঘনঘটা ;

[আলেখ্য একাদশ চিত্র (সিরাজদৌলা) ঐ পৃ. ৪৫০]
পরাজিত, পলাতক সিরাজদৌলার চিত্র বর্ণনায় কবি এখানে দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে উপযুক্ত প্রকৃতি-পরিবেশের ছবি আঁকেছেন।

(৪) ছয়মাত্রা পর্বের চতুঃপর্বিক দীর্ঘ দ্বিপদী : মাত্রাভাগ ৬||৬||৬||৩ I
দেখতে ভালো যাহা । দেখতে ভালবাসি, ॥

শুনতে ভালো যাহা । শ্রাব্য সে ; I

কিন্তু যেন মিষ্ট । ছন্দোবন্ধ হলেই ॥

হয় না কোন কালেই ॥ কাব্য সে। I

[ঐ অষ্টম চিত্র (নর্তকী) ঐ পৃ. ৪৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল এ-কবিতায় ছয়মাত্রার পর্বযতি এবং দীর্ঘ বারোমাত্রার পদযতি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তে এই ছন্দোবন্ধের প্রয়োগে নূতনত্ব রয়েছে।

(৫) ত্রিপদী মাত্রাভাগ ৮||৮||৬ I

কি আশ্চর্য ! কি সম্পূর্ণ ? । কি সুন্দর এ বিশ্ব বিকাশ । হচ্ছে অহরহ ? I

ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা, । নীহারিকা হতে সূর্য, । সূর্য হতে গ্রহ ; I

ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহা বিনাশ ; সৃষ্টি হতে লয় ;

কি তালে কি মহাছন্দে চলেছে এ মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

ভাবি সে কি মহাজালা — “শূন্য” পাত্রের অন্ধকারে উর্ধ্বে অধঃ হতে—

ফুটে উঠছে জ্যোতির্বিদ্যে, বিশ্ব ফেটে পড়লে শেষে কোথায় যাচ্ছে উড়ে ?

সে শক্তিমণ্ডলী কোথায় ?— যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে,

বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষায়, কোটি এ জ্যোতিষ্ক চক্রে, মহা আবর্তনে !

[ঐ ঊনবিংশ চিত্র (সত্যযুগ) ঐ পৃ. ৪৮৫]

এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,—

প্রবোধচন্দ্র “পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ত্ব হয়ে গেলে পাঠক সহজেই অনুভব
সেনের মন্তব্য করবেন, কি স্বাভাবিক এই ছন্দ, এবং এর শক্তি ও গাষ্ঠীর্থ্য কত! বোধ
করি লৌকিক ছন্দের চরম শক্তি ও গাষ্ঠীর্থ্য প্রকাশ পেয়েছে এই
কবিতাটিতে; আর কারও রচনায় লৌকিক ছন্দের শক্তি এর চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে
বলে জানি না।” [রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প, গল্পভারতী, ১৩৬৪, বৈশাখ]
আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের উনিশটি কবিতা
আলেখ্যের কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতাতেই ছন্দোবন্ধের নতুনতর
বিশ্লেষণের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে প্রত্যেক কবিতার পূর্ণাঙ্গ
তালিকা পরিচয় দেওয়া গেল।—

প্রথম চিত্র (ঘুমন্ত শিশু)	পয়ার ৮ ৬ I; আংশিক পর্বযতিস্পন্দ রয়েছে। যতিপ্রাস্তিক, দু’একটি পংক্তি প্রবহমান।
দ্বিতীয় চিত্র (পুত্রকন্যার বিবাদ)	দ্বিপদী ১০ ১০ I; ভাব-প্রবহমানতায় পদযতি মাঝে মাঝে লুপ্ত; পংক্তি যতিপ্রাস্তিক।
তৃতীয় চিত্র (নূতন মাতা)	দ্বিপদী একাবলী ৬৬ I; অনেক সময় ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ ঘটেছে। দলবৃত্তে ছয়মাত্রার যতিভাগ সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম ব্যবহার করেছেন। যতিপ্রাস্তিক।
চতুর্থ চিত্র (বুড়োবুড়ী)	ত্রিপদী ৮ ৮ ১০ I; ভাব-প্রবহমানতায় পদযতি সর্বত্র সমান নেই। যতিপ্রাস্তিক।
পঞ্চম চিত্র (বিপত্নীক)	ত্রিপদী ৮ ৬ ৬ I; ভাব প্রবহমানতায় পদযতি সর্বত্র সুনির্দিষ্ট থাকেনি। যতিপ্রাস্তিক।
ষষ্ঠ চিত্র (মাতৃহারা)	পদযতির ছন্দ; পংক্তিবন্ধ অসমান; সমিল মুক্তকধর্মী—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর মিশ্রবন্ধ।
সপ্তম চিত্র (বিবাহ যাত্রী)	চৌপদী; ত্রিপংক্তিক স্তবক; মিল লক্ষণীয়।— ৮ ৮ ৮ ৮ I ৮ ৮ ৮ ৮ I ৮ ৮ ৮ ৮ I কাঁকা— খ I গাঁগা— খ I ঘাঁগা— ঘ I
অষ্টম চিত্র (নর্তকী)	দ্বিপদী, ছয় মাত্রার পর্ব, ৬৬ ৬৬ I; তৃতীয় চিত্র থেকে এখানে ছন্দোবন্ধ ও মিল পৃথক, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই ছয় দলের পর্বযতি আছে।
নবম চিত্র (হতভাগ্য)	ত্রিপদী ৮ ৮ ১০ I; পদযতি সর্বত্র সুনির্দিষ্ট নয়।
দশম চিত্র (বিধবা)	দ্বিপদী-ত্রিপদী মিশ্র-স্তবক।

	মাত্রাভাগ ১০ ১০ I চ চ ১০ I চ চ ১০ I
	মিল কা ক I খা খা গ I খা খা গ I
একাদশ চিত্র (সিরাজদ্দৌলা)	চৌপদী চ চ চ ৬ I; পদযতি মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
দ্বাদশ চিত্র (মদ্যাপ)	দ্বিপদী চ চ I; ভাবের অনুরোধে দু-এক স্থলে পদযতি পরিবর্তিত হয়েছে।
ত্রয়োদশ চিত্র (রাখাল বালক)	ত্রিপদী চ চ ১০ I; পদযতি সর্বদা স্পষ্ট নয়।
চতুর্দশ চিত্র (নেতা)	দ্বিপদী ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ২ I; এখানে চতুর্দল পর্বযতিস্পন্দ সুস্পষ্ট। পদান্তর মিল।
পঞ্চদশ চিত্র (ভক্ত)	দ্বিপদী ৬ ৬ ৬ ৩ I; ছয় মাত্রার যতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়।
ষোড়শ চিত্র (রাজা)	দ্বিপদী ৬ ৬ ৬ ৬ I যতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়।
সপ্তদশ চিত্র (কবি)	দ্বিপদী ৪ ৪ ৪ ৩ I; চতুর্দল পর্বযতিস্পন্দ রক্ষিত হয়েছে।
অষ্টাদশ চিত্র (বিপ্লবীক২)	ত্রিপদী চ চ ৬ I; পদযতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়।
উনবিংশ চিত্র (সত্যযুগ)	ত্রিপদী চ চ ৬ I; ভাব-প্রবহমানতায় অনেক সময় পদযতি লুপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ বাক্যে ভাব ও ছন্দের গাভীর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে দলবৃত্ত ছন্দে মেঘনাদবধকাব্য লিখিত হলে আরও স্বাভাবিক হত। তখন একাধিক সমালোচক কবির এই অভিমতকে কটাক্ষ করেছিলেন। সম্ভবত তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকাব্য থেকে অংশ বিশেষ যে ভাবে তর্জমা করে পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি।^{১২} কবি সেখানে লৌকিক দলবৃত্তের উচ্চারণ-সঙ্কোচন ঘটিয়ে যে ছন্দ রচনা

মেঘনাদবধ কাব্যে দল-

মাত্রক ছন্দ প্রয়োগ

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের
অভিমত

১২। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এই প্রাকৃত বাংলাতেই ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাদ্ধ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুগুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ ক’রে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

(ছন্দ (১ম সং) বাংলা ছন্দের প্রকৃতি পৃ ৫৩)

এতে গাভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।...

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন।

করেছিলেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের পদযতিপ্রধান দলমাত্রিক রীতির সংহত উচ্চারণ এবং ধ্বনিগাণ্ডীর্থ্য পরিস্ফুট হয়নি। পর্বযতিসম্পন্দের আংশিক চট্টল নৃত্যভঙ্গি সেখানে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিতর্কের দীর্ঘকাল পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় সুগম্য মনোমোহন ভাবছন্দে এই সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির উপযোগিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত এখানে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির দলবৃত্ত ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে পার্থক্যটি কোথায় একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বহুবারই উল্লেখ করেছেন যে, প্রাকৃত ছড়ার ছন্দই প্রাণবান সচল বাংলা ছন্দ। একে

রবীন্দ্রনাথ ও	সাহিত্যের আসরে তিনি স্থান দিতে চেয়েছেন এবং দিয়েছেনও।
দ্বিজেন্দ্রলালের	রবীন্দ্র-কবিতায় এ-ছন্দের দুটি রূপ পাওয়া যায়। একটি সেই
সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত	‘ছেলেভুলানো ছড়া’র প্রসারিত বল-প্রান্তরিক উদাহরণের সুপরিচিত
ছন্দে পার্থক্য	রূপ; অপরটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের (যে রূপ ‘পলাতকা’র কবিতাগুলিতে

মিলে) রূপ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ভাবগাণ্ডীর্থ্য ফোটাতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ পদযতি আনলেও পর্বসম্পন্দ সম্পূর্ণ লোপ করেননি। পর্বযতিপ্রধান লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ থেকেই যে এ ছন্দের রূপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্র ছন্দোবলীতে সেটি স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল পদপ্রধান দলবৃত্ত ছন্দ রচনায় Cæsuri section -এ বিভক্ত ইংরেজি ছন্দের ছাঁটটিই মনে রেখেছেন। তারই বিকল্পরূপ হিসাবে মিশ্রবৃত্তে ব্যবহৃত আট-দশ বা আট-ছয় মাত্রার পদভাগের ছন্দোবলী কলামাত্রার পরিবর্তে দলমাত্রা বিন্যাসের দ্বারা নতুন ছন্দ উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন। তার ফলে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনিশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ নতুনরীতির একটি ছন্দ বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছে। এ ছন্দ লৌকিক ছড়ার ছন্দের আদর্শে রচিত নয়। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত থেকে এখানে ধ্বনিগাণ্ডীর্থ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও উভয়েই বাকধর্মী চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তবু প্রয়োগরীতির দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। এই জন্যই ‘মেঘনাদবধকাব্য’র অংশবিশেষের দলমাত্রিক অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যথোপযুক্ত গাণ্ডীর্থ্য সৃষ্টি করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ পদভাগের দলবৃত্ত রীতিতে এই কাব্যগ্রন্থের রূপান্তর করলে সেখানে যথোচিত ভাব-ও ধ্বনি-গাণ্ডীর্থ্য পরিস্ফুট করা সম্ভব বলেই মনে হয়।

‘ত্রিবেণী’ (১৯১২) কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তিন শ্রেণীর ছন্দ ব্যবহার করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন।^{১০} গ্রন্থের ভূমিকায় কবি ছন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে

ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের	তাঁর কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতি সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয়
ছন্দ	পাওয়া যায়। কলাবৃত্তের মধ্যে “যুক্তাক্ষর, ঐ কার, ও কার
	ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হয়” বলে কবি মন্তব্য

করেছেন;— এখানে স্পষ্টতই তিনি কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থটির ‘মিতাক্ষর’ বিভাগে লেখক বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত হ্রস্বের (‘বিকাহের উপহার’ পৃ ৫০৮, ‘প্রথম চূষন’ পৃ ৫১১ দ্র.) এবং মিশ্রবৃত্ত হ্রস্বের কবিতা চয়ন করেছেন। মাত্রিক বিভাগে প্রধানত যে কবিতা-গান বিন্যস্ত হয়েছে তার ছন্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির দলমাত্রক হলেও, লৌকিক দলবৃত্তেরই সংহতরূপ বলা চলে। পর্বকতি লোপ পেনেও তার স্পন্দনটুকু আংশিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে। তবে ‘দশপদী’ বিভাগে দলমাত্রক যে ১৮ মাত্রা পংক্তির ২৭টি দশপংক্তিক কবিতা সংগ্রহিত করেছেন তার ছন্দ ‘আলেখ্য’ কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃত কাব্যংশগুলির ন্যায় বিশুদ্ধ পদযতিভাগে (এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রবহমান) সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের উচ্চারণে রচিত হয়েছে।

ইংরেজি কাব্যে Rhyme Royal (সাত পংক্তির স্ববক), Ottava Rima (আট পংক্তির স্ববক), Spenserian Stanza (নয় পংক্তির স্ববক) ইত্যাদি বিশিষ্ট রীতির স্ববক সুপরিচিত। দশ পংক্তির স্ববকেও কীটসের Ode to Nightingale, ম্যাথু আর্নোল্ডের Scholar Gipsy, রসেটির Burden of Nineveh প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা লেখা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন বাংলা কবিতায় সুপ্রচলিত সনেটের তুলনায় দশপংক্তিক প্রবহমান, আঠারমাত্রা পংক্তিক সংশ্লিষ্ট নবরীতির দলবৃত্ত ছন্দ বেশী পছন্দ

দশপংক্তিক করেছিলেন। ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের ‘দশপদী’ বিভাগে তিনি মোট প্রবহমান সাতাশটি এই শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন (মাত্রিক বিভাগেও দু-একটি সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত কবিতায় মাঝে মাঝে দশপংক্তিক স্ববক ব্যবহার করেছেন)। এই রীতির কবিতা কবিতাগুলিতে চতুর্বিধ পংক্তিমিল লক্ষিত হয় : (১) কথকথ গঘগঘ

গুঙ, (২) কথকথ গঘগঘ গুঙ, (৩) কথকথ গঘগঘ গুঙ, (৪) কথকথ গঘগঘ গুঙ — সবগুলিই প্রবহমান আঠারো (কদাচিৎ সতের) দলমাত্রক মহাপয়ার পংক্তিবন্ধে রচিত

ত্রিবেণীর ভূমিকায়
দ্বিজেন্দ্রলালের
মন্তব্য

কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবদ্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর একর ও গুণকর ছন্দেবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈকর কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রচিত ‘মদ্র’ কাব্যে

সমস্ত কবিতা, এই শ্রেণীর। (২) মাত্রিক — অর্থাৎ যে কবিতায় ছন্দ মাত্রা (‘syllable’) দ্বারা পরিমিত হয়। মদ্রচিত ‘আলেখ্য’ কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর। (৩) দশপদী — অর্থাৎ ‘মাত্রিক কবিতা’ যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দশপদী কবিতা না লিখিয়া দশপদী কবিতা লিখি কেন ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজী বা ইটালিয়ান Sonnet এর অল্প অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। অষ্টপদী, যটপদী বা চতুর্দশপদী কবিতা কেহ প্রচার করিতে চাহেন—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ ‘বৃহৎ’ ঠেকে। এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে ‘আলেখ্য’র কবিতাগুলিরই মত একটু শরু ঠেকিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।

(ত্রিবেণী ভূমিকা, ৩ পৃ. ৪৯১)

দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি ‘দশপদী’ কবিতা উদ্ধৃত করছি।—

একটি বর্ণময়ী চিত্রা, একটি ক্ষুদ্র স্পন্দ স্পর্শময়,	ক
গীতিময়ী স্মৃতিসম প্রভাত হয়েছিলে—হে উর্বশী!	খ
যে দিন আমার জীবনে এ; বুঝেছিলাম এ প্রকৃত নয়,	ক
রবে না এ;— যবে বিশ্বের সমগ্র মাধুরী মহীয়সী	খ
ওঠে স্নর্গে ধুমায়িত হয়ে, নিঃস্ব করি মর্তভূমে,	গ
শেষে একটি রূপবিন্দু হয়ে ধীরে ধরাতলে নামে;	ঘ
সহে না প্রকৃতি তাহা; আমি যবে মগ্ন মোহঘূমে,	গ
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়ে, তুমি (করি বিদলিত কামে	ঘ
প্রেমসম) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত ক’রে	ঙ
উড়ে গেল; মিশে গেল সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত অশ্বরে।	ঙ

(ত্রিবেণী উর্বশী ঐ পৃ. ৫৩৫)

ভাবের দিক থেকে বিচারে প্রত্যেকটি কবিতা সমান সার্থক হতে পেরেছে বলা চলে না। তবে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার যে কত বলিষ্ঠভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং মহাকাব্যের মহিমাম্পিত বিষয়বস্তু যে এ ছন্দেই কত সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করা যায়— আলেখ্য ও ত্রিবেণী কাব্যের অন্তর্গত আলোচ্য শ্রেণীর কবিতাগুলি পাঠ করতে গেলে সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত বা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত ছন্দ, যেটাই ব্যবহার করুন না কেন, সর্বত্রই প্রধানত বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিক ভাবমুক্তির দিকে তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। সেই একই কারণে কৃত্রিম সাধু উদাহরণের ভাষার তুলনায় হসন্তপ্রাণ কথ্যভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যবহারের দিকেই তাঁর প্রবণতা দেখা যায়। এ সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট ছন্দের মতবাদ আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় (এবং অংশত আষাঢ়ে ভাষাবৈশিষ্ট্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়) প্রকাশ পেয়েছে। আলেখ্যের ছন্দ আলোচনা শেষে কবি লিখেছেন,

“তার পরে ভাষা ! যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি— যেমন যাচ্ছি, কচ্ছিলাম, ইত্যাদি। অন্য পদ নির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জন করিনি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমৃদ্ধ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে, যেখানে বাঙ্গলা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গলা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গলা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গলা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্তব্য। তাতেই বাঙ্গলা কবিতা হবে! ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ করে লিখলে সে ইংরেজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। “গুঁতোর

চোটে বাবা বলায়” কি “ভাতে মেরোনা” এই রকম জোরের বচন কেহ ইংরেজিতে কি সংস্কৃততে অনুবাদ করুন দেখি।

(আলেখ্য ভূমিকা ঐ পৃ. ৪০৬)

স্বাভাবিক ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা বচন ব্যবহারের অত্যধিক প্রবণতায় মাঝে মাঝে কবি ছন্দের এবং ভাবের ‘সুশ্রাব্যতা ও মর্যাদা’ কিছু ক্ষুণ্ণ না করেছেন এমন নয় (মন্দ্র সমুদ্রের প্রতি দ্র.)। তবু চলতি ভাষার হসন্তপ্রাণ ধ্বনি-সৌন্দর্য পরিস্ফুটনে এবং স্বাভাবিক বাকধর্মী প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধনে তাঁর এই বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ভাবপ্রকাশ ও ধ্বনিম্পন্দ সৃষ্টিতে বাংলা ভাষার বিপুল সম্ভাবনাময় অন্তর্শক্তি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন।

সংস্কৃত উচ্চারণের ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল যথাক্রমে কৌতুক কবিতায় এবং সংগীতে অল্পসল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

(১) অনুষ্টুভ — — — — —
ব্যারি ষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা!

— — — — —
ভারতে ভারি অভুত আশ্চর্যমহতী সভা॥

আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।

মাদ্রাজি উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে॥^{১৪}

(আষাঢ়ে কলিযজ্ঞ ঐ পৃ. ২৫২)

(২) পজ্ঝাটিকা — — — — —
জানো না কি কদাচন মুঢ়

— — — — —
কর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গুঢ়?

কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,

যদি না তা আকর্ষণ জন্য?^{১৫}

(কর্ণবিমর্দনকাহিনী আষাঢ়ে ঐ পৃ. ২৫৪)

১৪। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষে স্বনিয়মো মতঃ॥

(ছন্দোমঞ্জরী ২৫৮ শ্লোক)

অনুষ্টুভে সর্বত্র পঞ্চম বর্ণ লঘু, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তমবর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠবর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণে বিশেষ কোনও নিয়ম নেই।

১৫। প্রতি পদ্যমকিতষোড়শমাত্রা নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা।

‘পজ্ঝাটিকা’ পুনরত্র বিবেকঃ ক্বাপি ন মধ্যগুরুগণ একঃ॥ (ছন্দোমঞ্জরী : ২৬১ শ্লোক)

প্রতিপাদে যদি যুগ্মবর্ণে যতি ও ষোড়শমাত্রা থাকে এবং নবম মাত্রা গুরু হয়, তবে তাহা ‘পজ্ঝাটিকা’। এতে মধ্যগুরু গণ থাকবে না।

কৌতুক-কবিতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই কৃত্রিম উচ্চারণের ছন্দ কিছু বেমানান হয়নি। তবে গভীর ভাবের কোনও কবিতায় যে এ ছন্দ চলবেনা বাকধর্মী দলমাত্রিক ছন্দের উদগাতা নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করেছিলেন; আর সে কারণেই এই কৃত্রিম ছন্দ তিনি সেরূপ কোনও কবিতায় আদৌ ব্যবহার করেননি। একাধিক গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

প তি তো দ্বা রি নী গ ঙ্গে।

শ্যা ম বি ট পি ঘ ন ত ট বি প্লা বি নী ধু স র ত র ঙ্গ-ভ ঙ্গে।

(গান দ্বি. গ্র. পৃ. ৬১৮)

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দিকে রচিত তিনটি পৌরাণিক, (পাষাণী ১৯০০, সীতা ১৯০৮ নাট্যসংলাপে এবং ভীষ্ম ১৯১০)^{১৬} একটি ঐতিহাসিক (তারাবাই) এবং একটি ব্যবহৃত অপেরা শ্রেণীর (সোরাব রুস্তম) নাটকে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার প্রবহমান জাতীয় মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ভাবোচ্ছ্বাসধর্মী গদ্যরীতির চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। কারণস্বরূপ নাট্যকার বলেছিলেন,

“প্রথম Shakespeare এর অনুকরণে Blank verse লিখিতে আরম্ভ করি। তারাবাই প্রকাশ হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের এককপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন মন্তব্য ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই— এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক।... Shakespeare-এ খানিক গদ্য, খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরেজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাংলাতে, “যদি তুমি আস সখি, আমি সেথা যাবো” ইহার পরে “নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী” এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের সে অবস্থা আসিয়াছে।”

(আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩৯৭ পুনরুদ্ভার

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার : রবীন্দ্রনাথ রায়। পৃ. ৩৫১)

দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তি কিন্তু সমর্থনীয় নয়। ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপের উপযোগী মুক্তক ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার ছন্দে লিখিত

১৬। ‘ভীষ্ম’-এ হুয়েছিল অনেক আগে কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পর।

নাটকে পদ্যবন্ধ
ব্যবহার না করার
প্রকৃত কারণ

কয়েকটি নাটকও (রাজা ও রাণী, মালিনী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আসল কথা হল, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবোচ্চাসকে যত বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান পয়ারবন্ধে তাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তাছাড়া,

এযুগের নাটকে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বহুলাংশে কৃত্রিম বলেই গণ্য হয়েছে। ইংল্যান্ডে শেকসপীয়র-মার্লোর ছন্দোবদ্ধ-নাট্যসংলাপ পরবর্তী যুগে বাকধর্মী বিশুদ্ধ গদ্যসংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বহুলভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু বিংশ শতকে এসে সে প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র নিজেই পরিণত জীবনে ছন্দোবদ্ধ-সংলাপের পরিবর্তে গদ্যসংলাপ বেশী ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতকের নাটকগুলিতে ছন্দোবদ্ধ-সংলাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং এই যুগের অন্যান্য নাট্যকারেরাও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বাংলা নাটকে সাময়িকভাবে শেকসপীয়রীয় আদর্শে যে ছন্দোবদ্ধ নাট্যসংলাপ প্রবর্তিত হয়েছিল, বিংশ শতকে পৌছে সে প্রভাব থেকে আবার মুক্তি ঘটেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসে, গদ্যভাষা নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক একথা উপলব্ধি করেও বিংশ শতকে লিখিত ‘সীতা’ (১৯০৯ প্রকাশ, ১৯০১-২ রচনা) নাটকের সংলাপে লেখক সমিল প্রবহমান পয়ার-মহাপ্রয়ার ব্যবহার করলেন কেন? গ্রন্থটিকে কবি-নাট্যকার বিশুদ্ধ নাটক না বলে নাট্যকাব্য বলেছেন। তাতে মনে হয়, শেষ জীবনে কাব্যলক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিয়ে নাটক ও গানে আত্মসমর্পণ করলেও ছন্দের প্রভাবকে কবি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বিশুদ্ধ গদ্যসংলাপী নাটক রচনা না করে তাই এখানে ছন্দোবদ্ধ নাট্যকাব্য রচনায় আগ্রহী হয়েছেন।

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবন বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায়, তাঁর কবি-স্বভাবের দ্বিজেন্দ্রলালের কবি- উপর গীতি ও নাট্য প্রবণতায় বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁর প্রথম স্বভাবের সঙ্গে রচনার (আর্যগাথা ১ম ভাগ) সূত্রপাত গান দিয়ে। আর্যগাথা ২য় গীতি ও নাট্য- ভাগের গীতি কবিতাগুলি দেশী-বিদেশী সুরের দ্বারা প্রভাবিত। স্বভাবের বিরোধ আষাঢ়ে, হাসির গানেও সুরের প্রভাবে কাব্যছন্দ বার বার শিথিল হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নাট্যধর্মী সংলাপের প্রভাবও তার কাব্যছন্দের পরিমিত যতিভাগকে বার বার বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, আলোচ্য, ত্রিবেণী — সর্বত্রই তার সাক্ষ্য মিলবে। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে মৌলিক সুরশ্রুতি ছিলেন, বাংলা নাটকেও তিনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। সুরের সন্মোহন জাল এবং নাটকের উপযোগী চলতি ভাষার স্বাভাবিক বাকধর্ম দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ছন্দ-কাঠামোকে সর্বাংশে পূর্ণতা লাভ করতে দেয়নি। সেই কারণেই আর্যগাথা ২য় ভাগ (‘পিউ’ অংশ), আষাঢ়ে এবং হাসির গানে শিথিল মিশ্র-উচ্চারণরীতির ছন্দ প্রাধান্য পেয়েছে। বিদেশী ছন্দের আদর্শে দলমাত্রিক বলিষ্ঠ উচ্চারণভঙ্গির ছন্দ নিয়ে তিনি মৌলিকভাবে পরীক্ষা করেছেন। আংশিক সিদ্ধিলাভও করেছেন। অবশ্য তাঁর ছন্দের সাবলীলতা বিদেশী

ভাষাভঙ্গির একঘেষে অনুকরণে (mannerism) কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেকথা স্বীকার করতে হয়। নতুন কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ ফললাভের পূর্বেই কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সংস্কৃত ও নাটকের রাজ্যে আত্মনিমজ্জন করেছেন। দলমাত্রিক ছন্দের গাঞ্জীর্ষময় আশ্চর্য প্রকাশশক্তির পরিচয় তাঁর আলেখ্য কাব্যেই রয়েছে। ত্রিবেণীর ‘দশপদী’ কবিতাগুলিতে এ ছন্দের প্রবহমান রীতির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবি নিজেই সিদ্ধি করায়ত্ত হবার মুখে কাব্য রচনাই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজের ভার পরবর্তীরাও কেউ গ্রহণ করেননি। লৌকিক ‘ছড়ার ছন্দ’ থেকে উদ্ভূত পর্বস্পন্দনময় সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও সেই রীতিরই অনুসরণ করেছেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ এই বিশুদ্ধ দীর্ঘপদভাগের দলবৃত্ত ছন্দ আজও পর্যন্ত অবহেলিত রয়েছে।

।।গ।।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত এ যুগের উল্লেখযোগ্য সমস্ত কবিই কমবেশী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যেও সবচেয়ে কম প্রভাব পড়েছে কবি বিজয়চন্দ্র এই যুগের মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), অপর অনিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫২) এবং সুকুমার রায়ের কবিগণ (১৮৮৭-১৯২৩) উপর। বিজয়চন্দ্র ঊনবিংশ শতকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। তবে তাঁর প্রখ্যাত তিনটি কাব্যগ্রন্থ ফুলশর (১৯০১), যজ্ঞভঙ্গম (১৯০৪) এবং হেঁয়ালি (১৯১৫) বিংশ শতকেই প্রকাশিত হয়েছে।^{১৭} কবি তৎকালীন প্রচলিত বাংলা কবিতার সবরকম ছন্দরীতি সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার (সমিল), যতিপ্রাস্তিক মহাপয়ার ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত রীতিতে বহুল যুক্তবর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতির আদর্শে বাংলাছন্দে মুক্তদলের কৃত্রিম দীর্ঘ উচ্চারণের পরীক্ষা করেছেন। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের আদর্শে দলমাত্রিক রীতিতে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ আনবার চেষ্টা করেছেন।

কবির প্রবহমান (সমিল) পয়ার বা যতিপ্রাস্তিক মহাপয়ার ব্যবহারে নির্ভুল প্রয়োগরীতির পরিচয় থাকলেও, নূতনত্বের পরিচয় নেই। কলাবৃত্ত ছন্দে অতিপর্বিক দোলা এবং অনুপ্রাসবহুল যুক্তবর্ণ প্রয়োগে কবির ছন্দকুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

১৭। ফুলশরের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৯৫-১৯০০, যজ্ঞভঙ্গমের কবিতাগুলির প্রকাশ কাল ১৮৯৩-১৯০৩; হেঁয়ালিতে মুখ্যত কবি উক্ত দুটিগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতাই পুনর্বার সংকলিত করেছেন।

ঐ সানুর সোপান মালার উর্দ্ধে
 শৃঙ্গ চরণ রঞ্জিকা
 শোভে অভ্রসুখমা, যেন রে শুদ্ধা
 গৌরকান্তি অম্বিকা।
 তথা অর্ধধূসর ভূধরখণ্ড
 দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে;
 যেন নন্দীর মত রুদ্ধ প্রহরী
 দলিছে চরণে রৌরবে।

(হৈয়ালি হিমাচলে পৃ. ১৭)

কবিতাটিকে নানা দিক থেকে কবি ছন্দের অলঙ্করণে সাজিয়েছেন। অতিপর্বের দোলা প্রত্যেক পংক্তির প্রথমে এসেছে, যুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদল প্রয়োগে প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব তরঙ্গায়িত করেছেন। ছয়মাত্রার পর্বে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনমাত্রার গতিচঞ্চল দুটি করে শব্দ প্রয়োগে ছন্দকে নতুন গতি বেগ দিয়েছেন! পংক্তিশেষে চারমাত্রার পর্বে সেই গতিকে স্তিমিত করেছেন, সেখানেও ত্রিদল শব্দে প্রথম দুটি রুদ্ধ, বাকী দুটি মুক্ত রেখে সেই সঙ্গে ললিত মিল (feminine rhyme: অর্থাৎ, পংক্তি প্রান্তিক শব্দ মিলে তিনটি স্বরধ্বনির এবং প্রান্তস্থিত বাঞ্ছনধ্বনির মিল, যেমন রঞ্জিকা-অম্বিকা, গৌরবে-রৌরবে) দিয়ে ধ্বনির আবর্তন-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। সম্ভবত এতগুলি শ্রুতি-মনোহারী অলঙ্করণ লক্ষ করেই কবি-সমালোচক কালিদাস রায় আলোচ্য কবিতাটিকে ‘ছন্দহিল্লোলে’র একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করেছেন (দ্র. সাহিত্য প্রসঙ্গ ২য় সং পৃ. ৭৮)।

বাংলা কবিতায় সচেতনভাবে সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই চলেছে। সংগীতে কিছুটা সফল হলেও, আধুনিক যুগের কবিতায় এমন কৃত্রিম উচ্চারণ সফল হওয়া সম্ভবপর নয়,— সে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়চন্দ্র তার যজ্ঞভস্ম এবং হৈয়ালি কাব্যগ্রন্থে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দরীতি এবং আংশিক স্বাধীন হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ছন্দরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। মুক্তদলের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-সমন্বিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ ব্যবহারে তিনি আদৌ সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন তোটক ছন্দোবন্ধে লিখেছেন,—

গ গ নে গু রু গ জ ন কে ন ক র?

অতি ভৈরব মুরতি কেন ধর?

তব ঘৃণিত রক্তিম চক্ষু দিয়া

অনলের কণা পড়িছে খসিয়া।^{১৮}

(যজ্ঞভস্ম পৃ. ৬৮)

১৮। বদ ‘তোটক’ মধিসকারযুতন্ম (ছন্দোমঞ্জরী ৭০ সংখ্যক সূত্র)

যে ছন্দে ক্রমশ চারটি স-গণ (— — —) হয়, তাকে ‘তোটক’ বলে।

অনুরূপ ‘বসন্ততিলক’, ‘মন্দাকিনী’ প্রভৃতি ছন্দও ব্যবহার করেছেন। বসন্ততিলকের উদাহরণে কবি ভারতচন্দ্রের কৌশল অবলম্বন করেছেন। কবিতাটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পাঠ না করে একটি আধুনিক মিশ্রবৃত্ত পয়ার হিসাবে পড়া যেতে পারে।
যেমন—

— — — — —
মে ষে ড় বে ঝ রি প ড়ে ত ব র শ্মি মা লা,
দীপ্ত প্রভা পরশিয়ে তম যায় দূরে;
সংজ্ঞা ফুটে নরগৃহে হরষে প্রভাতে,
গীতিস্বরে বিহগিনী বনরাজি পুরে।^{১২}

(যজ্ঞভঙ্গ্য সূর্যপূজা পৃ. ৬৩)

এ কবিতায় সংস্কৃত হৃদ্যদীর্ঘ উচ্চারণ এবং মিশ্রবৃত্ত বাংলা উচ্চারণ,— উভয় পাঠক্রম রাখবার ফলে অনুমান করা চলে যে কৃত্রিম উচ্চারণে পাঠকের মন তৃপ্ত না হতে পারে এমন সংশয় কবির মনেও ছিল।

হৈয়ালি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় ‘ফুলশর’-এর নির্বাচিত কবিতাগুলি কবি ‘লঘু-গুরু’ উচ্চারণে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর একটি উদাহরণ তুলছি।—

— — — — —
ত ব প ঞ্জ পু ঞ্জ র চি ত কা ঞ্জি
— — — — —
নি শী থ কু সু ম চা পে
— — — — —
সি ত ই ন্দু কি র ণ র ঞ্জি ত ত নু
— — — — —
অ ত নু ভ রি ল তা পে ।
তুমি স্নিগ্ধমন্দ মধুর গন্ধি
মলয় পবন সেবিত,
তবু কান্ত পরশ লভি, পরবশ

অন্তর পরিদেবিত। (হৈয়ালি ফুলশর পৃ. ১০৯)

এখানে কবি সংস্কৃত বৃত্তছন্দের মতো রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্টতা রক্ষা করেননি। সমস্ত পংক্তিতে দলসংখ্যা সমান নয়, (২) ৬||৬||৬||৪ I — পর্ব-পদভাগে পংক্তি বিন্যাস করেছেন,— আর মুক্তদলের দীর্ঘ (গুরু) উচ্চারণ কেবলমাত্র প্রতি পংক্তির বাংলা কবিতা-গানে সর্বশেষ শব্দের মাত্রা-বিন্যাসে রেখেছেন।— তার ফলে পূর্ববর্তী সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের সংস্কৃত ছন্দের তুলনায় এই উচ্চারণরীতি ইন্দু কাব্যগ্রন্থে অনেকটা সফল হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ (দ্র. দেশ দেশ নন্দিত সকল) করি ও দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্র. পতিতোদ্ধারিনি গঞ্জে) — সংগীতে

১৯। ছেয়েঃ ‘বসন্ততিলক’ ততজা জগৌ গঃ (ছন্দোমঞ্জরী ১১২ সংখ্যক সূত্র)

যে ছন্দের প্রতিপাদে ক্রমশঃ একটি ত (— — —), একটি ভ (— — —), দুইটি জ (— — —) এবং দুইটি গ (—) গণ থাকে তাকে ‘বসন্ততিলক’ বলে জানবে।

আংশিক সংস্কৃত উচ্চারণরীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথও সংগীতে অনুরূপ উচ্চারণ এনেছেন। কাব্যে এ-ছন্দ সর্বপ্রথম সচেতনভাবে বিজয়চন্দ্র ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন। দিলীপকুমার রায় পরবর্তী কালে এই রীতির প্রধানতম সমর্থক হয়েছিলেন। আরও একাধিক আধুনিক কবি এই উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছেন। বাংলা ছন্দের আধুনিক উচ্চারণভিত্তিক প্রধান রীতিগুলির পাশে পুরানো সংস্কৃত উচ্চারণরীতির ছন্দকে ফিরিয়ে আনবার নানা প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রত্যেক যুগেই লক্ষিত হয়েছে।— এ-যুগে সে প্রচেষ্টা আরও তীব্র হয়েছিল, আংশিকভাবে সফলও হয়েছিল;— পরবর্তী সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দে তার নিদর্শন মিলবে। বিজয়চন্দ্র এই ধারারই অন্যতম পথিক ছিলেন বলা চলে।

বিজয়চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। হেঁয়ালির অন্তর্ভুক্ত ‘দ্বদেশীস্মৃতি’ কবিতাগুলো দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির প্রতি ভক্তমনের অর্থ নিবেদন করেছেন। এই অংশের কবিতায় সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দলমাত্রক সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক পদযতিপ্রধান ছন্দ (সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনারীতির আদর্শে উদ্ভূত হয়ে) ব্যবহার করেছেন। এখানে দীর্ঘ ত্রিপদী (৮॥৮॥১১ I) এবং মহাপয়ারের (৮॥১০ I) দুটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

- (১) একলা বসে থাকি পাড়ে; সাঁঝের পরে রাত্রি আসে;
জলের তলে জুলে তারার দেয়ালি।
শূন্য পথে এসে, আমার মৌন প্রাণের উপর ভাসে
জন্ম এবং মৃত্যুতত্ত্বের হেঁয়ালি।

(হেঁয়ালি অমানিশায় পৃ. ৩)

- (২) এই জীবনের উষাকালে, সাঁঝের বেলা, মায়ের কোলে শুয়ে,
দেখেছিলাম প্রথম তোমায় এমনি করে’ আসতে নেমে ভুঁয়ে।

কুণ্ডলিকায় ঢাকা তোমার অঙ্গ থেকে আলো আসুক ধয়ে,
সন্ধ্যা ভুলে আঁধার ভুলে, থাকি তোমার হাসির পানে চেয়ে।
ভোবের পাখির মত আমি গীতিস্বরে ভ’রে বিশ্বখানি,
সুপ্ত আঁখির তলায় তলায় জাগিয়ে তুলি জাগরণের বাণী।

(হেঁয়ালি এস তুমি পৃ. ৯)

এ ছন্দে সংহত উচ্চারণ-গাঙ্গীর্ষ এবং দীর্ঘ পদযতির দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য কাব্যে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক ছন্দের মতো অতট সংহত হতে পারেনি। তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল যে রীতিতে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন, বিজয়চন্দ্র সে রীতি অবলম্বন করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো, ছড়ার ছন্দকেই যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন;— তার ফলে পদযতি প্রাধান্য পেলেও পর্বযতির স্পন্দন সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ আলোচনার পূর্বে এ-যুগের আর একজন কবির হরগোবিন্দ লস্কর নামোল্লেখ করতে হয়,— তিনি হলেন হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী।

চৌধুরী ১৯০৩-এ সংস্কৃত ছন্দে তিনি ‘দশানন বধ কাব্য’ রচনা করে প্রকৃত পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দ রচনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কবি নিজে সংস্কৃত ছন্দের কাব্যগ্রন্থের ‘বিজ্ঞাপনে’ তাঁর নবপ্রবর্তিত ছন্দ সম্পর্কে যা লিখেছেন প্রয়োগ কৃত্রিম তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে,—

“বঙ্গ ভাষায় এ পর্যন্ত যে প্রণালীতে কবিতা রচিত হইতেছে আমি সে প্রণালী অবলম্বন না করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ চলাইতে অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই প্রকৃতরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই; আমিও যে কৃতকার্য হইয়াছি এরূপ কথা বলি না; তবে ছন্দগুলি আমি এরূপভাবে গ্রথিত করিয়াছি যে বালক বৃদ্ধ যুবা যে কেহই হউন পাঠ করিতে পারিলেই ছন্দঃ সমূহ অনায়াসে অনর্গল নির্গত হইবে, হ্রস্ব দীর্ঘাদি উচ্চারণ করিবার জন্য কোনও ক্লেশই করিতে হইবে না। বঙ্গভাষায় দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যবহার না থাকায় দীর্ঘস্বরগুলি টানিয়া পাঠ করিতে হয় যথা “দ্বিজ ভারত তোটক কবির মন্তব্য ছন্দ ভণে” “রে সতি রে সতি কাঁদিল পশুপতি” ইত্যাদিতে ‘ভা’ ‘তো’ ‘রে’ ‘কাঁ’ ইত্যাদি শব্দ টানিয়া পাঠ করিতে হয় নচেৎ ছন্দ রক্ষা হয় না; এবং এই জন্যই বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত সংস্কৃত ছন্দ লিখিয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি দীর্ঘ উচ্চারণ স্থানে কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষর গুরু হয় এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষা করিয়াছি।... এইরূপ নিয়মে আমি সমস্ত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি, তবে কচিৎ কোন স্থানে ব্যক্তিগণের নাম ব্যবহার অন্য উপায় না পাইয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইয়াছে যথা ‘ভরদ্বাজ’ ‘কৈকেয়ী’ এসবস্থলে ছন্দের গতি অনুসারে পাঠকগণ পাঠ করিবেন।”

(দশাননবধ কাব্যের ভূমিকা পৃ. ১)

কলাবৃত্ত রীতিতে মুক্তদলের লঘু এককলা এবং রুদ্ধ দলের গুরু দুইকলা উচ্চারণকে রক্ষা করে হরগোবিন্দ ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকেই সংস্কৃত ছন্দের সুনির্দিষ্ট গণবিন্যাসে বাংলা পদ্য রচনার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক। দশাননবধ কাব্যে কবি স্বরচিত এবং মূল সংস্কৃত ৫৭টি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত ‘উপেন্দ্রবজ্রা’ ছন্দের একটি উদাহরণ তুলছি।—

উপেন্দ্রবজ্রা : — — — — — (জ ত জ গ গ)

— — — — —
তৃ ষা র্ত স ম্পা গু সু গ দ্বি য ত্তে
সমীক্ষি সম্পূজ্য পদাজ রত্নে।

প্রশান্ত মৎ-চিত্ত সহর্ষ অদ্য,

সুধন্য সম্যক চতুরাস্য সদাঃ ॥

কিন্তু এ ছন্দেও কবি উচ্চারণের কৃত্রিমতা সর্বাংশে পরিহার করতে পারেননি। বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন,—

অকারান্ত শব্দগুলি স্পষ্টরূপে অকারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যথা ‘ভবন’, ‘গিরিশ’, ‘বিষয়’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ‘ভবন’, ‘গিরিশ’, ‘বিষয়’ — এইরূপ উচ্চারিত হয়। বাস্তবিক অকারান্ত শব্দগুলি অনর্থক ব্যঞ্জনান্ত করিয়া উচ্চারণ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

(দশাননবধ কাব্য ভূমিকা পৃ. ১০)

হরগোবিন্দ প্রবর্তিত ছন্দ উচ্চারণের দিক থেকে সফল না হবার প্রধান কয়েকটি কারণ হল : (১) রুদ্রদল ব্যবহারে লেখক কেবলমাত্র যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে চেয়েছেন তার ফলে, অপ্রচলিত দুরূহ তৎসম শব্দ অত্যধিক সংখ্যায় (মধুসূদনের তুলনায় বহুগুণে বেশী) ব্যবহৃত হয়েছে। (২) সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের সুনির্দিষ্ট লঘুগুরু দলবিন্যাস করতে গিয়ে ভাবযতি*ও ছন্দযতির সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি। (৩) বহু শব্দকে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী অ-কারান্ত রূপে উচ্চারণ করেছেন; স্বাভাবিক উচ্চারণের রুদ্র-মুদ্র দলে লঘু-গুরু উচ্চারণ-বিন্যাসে তাঁর এত যত্ন সত্ত্বেও এই তিনটি প্রধান ত্রুটির জন্য ছন্দ কৃত্রিম রয়ে গেছে। তবে এ কথা স্বীকার করতে হয়, বাংলা ছন্দে সংস্কৃত গুরু-লঘু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ যে রুদ্র-মুদ্র দলের সাহায্যে আনা সম্ভবপর, কৃত্রিম গুরুস্বর উচ্চারণের যে প্রয়োজন থাকে না, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি পরবর্তীদের বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দে বাংলা পদ্য রচনার পথ সুগম করে দিয়েছেন। বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ-পরীক্ষায় তাঁর এই মূল্যবান সংযোজনটুকুর মূল্য অনস্বীকার্য।

॥ ঘ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

এই যুগের ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আসনটি অধিকার করে আছেন। মাত্র চল্লিশ বৎসরের স্বল্পায়ু জীবনে

সত্যেন্দ্রনাথ ষোলখানি কাব্যগ্রন্থের (চারখানি মৃত্যুর পর প্রকাশিত) মাধ্যমে তিনি বাংলা ছন্দে অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যের বিপুল পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার কাব্যারসিক-সমাজ তাঁকে ‘ছন্দ যাদুকর’ আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

তাঁর সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হল, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষা-ছন্দের আভাষ, বাংলা উচ্চারণরীতি অবিকৃত রেখেও, আংশিকভাবে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশ কাল নিম্নরূপ সবিভা ১৯০০,

সন্ধিক্ষণ : ১৯০৫, বেণু ও বীণা : ১৯০৬, হোমশিখা : ১৯০৭, তীর্থসলিল : ১৯০৮,
 রচিত কাব্যগ্রন্থ তীর্থরেণু ১৯১০, ফুলের ফসল ১৯১১, কুহ ও কেকা
 ১৯১২, তুলির লিখন ১৯১৪, মণি মঞ্জুষা ১৯১৫, অত্র-
 আবীর ১৯১৬, হসস্তিকা ১৯১৭, বেলাশেষের গান ১৯২৩, বিদায় আরতি
 ১৯২৪, কাব্যসঞ্চয়ন ১৯৩০, সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা ১৯৪৫।

ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্র সংস্কৃতের আদর্শে কৃত্রিম হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণরীতি বাংলায়
 চালাবার যে চেষ্টা করেছিলেন, সর্বপ্রথম হরগোবিন্দ সেই রীতির দুর্বলতা উপলব্ধি করে

সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত কেবলমাত্র রুদ্রদলকে দুই কলার এবং মুক্তদলকে এক কলার মর্যাদা
 সংস্কৃত ছন্দের দিয়ে, সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ দলবিন্যাসে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা
 বৈশিষ্ট্য করলেন। কিন্তু তিনি লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের উদ্দেশ্যে
 অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বেশী মাত্রায় ব্যবহার করেছেন; অনেক

সময়ই ছন্দযতি এবং ভাবযতির ন্যূনতম সামঞ্জস্যবোধ অঙ্গীকার করেছেন এবং বাংলা
 বহু শব্দের শেষে রুদ্রদলকে কৃত্রিম স্রান্ত উচ্চারণে মুক্তদ্বিদলরূপে ব্যবহার করেছেন।
 ছন্দের স্বাভাবিকতা তাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ হরগোবিন্দের ন্যায়,
 বাংলা শব্দে সংস্কৃত গুরু মুক্তদলের উচ্চারণ কৃত্রিম বিবেচনায় তুলে দিলেন এবং রুদ্র-
 মুক্ত দলের সাহায্যে সংস্কৃত ‘গুরু-লঘু’ সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের উচ্চারণ পরিস্ফুট
 করলেন। সেই সঙ্গে হরগোবিন্দের ছন্দের দুর্বলতাগুলিও যথাসম্ভব পরিহার করলেন।
 তিনি (১) রুদ্রদল ব্যবহারে সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দের সাহায্য তেমন না নিয়ে, প্রয়োজন
 মতো রুদ্রদলবহুল দেশজ এবং বিদেশী শব্দ এনে ভাষা ও ছন্দে সজীবতা দান করলেন;
 সাধু ভাষার পরিবর্তে রুদ্রদলবহুল চলিত ভাষাও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন।
 (২) ছন্দের এবং ভাবের যতিবিন্যাসে যথাসম্ভব বিরোধ ঘটতে দিলেন না, এবং (৩)
 বাংলা রুদ্রদল-প্রান্তিক শব্দকে সংস্কৃত উচ্চারণে কৃত্রিম স্রান্ত রূপে ব্যবহারের চেষ্টা
 করলেন না। এই কারণেই তাঁর ছন্দ অনেকাংশে স্বাভাবিক এবং যথাযোগ্য ভাবানুগ ও
 গতিসম্পন্ন হতে পেরেছে। কৃত্রিম উচ্চারণ যথাসম্ভব পরিহার করলেও সত্যেন্দ্রনাথ
 বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের পূর্ণ আমেজ আনতে পারেন নি। তার প্রধানতম কারণ হল,
 প্রথমত বাংলায় মুক্তদলের গুরু উচ্চারণ নেই;— গুরু স্বরধ্বনির সেই বিস্ত্রিষ্ট সুরধর্মী
 উচ্চারণভঙ্গি বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত তিনি বাংলায় কলাবৃত্তে
 বা প্রসারিত উচ্চারণের দলবৃত্তে সংস্কৃত ছন্দের রূপাদর্শ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।
 বাংলার এই দুই ছন্দরীতিতে দীর্ঘ পদযতি উচ্চারণের সময় স্বভাবতই পর্বের লঘু
 যতিভাগে ভেঙে যায়। সংস্কৃতের তরঙ্গায়িত দীর্ঘ যতিভাগের উচ্চারণভঙ্গি তাতে পরিস্ফুট
 হতে পারে না। প্রধানতম এই দৃষ্টি অসুবিধার জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা
 উচ্চারণের স্বাভাবিকতা অনেকাংশে আনলেও সংস্কৃত ছন্দের ‘কল্লোলিত’ উচ্চারণভঙ্গি
 ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সম্ভবত এই বাধা কোনও কবির পক্ষেই সর্বাংশে
 অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। এই একই কারণে ইংরেজি, চীনা, জাপানী বা পার্সী ছন্দ
 প্রয়োগেও কবি সেই ছন্দগুলির বিশিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় ঠিক মতো পরিস্ফুট করতে
 পারেননি। অংশত কৃতকার্য হয়েছেন মাত্র। তবে অন্যান্য কবির তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের

উদাহরণ এবারে কবি রচিত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত
উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

www.amarboi.com

(১) পঞ্চচম্বর ছন্দ

মহৎ ভয়ের মূরং সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল,
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমায়, শোনাও কেবল।
(অব্র আবীর সিন্ধু তাণ্ডব)

(২) মন্দাক্রান্ত

পিঙ্গল বিহবল। ব্যথিত নভতল। কই গো কই মেঘ উদয় হও, I
সন্ধ্যার তন্দ্রার। মূরতি ধরি আজ। মন্দ্র মন্ত্র বচন কও; I
(কুহ ও কেকা যক্ষের নিবেদন)

(৩) মালিনী

উড়ে চলে গেছে বুলবুল।
শূন্য ময় সর্গ পিঞ্জর; I
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর। I (কুহ ও কেকা রিজা)

(৫) মর্যাস্বৈর্মসজন্ততাঃ সগুরবঃ শাদূলবিক্রীড়িতম্। (ছন্দোমঞ্জরী সূত্র ১৮৬)

যাহার প্রতিপাদে ক্রমে ম (— — —), স (— — —), জ (— — —), স (— — —),
ত (— — —), ত (— — —), গ (—) গণ থাকে এবং যথাক্রমে দ্বাদশ ও সপ্তমাক্ষরে যতি
পড়ে তাকে ‘শাদূল-বিক্রীড়িত’ ছন্দ বলে। যেমন —

গোবিন্দং প্রণমোত্তমাস্তরসনে। তং যোষয়াহর্নিশং I
পাণী পূজয়তঃ মনঃ স্মর পদে। তস্যালয়ং গচ্ছতম। I (ছন্দোমঞ্জরী পৃ. ১৩০)

(৬) বদ ‘তোটক’ মঙ্গিসকারযুতম্।

যে ছন্দে ক্রমশঃ চারটি স (— — —) গণ থাকে, তাকে ‘তোটক’ বলে। যেমন
প্রণামি শিবং শিবকল্পতরুং (শঙ্করাচার্যের শিবস্তোত্র)।

(৭) মোমোগোগো ‘বিদ্যাম্বালা’।

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে দুটি ম (— — —) গণ ও দুটি গ (—) গণ থাকে তাকে বিদ্যাম্বালা বলে।

যেমন — “বাসোবল্লীবিদ্যাম্বালাবর্হশ্রেণীশাক্রশাপঃ। (ছন্দোমঞ্জরী: পৃ. ২৮)

(৮) ‘গায়ত্রী’ প্রাচীনতম বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছন্দ। প্রতিপংক্তিতে আটটি দল (রুদ্র-মুক্তের
সুনির্দিষ্টতা নেই), —একপত্রিপংক্তিতে এক এক শ্লোক। সত্যেন্দ্রনাথ ‘গৌড়ী’ রীতি উদ্ভাবনে তৃতীয়
পংক্তিতে নয় দল, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে আট দল রেখেছেন।

(৪) রুচিরা

তখন কেবল । ভ রি ছে গগন । নূতন মে ঘে, I

কদম কোরক । দুলিছে বাদল । বাতাস লেগে; I

(কুহ ও কেকা তখন ও এখন)

(৫) শার্দূল বিক্রীড়িত

সিন্ধুর রোল

মে ঘে ভিড়ল আজ,

গ র জে বাজ ।

বিদ্যুৎ বিলোল —

র ভ্র চোখ ! I

ঝঞ্ঝার দোল

সা রা সৃষ্টি ময়,—

জা গে প্রলয়; ।

তাণ্ডব বিভোল—

ছায় দুলোক । I

(কাব্যসঞ্চয়ন বিদ্যুৎবিলাস)

(৬) তেটকু

আ মি চলব কি, চললে যে ফুল মা ডা ব;

শেষে সাধ করে ভুল করে দিক হারাব ;

(অভ্র আবীর জাফরানের ফুল)

(৭) বিদ্যাম্বালা

ছিপখান তিন দাড়

তিন জন মা ল্লা

চৌপার দিন ভোর

দেয় দূর পাল্লা ।

(কাব্যসঞ্চয়ন দূরের পাল্লা)

(‘চরকার গান’ কবিতাটিও ‘বিদ্যাম্বালা’ ছন্দে লিখিত বলা যেতে পারে)

(৮) গৌড়ী (?) - গায়ত্রী

জয় ক রি ! জয় জগৎ প্রি য়
 ব রে ণা হে ব ন্দ নী য়!
 অগম শ্রুতির শ্রো ত্রি য়! জয়! জয়!
 প্রাণ-প্রণবের দ্রষ্টা ন ব!
 গান সে অ স প ত্ত ত ব
 অ মৃ ত স মু দ্র ব ! জয়! জয়!

(কাব্যসঞ্চয়ন শ্রদ্ধা হোম)

উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে কবি সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু দলবিন্যাস-রীতি রক্ষা করেছেন,— তবে এই লঘু-গুরু বা এক কলা ও দুই কলা উচ্চারণে কলাবৃত্ত রীতির মূর্ত্ত ও রুদ্ধ দল প্রয়োগ করে আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণ-
 দিলীপকুমার স্বাভাবিকতাও পাশাপাশি রক্ষা করেছেন।^{২১} এ প্রসঙ্গে ‘ছান্দসিকী’
 রায়ের লেখক দিলীপকুমার রায়ের একটি মন্তব্য বিচার্য। দিলীপকুমার তাঁর
 মন্তব্য ‘অনামী’ কাব্যগ্রন্থের একটি পত্রে লিখেছেন,—

সংস্কৃত গুরুস্বর অতি অপূর্ব কল্লোল আনে। কিন্তু কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না। তাই তিনি স্বরমাত্রিকের (কলাবৃত্ত) যুগ্মধ্বনিকে (রুদ্ধদল) সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরবর্ণের বদলী হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলুন তো তাতে কি সংস্কৃত ছন্দের প্রতিকৃতি এসেছে? ঠাট এসেছে মানি, কিন্তু উদাত্তধ্বনি — ডমরু রোল — গাভীর্য়?— আসতেই পারে না। কেন পারে না? কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজের পরে ওর অনেকখানি সৌন্দর্য নির্ভর করে।... আমার কেবল দুঃখ বৈষ্ণব কবিদের তথা ভারতচন্দ্রের দীর্ঘস্বরপ্রীতি আমাদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হতে বসেছে বাংলা যুগ্মধ্বনিগুলির নানারকম ফুলঝুরির চটকে।... আমি একথা বলছি শুধু এই জন্যে যে সত্যেন্দ্রনাথের যুগ্মধ্বনি দিয়ে সংস্কৃত গুরুস্বরের ওজন রাখার চেষ্টাকে আমি বন্ধ্যাম মনে করি। ওতে সংস্কৃত ছন্দের “সিংহের” সেই শরীর লাভ হবে যাকে খানিকটা সিংহের মতো দেখালেও সংস্কৃত সিংহবীর্যসমম্প্রিত হবে না— সহজেই তাকে গাভীতে ভক্ষণ করতে পারবে।”

(কল্পনাকুমারকে লেখা পত্রগুচ্ছ অনামী ১ম সং, পৃ. ৪০২-২৪)

২১। এ-ছাড়াও কবির ‘চণ্ডবৃষ্টি’ (গগনে গগনে নীল নিবিড়), ‘অনুদ্রুত’ (আর্ত সংসার ব্যথায় কাঁদছে) ও ‘ছালিকা’ (আদ্যের গুরু অর্ধেক ধরার) ছন্দে রচিত কবিতার নিদর্শন মিলছে।— এসব কবিতাতেও তিনি রুদ্ধ-মূর্ত্ত দলের সাহায্যে লঘু-গুরু গণ-বিন্যাসক্রম রক্ষা করেছেন।

এখানে দিলীপকুমার রায়ের প্রধানতম বক্তব্য হল, সত্যেন্দ্রনাথ রুদ্র-মুক্ত দল ব্যবহারে যেভাবে বাংলাছন্দে সংস্কৃতের লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ আনতে চেয়েছেন তাতে আকৃতিগত বা বহিরঙ্গ রূপ ফুটলেও, সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বর উচ্চারণের প্রকৃতিগত চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাবে না। ফলে তার এ-ছন্দ একান্তই নিষ্প্রাণ হয়ে থাকবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য, রুদ্রদলের গুরুধ্বনি আর দীর্ঘস্বর-মুক্তদলের গুরুধ্বনিতে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উচ্চারণ অনেক বেশী সুশ্রাব্য। যেদিন থেকে বাংলা ছন্দ ‘আধুনিকতা’র মর্যাদা পেয়েছে,— সেদিন থেকে ক্রমান্বয়ে তার ধ্বনিগত সুর-প্রাধান্য কমে এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে লঘু-গুরু উচ্চারণ ছিল, কিন্তু সেগুলি

মস্তবোর সত্যতা
বিচার

মূলত কীর্তনগীতি হিসাবে গীত হত। ভারতচন্দ্রের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের বাংলা ছন্দ আধুনিক বাংলা পঠনরীতিতে নিতান্তই কৃত্রিম মনে হবে। এই কারণেই বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কোন

কবিই ঠিক সফল হতে পারেননি। দিলীপকুমার যে অভিযোগ এনেছেন, ‘কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না’ সেকথা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সংগীতে মুক্তদল-স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ তিনিও এনেছেন। যেমন,—

চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে!

অনিবার মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে!

ধীরে! ধীরে! ধীরে!

খর রৌদ্রে বায়ু মুছে, জ্বলে জ্বালা,

চির স্বপ্নে, রহে চম্পা চির বালা;

তনু আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি, ঘুরে ফিরে।

ধীরে! ধীরে! ধীরে!

(বিদায় আরতি বৈশাখের গান)

এমনকি প্রয়োজন মতো কোনো কোনো কবিতায় দীর্ঘযতি স্থানে (পংক্তি শেষে) দ্বিমাত্রক উচ্চারণে মুক্তদল ব্যবহার করেছেন। আধুনিক উচ্চারণের স্বাভাবিকতা (আবৃত্তির স্বাভাবিক পঠনভঙ্গি) রাখতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে সুশ্রাব্যী করা সঙ্গত মনে করেননি। তিনি বুঝেছিলেন অন্য ভাষার ছন্দ স্বীয় মাতৃভাষায় আনতে হলে, নিজস্ব ভাষাছন্দের মূল উচ্চারণ-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ না করেই আনতে হবে। নাহলে পাঠকের অভ্যস্ত ধ্বনিগত প্রত্যাশাবোধ ক্ষুণ্ণ হবে, এবং তার ফলে এই বিভাষার ছন্দ বাংলায় আমদানির আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সর্বাংশে বাংলায় তিনি আনতে পারেননি; — কিন্তু জোর করে তেমনটি আনতে গিয়ে যে আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা, সজীব প্রাণধর্ম নষ্ট করেননি, বাংলাছন্দকে ‘প্রভু’ উচ্চারণের কৃত্রিমতায় রূপান্তরিত করেননি সেটিই তাঁর প্রধানতম কৃতিত্বের পরিচায়ক বলতে হয়।

অন্যান্য বিদেশী

ছন্দ ব্যবহার

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যতীত ইংরেজি, ফরাসী, জাপানী
প্রভৃতি ছন্দও বাংলায় আমদানি করতে গিয়ে এই একই গৃহণ

করেছেন। তার ‘পিয়ানোর গান’ কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।—

তুল তুল । টুক টুক ।

ট্রোকে পর্বভাগ টুক টুক । তুল তুল I

কোন ফুল । তার তুল ।

তার তুল । কোন ফুল? I

(কাব্যসঞ্চয়ন পিয়ানোর গান)

ইংরেজী ট্রোকে পর্বভাগে (দ্বিদল পর্ব প্রথম দলে প্রসঙ্গ) কবিতাটি পাঠ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে কবি চতুর্মাত্রা কলাবৃত্তের পর্বভাগও রক্ষা করেছেন।

‘সিংহল’ কবিতাটি স্কটের ‘Young Lochinvar’-এর ছন্দে লিখিত বলে কবি জানিয়েছেন। উভয় কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

স্কটের Young Lochinvar থেকে,—

O young | Lochinvar | is come out | of the west.

Through all | the Bor | der his steed | was the best
And save | his good broad | sword he wea |

Young
Lochinvar

ও

সিংহল
কবিতা

He rode | all unarm'd, | and he rode | all alone,
So faith | ful in love, | and so daunt | less in war,
There ne | ver was knight | like the young | Lochinvar.

[Lochinvar Lady Heron's song : 1st Stanza :
From Scott's Poetical Works : by J. G. Lockhart]

সত্যেন্দ্রনাথের সিংহল কবিতা থেকে,—

ওই । সিংহল দ্বীপ । সুন্দর শ্যাম, । নির্মল তার । রূপ, I

তার কণ্ঠের হার লঙ্ঘন ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ;

আর কাঞ্চন তার গৌরব আর মোক্তিক তার প্রাণ,

আর সম্মল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নিব্বাণ।

(কাব্যসঞ্চয়ন সিংহল)

সত্যেন্দ্রনাথ স্কটের কবিতাটি থেকে দলসংখ্যার হিসাবটি নিয়েছেন।^{২২} অতিপর্ব ইংরেজি

২২। Young Lochinvar কবিতাংশের প্রথম ও ষষ্ঠ পংক্তির বিকল্প ছন্দ-বিশ্লেষণ :

১ম O young Lo | chinvar | is come out | of the west,

৬ষ্ঠ There never | was knight | like the young | Lochinvar

কবিতাটিতে নেই, শুধু চারটি পর্ব আছে। সত্যেন্দ্রনাথ চারটি পর্বের অতিরিক্ত প্রথমে একটি অতিপর্বের প্রসঙ্গ-স্পন্দন রেখেছেন। Lochinvar কবিতাটিতে Iambic (—) -মিশ্রিত Anapaest (—) পর্বভাগ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাটিতে অতিপর্ব সহ ২।৬।৬।২ মাত্রার পর্বভাগে কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। সমগ্র কবিতায় মাত্র দুটি অতিপর্বে মুক্তদল ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রেই রুদ্ধদল দিয়েছেন। অতিপর্বে এবং পর্ব-সূচনায় রুদ্ধদলের স্পন্দনে আংশিকভাবে ইংরেজি প্রাসঙ্গিক উচ্চারণের অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন অনুমিত হয়।

এই প্রসঙ্গে ‘তাজের প্রথম প্রশস্তি’ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মূল ফার্সী ছন্দের অনুকরণে রচিত বলে কবি জানিয়েছেন। সম্ভবত ফার্সী ‘মোতাকারিব’ ছন্দের একটি ধারায় (ফউলুন। ফউলুন। ফউলুন। ফোল) কবিতাটি রচিত হয়েছে। এখানে প্রথম চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।—

ফার্সী
মোতাকারিব
ছন্দ প্রয়োগ

জগৎ সার! | চমৎকার! | প্রিয়ার শেষ | শেষ |
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!
উজল দিক! শোভায় ঠিক স্রগ-উদ্যান,
সদাই তর সুবাস-ঘর — যেমন প্রেম-ধ্যান!

(কাব্যসঞ্চয়ন তাজের প্রথম প্রশস্তি)

কবি গোলাম মোস্তাফা এই রীতির মোতাকারিব ছন্দের বাংলা উদাহরণ দিয়েছেন,—
সরাব নাও, | গজল গাও | মাতাও মন | দিল, |
নুপূর ঘায় | মুখর হোক | হৃদয় মন | জিল। |

(প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ পৃ. ৪৬-৫৭)

কবিতাটি পঞ্চমাত্রাপর্বিক কলাবৃত্ত (৫।৫।৫।২) অথবা ত্রিদল সমন্বিত দলবৃত্ত পর্বে স্ফুটপদ পাঠ করা যায়। তাছাড়া, কবি প্রতি পর্বের রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসেও সুনির্দিষ্টতা রেখেছেন দেখা যাচ্ছে।

জাপানী
তানকাসপ্তক

‘তীর্থরেণু’ এবং ‘অন্ন আবীর’ কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে ‘তানকা’ এবং ‘তানকাসপ্তক’ ও ‘বৈকালী’ নামে একই স্তবকবন্ধের তিনটি কবিতা লিখেছেন। তানকাসপ্তকের একটি স্তবক এখানে তুলছি,—

অশ্রু দে শৈ |

হা সি এ সে ছি ল | ভূ লে ; I

অনুমিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রথম ছন্দ-বিশ্লেষণরীতিই বথাসম্ভব অনুসরণ করেছিলেন। এমন রুদ্ধদল-সর্বস্ব ছন্দে নতনত্ব থাকলেও অত্যন্ত কৃত্রিম ও আয়াসসাধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে হা সিও শে যে
 ম র গে প ড়ি ল ঢু লে ।
 অ ঞ্চ সা য র-ক্ লে ।

(অত্র আবীর তানকাসপ্তক)

কবি নিজে জাপানী তানকা ছন্দাবদ্ধ সম্পর্কে লিখেছেন—

“এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম নাই; যুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, জাপানী ভাষায় এইগুলিকে ‘তানকা’ বলে। তানকার পাঁচপংক্তিতে সাধারণত একত্রিশটি মাত্রা থাকে।

(১৯১৮, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে ‘তানকা’ প্রবন্ধ দ্র.)

কবি আলোচ্য কবিতা দুটিতে যে কলাবৃত্ত রীতির ৬া৬া২ I ৬া৬া২ I ৬া২ I পর্ব-পংক্তি বিভাগ করেছেন এবং তিনটি পংক্তি শেষে (এবং প্রথম দুই পংক্তির পর্বশেষে) মিল দিয়েছেন তার ফলেই কবিতাটি বাঙালী পাঠকের শ্রুতিবোধকে তৃপ্ত করেছে।

চীনা ভাষায় একদল শব্দে (mono-syllabic word) ছন্দ রচিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তার অণুকরণে ‘আলগ পাপড়ি’ ছন্দ রচনা করেছেন। যেমন—

শিষ কে দ্যায় গো । আজ I
 তার কি ভিন্ গাঁ ঘর?
 দুখ্ সে তার কি পর?
 চাঁদ সে তার কি তাজ?

(ছন্দ সরস্বতী ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)

এখানে রুদ্ধ এবং মুক্ত দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্টতা এসেছে এবং প্রতি তিনমাত্রায় (উপপর্ব বিভাগে) যতি স্পষ্ট হয়েছে; উপপর্বিক দ্বিদলযতি-ভাগে প্রথম রুদ্ধদলটিতে প্রাসরিক উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। সমস্ত পংক্তিটি ৩ ৩া২ I যতিবিভাগে আট মাত্রার কলাবৃত্ত রীতির (অথবা, ২:২।১ I দলবৃত্ত রীতির) ছন্দে রচিত হয়েছে।

গুজরাটি অঁজনী ছন্দের^{২৩} একটি নিদর্শন দিয়েছেন কবি

২৩। গুজরাটি অঁজনী হল, চা||চ I চা||চ I চা||চ I ১০ I মাত্রক চতুষ্পংক্তিক স্তবকবদ্ধ।
 যেমন,—

আ থো মা লা ॥ আঁ সূ খু ত্যা I
 হ ই আ লা দোদীআ তুত্যা I

গুজরাটী স্বরগের সন্দেশ ॥ তুই যে শোনাস্ রে, I
অঁজনী দেবতার গান মোর আঙিনায় গাস্ রে;
ছন্দ ভাবরস চন্দনে মন যে ভিজাস্ রে

তুই সুখা মৌচাক রে।

(মণিমঞ্জুসা খোকা)

এটি বিশুদ্ধ কলাবৃত্তে, ৪।৪।৪।৪।৪ I মাত্রাভাগে রচিত। তিনটি অনুরূপ ষোড়শ মাত্রক পংক্তির পর দশ মাত্রার একটি ছোট পংক্তি এনে চতুষ্পংক্তিক স্তবক রচিত হয়েছে। পংক্তিশেষে ‘রে’ একমুক্তদল শব্দটিকে দীর্ঘ (দ্বিকলারূপে) উচ্চারণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতীয় সংস্কৃত এবং দেশী ও বিদেশী লঘু-গুরু বা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক ছন্দকে মোহিতলাল ‘হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত’ নাম দিয়েছেন। আলোচ্য ছন্দ সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।—

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ‘হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত’ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা — তুম, দেব, সর, নার) গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা — তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায় মোহিতলালের সংস্কৃতির অনুকরণে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।
মন্তব্য উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে, তথাপি কথ্য বাংলা ভাষায় উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেই কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্প হিসাবে উপভোগ্যও বটে; কিন্তু সে ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা ‘চিত্রকাব্য’ রচনাই সম্ভব। কারণ, বাংলা কাব্যের উচ্চারণে আদ্য ঝাঁককে কোনক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না; এজন্য গুরু-লঘু স্বর সন্নিবেশকালে, সেই ঝাঁককে লঙ্ঘন করিয়া— ছন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনি চাতুর্ঘ্যই প্রধান হইয়া উঠে,— কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

[বাংলা কবিতার ছন্দ (২য় সং) পৃ. ৬৮]

এককালে গ্রীকে এবং পরে ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে প্যাটার্ণ কবিতা (pattern poetry) রচনার রেওয়াজ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথও নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু প্যাটার্ণ কবিতা লিখেছেন। তাঁর ‘রাজর্ষি’ রামমোহন’ এবং ‘দিশ্বিজয়ী’ কবিতাদুটি গ্রীক

রণবন্দে লুতারে লুতা ॥

জাবুকা হাবা I

এটি লঘু গুরু উচ্চারণের কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ আধুনিক কলাবৃত্তের উচ্চারণে এ-ছন্দোবন্ধকে এনেছেন। অঁজনী হিন্দী ও মারাঠীতেও প্রচলিত আছে।

গ্রীক
Bumos বা
বেদীভূমক ছন্দ

Bumos বা বেদীভূমক ছন্দে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক কাব্যের উচ্চারণ রীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র বহিরঙ্গ পংক্তিসম্ভ্রায় এ কবিতাদ্বয় যজ্ঞবেদীর আকার লাভ করেছে। মূলত এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির অসমান পংক্তিবন্ধের প্রবহমান ছন্দে

রচিত। যেমন,—

তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়
তব শ্রদ্ধা দিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায়
তোমার সমাধিতীর্থে, হে মনস্বী! নিত্য স্মরণীয়!
নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ! ওহে সত্যপ্রিয়!
আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা পাতকের শেষ
করিলে, বাঁচাতে বহু প্রাণী
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি
বেদান্ত, কোরান, বাইবেল
মিলালে তুমি হে অবহেলে
নবযুগ প্রবর্তিলে তুমি—
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি;
উচ্ছে ধরি তর্ক তরবার
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার!
কীর্তি তব কীর্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত!
বিশ্বে মহামিলনের তুমি অগ্রদূত,
যুগ যুগন্ধর রাজা! রাজপূজা প্রাপ্য সে তোমার
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত আপনার।^{২৪}

(অব্র আবীর রামমোহন স্মরণে)

পরবর্তী ‘দিগ্বিজয়ী’ (অব্র আবীর) কবিতাটিও অনুরূপ পংক্তিবন্ধে লিখিত,— সেখানে শেষের দিকে আঠারো মাত্রার পংক্তি চারটি আছে।— অর্থাৎ বেদীভূমিকে আরও দৃঢ় করেছেন কবি। এই পর্যায়ে ‘কুহ ও কেকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘গ্রীষ্মের সুর’ কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। চতুষ্কোণাকৃতি পংক্তিবিন্যাসে দুইমাত্রা থেকে চব্বিশমাত্রা পর্যন্ত পংক্তি-পরিসরে বারো পংক্তিতে স্তবক সাজিয়েছেন।^{২৫} সে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কবিতার ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে, ছন্দ দুর্বল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছন্দমিলের

২৪। কবিতাটির ‘বেদীভূমি’র আকৃতি চারপাশে রেখা টানলেই ধরা পড়ে।

২৫। ‘গ্রীষ্মের সুর’ কবিতার চতুষ্কোণ আকৃতি ইংরেজ কবি ভিক্টোর হগোর কবিতাকৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে রেখাচিত্র আঁকতেন।— সত্যেন্দ্রনাথের এ কবিতাগুলিকে সেই পর্যায়ভুক্ত করে দেখা যেতে পারে।— মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লিখিত কবিতায় ‘চিত্র ছাঁদ’ কিছু হয়তো আছে, তবে সেটি চিত্র সৌন্দর্যের আলোচনার বিষয়। ‘হুন্দ যাদুকর’ কবি এখানে কিছুটা স্বকীয় ছন্দোধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সে কারণে ধ্বনিসৌষম্য বিচারে কবিতাগুলি সর্বাংশে সফল হতে পারেনি।—

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দ প্রয়োগ করেই সন্তুষ্ট রুদ্রদল বিন্যাসের থাকেননি, তিনি রুদ্রদল বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ছন্দের নতুনতর ধ্বনিসৌন্দর্য ধ্বনি-তরঙ্গ ও সৃষ্টি করেছেন;— বিভিন্ন যতিবিভাগের এবং প্রাসঙ্গিক উচ্চারণের দ্বারা, রুদ্র ও মৃত্তদলের সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের দ্বারা বাংলা কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিস্পন্দনগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করেছেন। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথও যে অনুরূপ পরীক্ষা করেছেন পূর্বেই আমরা দেখেছি। এখানে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কলাবৃত্ত রীতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,—

(১) ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 ঝ ণা! | ঝ ণা! | সু ন্দ রা | ঝ ণা!
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 ত র লি ত | চ দ্রি কা! | চ ন্দ ন- | ব ণা! I
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 অ ঞ্জ ল সি ঞ্জি ত গৈ রি ক স্ব ণে,
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 গি রি ম ল্লি কা দো লে কু ত্ত লে ক ণে,
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 ত নু ভ রি যৌ ব ন তা প সাঁ অ প ণা!
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 ঝ ণা !

(কাব্যসঞ্চয়ন ঝর্ণা)

চতুঙ্গল পর্বভাগের এ-ছন্দে প্রয়োজনে কবি মৃত্তদলের গুরু দ্বিকলা (১ ১) উচ্চারণ এনেছেন। রুদ্রদলের বহুল ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। চতুঙ্গল পর্বভাগের আরও বৈচিত্র্য কবি দেখিয়েছেন—

(২) ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 চূপ চূপ | ওই ডুব |
 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
 দেয় পান | কৌ টি, I

দেয় ডুব | চূপ চূপ |

ঘোমটার | বৌটি! I

(কাব্যসঞ্চয়ন দূরের পাল্লা)

এখানে কবি সবই রুদ্রদল ব্যবহার করেছেন। দুটি রুদ্রদলে চার কলামাত্রায় পর্ব

সাজিয়েছেন। এ ছন্দকে সরল কলারীতির ছন্দ না বলে দলবৃত্ত
 সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ-মুক্ত
 (সংস্কৃত ছন্দের ন্যায়) দলটিতে ছাড়া) ঘটেনি বলেই দলবৃত্ত প্রকৃতির উচ্চারণ প্রকাশ
 দলবিন্যাস-বৈচিত্র্য পায়নি।— সুতরাং এটি কলাবৃত্ত রূপেই গণ্য করতে হবে।^{২৬}

(৩)

ম নে প্রা নে হি ল্লো ল ॥

ব নে ব নে হি ন্দো ল ॥

মে ষে মৃ দ ঙের বো ল ॥ মৃ দৃ ম হ্রর । I

শ্রা ব ণে রি ছ ন্দে ॥

ক দ মে রি গ ঙ্গে ॥

আয় তুই চঞ্চল ॥ চি র সুন্দর । I

(বিদায় আরতি হিল্লোল বিলাস)

কবি এ কবিতার নাম দিয়েছেন হিল্লোল বিলাস। ৪।৪॥৪।৪॥৪।৪॥৪।২ I-মাত্রা ভাগের
 চৌপদীবন্ধে, রুদ্ধ ও মুক্ত দলের অনেকটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস-রীতিতে এ-ছন্দ রচনা
 করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসে ত্রিদল-পঞ্চকলা, এবং চতুর্দল-পঞ্চকলা
 ছন্দ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।—

(৪) ত্রিদল-পঞ্চকলা পর্ব

চ পল পায় । কে বল ধাই ॥

উ পল ঘায় । দিই ঝি লিক । I

দুল দো লাই । মন ভো লাই, ॥

ঝিল মিলাই । দি ঙ্গি দিক । I (বিদায় আরতি : ঝর্ণার গান)

(৫) চতুর্দল-পঞ্চকলা পর্ব

সি কু তু মি । বন্দ নী য়, ॥ বি স্ব তু মি । মা হে স্ব রী ; I

দী প্ত তু মি ; । মু ক্ত তু মি, ॥ তো মা য় মো রা । প্র ণা ম ক রি । I

২৬। 'বিদায় আরতি'র 'চরকার গান' কবিতাটিও এই একই ছন্দে রচিত।

অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাগপ্রিয়!

গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

(অব্র আবীর সমুদ্রাষ্টক)

ছন্দহিল্লোল

‘ছন্দোহিল্লোল’ কবিতায় চতুর্দল-সপ্তকলা পর্ববিন্যাসে একটি সার্থক ছন্দোবন্ধ রচনার নিদর্শন দেখা যায়।—

(৬) ঝর্ ছে ঝ ঝর্, | ঝর্ছে ঝম ঝম ॥

ব জ্র গর্জায়, | ঝ গ্গা গম গম I

লিখছে বিদ্যাৎ | ম দ্ব অদ্ভুত, ॥

বলছে তিনলোক | “বম ব বম বম!” I

(কাব্য সঞ্চয়ন ছন্দোহিল্লোল)

এখানে একদিকে কবি লঘু-গুরু শব্দবিন্যাসক্রম ঠিক রেখেছেন, সেই সঙ্গে সাতমাত্রা পর্বের শব্দবিন্যাসেও তিন ও চার মাত্রার ক্রম ঠিক রেখেছেন।

অতিপর্বিক দোলা,

(৭)

মিল-বৈচিত্র্য, অতিপর্বিক দোলা এবং বিচিত্র

মিল-বৈচিত্র্য, বিচিত্র মাপের পর্ব বিন্যাস-নিদর্শন হিসেবে একটি উদাহরণ মাত্রার পর্ববিন্যাস তুলছি।—

		পর্ব-পদভাগ	মিল
বয়েস	আড়াই কি দুই	(৩) ৬॥	ক
মনটি	নিরমল যুই	(৩) ৬॥	ক
হালকা	যেন হাওয়া	(৩) ৫॥	খ
মেয়ে	সে মুখ চাওয়া	(৩) ৫॥	খ
মাযের	কাছে কাছে	(৩) ৪॥	গ
ছায়ার	মত আছে	(৩) ৪॥	গ
জানেনা	মা বিনা কিছুই।	(৩) ৬ I	ক
একদা	হল দু’টি বোনে	(৩) ৬॥	ঘ
পুতুল	নিযে কি কারণে	(৩) ৬॥	ঘ
ঝগড়া	কাড়াকাড়ি	(৩) ৪।	ঙ
তখন	দিয়ে আড়ি	(৩) ৪॥	ঙ
হারিয়ে	কাঁদো কাঁদো	(৩) ৪॥	চ
হয়ে সে	আধো আধো	(৩) ৪॥	চ
কহিল	“ডিডি! টুমি টুই!”	(৩) ৬ I	ক

(অব্র আবীর প্রথম গলি)

অনুমিত হয়, কবি এখানে ৩।৬— মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দই রক্ষা করতে চেয়েছেন।
যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, চারদলে হয় কলার প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

দলবৃত্ত ছন্দের দলবৃত্ত ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র পর্ব ও পদের বিন্যাস
বিচিত্র প্রয়োগ করেছেন। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

পর্ব-পদভাগ

(১)	লাল প রী গো! লাল প রী!	৪।৩।।
	ই ন্দ্র পূ রী র সু ন্দ রী!	৪।৩
	কখন আসিস্ কখন যাস!	৪।৩।।
	কার গালে যে গাল বোলাস!	৪।৩ I
	কার হাতে পায় তুলতুলি—	৪।৩।।
	ফোটাস রান্ধা পদ্ম গো	৪।৩ I
	জানবে তা কোন মদ গো!	৪।৩ I
	তোর চুম্বাতে হয় যে লাল	৪।৩ I
	থোকা খুকুর হাত পা গাল।	৪।৩ I
	লালপরী গো! লালপরী।	৪।৩।।
	স্বপ্ন পুরীর অঙ্গরী!	৪।৩ I
	(অত্র আবীর লালপরী)	

(২) ঝড় ঝুঁষিয়ে

ধায় ঢুঁসিয়ে

ফোঁস ফুঁসিয়ে

খুব ইসিয়ার।

ডাল মট কায়

এক ঝড় কায়

ফুল চট কায়।

সব দুনিয়ার।

(শিশু কবিতা ঝড়ের ছড়া)

কবিতাটি দলবৃত্ত অথবা কলাবৃত্ত যে কোনও রীতিতে পড়তে বাধা নেই। তবু পর্বসূচনার প্রসঙ্গ এবং দ্বিদল পর্বের কলা (চার কলা?)—প্রসারণ এখানে দলবৃত্ত রীতির প্রকৃতিধর্মই এনে দিয়েছে। দলবিন্যাসে, যতি সংস্থাপনে কবি সুনির্দিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করার ফলে ছন্দের নতুন রূপাদর্শ (pattern) পরিস্ফুট হয়েছে।

(৩) খোকন ধন । ঘুম চায়-গো ।

ঘুম আয় গো ।

চোখ পিট পিট । মিট মিট মিট— ।

ঘুম পায় গো— । ঘুম আয় গো! ।

(মণিমঞ্জুষা ঘুমপাড়ানি গান)

দলবৃত্তে তিনদল-পর্ব
ব্যবহার
দলবৃত্ত রীতির ছন্দে চারটি দলে সাধারণত পর্ব গঠিত হয়।
— এখানে সত্যেন্দ্রনাথ তিনদলে পর্ব গঠন করেছেন,— তাতে ছন্দ
এতটুকু দুর্বল হয়নি সেটি লক্ষণীয়।

ছড়া জাতীয় কবিতায় এমন বহু বিচিত্র পর্ব-পদ-পংক্তিবন্ধে, রুদ্ধদলের উপলভ্যের তরঙ্গধ্বনি তুলে, পর্বের প্রথমে প্রসঙ্গ দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ঐশ্বর্য বুদ্ধি করেছেন। দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত ছন্দ তাঁর হাতে এসে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করেছে।

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দে
দীর্ঘ ত্রিপদী
সত্যেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন।
এখানে একটি দীর্ঘ ত্রিপদী-বন্ধের উদাহরণ দিচ্ছি।—

তো মার না মে নো যাই মা থা ॥ ও গো অনাম! অ নি বঁ চ নী য় ॥

প্রণাম করি হে পূর্ণ কল্যাণ ।

প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ ॥ সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়, ॥
আলোয় জাগো সকল আলোর ধ্যান।

(বিদায় আরতি বর্ষবোধন)

কবি এখানে ৮॥১০॥৯ I মাত্রার পদযতিতে পংক্তি সাজিয়েছেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির মতো এ ছন্দ অতটা সংবদ্ধ হতে পারেনি স্বীকার করতে হয়। এ ছন্দে লৌকিক ছন্দোদ্ভূত (রবীন্দ্র-প্রভাবিত) সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দের রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দও প্রচলিত প্রায় প্রত্যেকটি ছন্দোবন্ধের ব্যবহার করেছেন। কিছু সনেট কবিতাও লিখেছেন। প্রবহমান অমিল পয়ার-বন্ধে মধুসূদনের ছন্দের ‘প্যারডি’ (হসন্তিকা অঙ্গলসম্পরা কাব্য) রচনা করেছেন।

সমালোচক অজিত চক্রবর্তী সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য

করেছিলেন, “ফরাসী কবি পল্ ভারলেন সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে ‘he paints with sound’ তিনি ধ্বনির দ্বারা চিত্র আঁকেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অজিত চক্রবর্তীর এই কথা বলা যাইতে পারে।” (প্রবাসী কার্তিক ১৩২৫ দ্র) এই মন্তব্য মন্তব্যের আলোকে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের প্রকৃতি বহুলাংশে উপলব্ধি করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও ছন্দ বিষয়ক একটি আলোচনায়^{২৭} বলেছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে বললেন, “বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃত ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে।... তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না।... মন্দাক্রান্ত নিয়ে শুরু কর।” ওই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলেছেন, ছন্দেশ্বরী দেবী তাকে জানালেন, “বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই বা থাকল? যুক্তাক্ষর তো আছে। যুক্তাক্ষরের পর্য্যায় বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি বৈচিত্র্যের গতিক্রম প্রবর্তিত কর।”^{২৮} সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপায়নে মূলত এই নীতিই সম্যক পালন করেছেন। নতুন বাংলা ছন্দস্পন্দও এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ যুগে এত বেশী সচেতন ছন্দকুশলী কবি আর দেখা যায় না।— অবশ্য ছন্দ সম্পর্কে অতিরিক্ত রীতি-সচেতন হবার ফলে তার কিছুটা কুফলও তাঁর রচনায় মেলে। ধ্বনিস্পন্দন ও মিল সৃষ্টির জন্যে মাঝে মাঝে দুর্বল শব্দ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তেমন উদাহরণ তাঁর সমগ্র কবিতার ঐশ্বর্যের তুলনায় বেশী নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে একজন বিশিষ্ট ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা ছন্দচিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য ছান্দসিকের সম্মানও তাঁরই প্রাপ্য। সে বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনা গ্রন্থ-পরিশিষ্টে সংযোগ করা হল।

॥ ৬ ॥

আলোচ্য যুগের অপর শক্তিমান ছন্দকুশলী কবি হলেন সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রতিভার উন্মেষ-যুগেই এই শিশুপাঠ্য কবিভাষ্য তরুণ কবি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর ‘আবোল তাবোল’ নামক কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছড়াগ্রন্থটি (শিশু সাহিত্য) ছন্দবৈচিত্র্য এবং নির্মল হাস্যরসের ও ছন্দের ব্যবহার অদ্ভুতরসের নিদর্শন হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে বিচিত্র পর্ব-পদ-পংক্তি-বন্ধের ব্যবহার করেছেন।

প্রথম তাঁর কলাবৃত্ত রীতির কয়েকটি উদাহরণ তুলছি।—

২৭। দ্র. ছন্দসরস্বতী চতুর্থ প্রকাশ।

- (১) হাস ছি ল, স জা রু, (ব্যাকরণ মা নি না),
হ য়ে গে ল হাস জা রু কে ম নে তা জা নি না।
বক কহে কচ্ছপ — বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।

(আবোল তাবোল খিচুড়ি)

এখানে লক্ষণীয়, কবি স্বচ্ছন্দে প্রয়োজন মতো যেমন ‘সজারু’ শব্দে উচ্চারণ-প্রসারণ ঘটিয়ে তিনমাত্রার স্থলে চার মাত্রা দিয়েছেন, তেমনি ‘বকচ্ছপ’ শব্দে উচ্চারণ সংকোচন করে পাঁচমাত্রার স্থলে চার মাত্রা দিয়েছেন।— তাতে কিন্তু কবিতাটি পড়তে ছন্দের কোনও দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি।— তার কারণ, ছড়ার প্রাসঙ্গিক (প্রতি পর্বের প্রথমে) উচ্চারণে এই গৌণ দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেছে।

দ্বিমাত্রিক উপযতি ভাগের (কলাবৃত্ত) ছন্দে প্রসঙ্গ এবং কলা-প্রসারণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলছি।—

- (২) চূপ চূপ ঐ শোন ! বুপ বুপ ঝ পা — স!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ? — গব গব গবা — স।
খ্যাশ খ্যাশ ঘ্যাচ ঘ্যাচ, রাত কাটে ঐ রে
দুড় দাড় চুরমার — ঘুম ভাঙে কইরে।

(আবোল তাবোল শব্দ কল্পদ্রুম)

এখানে, শব্দের ধ্বনি-অনুপ্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং প্রয়োজনে রুদ্ধদলের তিন কলামাত্রার প্রসারণ (‘ঝপা—স’ ‘গবা — স’) লক্ষণীয়।

বিচিত্র পর্বভাগের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

- (৩) আয় তোর । মু তু টা দে যি, ॥ আয় দে যি । ‘ফু টো স্কোপ’ দি য়ে, I
দেখি কত । ভেজালের মেকি ॥ আছে তোর । মগজের ঘিয়ে । I
কোনদিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোনদিকে থেকে যায় চাপা
কতখানি ভস ভস ঘীলু, কতখানি ঠক ঠকে ফাঁপা।

(আবোল তাবোল বিজ্ঞান শিক্ষা)

এখানে ৪ । ৬ ॥ ৪ ॥ ৬ I — পর্ব-পদ-মাত্রাভাগ এনে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

- (৪) ক হ ভাই ক হ রে, ॥ আঁ কা চো রাঁ স হ রে ॥
বদ্যিরা কেন কেউ ॥ আলুভাতে খায় না? I
লেখা থাকে কাগজে ॥ আলুখেলে মগজে, ॥
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে ॥ বুদ্ধি গজায় না। I

(আবোল তাবোল বুড়ীর বাড়ী)

এখানেও পদের শেষ মুক্তদলে গুরু দ্বিকল উচ্চারণ দিয়েছেন,— তার ফলে কবিতাটিতে নতুন ধ্বনি-সুষমা প্রকাশ পেয়েছে।

এবারে দু-একটি দলবৃত্ত বিন্যাসরীতির উদাহরণ তুলছি। ‘ভালরে ভাল’ কবিতাটিতে আটদল পংক্তিবিন্যাসে এবং একই শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ধ্বনিগত অনুপ্রাস-সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

কবি শুরু করেছেন,—

দাদাগো! দেখছি ভেবে অনেক দূর—

এই দুনিয়ার সকল ভাল,

আসল ভাল, নকল ভাল,

সস্তা ভাল, দামীও ভাল,

এমনি ‘ভাল’র দীর্ঘ ফিরিস্তি শেষে—

শিমুল তুলো ধুনতে ভালো,

ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,

কিন্তু সবার চাইতে ভাল?

—পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।

(আবোল তাবোল ভালোরে ভাল)

অনুরূপ আটদল পদ ব্যবহার করতে গিয়ে, প্রতি চার পংক্তি শেষে একটি অতিরিক্ত একরুদ্ধদল শ্বাসাঘাতপ্রধান শব্দ বিন্যাসের দ্বারা পংক্তিবন্ধ রচনা করে ছন্দে নতুনতর ধ্বনিস্পন্দ এনেছেন,—

দেখ বাবাজি দেখবি নাকি ॥

দেখরে খেলা দেখ চালাকি, ॥

ভোজের বাজি ভেঙ্কি ফাঁকি ॥

পড় পড় পড় পড়বি পাখী — ধপ ॥ I

লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে ॥

তাক করে যাই তীর ধনুকে, ॥

ছাড়ব সটান উর্ধ্বমুখে ॥

হস ক’রে তোর লাগবে বৃকে — খপ ॥ II

(আবোল তাবোল ফসকে গেল)

অনুমান করা যেতে পারে, ছন্দের এই রুদ্ধদল-বিন্যাসে চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়ে তুলতে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন ; তবু সেখানেও বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু এবং ভাবানুযায়ী লঘু পর্ব্যতি, প্রাসঙ্গিক স্পন্দন এবং রুদ্ধদল বিন্যাসের তরঙ্গ-ভঙ্গ সৃষ্টিতে কবির সৃক্ষ ধ্বনিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের মধ্যেও ছন্দের গুরুত্ব বিচারে প্রমথ

প্রমথ চৌধুরী

চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বিদেশী

(বিশেষত ইউরোপীয়) ছন্দকে সচেতনভাবে বাংলায় আমদানীর

প্রচেষ্টা খুব কম কবিই করেছেন। মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানে প্রমথ চৌধুরীর নামও সংযুক্ত হতে পারে। তাঁর কবিতা রচনার সূত্রপাত ১৯১৩-তে ভারতী এবং সাহিত্য পত্রিকায় কয়েকটি সনেট প্রকাশের মাধ্যমে। সে বছরই তাঁর

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সনেট পঞ্চাশৎ’ প্রকাশিত হয়েছিল।— আর তাঁর কাব্যচর্চার সমাপ্তি হল মাত্র ছয় বছর পরে (১৯১৯) প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘পদচারণ’ রচনার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নতুন ছন্দের পরীক্ষার দিক থেকে এই দুটি গ্রন্থেরই গুরুত্ব রয়েছে।

‘সনেট পঞ্চাশৎ’ কবির পঞ্চাশটি সনেটের সংকলন। লেখক নিজে এ সনেটগুলির রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন, “সনেট পঞ্চাশতের প্রতি সনেটই ফরাসী সনেটের আদর্শে লেখা। প্রথমে দুটি চৌপদী তারপর একটি দ্বিপদী তারপর আর ফরাসী আদর্শে একটি চৌপদী।” (অমিয় চক্রবর্তীকে ৫।১১।৪১ তারিখে লেখা সনেট রচনা পত্র ‘দেশ’ ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র.)

পূর্ববর্তী আর একটি চিঠিতে আরও বিশদভাবে লিখেছেন,—

“এখন আমার সনেটের জন্মকথা লিখছি!... আমি Renaud প্রভৃতি ফরাসী কবিদের পদানুসরণ করে সনেট লিখতে শুরু করি। ফরাসী সনেটের সহিত ইতালীর কবির মস্তব্য সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম অষ্টক সমান। শেষ যষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুইভাগ করেছেন। প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুস্পদী। সনেটের technique বড় কঠিন, অন্তত: আমার পক্ষে। ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি এ form টাই নিই। ওরি মধ্যে একটু সহজ বলে।

(শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৬।১০।৪১ তারিখে লেখা পত্র

দেশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র.)

‘সনেট পঞ্চাশৎ’ থেকে তাঁর একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

সত্যকথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নিশ্চয় অনল
দক্ষ করে পৃথিবীর গুপ্ত তুণ রাজি॥
হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়,
সুখ তারা দেয় নাকো তাই দুঃখ পায়॥
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর মমতা,
মনে জেনে বিষ শুধু রঙীন ফানুস॥

মি
ক
খ
খ
ক
ক
খ
খ
ক
গ
গ
ঘ
ঙ
ঘ
ঙ

(সনেট পঞ্চাশৎ হাসি ও কান্না)

সনেটের আঙ্গিক
সম্পর্কে প্রথম
চৌধুরীর মন্তব্য

সনেটের বিশিষ্ট আকৃতিবন্ধ যে তার ভাবধর্মকে ফুটিয়ে
তোলে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথম চৌধুরী
বলেছেন,—

রবীন্দ্রনাথের lyric মূলতঃ গীতধর্মী, তার flow অসাধারণ। সনেট হচ্ছে আমার
মতে sculpture ধর্মী — এর ভিতর উদ্দাম flow নেই যেটুকু গতি আছে তা
সংহত ও সংযত। সনেটের ভিতর এমন কোন তোড় নেই যা পাঠককে ভাসিয়ে
নিয়ে যেতে পারে। সনেট প্রতিমাধর্মী। অবশ্য আমি একথা বলতে চাইনা আমার
প্রতি সনেট একটি প্রতিমা। কিন্তু দাস্তে প্রভৃতি বড় কবিদের সনেট তাই। এবং
সৌন্দর্য অনেকটা technique এর উপর নির্ভর করে।... কবিতা বস্তুকেই আমরা
আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার
জিনিস।... আর্ট অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা
experiment হিসেবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কবিতাগুলি সনেট কবিতা হিসেবে
উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে।”

(অমিয় চক্রবর্তীকে ৬।১০।৪১ তারিখে লিখিত পত্র

দেশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র.)

ফরাসী অঙ্গিকের সনেট প্রথম চৌধুরীর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও দু-একটি (‘কড়ি ও
কোমল’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত চরণ, হাসি সনেট দুটি দ্র) রচনা করেছিলেন।— রবীন্দ্রনাথ
‘সনেট পঞ্চাশৎ’-এর সনেটগুলির বিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন। তবু বলতে হয়,
পেত্রাকীর্য সনেটের প্রগাঢ় ভাব ও ছন্দের আবর্তন এই ‘ত্রিভঙ্গ’ সনেটে প্রকাশ পায়
নি। রবীন্দ্র-সনেটের দৃঢ়বন্ধ সংহতি-বোধও ‘বীরবলী’ সনেটে দেখা দেয়নি।

‘পদচারণ’ (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে সনেট ছাড়াও ইতালীয় তের্জারিমা (Terza Rima)

তের্জারিমা ও এবং ফরাসী ট্রিয়োলেট (Triolet) নামক আরও দুই রীতির
ট্রিয়োলেট রচনা ইউরোপীয় ছন্দাবন্ধ রচনা করেছেন। তের্জারিমা তিন পংক্তির

স্তবকবন্ধ, প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে মিল থাকে, মিলহীন দ্বিতীয়
পংক্তিটির সঙ্গে পরবর্তী স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মিল রাখতে হয়।— এই
ভাবে পর পর বিনুনি বিন্যাসে (inter-lace-rhyme) ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আর
ট্রিয়োলেট হচ্ছে ‘কখকক কখকখ’ মিলের, আট পংক্তির স্তবকবন্ধের কবিতা। এ কবিতায়
১ম, ৪র্থ, ৭ম পংক্তি অনেকাংশে অভিন্ন থাকে, তেমনি ২য় এবং ৮ম পংক্তিতেও
সাধর্ম্য রক্ষিত হয়।— এই দুই রীতির পদ্য রচনা সম্পর্কে লেখক একটি পত্রে
জানিয়েছেন,—

পদচারণে.. Terza Rima ও Triolet লিখতেও চেষ্টা করেছি। Terza Rima যে

এ বিষয়ে কেন লিখতে গেলুম মনে পড়ছে না। ইংরেজি ভাষায় ও জাতের
কবির মন্তব্য কবিতা নেই। বোধ হয় একমাত্র Browning এর The Statute of
Rust ছাড়া। আমি পরে আবিষ্কার করেছি যে Dante র Divina

Comedia আগাগোড়া Terza Rima ছন্দে লেখা। যেন ও ছন্দ পয়ারের স্বগোত্র। কিন্তু আমি কথাকে ও ছন্দে লেখা অসম্ভব মনে করেছি। একটি Terza Rima লিখতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতি তিন ছত্রের মধ্যে একছত্র unrhymed থাকে তার পরের ত্রিপদীতে তার মিল টেনে আনতে হয়। সনেট চৌদ্দ ছত্রে লিখেই খালাস কিন্তু Terza Rimaয় শেষ পর্যন্ত ছুটি নেই!... Triolet লেখাও কঠিন — তার পুনরুক্তির জন্য। এ দুই ইচ্ছে experiment— আর এ দুই বিষয়েই আমি পাস হয়েছি। অর্থাৎ হাতের পাঁচ রেখেছি।

(অমিয় চক্রবর্তীকে ৫।১১।৪১ তারিখে লিখিত পত্র

দেশ ১৩৬৩ সাহিত্য সংখ্যা দ্র.)

কবির তেজরিমা এবং ট্রিয়োলেট ছন্দোবন্ধের দুটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(১) তেজরিমা	মিল
“এদিকে সুমুখে দেখি সময় সংক্ষেপ	ক
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,	খ
বর্ণসূর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।	ক
আনিবু সংগ্রহ করি বিষং প্রমাণ	খ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কনেট,	গ
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।	খ
এহাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,	গ
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,	ঘ
প্রকৃতি যাহার ‘জেঠ’, অকৃতি ‘কনেঠ’।	গ
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,	ঘ
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,	ঙ
বারো কিস্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।”	ঘ

[পদচারণ কৈফিয়ৎ (Terza Rima ছন্দে)]

(২) ট্রিয়োলেট	মিল
তোমাদের চড়া কথা শুনে	ক
হয় যদি কাটিতে কলম্	খ
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে	ক
তোমাদের চড়া কথা শুনে।	ক
তার চেয়ে ভালো শত গুণে	ক
দেয়া চির লেখায় অলম্,	খ

তোমাদের চড়া কথা শুনে
হয় যদি কাটিতে কলম।

ক
খ

(পদচারণ সমালোচকের প্রতি) ২৭

কবি ‘তেজরিমা’তে পয়ার পংক্তি (৮ ও ১) এবং ‘ট্রিয়োলেটে’ দশমাত্রিক একপদী পংক্তি ব্যবহার করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর পর এই যুগে ছন্দবৈচিত্র্যের দিক থেকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের (১৮৭১-১৯৫১) নামকরা যেতে পারে। শিল্পচর্চায় জীবন কাটালেও প্রায় প্রথম যৌবন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেকেই (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘শকুন্তলা’ ১৮৯৫ জুলাই-আগষ্ট)

তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন; এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও

গদ্য ও পদ্যের বিশিষ্ট ছন্দোময় ভঙ্গীতে বহু বিচিত্র সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশুদের বা বড়োদের আসরে তিনি যে রূপকথা বলার ছলে গল্প শোনাতে বসেছেন তাতে

পালাগানের

নলবৃত্ত ছড়া

ছন্দোবদ্ধ ভাষাও সার্থক সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। ছন্দের

সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগ প্রয়োজন মতো তিনি শিথিল করেছেন, ছন্দের

প্রকৃতিগত পরিবর্তন করেছেন। গদ্য ভাষাতেও ধ্বনি-অনুপ্রাস এবং

মিল দিয়ে চমৎকার শ্রুতিমাধুর্য এনেছেন, যাত্রার পালাধর্মী ছন্দোবদ্ধ নাটকেও তাঁর ভাষা আশ্চর্য স্নাত্ত্ব লাভ করেছেন। এখানে দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

(১)

ঘুমতা ঘুমায়

ঘুমেতে ঘুমায়

রাত বিরেতে

চাঁদটা ঘুমায়;

নীলের ক্ষেতে

বাদলা ঘনায়

ঘুম ঘুম যায় গাঙের বাতাস — স-স

নিশার পিদুম রাতের আকাশ — শ-শ

এ পর্যন্ত আকৃতিবন্ধের একটি রূপ। তারপরই পদযতির কিছু পরিবর্তন করে লিখেছেন,—

হস-পরীর ধীর নিশ্বাস

থেকে থেকে উলু ঘাস — দুলায়

পোড়ো বাড়ির ভাঙা আলিসায়।

চিল ছত্তর রাজপুত্তর ঘুমাতে ঘুমাতে কলাই চিবায়—

চিলে কোঠায়।

২৭। প্রমথ চৌধুরী সনেট পঞ্চাশতে আটটি ট্রিয়োলেট লিখেছেন। সবগুলি আঙ্গিকের দিক থেকে বিশুদ্ধ বলা চলে না। এখানে তাঁর একটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ট্রিয়োলেটের উদাহরণ দেওয়া গেল।

ভঙ্গি পরিবর্তন করে সংলাপকে আরও স্পষ্ট করে এরপরে আবার লিখেছেন,—

‘ও বড়াই বুড়ি।

কয়লা ঘরে কয়লা বুড়ি

তাতে নড়ে কি?

দেখ দেখি!’

‘নড়ে কালো বেড়ালের বাচ্চা কটি

দেখেচি দেখেচি

দেখে এসেছি!’

(অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ভূতচৌদশী, পৃ. ১৯৫-৯৬)

মূলত কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। সমগ্র কবিতায় পর্বের দলবিন্যাসে প্রয়োজন মতো একরূপ শৈথিল্য রেখেছেন। বিচিত্র অনুপ্রাস-মিলে, উচ্চারণের বাকধর্মী শিথিলতায় এ-জাতীয় কবিতাগুলিতে রূপকথার ছন্দোবদ্ধ গল্প বলার একটি নিজস্ব ভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

কবিতার সংলাপধর্মী ‘চট জলদী’ কবিতাগুলিতে^{২৮} কথ্য সংলাপ-ভঙ্গির আর
ছন্দ একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

(২) ‘সমুদ্রটা কেমন ঠেকল

চক্কোতি মশায়,

‘যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয়।’

‘হুকোঁটা নেন খুলে, কন

ধুলো পায়ে কেমন হল

সমুদ্র মজ্জন।’

‘মশায় কিভাবেসে পড়েছিলেম

সাগর বর্ণন—

বুঝি না কোন্ সাহসে

সাগরের এত কাছে আছেন বসে

বেঁধে বালির ঘর—

বাপরে বাপ্ কি জলের ডাক

বুঝি না সারারাত জগন্নাথের

কি প্রকারে ঘুম হয়।

আমরা মানুষ বই তো নয়।’

২৮। চট্জলদী কবিতা সমষ্টি ১৩৪৬ ভাদ্র থেকে ১৩৪৭ ফাল্গুন পর্যন্ত নিয়মিত ‘রঙমশাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানেও কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন ধ্বনি-অনুপ্রাস এবং সংলাপী ভঙ্গি এ পদ্যবন্ধে অনেকটা নতুন আমেজ সৃষ্টি করেছে।

গদ্যকবিতা
অন্তর্মিল

অবনীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্র গদ্যকবিতার ভাবাবেগ না থাকলেও সে কবিতায় অনুপ্রাস মিলের নূতনত্ব আছে।
যেমন—

(৩) অন্তকালে কেউ মুখে জল ঢালে
কেউ দেয় পাখার বাতাস।
কেউ চাপড়ায় আপনার গালে।
ত্রিকোটি-পতি মলো বলে—
করে কেউ হা-হতাশ।

অন্তর্জলির কালে

পড়শিরা শুধালে—

সন্তাপন দাদা, ধনের ঘড়া কটা পুঁতে পালালে?

বেলা অসকালে, চোখ তুলে কপালে

তিন আঙুলে কি দেখালে—

বোঝা গেল কি বোঝা গেল না।

রটনা হল, তেমাথা পথে পুঁতে গেল

তিন ঘড়া সোনা

মান কচুর আড়ালে

(ঐ গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত পৃ. ১৮২)

গদ্যভাষা রচনাতেও অবনীন্দ্রনাথ ধ্বনিমিলের এবং যতিস্পন্দের অলঙ্কারে অনতিস্পষ্ট ছন্দবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্যভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিতে এই ছন্দের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

ঘরে ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ
গদ্য ভাষার একসময় দপ্ করে নিভে গেল; আর জ্বলল না—কোথাও আর
ছন্দস্পন্দ আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না;
রূপকথা আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো
বলার ঢঙ দুখানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো

বৃষ্টির এক একটি ফোঁটা ঝরে পড়েছে— আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর। তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে— শাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়েছে কিন্তু কোন শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুক ফাটা কান্নায়, কিন্তু কোন কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর-পারে— যে দিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়— সেই দিকে দুই উদাস চোখ রেখে হন্ হন্ করে

তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে দূরে-দূরে, অনেক দূরে—
ঘর থেকে অনেক দূরে, বকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক
দূরে— ঘরে আসা, ফিরে আসা, বকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে
অনেক দূরে— চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে
যাবার পথে।

(নালক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিগনেট সং পৃ. ৩০-৩১)

নাটকেও অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে লৌকিক যাত্রার পালার ঢঙে এক নতুন
নাটকের গদ্য-পদ্য রীতির সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পদ্যের ছন্দোবদ্ধ সেখানেও
মিশ্র-সংলাপ শিথিল, গদ্যে ধ্বনি-অনুপ্রাসের ফুলঝুরি সেখানেও বিকমিক
করছে। ‘ভূতপত্নীর যাত্রা’ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি।—
মূল গায়ন দিশা। হল সন্ধিপূজা সমাপন—

গোধূলিতে গোষ্ঠে ফিরেন কৃষ্ণের গোধন;

কৃষ্ণের মায়া বোঝা ভার,

মোহ হয় বিধাতার;

বচ্ছরে একবার জগবন্ধুরও করতে হয়

মাসি পিসির ভবনে গমন—

অন্যে পরে কা কথা,

অবুনাথ তো সামান্য জন;

জগন্নাথের নাটঘরে শঙ্খ বাজায়ে বলে দাস গোবর্দ্ধন॥

অবু। কি মোয়াই খাওয়ালে মাসি অবুরে তাঁহার

চারসের পাক্কি ওজন একেবারে পার।।

যেমন কপ্ করে মুখে দেওয়া

তেমন টপ করে গিলে নেওয়া,

এখন পাক্কি ছাড়া একপদ নড়া ভার।

উদ্ধব বলতে পার, পিসির ওখানে আহরাদি ব্যবস্থা কি প্রকার?

উদ্ধব। শুনেছি দেবতা-দুর্লভ কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল সেথাকার।

অবু। চলনা তুমিও সাথে আমার!

উদ্ধব। সে গুড়ে বালি, মাসিকে শুনিয়ে দিয়েছি তোমার সেই শেখানো ছড়া—

মাসি পিসি বনগাঁবাসী—

অবু। চূপ চূপ এখনি আসবে মাসি!

উদ্ধব। বসে আর হবে কি, শোনাতেই হয়ে গেছে কানমলা।

অবু। উদ্ধব তুমি একটি গর্দভ, ঘরের দ্যাঁলে লিখে রাখলেই হত, কানের কাছে
কেন পড়া?

উদ্ধব। কে জানে দাদা, আমি কি জানি অত লেখা পড়া!

অবু। মুন্সিল এখন মাসির সঙ্গে দেখা করা—লাঠি লঠনটা নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়া যাক— পাক্কির জন্যে মিছে অপেক্ষা করা।

(অ. কি. সঞ্চয়ন ভূতপত্রীর যাত্রা পৃ ৭৫-৭৬)

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,—

লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক’রেই তাঁর ভাষা তাঁর অসামান্য শিল্পদৃষ্টির আলোকে এক নূতন আভাষ মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ। খাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিত্র ছড়ায় এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার মধ্য দিয়ে খামখেয়ালী উদ্ভট পালাগান পর্যন্ত চারিয়ে নিয়েছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে যে কি অলৌকিক খেলা খেলাতে পারে রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ অশোকবিজয় রাহা বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শকাব্দ, পৃ. ১১০)

ইংরেজি কাবো হপকিন্স (G. M. Hopkins) যেমন লৌকিক ছড়ার শিথিল রূপাদর্শ (Pattern) ‘স্প্রাং রিদম’ (sprung rhythm) সৃষ্টি করেছেন, সাম্প্রতিক কবিতায় কবি অমিয় চক্রবর্তী যে ন শিথিল ‘স্প্রাং রিদম’ জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথের রূপকথা বলার ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট ঢঙটিকে এই জাতীয় ছন্দেরই পূর্বাভাস রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৩৬), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১৯) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। নবকৃষ্ণ শিশুপাঠ্য কবিতা রচনায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের সহজ সৃষ্ঠ ব্যবহারে

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাবৃত্ত ছন্দে বিংশ শতকে পৌছে অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন। ১৮৮৮-তে ‘প্রচার’ পত্রিকা বন্ধ হবার সময় ‘শেষ’ নামে যে কবিতাটি প্রচারের সর্বশেষ সংখ্যায় (চৈত্র ১২৯৫) প্রকাশ করেছিলেন কলাবৃত্ত ছন্দের পূর্বাভাস সেখানে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। কয়েকপংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন।

(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।

দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কালিকা সনে,

মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ॥

অমিয় স্বর-লহরে মাখি স্তবধ করি পশুপাখী

মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন॥

যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন নীরে,
পরানে শুধু উছলি উঠে সুনীলজলে সন্তরণ ॥

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮ খণ্ড (৮৩)

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৬-৩৭]

কবিতাটি পাঁচ মাত্রার পর্বভাগে রচিত। প্রত্যেক পর্বে আবার ৩+২ মাত্রাভাগে উপষতি দিয়েছেন। কবিতার প্রথম দুটি পংক্তি দ্বিপদী (৫।৫॥৫।৫ I), অন্যান্য পংক্তি চৌপদী (৫।৫॥৫।৫॥৫।৫ I)। প্রত্যেক পংক্তিরই শেষ পদে যুক্তবর্ণ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পংক্তির মাঝে যুক্তবর্ণ ব্যবহারে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সে কারণেই ‘স্কন্ধ’ না লিখে ‘স্ববধ’ লিখেছেন, ‘জ্যোৎস্না’ বা ‘উর্ধ’ না লিখে যথাক্রমে ‘জোছনা’ বা ‘উরধ’ লিখেছেন। পর্বভাগ সর্বত্রই নিখুঁত (৩:২) হয়েছে, কেবল একটি ক্ষেত্রে পাঁচ মাত্রার পরিবর্তে চারমাত্রার (এখানে উদ্ধৃত তৃতীয় পংক্তির ‘পশুপাখী’ পর্ব দ্র) সমাবেশে ছন্দ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিমধ্যেই কড়ি ও কোমলের (১৮৮৬) দু একটি কবিতায় এবং মানসীর ‘ভুলভাঙা’ (১৮৮৭) কবিতায় যুক্তাক্ষর সমন্বিত কলাবৃত্ত রীতির কবিতা রচনা শুরু করেছেন। তবে সে যুগে অন্য কোনও কবিই কলাবৃত্ত রীতিতে যুক্তাক্ষরের দ্বিমাত্রিক ব্যবহার-রহস্য ধরতে পারেননি,— সেদিক থেকে নবকৃষ্ণের ‘শেষ’ কবিতাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

নবকৃষ্ণ শিশুপাঠ্য কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে যে সচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন তারও দু একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

- (১) বর্ষা গেলো আকাশ ধূয়ে, ফর্সা হলো দিক ।
কঁদে কেটে হেসে ধরা উঠলো যেন ঠিক ॥
সকাল বেলা চারিদিকে, শিশির ভেজা ঘাস ।
শিউলি তলা ছেয়ে পড়ে শিউলি ফুলের রাশ ॥

(সা. সা, চ, ৮ম খণ্ড (৮৩) আগমনী পৃ. ৪৩)

- (২) নদীর তীরে শ্যামল তরু পাশে সবুজ মাঠ ।
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শোভার হাট ॥
অযোধ্যা নগরী ছিল এই সরযুর তীরে ।
শোভা কি তার! দেখলে পরে নয়ন নাহি ফিরে ॥

(ঐ টুকটুকে রামায়ণ পৃ. ৪৩)

কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১৯) প্রধানত সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর রজনীকান্ত সেন কাব্যগুলির মধ্যে বাণী (১৯০২) এবং কল্যাণী (১৯০৫) সমধিক খ্যাত। কবিতা-গানে প্রধান তিনটি রীতির ছন্দ তিনি নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এখানে তাঁর কলাবৃত্ত সাতমাত্রা পর্বভাগের একটি এবং দলবৃত্ত (আঞ্চলিক কথ্যভাষার নিখুঁত প্রয়োগ দৃষ্টান্ত) ছন্দে রচিত আর একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।—

(১) কলাবৃত্ত সাত মাত্রা (৩ ৪) পর্বভাগ

স্নেহ বিহবল করুণা ছলছল,

শিয়রে জাগে কার আঁখিরে!

মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা

এনেছে, অশরণ লাগিরে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে,

অবশ কৃশতনু মলিন অনশনে;

আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,

তপ্ত তনু মম, করুণা ভরা বুকে

টানিয়া লয় তুলি, যাতনা তাপ ভুলি,

বদন-পানে চেয়ে থাকি রে।

(বাণী মা)

মাঝে মাঝে কবি মুক্তদল স্বরধ্বনির দীর্ঘ দ্বিমাত্রক (যেমন ‘স্নেহ বিহবল’) উচ্চারণ দিয়েছেন। অবশ্য গানে এরূপ প্রয়োগ অনেকেই করেছেন। এ ছন্দে যুক্তবর্ণ ব্যবহারে কবির দ্বিধা ছিল না তার পরিচয় প্রায় প্রতি পংক্তিতেই পাওয়া যায়। সাত মাত্রার পর্বে কবি প্রায় সর্বত্রই ৩+৪ মাত্রাভাগে উপযতি স্থাপন করেছেন; তাতেও ছন্দের ধ্বনি-সৌষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

দলবৃত্ত ছন্দে আঞ্চলিক

কথা ভাষা

(২) দলবৃত্ত আঞ্চলিক কথ্যভাষায় লিখিত

ব্যবহারের উদাহরণ

বাজার হুদা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায়;

তোমার লাগে কেমতে পারুম, হৈয়্যা উঠচে দায়!

আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,

চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?

বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর্যা কাপার দিচি,

পিরান দিচি, মজা কৈর্যা দিবার লাগচ গায়।

উলের হতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মনডা পাইন্যা?

ওজন কৈর্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায়!

বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান কোরচ পাগল?

যহন বিয়্যা কোরচ, ফেলবো ক্যামতে?

কৈয়্যা দ্যাও আমায়।

(কল্যাণী বুড়ো বাঙ্গাল)

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ আঞ্চলিক কথ্য বাচনভঙ্গির পক্ষে কত উপযুক্ত, আলোচ্য গানটি তার একটি সার্থক নিদর্শন। রজনীকান্ত এখানে চতুর্দল পর্বভাগের সুনির্দিষ্টতা প্রত্যেক পূর্ণ পর্বেই রক্ষা করেছেন, সেই সঙ্গে চলতি ভাষার আমেজও পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। বাংলা দলবৃত্ত ছন্দের দিক থেকে আলোচ্য গানটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচী সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ‘মদনভস্মের পরে’ (কল্পনা) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত রীতির পঞ্চমাত্রক পর্বে (৫|৫|৫|৪||৫|৫|৩ I) রচনা করেছেন। অনুরূপ ছন্দোবন্ধে যতীন্দ্রমোহনও লিখেছেন,—
 প্রলয় জলে । মগ্ন করি । দহিয়া মহা । খাণ্ডবে ॥
 বিশ্ব নাকি । লুপ্ত করো । হেলাতে, I
 অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি’ নৃত্য করো তাণ্ডবে—
 তোমার সুখ — রুদ্র, সেই খেলাতে !

(কাব্যমালঞ্চ শিবসপ্তক)

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার শব্দকে কলাবৃত্ত ছন্দে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন! ‘ছন্দের মাত্রা’ প্রবন্ধটিতে (ছন্দ পৃ ৮২-১১৫ দ্র) ‘নয় মাত্রার চাল’ তিনমাত্রার চল সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনায়, ছন্দের একটি গতিসঞ্চারী পদবন্ধ হিসাবে ৩ ৩ ৩ মাত্রক শব্দবিন্যাসের উদাহরণ তুলেছেন। যতীন্দ্রমোহনও অনুরূপ নয়মাত্রার (৩ ৩ ৩ :) পদবন্ধ রচনা করেছেন।—

শালের শ্যামল ছায়ায়
 শীতের বাদল হাওয়ায়—
 দিবস আজিকে ঘুমায়
 মেঘের মুদং শুনে।
 আজ দুপুর হতেই রজনী

শ্রাবণ মেঘের গুণে ! (কাব্যমালঞ্চ শ্রাবণে)

৮||৬ I মাত্রার পদবিন্যাসে কলাবৃত্তের দৃষ্টান্ত সমগ্র বাংলা কাব্যে খুব বেশী মিলবে না। দ্বিমাত্রিক অতিপর্বের স্পন্দন সহ, সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগের শব্দবিন্যাসে যতীন্দ্রমোহন সেরূপ ছন্দ রচনা করেছেন।— এখানেও রবীন্দ্রনাথের ত্রিমাত্রক ছন্দের প্রভাব লক্ষণীয়।—

আমি নইক পাথর গাঁথা সিংহদুয়ার—

যেথা লোহার ফটকে রুখে পথের জুয়ার। (কাব্যমালঞ্চ খিড়কী)

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির অনুকারক বেশী নেই। যতীন্দ্রমোহন ত্রিপদীবন্ধে এই ছন্দ অল্পস্বল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

সংশ্লিষ্ট	ম স্ত একটা ব ড় বটগাছ ভৈরব নদীর ধারে	৮ ৬
দলমাত্রক	ছাতরা বট তার নাম	৫ I
রীতির প্রয়োগ	ছাতার মতন পাতায় ছাওয়া, তলায় সারে সারে হাজার বুড়ির থাম।	

(কাব্যমালঞ্চ মালোর মেয়ে)

এখানে কবি পর্বস্পন্দন অনেকাংশে বিলুপ্ত করে বাকধর্মী রচনাভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম

হয়েছেন। তবু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনারীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করতে পারেননি মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের

সত্যেন্দ্রনাথের মতো রুদ্রদলের ধ্বনি-অনুপ্রাস, প্রাসবিকতা

প্রভাব

এবং লঘু পদযতির স্পন্দন এনেছেন।—

ঝরঝর ঝরণা গিরিঘর করনা—
জ্বলজ্বল উজ্জ্বল যেন কালো কজ্জল,
কভু শাদা ধবধব তুষারের উদ্ভব,

গদ গদ গদ গদ চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ বুদ বুদ বুদ কেটে চলে বুদ্ধদ,
কল-কল তল-তল আঁখি দেখি ছল-ছল,
চোখে বুঝি আসে জল — বল বল ঠিক বল।

(কাব্য মালঞ্চ ঝরণা ঝারা)

আলোচ্য যুগে প্রচলিত প্রধানতম ছন্দপ্রকৃতিগুলি যতীন্দ্রমোহন নিপুণভাবে আয়ত্ত্ব করেছিলেন। কথ্যভাষার স্ভাবিক সংলাপভঙ্গিও তিনি ছন্দের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির একটি উদাহরণ তুলছি।—

দলবৃত্ত ছন্দে
চমৎকারিত্ব

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি!
আস্তে একটু চলনা, ঠাকুর ঝি—
ওমা, এয়ে ঝরা বকুল!— নয়?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাঙিরে কাল— মধুমদির বাসে—
আকাশ পাতাল— কতই মনে হয়!

(কাব্যমালঞ্চ অন্ধবধু)

কলাবৃত্ত রীতিতে সাতমাত্রা পর্বভাগে, দ্বিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্তবকবন্ধে রুদ্রদল স্পন্দন যতীন্দ্রমোহন প্রায় পতি পর্বের সূচনায় রুদ্রদল ব্যবহারের দ্বারা চমৎকার ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন,—

ক্ষুদ্র জীবনের মুঞ্চ খেলা হেরি রুদ্রদেব বুঝি হাসে,
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্রে রূপধারী উর্ধে ফুটে নীলাকাশে!
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে!

নামিছে লীলা হেরি ভক্ত করপুটে, চক্ষু ধারাজলে ভাসে!

(কাব্যমালঞ্চ লীলা)

যতীন্দ্রমোহন লৌকিক দলবৃত্তে মুক্তক এবং মিশ্র কলাবৃত্তে প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। মৌলিক কোনও ছন্দোরীতি উদ্ভাবন না করলেও তৎকালীন প্রচলিত ছন্দগুলির নিপুণ প্রয়োগে তিনি সফল হয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

আলোচিত যুগের এবারে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে পুনর্বার উল্লেখ বৈশিষ্ট্য করে বর্তমান অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে।—

(১) এই যুগে রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রিক রীতির বিশ্লিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে বিচিত্রধর্মী প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যতিবিভাগ, ধ্বনিস্পন্দ এবং মিলবিন্যাসে বিশ্লিষ্ট রীতির অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। বলাকার কয়েকটি এবং পলাতকার সমস্ত কবিতায় সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘপদযতি কবিতার ভাবগাভীর্য পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে।

(২) মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ারবন্ধের সনেট রচনায় এইযুগে রবীন্দ্রনাথ (নৈবেদ্য, স্মরণ এবং উৎসর্গ কাব্য) ভাব ও ছন্দোবন্ধের দিক থেকে আরও স্বাধীন এবং পরিণত রচনারীতির পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতিতে সমিল মুক্তক (বলাকা এবং পলাতকা কাব্য দ্র) রচনা করে তিনি ছন্দে ভাবমুন্ডির ধারাকে আরও প্রসারিত করেছেন।

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল এই যুগে বাংলা কাব্যে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের একটি নতুন ছন্দোরীতি (আলেখ্য দ্র) প্রবর্তন করেছেন। দীর্ঘ পদভাগে পর্বযতি-স্পন্দ সম্পূর্ণ লুপ্ত করে তিনি এ-ছন্দে দৃঢ়, সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের নতুন প্রকাশভঙ্গি পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দোদ্ভূত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের রীতি ভিন্নতর; মহিমাস্থিত গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে আরও উপযোগী।

(৫) দ্বিজেন্দ্রলাল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান দীর্ঘপদী পংক্তি-বিন্যাসে, মুক্তক রচনায়, বিচিত্র স্বরক রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

(৬) তিনি বাকধর্মী স্রাবিক উচ্চারণ পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে মিশ্র উচ্চারণরীতির ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

(৭) যুগোচ্চর-বহুল কলাবৃত্ত রীতিতে তিনি অনেকগুলি গান লিখেছেন। একটি কবিতায় এ-ছন্দের প্রবহমান প্রয়োগরীতির আংশিক আভাষ ফুটে উঠেছে।

(৮) দ্বিজেন্দ্রলাল রুপদলবহুল চলিতভাষা ব্যবহারের দিকেই বেশী লক্ষ রেখেছিলেন। তিনি একাধারে সংগীতকার, কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তার ফলে কাব্যের ভাষা কখনও সংগীতের সুরাশ্রয়ী হয়েছে, কখনো বা অতিরিক্ত সংলাপ-প্রধান হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই ছন্দোবন্ধের শৈথিল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছন্দ ও ভাবের বিরোধ তাঁর কাব্য-পঠনে পাঠকের কাছে অনেক সময় বাধা-স্বরূপ মনে হয়।

(৯) দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রথম কয়েকটি নাটকে মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ছন্দোবন্ধ ভাষা নাট্যসংলাপে অনুপযোগী মনে করে পরে এ রীতি প্রায় বর্জন করেছিলেন।

(১০) বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ বিষয়ে এযুগেও অনেকে পরীক্ষা চালিয়েছেন। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছন্দোবন্ধে সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ আনতে চেয়েছেন। বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী গুরুস্বরধ্বনি প্রয়োগে তাঁর প্রয়াস সফল হতে পারেনি। বিজয়চন্দ্র রবীন্দ্র-রীতিতে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

(১১) হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী দীর্ঘ স্বরধ্বনি বর্জন করে রুদ্ধ ও মুক্তদলের সাহায্যে সংস্কৃত গুরু ও লঘু উচ্চারণের ধারাবাহিকতা রাখতে চেষ্টা করেছেন। তবে শব্দপ্রান্তিক কৃত্রিম স্রাব্ত উচ্চারণ এবং পদে পদে ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি।

(১২) এই যুগের রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ছন্দে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছেন। হরগোবিন্দের পদ্ধতি অনুসরণে রুদ্ধ-মুক্ত দল-বিন্যাসের দ্বারা বাংলায় সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের লঘুগুরু সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসরীতি তিনিও প্রয়োগ করেছেন, কৃত্রিম গুরু স্বরধ্বনির সংস্কৃতানুগ প্রয়োগ তিনিও বর্জন করেছেন। তবে হরগোবিন্দের ছন্দের দুটি প্রধান দুর্বলতা,— শব্দ প্রান্তিক রুদ্ধদলের কৃত্রিম স্রাব্ত উচ্চারণ ও ছন্দযতির বিরোধ—সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের বাংলা রূপায়ণে এতদিনের কৃত্রিম উচ্চারণ কাটিয়ে উঠেছেন সত্য, তবু সে ছন্দের পূর্ণ আমেজ বাংলায় আনতে পারেননি। কারণ, প্রথমত বাংলায় মুক্তদল-স্বরধ্বনির গুরু বা দীর্ঘ উচ্চারণ নেই; দ্বিতীয়ত, কলাবৃত্ত বা লৌকিক দলবৃত্ত যে দুটি রীতিতে তিনি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের পরীক্ষা করেছেন, উভয়ক্ষেত্রেই লঘু যতি সুস্পষ্ট প্রাধান্য পায়,— সংস্কৃত দীর্ঘ তরঙ্গায়িত ছন্দোবন্ধের পক্ষে এমন লঘু যতি আদৌ অনুকূল নয়।

(১৩) সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-প্রকৃতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাস এবং প্রাসঙ্গিক উচ্চারণের সাহায্যে ইংরেজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ছন্দের আভাস বাংলায় পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন।

(১৪) তিনি রুদ্ধ-মুক্ত দলের স্পন্দমান প্রয়োগধর্মে, পর্ব-উপপর্বের যতিভাগে উচ্চারণ প্রাসঙ্গিকতায় এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসে বাংলা ছন্দের অলঙ্কার-ঐশ্বর্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেছেন।

(১৫) কবি সুকুমার রায় কিশোর পাঠ্য কবিতায় কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগধর্মে ছন্দের মিল ও ধ্বনিস্পন্দনের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলেছেন।

(১৬) প্রমথ চৌধুরী ফরাসী রীতির সনেট, ট্রিয়োলেট এবং ইতালীয় তের্জারিমা ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনে বাংলা ছন্দের সীমান্ত আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

(১৭) শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পদ্য এবং গদ্য উভয় রচনায় ভাষাকে এক বিশেষ রীতিতে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। পদ্যে সংলাপ ফোটাতে গিয়ে উচ্চারণের শৈথিল্য রেখে প্রাকৃত হড়াগানের আদর্শ রক্ষা করেছেন। গদ্যকবিতায় অনুপ্রাস মিলের নূতনত্ব এনেছেন।

নাটকের সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে এবং মিল-অনুপ্রাসের ফুলঝুরিতে ছন্দ ও ধ্বনির সমৃদ্ধি এনেছেন।

(১৮) অপেক্ষাকৃত অপ্রধান রবীন্দ্রানুগ কবিদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কলাবৃত্ত ছন্দের প্রাথমিক প্রয়োগে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রজনীকান্ত সেন দলবৃত্ত ছন্দে আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী রবীন্দ্র-মুক্তক রচনায় এবং ছন্দে বাক্‌ধর্মী ভাষাবিন্যাসে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ অন্ত্যপর্ব (১৯১৮-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল,
জীবনানন্দ, সজনীকান্ত, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র,
অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, দিলীপকুমার প্রভৃতি

॥ ক ॥

হুন্দ বিচারে এই পর্বকে রবীন্দ্র-যুগের অন্ত্যপর্ব বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী দুটি পর্বের (রবীন্দ্র-যুগ : আদিপর্ব, রবীন্দ্র-যুগ : মধ্যপর্ব,) ক্রম অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে নতুন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন।^১ পূর্ববর্তী যুগে প্রবর্তিত সমিল ও অমিল দলবৃত্ত মুক্তক এ যুগে আরও পরিণতভাবে ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্ত বীতির মুক্তক অর্ধশতাব্দী কাল পরে অমিল পংক্তিবন্ধে আরও সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় পুনর্ব্যবহার করেছেন। শিশুপাঠ্য কবিতায় লঘু যতিভঙ্গে প্রস্র এবং রুদ্ধদলের ধ্বনি-তরঙ্গ এনে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকুমার রায়-অনুশীলিত এই বিশিষ্ট ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সর্বোপরি, ছন্দে ভাবমুক্তির যে বিপ্লবী ধারা মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ এবং রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের মুক্তক রচনাপথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছিল, আলোচ্য যুগে নব-প্রবর্তিত গদ্য-কবিতার ছন্দে সেই ধারা পরিণতি লাভ করেছে বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য যুগের বাংলা পদ্য-ছন্দে একাধিক কবি বা ছন্দ-জিজ্ঞাসুর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) ‘রবীন্দ্র যুগ : আদি ও মধ্যপর্বের’ ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-

১। এই যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশ কাল : পলাতকা ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ ১৯২২, লিপিকা ১৯২২, পূর্ববী ১৯২৫, লেখন ১৯২৭, মহয়া ১৯২৯, বনবাণী ১৯৩১, পরিশেষ ১৯৩২, পুনশ্চ ১৯৩২, বিচিত্রিতা ১৯৩৩, শেষ সপ্তক ১৯৩৫, বীথিকা ১৯৩৫, পত্রপুট ১৯৩৬, শ্যামলী ১৯৩৬, যাপছাড়া ১৯৩৭, ছড়ার ছবি ১৯৩৭, প্রান্তিক ১৯৩৮, সঁজুতি ১৯৩৮, প্রহসিনী ১৯৩৯, আকাশ প্রদীপ ১৯৩৯, নব জাতক ১৯৪০, সানাই ১৯৪০, রোগশয্যা ১৯৪০, আরোগ্য ১৯৪১, জন্মদিনে ১৯৪১, শেষলেখা ১৯৪১।

এ যুগের অন্যান্য
কবিগণ

১৯৫৪) ‘রবীন্দ্রযুগ মধ্যপর্বের কলাবৃত্ত ছন্দরীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কলাবৃত্ত রীতির দীর্ঘ পদ-পংক্তি-বিন্যাসের সাহায্যে ছন্দে ভাবমুক্তির ধারাকে অব্যাহত

রেখেছেন। নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭) এক দুর্বীর ভাবোচ্ছ্বাসকে বৈচিত্র্যময় ছন্দস্পন্দে প্রকাশ করেছেন; সংস্কৃত ছন্দের কবিতায় তিনি অনেকাংশে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবর্তী হয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) আঙ্গিক-সচেতন এবং দৃঢ় ছন্দোবন্ধের অনুরাগী ছিলেন। ভিন্নধর্মী দুই রীতিতে উভয়েই শব্দের সুমিত সাবধানী প্রয়োগে এবং স্তবক রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮০) ছন্দমুক্তির ধারায় ‘স্প্রাং রিদম’ এবং বিদেশীয় অন্যান্য ছন্দরীতির পরীক্ষায় নূতনত্ব দেখিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) রবীন্দ্র-ছন্দমুক্তি-ধারারই অনুসরণে দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। অনন্যদাশঙ্করের (১৯০৪) ‘লিমেরিক’, ‘ক্লেরিহিউ’ প্রভৃতি পাশ্চাত্য রূপাদর্শের ছড়া রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়। ছন্দসচেতন সজনীকান্ত (১৯০০-১৯৬২) স্বরচিত উদাহরণ-সাহায্যে বাংলা ছন্দের ক্রমবিবর্তন রেখাটি যে ভাবে ফুটিয়েছেন তারও চমৎকারিত্ব কম নয়। রবীন্দ্র-অন্ত্য পর্বের নবীন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধদেব বসুও (১৯০৮-১৯৭৪) বাকধর্মী উচ্চারণ প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা চালিয়েছেন।—এই কবিগোষ্ঠীকেই রবীন্দ্র-অন্ত্যপর্বের উত্তরসূরী বলা যেতে পারে। আরও নবীন এক কবিগোষ্ঠী আবার এঁদের অনুবর্তী হয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রভাবিত ছন্দের পরীক্ষা এ যুগেও চলেছে। কবি-সঙ্গীতকার দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮২) লঘু-গুরু সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলা পদ্যে পুনঃপ্রবর্তনে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিয়েছেন। আলোচ্য যুগের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল এবং দিলীপকুমার ছন্দরীতি-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কবি কালিদাস রায় বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে, বিশেষ করে বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (দ্র. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য)। ছন্দ-আঙ্গিকের আলোচনায় এযুগের কবিদের প্রবণতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

॥ খ ॥

রবীন্দ্রনাথ (অন্ত্যপর্ব)

দ্বিজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক রীতির ছন্দ যতটা সংবদ্ধ ভাবে প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের হাতে সে তুলনায় এ ছন্দ অনেকটা শিথিলবদ্ধ রূপে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে, ইতিপূর্বেই সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী মুক্তক (অমিল) যুগে ‘বলাকা’ কাব্যে তিনি প্রথম কলাবৃত্ত রীতির মুক্তক লিখতে শুরু করেন। আলোচ্য যুগের ‘পলাতকা’ কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তক ছন্দে লিখিত হয়েছে। আরও পরিণত জীবনে ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে (১৩৯৩)

কবি সর্বপ্রথম দলবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তক লিখেছেন। তাঁর প্রথম লেখা এই রীতির কবিতা ‘ছুটি’ থেকে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃতি করছি।—

দাও না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন খানে।
যেখানে ওই শিরীষ বনের গন্ধ পথে
মৌমাছদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ ভাসে ঐ সুদূরতা,—
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে,
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে—
শূন্য ঘরে অতীতস্মৃতি গুণগুণিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদল রাতে।

(পুনশ্চ ছুটি)

‘পুনশ্চ’র ‘গানের বাসা’ এবং ‘পয়লা আশ্বিন’ কবিতা দুটিও এই রীতিতে লেখা। রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রিক অমিল মুক্তক বেশী লেখেন নি।— সম্ভবত তার কারণ হল, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অমিল মুক্তকের দীর্ঘ পদভাগে, ভাবমুক্তি যতটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, ঘন ঘন যতিপতনের ফলে দলমাত্রকে সেই ‘লম্বা নিঃশ্বাসের দীর্ঘ চাল’ ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক দীর্ঘ পদভাগই স্বাভাবিক রীতি; এবং সেখানে উচ্চারণ দৃঢ়তা ও ভাবের প্রবহমানতা আরও বেশী পরিস্ফুট হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রকের এই বিশিষ্ট রীতিটি গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্র-আদর্শে সংশ্লিষ্ট দলমাত্রক অমিল (বা সমিল) মুক্তক এই যুগে অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন।

মুক্তক রচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, যদি ভাবমুক্তিই মুক্তকের প্রধান লক্ষ্য থাকে— তবে পংক্তিশেষে মিল দেবার বাধ্যবাধকতা না থাকলেই কবি আরও স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহু সময়ে ভাবের প্রবহমানতার প্রতি কিছুটা উপেক্ষা দেখিয়ে পংক্তি-মিলের অনুরোধে মুক্তকে কৃত্রিমভাবে পংক্তি-বিন্যাস করতে হয়েছে। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত — তিন রীতিতেই মিলের অনুরোধে পংক্তিবিন্যাসের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।— এটি মুক্তকের আদর্শ-বিরোধী।

দূরাস্থিত মিল দিয়ে, মাঝে মাঝে অমিল পংক্তিবিন্যাসে কবি এ যুগে কিছু কবিতা লিখেছেন। ‘সেঁজুতি’র ‘যাবার মুখে’ বা ‘সানাই’-এর ‘উদবৃত্ত’ এই শ্রেণীর কবিতা। পরবর্তী একাধিক কবি এ রীতি গ্রহণ করেছেন। এটি বোধহয় মিলের একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তিলাভের

প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পরে রবীন্দ্রনাথ এ যুগে মিশ্রবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তক মিশ্রবৃত্ত রীতির লিখেছেন। এ প্রচেষ্টা প্রথম ১২৮৭-তে ‘নিষ্ফল কামনা’ কবিতায় অমিল মুক্তক করেছিলেন। এ যুগে এই শ্রেণীর প্রথম কবিতা ‘অগোচর’ (পরিশেষ — ১৩৩৯)।

এ যুগে কয়েকটি কবিতায় কবি এক কবিতার বিভিন্ন স্তবক বিভিন্ন ছন্দ-প্রকৃতি বা একই কবিতায় ছন্দের আকৃতিতে লিখেছেন। ‘আশা’, ‘ঝড়’, ‘আকন্দ’, ‘চিঠি’,— একাধিক পূর্ববীর এই কবিতা চতুষ্টয়ের নাম করা যেতে পারে। বৈচিত্র্যলোভী হৃদয়রীতির ব্যবহার নবীন কোনও কোনও কবি এ রীতিও অনুসরণ করেছেন।

শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি এবং ছড়া — এই যুগের চারটি শিশুপাঠ্য শিশুপাঠ্য কবিতার কাব্যগ্রন্থে কবি অতিপর্ব ও রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং মিলের ফুলঝুরি ছন্দবৈচিত্র্য এনে, লঘুতর যতিভঙ্গের পদক্ষেপে ছড়া জাতীয় কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুলের সমধর্মী বলা যেতে পারে।

এ যুগের বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন হল গদ্যকবিতার ছন্দ। বাংলা ছন্দে ভাবপ্রবহমানতার ক্রম-মুক্তির ধারায় গদ্যকবিতার ছন্দকে গদ্য কবিতার সর্বশেষ স্তর বলা চলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু ছন্দ সমালোচকই বিভিন্ন সময়ে এ ছন্দের মূল রহস্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।— ‘অতিনিরূপিত’ মাত্রা গণনার সুনির্দিষ্ট হিসাবে যে এ ছন্দের নিয়ম বাঁধা চলে না সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ছন্দের সুনির্দিষ্ট মাত্রার হিসাব না মিললেও কিছুটা আভাস, কিছুটা গতি ও যতির স্পন্দমানতা যে গদ্য কবিতার শব্দ-বিন্যাসে রক্ষিত হয় সেকথা বোঝাতে গিয়েই ছান্দসিক একে ‘ছন্দগন্ধি গদ্য’ (rhythmic prose) বলেছেন। গদ্যকবিতারও পদ্যের মতোই একটি গতিবেগ রয়েছে, প্রত্যাশিত বাকপর্বের বিন্যাসে যতি রয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ করেছিলেন।

ছন্দবোধ মূলত কিসের উপর নির্ভরশীল,— এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আই. এ. রিচার্ডস বলেছেন, Rhythm depends upon repetition and expectancy (Principles of Literary Criticism. P. 134) — এখানে গদ্যকবিতার ছন্দে সেই আবর্তন (repetition) এবং প্রত্যাশাবোধ (expectancy) কোথায় কি ভাবে কাজ করছে সেটি লক্ষণীয়। রিচার্ডস তার Principles of Literary Criticism গ্রন্থে Rhythm and Metre — নামক প্রবন্ধটিতে যে আলোচনা করেছেন (উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দৃষ্টব্য) তাতে গদ্য কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। গদ্য

গদ্য কবিতার কবিতায়, (১) শব্দধ্বনির গতি ও যতির আবর্তনজনিত প্রত্যাশাবোধের ছন্দবৈশিষ্ট্য তৃপ্তি রয়েছে, (২) ভাবের প্রত্যাশিত স্পন্দমানতা রয়েছে, (৩) বাকপর্বের প্রত্যাশিত বিন্যাস রয়েছে।— এগুলির সমন্বয়ে গদ্যকবিতার রূপাদর্শ গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলায় অনুরূপ গদ্যকবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় সে কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা এবং ইংরেজি শব্দ উচ্চারণে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি শব্দে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দলবিন্যাস সুনির্দিষ্ট। বাংলা শব্দে ভাবগত গুরুত্ব আনতে হলে অনেক সময় জোর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ চলে না।— শব্দগুচ্ছকে বাংলা গদ্যকবিতায়ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে ভাবগত স্বাধীনতা এখানে ‘অতিনিরূপিত’ মাত্রাগণনার ছন্দ থেকে অনেক বেশী। শব্দগুচ্ছকে ভাবানুযায়ী পদভাগে সাজাতে গিয়ে পাঠকমনের তৃপ্তিবোধ সম্পর্কে কবিকে অবহিত থাকতে হয়। সুখকর তৃপ্তিবোধ ভাব এবং ধ্বনিস্পন্দনের মাধ্যমে জাগে, গদ্যকবিতার বাক্যপর্ব রচনায় এ সম্পর্কে কবিকে সচেতন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিপিকার গদ্যকবিতা লিখবার সময় ভাবগুচ্ছ অনুযায়ী পংক্তিবিন্যাস করেননি। পরে পুনশ্চের গদ্য-কবিতাগুলি রচনার সময়ে মুক্তকের মতোই ভাবানুযায়ী ছোট-বড়ো পংক্তি-বিন্যাস, বাক্যপর্বগুলিকে সাজিয়েছেন মধুসূদন ভাবকে পদ্যের পংক্তির সীমা পেরিয়ে চলবার ক্ষতি দিয়েছিলেন,— মুক্তক ছন্দে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পয়ার পংক্তির দৈর্ঘ্যসীমা ভেঙে ভাবানুযায়ী ছোট-বড়ো করেছেন। অতিনিরূপিত ছন্দের পদক্ষেপ এখানে ক্রমাগত ভাবের অনুগামী হতে বাধ্য হচ্ছিল। গদ্য কবিতার ছন্দে এসে ভাব আরও মুক্ত হতে পারল, ছন্দের অতিনিরূপিত মাত্রা বিভাগের বোঝা এবারে হালকা হল,— যতি ও ধ্বনিস্পন্দনের ভাবনিয়ন্ত্রিত অনুভূতিকে সহায় করে এবারে সে আরও স্বচ্ছন্দে চলতে স্বাধীনতা পেল। গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের একটি উদাহরণ এখানে তোলতে যেতে পারে।—

আজ এই বাদলার দিন,

এ মেঘদূতের দিন নয়।

দিন অচলতায় বাঁধা

মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,

টিপ্টিপ্টি বৃষ্টি

অতিনিরূপিত মাত্রাগণনা শব্দ ছন্দবোধ জাগে এমনটি মনে করা
সরলতায় পয়ার পংক্তি-বিন্যাস আবর্তন যদি সে ভ্রমনার দূরস্থিত যতি বা মিলের
বিন্যাস ঘটে তাহলে পংক্তি পারেননা অনেক ছন্দ লক্ষিত হয়।— অপরপক্ষে
অতিনিরূপিত মাত্রা গদ্য হিসাবে রচিত নও যতি বা ধ্বনিস্পন্দনের আবর্তন যদি সরলভাবে
অঙ্কিত থাকে তাহলে ছন্দ আবর্তন ক মনে অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। গদ্যকবিতায় কবি
এই অনতিসীমিত যতি ও ধ্বনিস্পন্দ রক্ষা করেন; ভাবের মুক্তিসাধন করেও
এই সুখকর ধ্বনিস্পন্দ করেন,— তারই ফলে কবির এবং পাঠকের মনে
কবিতার ছন্দ

ঘোমটার মতো পড়ে আছে

দিনের মুখের উপর।

সময়ে যেন স্রোত নেই

চারিদিকে অব্যবহিত আকাশ

অচঞ্চল অবসর।

(পুনশ্চ বিচ্ছেদ)

গতি এবং যতির আবর্তন-জনিত একটি সুখকর অনুভূতি এখানে সহজ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে; ভাব এখানে প্রধান, ছন্দ তার অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কিছুটা তাঁর থেকে স্বকীয়তা রেখে নবীন কবিগোষ্ঠী গদ্যকবিতার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই মৌলিকতার আলোকে এবারে আলোচ্য যুগের অন্যান্য কবিদের ছন্দ-বৈচিত্র্য বিচার করা যেতে পারে।

।। গ

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-

করুণানিধান

বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) পদ্যরচনায়

প্রধানত রবীন্দ্র আদি ও মধ্যপর্বের ছন্দরীতিকেই অনুসরণ

করেছেন। তিনজন কবিই সমিল যতিপ্রাপ্তিক ছন্দোবন্ধ পছন্দ

করতেন। অতিপর্বিক দোলা, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং বিচিত্র যতিভাগে পূর্ব-পদ রচনা-রীতি তাঁদের ছন্দে রবীন্দ্র-(এবং আংশিকভাবে সত্যেন্দ্র-) প্রভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

করুণানিধানের ছন্দ সম্পর্কে বলা চলে,

(১) তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত ছন্দই বেশী পছন্দ করতেন, এখানেও ছয়মাত্রা পর্বভাগের ছন্দোবন্ধ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তুলনামূলক ভাবে মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কম ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্তে সমিল প্রবহমান পয়ার এবং শেক্সপীয়রীয় রীতির সনেট-কল্প কিছু লিখেছেন। এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিকতারই সাক্ষ্য মেলে।

(২) কলাবৃত্ত ছন্দে বাকধর্মী ভাষ্য ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। এ ছন্দ অনেকাংশে স্থিরমাত্রক, তবু কবি প্রয়োজনমতো মাত্রার সংকোচন ও প্রসারণ এনে উচ্চারণে নমনীয়তা দিয়েছেন। এখানে কবি গতানুগতিকতা কাটিয়ে উঠেছেন। কবির বাকধর্মী নমনীয় উচ্চারণভঙ্গির একটি উদাহরণ তুল্যি:—

‘টু’ দিতেছেন অটলচন্দ্র.

ভুল হয়েছেন ‘বুড়ী’

মহা হৈ চৈ, খেলা চলছে সে

লুকোচুরি—হুড়োমুড়ি।

চারু ভাবছেন মৌলিক আমোদ

এবার ‘নষ্টচন্দ্রে’,—

তিষ্টানো দায়, ‘বার্ডসাই’ এবং

সিগারেটটার গন্ধে।

রায়েদের বাড়ী চলছে বিচার

নৈশ এবং দৈন,

শিরীষটারে একঘরে কর,

গিরীষটা কি স্ত্রৈণ!

[ঝরাফুল: বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত: ত্রয়ী (১ম সং), পৃ. ৯৯]

এখানে ‘টু দিতেছেন’, ‘শিরীষটারে’, ‘গিরীষটা কি’ পর্ব-তিনটিকে অন্য ছয়মাত্রা পর্বগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছয়মাত্রাতেই প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করতে হচ্ছে। আবার ‘মৌলিক আমোদ’, ‘বার্ডসাই এবং’ পর্বদুটির উচ্চারণ সঙ্কুচিত করে ছয়মাত্রার আনতে হচ্ছে। এই প্রসারণ বা সংকোচনে বাকধর্মী উচ্চারণ আরও স্বাভাবিক হতে পেরেছে। অমিয় চক্রবর্তী এবং সাম্প্রতিক কালের আরও দু-একজন কবি এই রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

করুণানিধানের মতো কুমুদরঞ্জনেরও কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি কিছুটা বেশী কুমুদরঞ্জন মল্লিক পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে আরও কিছু কিছু মিল রয়েছে। দুজনেই লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ (কলাবৃত্তের পরেই) বেশী ব্যবহার করেছেন। সে কারণেই, মিশ্রবৃত্ত রীতি অবলম্বনে রঙ্গলাল, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক এবং গদ্যছন্দের পথে যে ছন্দমুক্তির প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এই উভয় কবিই সেই ধারার কিছুটা বাইরে পড়ে রয়েছেন।

কালিদাস রায় সেই তুলনায় আধুনিক ছন্দমুক্তি-ধারার সঙ্গে কিছুটা বেশী সম্পর্কান্বিত রয়েছেন বলা যায়। তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান কালিদাস রায় (সমিল) পয়ার, মহাপয়ার এবং দীর্ঘ বাইশমাত্রা পংক্তির ছন্দোবন্ধ রচনা করেছেন, তবে পংক্তি-দৈর্ঘ্য আঠার বা বিশ মাত্রা অতিক্রম করলেই দ্বিপদীর মর্যাদা হারিয়ে সেটি ত্রিপদীর বা চৌপদীর আকৃতি লাভ করে। তিনি মিশ্রবৃত্ত সমিল মুক্তকও রচনা করেছেন। তবে এ সকল ছন্দোবন্ধে কবির স্বকীয় কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

কালিদাস রায় কলাবৃত্ত রীতিতে কিছু রচনা-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের মতো চারমাত্রার পর্বভাগে তিনিও কয়েকটি (‘আহরণ’ কাব্যগ্রন্থের বঙ্গলক্ষ্মী, গোকুর গাড়ী, জবা প্রভৃতি কবিতা দ্র) চমৎকার কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্র ছন্দোবন্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ‘গানভঙ্গ’ (সোনার তরী) কবিতার আদর্শে ৭।৫।৭।২ I পর্বভাগে একটি কবিতা লিখেছেন। যেমন,—

এখন ফুলকপি । ঝাঁকায় ভরি ॥ বেসাতি করি আমি । তার ; I
সবাই কেনে তাই আদর করি তুরায় নেমে যায় ভার ।
আকাশে ফুল আজো তেমনি ফুটে আমার পানে চায় তারা ।
দীর্ঘশ্বাস বৃকে গুমরি উঠে, নয়নে বয় জলধারা ।

(আহরণ আকাশ কুসুম)

কবির পর্ববৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসাবে ৮।৫।২।৬ I পর্বভাগের ‘কাজরী’ কবিতাটিরও (দ্র আহরণ, পৃ ২১১) উল্লেখ করা যেতে পারে। কালিদাস রায় বৈষ্ণবপদের আদর্শে রচিত তার প্রখ্যাত ‘বৃন্দাবন অঙ্ককার’ কবিতায় (আহরণ ৬০-৬১ পৃ. রচনাকাল ১৯১০) তিন-দুই মাত্রাভাগের পঞ্চমাত্রক পর্বে মাঝে মাঝে তিনমাত্রার শব্দের প্রথমেই রুদ্রদল ব্যবহারে চমৎকারে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন,—

নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অঙ্ককার

চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার ।

জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,

ছুটে না কল কণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার ।

বৃন্দাবন অঙ্ককার ।

(আহরণ বৃন্দাবন অঙ্ককার)

এ প্রসঙ্গে কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১৮৪৯-১৯০৯) ১২৯৫ চৈত্র সংখ্যা ‘প্রচার’ পত্রে প্রকাশিত ‘শেষ’ কবিতাটির কথা পাঠকের মনে আসবে (দ্র পৃ ১০২) । অবশ্য সেখানে নবকৃষ্ণ যুক্তবর্ণ পরিহার করতে চেষ্টা করেছেন। কলাবৃত্ত রীতিতে তখনও যুক্তবর্ণের মাত্রা-নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট হয়নি। কবি কালিদাস রায় বৈষ্ণব গানের আদর্শে আরও কিছু গান লিখেছেন। এখানে আর একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে,—

ন মি	সি দ্ব বে গু ক র, হু দা ধা রা ধ র প দ্ব রে গু হ র ভৃঙ্গ,
ন মি	নন্দ যশোমতী মর্ম গৌরবে তুঙ্গ গিরিবর শৃঙ্গ ।
তু মি	গোষ্ঠ পালিকার কণ্ঠ মালিকায় শ্রেষ্ঠ নীলমণিরত্ন,
চির—	তীর্থ গোকুলের মর্ত প্রেমঘন দাস্যমধুভরা যত্ন ।

(আহরণ বৃন্দাবন)

(২) ৭।৭।৭।৩। — যতিভাগে প্রতি পর্বের প্রথমে যুক্তবর্ণের স্পন্দন এ-ছন্দের ধ্বনিমধুর্য বৃদ্ধি করেছে ।

বাংলা সাহিত্যে একাধারে ছান্দসিক এবং কবির সংখ্যা অল্প। কালিদাস রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (‘প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য’ দ্র.) ।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২)

আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি মোহিতলাল মজুমদার ছন্দের আকৃতি

মোহিতলাল সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ও সাবধানী কবি ছিলেন। সুসংবদ্ধ পদ-
মজুমদার পংক্তি-স্তবক বিন্যাসে, মিল-বৈচিত্র্যে তিনি দেশী-বিদেশী নানা

পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। প্রবহমান পয়ার, মুক্তক এবং গদ্য
কবিতার ছন্দে আকৃতি-ও প্রকৃতি-বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হয়ে ভাবগত স্বাধীনতা
বৃদ্ধি পাচ্ছিল,— মোহিতলাল সেই রীতির বিরোধী ছিলেন মনে হয়। সনেট
এবং অন্যান্য পদ্যের স্তবকবন্ধে তিনি আকৃতি-বন্ধের দৃঢ়তাই আনতে চেয়েছেন।
আধুনিক যুগের প্রধান সমস্ত ছন্দ-প্রকৃতিই তিনি বেশ স্বেচ্ছান্দের সঙ্গে ব্যবহার
করেছেন।

মোহিতলাল যে সাবধানী শব্দপ্রয়োগে কি চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করতেন,

রুদ্ধদল-বহল আরবী-পারশী রুদ্ধদল-বহল শব্দ ব্যবহারে ভাবগত পরিবেশ কত
বিন্দেী ছন্দস্পন্দ সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে জানতেন, কলাবৃত্ত রীতির একটি কবিতা
থেকে তার নিদর্শন তোলা যেতে পারে।— কবিতাটির স্তবক-বিন্যাস

ও পংক্তি-মিলও লক্ষণীয়।

গুলজার বাগে ফুল বিলকুল

পংক্তিমিল

নাশপাতি

—

গালে গাল দিয়ে লালে লাল হল

বোস্তানে।

ক

ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের

আবছায়া,

—

সরাইখানায় মেতেছে মাতাল

খোসগানে !

ক

সে কোন সরাবে করিলি বেহৌশ

মস্তানা —

—

নার্গিসাক্ষি! কি কথা আমার

কোস্ কানে

ক

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালার ভর সাকী!

খ

হরদম দাও।— আজ বাদে কাল ভরসা কি?...
(সুনির্বাচিত কবিতা গজলগান)

খ

কবি কলাবৃত্ত রীতির চতুষ্কল পর্বে সত্যেন্দ্রনাথের মতোই অনুপ্রাসমিলে ও রত্নদল ব্যবহারে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন,—

গুণগুলে মশগুল বিলকুল ভরভর
কার ছায়া জ্যোৎস্নায়? সুন্দর সুন্দর!

দিল-দিল মঞ্জিল ভাঙ্গা ঘর সরায়ের—
করে তুলি রঙ্গিল, আয় ভাই মুসাফের।

(স্বপ্নমপসারী দিলদার)

স্তবক মিলের সপ্তকল-পার্বিক কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা আর একটি

উদাহরণ স্তবকবন্ধের পংক্তিমিল লক্ষণীয়।—

সেখানে যত আছে কবি ও গীতিকার	ক
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর,	ক
মানব কলভাষে বেদনা মধুময়	খ
উথলি তোলে যারা মরণে করি জয় ;	খ
চয়ন করে যারা নিজেরা নিশি জাগি,	গ
স্বপন ফুল শোভা নিম্নলি আঁখি লাগি—	গ
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালোলাগে	ঘ
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার।	ক

(সুনির্বাচিত কবিতা নমস্কার)

এই আট পংক্তির স্তবকে প্রথম ছয় পংক্তিতে দ্বিপংক্তিক মিল আছে। সপ্তম পংক্তি মিলহীন। অষ্টম পংক্তিটি কবিতার পরবর্তী প্রত্যেক স্তবকের অষ্টম পংক্তির সঙ্গে মিলবদ্ধ।

ফার্সি রুবাই এর কবি ফার্সি রুবাই এর আদর্শে চতুষ্পংক্তিক (ককখক) মিলের মিলবদ্ধ স্তবক রচনা করেছেন :

সুরায় আমার আয়ুরে ফুরাই—দুঃখিও না মোরে তাই,	ক
করি ও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই!	ক
শাদা চোখে বসি যাদের সমাজে তারা সে সবাই পর,	খ
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে—বন্ধুরে মোর পাই।	ক

(হেমন্ত গোধূলি ফার্সি ফরাস)

পংক্তিমিল একেবারেই তুলে দিয়ে মোহিতলাল কলাবৃত্ত রীতির স্তবক রচনা করেছেন। যেমন,—

ফুলেরা ঘুমায়, সাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম ঢালা ;
কলাবৃত্ত রীতির প্রাসাদ কাননে তরুবীথি পরে' দুলিছে না ঝাউগুলি;
মিলবিহীন পদ্য নীল কাচে ঘেরা সোনার শফরী জনতলে গতি হারা;
জোনাকীরা জাগে; মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরী।

(হেমন্ত গোধূলি নিশীথ রাতে)

বোদালেয়ারের আদর্শে এটি টেনিসনের The Princess কবিতার অনুবাদ। মূল কবিতায়ও রচিত বিনুনি পংক্তিমিল দেওয়া হয়নি। হেমন্ত গোখলির আর একটি মিলের উদাহরণ কবিতায় বোদালেয়ারের অনুকরণে কবি বিভিন্ন স্তবকে বিনুনি মিল (Interlace-rhyme) কি ভাবে এনেছেন দেখা যেতে পারে।—

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,	মিল ক
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়—যেন সে ধূপের ধূম!	খ
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে; শীতের মূর্ছনায়—	ক
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ — চরণে জড়ায় ঘুম।	খ
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়— যেন সে ধূপের ধূম!	খ
বেহালার সুর শুনতেছি কোন প্রেতের আর্তনাদ!	গ
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ— চরণে জড়ায় ঘুম,	খ
অস্ত গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ!	গ
বেহালার সুরে শুনতেছি কোন প্রেতের আর্তনাদ—	গ
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায়!	ক
অস্ত গগন মৃত্যু সদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ,	গ
রক্ত সাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি হয়!	ক

(হেমন্ত গোখলি সন্ধ্যার সুর)

এই দ্বাদশ পংক্তিতে (চতুঃপংক্তিক তিনটি স্তবকে) কবি যথাক্রমে ২য় এবং ৫ম, ৪র্থ এবং ৭ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম, ৮ম এবং ১১শ পংক্তি অভিন্ন রেখেছেন।— এইভাবেই পর পর পংক্তিবিন্যাসের ক্রম ঠিক রেখেছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে কবি স্তবক রচনার বৈচিত্র্য আরও বেশী দেখিয়েছেন। প্রথম চৌধুরীর মতো Terza Rima-র বিনুনি মিল দিয়েছেন। স্পেনসেরীয় স্তবক রচনা করেছেন; কীটস, সুইনবার্ণের কবিতার স্তবকাদর্শে বাংলা স্তবক রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্তবক রচনাদর্শ সামনে রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব মিলেও সার্থক স্তবক রচনা করেছেন। এখানে কয়েকটি বিদেশী আদর্শ-প্রভাবিত উদাহরণ তুলছি।

(১) তের্জারিমা— (কথক, খগখ, গগগ.....)

তের্জারিমা	ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—	মিল ক
স্তবকবন্ধ	তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছূ? ভাবিয়া না পাই,	খ
	জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়—	ক
	ভাল যে বাসেনি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই	খ
	কৈশোরের আদি হতে যত কথা মনে পড়ে আজ—	গ
	দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই	খ
	ভরিবারে চুপি চুপি এই মোর দুই মুঠি মাঝ	গ
	তাহারি অশেষ স্নেহ, প্রীতি, প্রেম— অমূল্য রতন!	ঘ
	আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ।	গ

(স্মল গরল শেষ ভিক্ষা)

(২) স্পেনসেরীয় স্তবক (বৈশিষ্ট্য নবম পংক্তি দীর্ঘ, মিল-কথকথখগখগগ)

		মিল
স্পেনসেরীয়	তোমার চরিত, নারী, কতজনে কত যে বাখানে—	ক
স্তবকবন্ধ	অযুতাস্ক নটকের এক নটী— তুমি নিপুণিকা!	খ
	কত নিন্দা, কত স্তুতি! স্বপনের সীমান্ত সন্ধান	ক
	ছুটিয়াছে পিছে পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা	খ
	কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা	খ
	চির-শান্তি মানবের — তনু তব নরকের দ্বার!	গ
	‘শয়তানের মোহমন্ত্র’, তুমি তার সহজ সাধিকা—	খ
	আদি মাতা ‘ইভ’ সেই শিখাইল সহচরে তার	গ
	রসাল ফলের স্নাদ, হ’ল যাহে চিরতরে স্বর্গ বহিষ্কার।	গ
	(স্মরণরল নারী স্তোত্র)	

(৩) কীটসের স্তবক অনুসরণে :

		মিল
কীটস্-এর	সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারিনা ভুলিতে—	ক
স্তবকাদর্শ	প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল!	খ
	যৌবন বসন্ত শেষে ফাগুনের সে ফুল ভুলিতে	ক
	হেরি সবই রঙ ছুট,— প্রেমেরও যে মিনতি বিফল!	খ
	তবু জানি মধু মাসে এই দেহ মাধবী বল্লরী—	গ
	মুঞ্জুরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে;	ঘ
	শেষে রচি ঝরা ফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ	ঙ
	বন্দাবন চির পরিহরি	গ
	গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদপরশে	ঘ
	কালিন্দীর কূল ছাড়ি রাধিকার চলে না চরণ!	ঙ

(স্মরণরল প্রেম ও জীবন)°

৩। কীটসের প্রখ্যাত Ode to a Nightingale- এর স্তবকবন্ধ অনুসরণে লিখেছেন—

Fade far away, dissolve, and quite forget	a
What thou among the leaves has never known.	b
The weariness, the fever, and the fret	a
Here, where men sit and here each-other groan	b
Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs.	c
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies	d
Where but to think is to be full of sorrow	e
And leaden-eyed despairs.	c
Where beauty cannot keep her lustrous eyes.	d
Or new Love pine at them beyond tomorrow	e

অনুরূপ সুইনবার্গের Ave Atque Vale কবিতার স্তবকের (কখখকগঘঙচচঙচ) অনুসরণে হেমন্ত গোধূলির ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী’ কবিতার স্তবক রচনা করেছেন।— এই স্তবকে সর্বশেষ একাদশ পংক্তিটি অন্যান্য পংক্তিগুলির তুলনায় ছোট।

মোহিতলাল ফরাসী ‘Ballade a Double Refrain’ নামক ছন্দোবন্ধে লৌকিক ফরাসী ‘Ballade a Double Refrain’ দলবৃত্ত রীতির একটি গীতিকবিতা লিখেছেন। এই ছন্দোবন্ধে আটশটি পংক্তিতে (৮+৮+৮+৮ পংক্তিভাগে) চারটি স্তবক বিন্যস্ত হয় মিল মাত্র তিনটি। প্রথম তিনটি স্তবক একই মিলবিন্যাসে রচিত। শেষ চারপংক্তিতে দ্বিপংক্তিক মিল থাকে। যেমন,—

মিল

- (৪) গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা ক
কিন্মা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধুলো-বালি, খ
নীতের ঠেলায় ঘরে যখন শার্সি কপাট আটা, ক
তখন যেমে হাপিয়ে কেসে গদ্য লেখো খালি। খ
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি, খ
ঝুমকো লতা দুলছে দেখি, বারান্দাটির পাশে, গ
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ ফুল্লফুলের ডালি— খ
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছাসে। গ
- মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাটা। ক
বুদ্ধি তো নয় — যেন সমান চারকোণা এক টালি; খ
মনটা তখন দড়ির মতন ছুঁচলো করে ছাঁটা,— ক
তখন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি। খ
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন চতুরালি খ
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে, গ
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী— খ
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছাসে। গ
- চাই যেখানে ভারিক্কে চাল— বিদ্যে বহু ঝাঁটা, ক
‘হতেই হবে’, ‘কখনো নয়’— তর্ক এবং গালি, খ
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় ‘কিন্তু’ ‘যদি’র কাঁটা,— ক
তখন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি। খ
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল কালি, খ
মিলন লগন ঘনিয়ে আসে কনক চাঁপার বাসে, গ
যে কথা কেউ জানবে নাকো, সেই কথা কয় আলি,— খ
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছাসে। গ

সংসারে যে অনেক অভাব অনেক জোড়া তালি!— খ
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি; খ
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে, গ
তখন, ওহো!— পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে। গ

(সুনির্বাচিত কবিতা গদ্য ও পদ্য)

এটি Austin Dobson এর কবিতার অনুবাদ। ভাবানুযায়ী মিলবিন্যাসের একটি সার্থক নিদর্শন।

সনেট লেখক হিসাবে বাংলা কাব্যে মোহিতলাল বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারেন। সম্ভবত আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁকে সার্থক সনেট রচনার প্রেরণা দিয়েছে। তিনি মোট ৮৫টি সনেট লিখেছেন। খাঁটি পেত্রাকীয় আদর্শেরই অনুরাগী ছিলেন, শেকস্পীয়রীয় রীতির সনেটও লিখেছেন। — শেকস্পীয়রীয় বা আধুনিক মিলের সনেটকে তিনি ‘মুক্তবন্ধ’ নাম দিয়েছেন। ইংরেজি সনেটে পেত্রাকীয় আদর্শ ছাড়া যে নতুন প্রকৃতিধর্ম শেকস্পীয়র বা অন্য কবিরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অপর বাঙ্গালী সনেটকারদের মতো মোহিতলালও কিছুটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ; তবে couplet বা দ্বিপংক্তিক মিলের সনেট তিনি সনেটাদর্শ-বিরোধী বলে মনে করতেন।— এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীগুলিকে উৎকৃষ্ট কবিতা বলে স্বীকার করলেও আদর্শ সনেট বলতে চাননি। এখানে তার পেত্রাকীয় ও শেকস্পীয়রীয় আদর্শের দুটি সনেট উদ্ধৃত করছি!—

পেত্রাকীয় সনেট

মিল

	একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর পর,	ক
পেত্রাকীয়	মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে,—	খ
রূপাদর্শ	শাল্মলীর বক্তৃভাষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,	খ
	হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব কেশর!	ক
	নরত্ত্ব দুর্লভ জানি, সুদুর্লভ কবি কলেবর—	ক
	সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু সৈকত-সমীরে,	খ
	পাই যদি প্রীতিমুক্তা আবগাহি লবনাসু-নীরে,	খ
	বাণীর উদাস দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।	ক

	চলেছিনু ক্লাস্ত পদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,	গ
	সম্মুখে পড়িল ছায়া,— বনপথে এ কোন পথিক	ঘ
	গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!	ঙ
	জিজ্ঞাসিনু কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে	গ
	বাহুপাশে দিল ধরা। — সে মাধুরী মর্তের অধিক!	ঘ
	অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রাশুভ, আমি পুণ্যবান।	ঙ

(ছন্দ চতুর্দশী তীর্থ পথিক)

শেক্সপীয়রীয় সনেট	মিল
সায়াহে কুটির তলে বসে একাকিনী	ক
শেক্সপীয়রীয়	খ
রূপাদর্শ	ক
কেহ কি গাহেনা গীত — অতীত কাহিনী—	খ
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে?	গ
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,	ঘ
বেদনা সুরভি! দিন শেষে সন্ধ্যা যথা,	গ
ভোগ শেষে উপভোগ,— হৃদি ভরপুর	ঘ
রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা!	ঙ
তবু স্মৃতি স্পন্দ আনে ভরিয়া নয়ন,	চ
সেই সুরে বেজে ওঠে মনের মুরলী,	ঙ
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন	চ
সেদিনের ফোটা ফুল— অশ্রু মুক্তাবলী।	ছ
মনে হয় বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী,—	ছ
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাশরি!	

(ছন্দচতুর্দশী স্মরণ)

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের মতো মোহিতলালও sonnet-sequence বা সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। দ্রৌপদী, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রূপার্টব্রুক, কবিধাত্রী, এক আশা প্রভৃতি সনেট এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ‘রূপার্টব্রুক’ ছয়টি সনেটে গ্রথিত কবিতা। মোটামুটি বলা যেতে পারে, পেত্রার্কীয় আদর্শে “অতি পিনদ্ধ নিচোলাবরণে একটি বিশেষ শ্রী ও সৌষ্ঠব” ফুটিয়ে তোলাই মোহিতলালের সনেট রচনার লক্ষ্য ছিল। সে সাধনায় অনেকাংশে তিনি সিদ্ধ হতে পেরেছেন। ভাবের গাভীর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই সনেটে তিনি মহাপয়ার পংক্তিবন্ধ ব্যবহার করেছেন।

||ঙ||

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪) মোহিতলালের মতো ছন্দ-সচেতন না
 যতীন্দ্রনাথ হলেও ভাবের যথায়থ প্রকাশনায় ছন্দকে সার্থকভাবে ব্যবহার
 সেনগুপ্ত করেছেন। তিনি কলাবৃত্ত রীতিই বেশী ব্যবহার করেছেন। এই রীতির
 চতুষ্কল পর্বভাগে তাঁর অভিনবত্ব লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্ত রীতির মূলক এবং গদ্য কবিতাও
 তিনি অল্পসল্প লিখেছেন। লৌকিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দে
 কলাবৃত্ত চর্চুমাত্র অভিনবত্ব না থাকলেও নির্ভুল সার্থক ব্যবহারের নিদর্শন দিয়েছেন।
 পর্বের উদাহরণ এখানে কলাবৃত্ত চতুষ্কল পর্বভাগের কয়েকটি বৈচিত্র্য-নিদর্শন
 তুলছি।

- (১) বৈশাখে চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল।
দু'পরে দারুণ রোদে
মাদুরে নয়ন মোদে—
কবি সনে কবি-প্রিয়া প্রেমে মশগুল!
আমি কি করি?
যা তা উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ত্রুটি
'বাই সাইকেলে' উঠি
সাড়ে দশ ক্রোশ ছুটি; এই চাকরি!

(অনুপূর্বা পথের চাকরি)

এখানে স্তবকের পংক্তি-মিল ও পংক্তির মাত্রাবিন্যাস-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। পংক্তিগুলির পর্বগত ধ্বনি-অনুপ্রাসের মাধ্যমেও কবিতাটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

- (২) গুড়ু গুম — ঘচো, ঘচ ঘচ ঘচো,
ওখানে কি কোচো? বাঁধা পথে গচ্ছ।
ঘচাঘচ ঘতোর লোহাবাঁধা পথ তোর,
কি সাত কি সোতোর; মাঝে মাঝে— দোতোর—
প্রলাপ সে মত্তর। উচুনীচু গর্তর
পথ নয় পথ তোর।
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর।

(অনুপূর্বা রেলঘুম)

পুল পার হবার মুখে রেলগাড়ী যে শব্দ করে, ঘুমের আমেজ নিয়ে কবি এখানে সেই শব্দধ্বনি প্রকাশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ যে সাবধানী শব্দশিল্পী ছিলেন এখানে তার সার্থক প্রমাণ মিলছে। সমস্ত কবিতাটিই সেইরূপ শব্দের ধ্বনিসম্পদে সমৃদ্ধ।

- (৩) এল গেল বসন্তে কত না আগন্তুক,
জ্বলে গেল চূতকলি ঝরে গেল কিংগুক,
রাঙা পায়ে চলে গেল,
অশোক কি বলে গেল!
চম্পা গো চম্পা গো, জা— গো— !

(অনুপূর্বা পারুলের আহ্বান)

প্রত্যেক স্তবকেই শেষ পংক্তিটি অভিন্ন। এখানে ঘুম থেকে জাগাবার মিষ্টি আহ্বানকে জা—গো—দীর্ঘ উচ্চারণে চার কলামাত্রার প্রসারণে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

(৪) তিন আনা চৌকা,—
 ভুখা পেলে খেটে খা,
 দলে দলে লেগে যা,
 কে বলে কঠিন মাটি? না পোষায় ভেগে যা।
 ঘরে বসে মড়কে
 চলেছিলি নরকে,
 না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে।
 খাট তবে খাটরে
 ডোঙা পেট কোঙা ক'রে গোঙা মাটি কাটরে!

(অনুপূর্বা ফেমিন রিলিফ)

চার মাত্রার পর্বযতি ছাড়াও আট ও সাত মাত্রার পদযতি এবং পদ-পংক্তির মিল এ কবিতাংশে লক্ষণীয়।

চার মাত্রার পর্বযতি লুপ্ত করে আট + ছয় মাত্রাভাগে পয়ার পংক্তি কলাবৃত্ত ছন্দে কবি বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করেছেন। একটি দ্বিমাত্রিক মিলের অনুরূপ ‘চতুর্দশপদী’ কবিতার চারটি পংক্তি এখানে তুলছি,—

(৫) কে জানে কি আছে দুটি জরা ভরা দেহে,
 জুড়ায় একের দাহ অপরের স্নেহে।
 এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
 এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই। (অনুপূর্বা হেন প্রীতি)

কলাবৃত্ত (৮||৬) পয়ারবন্ধ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বেশী রচনা করেননি।^৪

পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব বিন্যাসও যতীন্দ্রনাথের কবিতায় লক্ষ করা যায়। যথাক্রমে এক একটি উদাহরণ তুলছি।—

পাঁচমাত্রা পর্বের
 উদাহরণ
 শুনিয়াছিনু — উদিবে তুমি তিমির নিশি-শৈশ্বে,
 সূর্যসম সুদূরচলে নবীন কোন প্রাতে।
 অকস্মাৎ না চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে
 শ্রাবণ ঢাকা অন্ধকার চতুর্দশী রাতে।
 আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো—

খোলো গো দ্বার খোলো,
 আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হলো। (অনুপূর্বা মুক্তি)^৫

৪। চতুর্মাত্রক পর্বভাগে কবির ‘গঙ্গাস্নান’ ‘শাওনের রক্তি’ ‘দুঃখের পার’ ‘বরনারী’ ‘নওজোয়ার’ প্রভৃতি কবিতাগুলি কলাবৃত্ত প্রকৃতিতে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধে সার্থকভাবে লিখিত হয়েছে

৫ এই প্রসঙ্গ কবির ‘অনুপূর্বা’ কাব্যগ্রন্থে
 কবিতাটির
 পঞ্চমাত্রক পর্বভাগের কলাবৃত্ত উল্লেখ রয়েছে কবি
 কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘মদনভাস্কর পূর্ণ’ উপাখ্যের অঙ্গশ্রেণী

স্তবকটির পংক্তিবিন্যাস ও মিল লক্ষণীয়।

ছয়মাত্রা পর্বের
উদাহরণ

জ্যৈষ্ঠ দু'পরে গলদঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কতনা ঝঞ্ঝা মুসলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে
ধরণীগর্ভে ধন;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে
ধূলা-কাদা আতর
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ধুচে নাই,—
ভাঙা করুণা কোয়েল তাদের শ্রদ্ধা করে
মানুষেরি ভাই।

(অনুপূর্বা মানুষ)

প্রত্যেক পংক্তিতে ডাডা৫৥ডাঙ I— পর্ব-পদভাগ এবং পদের ও পংক্তির মিলবিন্যাস কবিতাটিতে চমৎকার ধ্বনি-মাধুর্য এনে দিয়েছে। প্রতি স্তবকের সর্বশেষ পংক্তিতে একই ধরনের শব্দবিন্যাসের দ্বারা সেখানেও কবি একটি ভাবগত পূর্ণতা দিয়েছেন।

সাতমাত্রা পর্বের
উদাহরণ

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো ফিরাতে মধুমাস?
নাই যে ধূপছায়া
নাই যে মেঘমায়া
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
উসর ও-কপোলে বিফল জলাধার।

(অনুপূর্বা চোখের জল)

এখানে দ্বিপদী ও চৌপদী পংক্তি মিলিয়ে চতুষ্পংক্তিক স্তবক রচিত হয়েছে। কলাবৃত্তের এই সকল পর্ববিন্যাসে যতীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন বলা যেতে পারে। কলাবৃত্তের তুলনায় যতীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্ত কম ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে।—

মিশ্রবৃত্ত রীতির
মুক্তক

এসেছে ফাল্গুন;—
মৌমাছি করিছে গুন্ গুন্,
নানান মরসুমী ফুল শখের বাগানে
'পপিফ্লকস হরলিকস' 'জিনিয়া ডালিয়া'
স্বপ্ননার সোহাগ-পরশে
রঙিন শৌখিন অঙ্গ দিয়াছে ঢালিয়া,

টুনটুনিয়া মত্ত মধুপানে
 ‘দূলে দূলে’ নিতান্ত অজানা ‘ফূলে ফূলে’

(অনুপূর্ণা আমার বসন্ত)

এখানে মিল-অমিলের শিথিল বিন্যাসে পংক্তি রচিত হয়েছে। অযুক্তবর্ণে লেখা শব্দ-মধ্য-রুদ্ধদল সংবদ্ধ এককলা হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। তার ফলে মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। ‘পপিফ্লুক্স-হরলিক্স’, ‘জিনিয়া ডালিয়া’, ‘দূলে দূলে’, ‘ফূলে ফূলে’ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রচ্ছন্ন অন্তর্মিলও লক্ষণীয়।

গদ্য কবিতার ছন্দ ব্যবহারে যতীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। ভাবময় বাকপর্বক
 গদ্য কবিতায় ছন্দযতি-বিভাগে রচিত গদ্য কবিতার মাঝে কলাবৃত্ত অথবা দলবৃত্ত
 পদ্য-পংক্তির রীতির পংক্তি বিন্যাসের দ্বারা মাঝে মাঝে পাঠক মনে অপ্রত্যাশিত
 মিশ্রণ সুখকর অনুভূতি (sense of happy variation) এনে দিয়েছেন।
 যেমন,—

আমি ফুল দিইনি বন্ধু,
 আমার পথে ফুলের দোকান পড়েন।
 আমি বলতে এসেছিলাম,—

হৃদয়বন্ধু, শোনগো বন্ধু মোর—।

কিন্তু তুমি তখন
 আমার কথার বাইরে চলে গেছ।
 তাই শুধু চোখের জল মুছে
 চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
 ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
 মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না
 শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
 আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে।

আর সাথে সাথে
 রিকসাওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ধুনা বাজছে—

কি বিচিত্র শোভা তোমার
 কি বিচিত্র সাজ!

(অনুপূর্ণা বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

আলোচ্য যুগে এবং পরবর্তী যুগে এই নতুন রীতির গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত কবিতা একাধিক কবি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গদ্য কবিতার ছন্দ থেকে এ কবিতার ছন্দস্পন্দ পাঠক মনে কিছুটা পৃথক আবেদন জাগায়।

যতীন্দ্রনাথ লৌকিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দও নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য কোনও মৌলিকতা সেখানে লক্ষিত হয় না।

॥ চ ॥

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭)

ছন্দের গুরুত্ব বিচারে এ-যুগে নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতিতেই বিচিত্র ছন্দোবন্ধ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতো শিশুপাঠ্য কবিতায় লঘুযতি এবং রুদ্ধদল-স্পন্দনের বৈচিত্র্য এনেছেন। তিনিও সংস্কৃত ও ফার্সী ছন্দে বাংলা পদ্য রচনা করেছেন।

কলাবৃত্ত রীতির ছন্দকে ছান্দসিকেরা বিল্লিষ্ট উচ্চারণের কোমল ছন্দরূপেই গণ্য করেন। কিন্তু উপযুক্ত কবির হাতে বীণা যে তরবারি হতে পারে, নজরুলের ষট্‌কলপর্বিক কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কবিতায় নজরুল অবস্থা-বিশেষে মুক্তদলের উচ্চারণ-প্রসারণ ঘটিয়েছেন। যেমন,—

আমি হোমশিখা, আমি । সান্নিক যম । দগ্নি, I
 আমি ‘যজ্ঞ’, আমি । পুরোহিত আমি । অগ্নি! I
 আমি ‘সৃষ্টি’, আমি । ‘ধবংস, আমি’ । লোকালয়, আমি । শ্মশান, I

আমি অবসান নিশা । বসান! I

মম এক হাতে বাঁকা । বাঁশের বাঁশরী । আর হাতে রণ।তুর্ষ। I

(অগ্নিবীণা বিদ্রোহী)

এখান ‘যজ্ঞ, আমি’, ‘সৃষ্টি, আমি’ এবং ‘ধবংস, আমি’ পর্ব তিনটিতে যথাক্রমে ‘যজ্ঞ’, ‘সৃষ্টি’, এবং ‘ধবংস’ শব্দ তিনটির উচ্চারণ-প্রসারণ লক্ষণীয়।^৬ অতিপর্বিক দোলা এবং ভাবযতি ও ছন্দযতির বৈচিত্র্য এ-কবিতাটিতে বিশিষ্ট গতিবেগ ও স্পন্দন এনে দিয়েছে।

আবার রবীন্দ্র-আদর্শে কলাবৃত্তে সবগুলি মুক্তদল এনে, সেই সঙ্গে প্রতি পর্বে শব্দের ও মাত্রার বিন্যাসক্রম এক রেখে উচ্চারণে কোমলতার পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

আদর গর-গর,
 বাদর দর-দর,
 এ তনু ভর ভর
 কাঁপিছে থর থর—

৬। বাংলা পদ্যে মুক্তদলের দ্বিকল গুরু উচ্চারণ কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরোধী, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য যেখানে যতি পড়ে সেখানে প্রয়োজনবোধে মুক্তদলের গুরু উচ্চারণ চলে। এখানে ‘যজ্ঞ’, ‘সৃষ্টি’ এবং ‘ধবংস’ তিনটি শব্দের পর ভাবযতি রয়েছে এবং পরবর্তী ‘আমি’ শব্দ অতিপর্বিক স্পন্দন সৃষ্টি করেছে,— সে কারণেই এখানে মুক্তদলের দ্বিকলামাত্রিক উচ্চারণ স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

নয়ন ঢল ঢল
সজল ছল ছল
কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝরঝর।

(ছায়াশট বাদল দিনে)

কবি এ কবিতাংশে প্রতিটি দল মুক্ত রেখেছেন এবং শব্দের মাত্রিক ক্রমবিন্যাস (৩+২+২) ঠিক রেখেছেন। অবশ্য এ-রীতি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছে সেটিও লক্ষণীয়।

এবারে আর একটি সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ-মুক্ত দল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলছি।—

অলক দুল্ দুল্
পলক ঢুল্ ঢুল্
নোলক্ চুম্ খায় মুখেই
সিঁদুর মুখ টুক
হিঙুল টুক টুক

দোলক ঘুম যায় বুকেই। (ছায়াশট প্রিয়ার রূপ)

সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের এমন ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন।

আরবী ‘মোতাকারিব’^৭ ছন্দের লেখা একটি কবিতা থেকে এখানে সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্।
বেগীর বাঁধ
আলগ্ ছাঁদ,
খোপার ফুল্
কানের দুল্
খোপার ফুল্
দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্।

(দোলন চাঁপা দোদুল্ দুল্)

৭। আরবী ‘মোতাকারিব’ ছন্দের ছয়টি প্রকার ভেদ আছে। এ দৃষ্টান্তটি, ‘ফউলুন । ফউলুন । ফউলুন । ফউলুন (প্রতি পর্বে উ দীর্ঘ উচ্চারিত) — এই রীতির ‘মোতাকারিব’ ছন্দাবল্লের আদর্শে রচিত হয়েছে। বাংলায় এই রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে কবি গোলাম মোস্তাফা লিখেছিলেন,—

আকাশ-তল । সুনির্মল, । মেঘের দল । কোথায় বল? ।

বিফল তোর । করুণ রব । ‘ফটিক জল’ । ‘ফটিক জল’ । ।

(প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ পৃ ৪৬-৫৭ দ্র)

মুক্তদলের আংশিক গুরু বিন্যাসে লিখিত কলাবৃত্তের আর একটি উদাহরণ তুলছি।—

॥ ॥
আল সে

॥ ॥
নয় সে
রোজ তাই

ওঠে রোজ

। । ॥
স কা লে

চাঁদা ভাই

টিপ দেয়

। । ॥
ক পা লে

॥ ॥
উঠ ল

॥ ॥
ছুট ল

ঐ খোকা খুকী সব,

। । ॥
উ ঠে ছে

। । ॥
আ গে কে

ঐ শোনো কলরব।

(সঞ্চিতা প্রভাতী)

কলাবৃত্তের
উচ্চারণ সঙ্কেচন

কলাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনির কলাসঙ্কেচনের অবকাশ অত্যন্ত কম।
নজরুলের কবিতায় কিন্তু এই ধরনের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার কিছু কিছু
রয়েছে। যেমন:—

- (১) আবুবকর উসমান উমর আলি হায়দর
দাঁড়ী এয়ে তরগীর, নাই ওরে নাই ডর।

(অগ্নিবীণা খেয়াপারের তরগী)

- (২) এ যে ইব্রাহীম আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন।
ওরে হত্যা নয় আজ ‘সত্য-গ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন।^৮

(অগ্নিবীণা কোরবানী)

নজরুল কলাবৃত্তের তুলনায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কম ব্যবহার করেছেন। তবে এ ছন্দ
মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান তাঁর পূর্ণায়ত্ত্ব ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। সমিল
পয়ার ও অমিল প্রবহমান পয়ার, এবং সমিল মুক্তক তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে
ব্যবহার করেছেন। এখানে অমিল প্রবহমান পয়ার এবং সমিল
মুক্তকের এক একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

৮। শব্দের উপরের দিকে ˆ চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি-সংকেচন বোঝানো হল।

(ক) যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দুহাতে
নয়ন ঢকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না? (নতুন চাঁদ শিশু)

(২) মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহঁশ!
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে

এ নিখিলে

জানিতে না আপনারে ছাড়া।

তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নিকো নাড়া!

বিপুল আরশি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,

তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইতো তীর।

(সিন্ধুহিল্লোল সিন্ধু)

লৌকিক দলবৃত্তে
সত্যেন্দ্রনাথের
প্রভাব

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে রুক্মদলের স্পন্দন-মাধুর্য সৃষ্টিতে
নজরুল অনেক ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।
যেমন,—

ঐ সর্ষে ফুলে লুটানো কার

হলুদ রাঙা উত্তরী।

উত্তরী বায় গো—

ঐ আকাশ গাঙে পাল তুলে যায়

নীল সে পরীর দূর তরী।।

(ছায়ানট নীলপরী)

স্পষ্টতই এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ‘লালপরী’ ও ‘নীলপরী’ কবিতা দুটি মনে পড়বে।
শিশুপাঠ্য কবিতায় কথ্য-সংলাপের আমেজ মিশিয়ে, ছড়ার মতোই কিছুটা শিথিল
ছন্দোবন্ধে লৌকিক দলবৃত্ত রীতির যে কবিতা লিখেছেন সেখানে শিথিল দলবিন্যাসের
সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন,—

কাঠবেড়ালি! | কাঠবেড়ালি! | পেয়ারা তুমি | খাও? |

গুড়-মুড়ি খাও? | দুধ ভাত খাও? | বাতাবি নেবু? | লাউ? |

বেড়াল-বাচ্ছা? | কুকুর ছানা? | তাও ? |

কাঠ বেড়ালি! | তুমি আমার | ছোড়দি হবে? | বৌদি হবে ? | হঁ |

রাঙা দিদি? | তবে একটা | পেয়ারা দাও না! | উঁ |

এ রাম! তুমি। ন্যাংটা পুঁটো? I
ফ্রকটা নেবে?। জামা দুটো? I
আর খেয়োনো। পেয়ারা তবে, I
বাতাবি নেবুও। ছাড়তে হবে! I
দাঁত দেখিয়ে। দিচ্ছ ছুটু?। অ—মা দেখে। যাও!— I
কাঠ বেড়ালি!। তুমি মর। তুমি কচু। খাও। I

(ঝিঙেফুল খুকী ও কাঠবেড়ালি)

এখানে মূল পর্বভাগ চতুর্দল-ছয়কলামাত্রক। ছয় কলামাত্রার উচ্চারণকাল ঠিক রেখে ছড়ার মতো পর্বে তিন, চার পাঁচ বা ছয় দল ব্যবহার করেছেন। শিশুমুখের সংলাপের স্বাভাবিকতা তাতে আরও চমৎকার ফুটে উঠেছে। শিথিল উচ্চারণের ছড়ার কথ্য সংলাপী ভঙ্গি ইতিপূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতায় এবং যাত্রার পালাগানে ব্যবহার করেছেন। এ-যুগেও একাধিক কবি এমন শিথিল দলবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়।

সাতদল-পর্বের প্রথম তিন দলের পর অতিপর্বিক যতিস্পন্দন দিয়ে নজরুল ছড়ার আদর্শে পদ্য রচনা করেছেন। যেমন,—

‘বাবাগো মাগো’ বলে
পাঁচিলের ফোকল গ’লে
চুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসল ধড়ে।
যাব ফের কান মলি ভাই
চুরিতে আর যদি যাই।* (ঝিঙেফুল লিচুচোর)

সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে নজরুলও বাংলা পদ্যে সংস্কৃত হ্রস্ব প্রয়োগ করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

৯। তুলনীয়া :

হাদেরে	কলমি লতা
এতকাল	ছিল কোথা॥
এতকাল	ছিলাম বনে।
বনেতে	বাগদি ম’ল,
আমারে	যেতে হল॥
তুমি নেও	কলসী কাঁকে,—
আমি নিই	বন্দু হাতে।
চলো যাই	রাজপথে।
ছেলের মা	গয়না গাঁথে,
ছেলেটি	তুড়ুক নাচে॥

(ছড়া সংগ্রহ ৩২ নং ছড়া : লোক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ)

www.amarboi.com

এখানে সত্যেন্দ্রনাথের তোটক (জাফরাণের ফুল পৃ ৭৯ দ্র) থেকে পার্থক্য রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে পর্বের যতিভাগ দিয়েছেন : ২।৪।৪।৪।২, আর এখানে নজরুল যতি ভাগ করেছেন : ২।৬।২।৬। সত্যেন্দ্রনাথ একদল-শব্দ (monosyllabic word) দিয়েছেন বেশী। নজরুল সে আদর্শ গ্রহণ করেননি। নজরুল এখানেও দল-বিন্যাসে ত্রুটি রেখেছেন। ‘রক্তাঙ্গর’ শব্দের ব্যবহারে তোটকের লঘুগুরু বিন্যাসপদ্ধতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

(৩) সিংহ বিক্রীড় ^{১২} — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
না চায় প্রাণ রণেহ্রাদ বিজয় গান, গগনময় মহোৎসব।

রবির রথ অরুণ খান কিরণপথ ডুবায় মেঘ মহার্ঘব ॥

(ছায়ানট পূবের হাওয়া)

(৪) অনঙ্গশেখর ^{১৩} — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
তাপস কঠিন উমার গালে চুমার পিয়াস জাগে,

বধূর বৃকে মধুর আশা কোলে কুমার মাগে! (ছায়ানট পূবের হাওয়া)

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

জীবনানন্দ অল্পকিছু গদ্য কবিতার ছন্দও ব্যবহার করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য

বিভিন্ন রীতির স্তবকবন্ধ ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। দীর্ঘ পংক্তি ব্যবহারে তিনি ছন্দের ধ্বনিগাষ্ঠীয় বাড়িয়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে ব্যালাড স্তবক, পাঁচ ও ছয় পংক্তির স্তবক (Quintette and Sextain), নয় পংক্তির স্পেনসেরীয় স্তবকবন্ধ, তেরজারিমা (Terza Rima) ত্রিপংক্তিক বন্ধের সনেট প্রভৃতি রচনায় কবির ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দু-একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে।—

— — — — — — — — — —
১২। যা কা রৈঃ ক বী চ্ছা নু রো ধা মি ব দ্বৈঃ প্র সি দ্বো বি শু দ্বো হ প র দ গু কঃ

— — — — — — — — — —
‘সিংহ বিক্রীড়’ না মা

(ছন্দোমঞ্জরী ২২৩ সূত্র)

কবির ইচ্ছানুসারে কেবলমাত্র য-কার (— — —) দ্বারা প্রতিপাদ রচিত হলে সিংহবিক্রীড় (দগুক) ছন্দ বলে।

— — — — — — — — — —
১৩। ল য় গু রু নি জে চ্ছ যা য দা নি বে শ্য তে

— — — — — — — — — —
ত দে ব দ গু কো ভ ব ‘ত্যা নঙ্গ শে খ রঃ’

(ছন্দোমঞ্জরী ২৩১ সূত্র)

স্বেচ্ছায় যে ছন্দে একটি লঘু ও একটি গুরু — এই ক্রমে অক্ষর সমাবেশ করা হয় তাকে অনঙ্গশেখর (দগুক) ছন্দ বলে।

(১) ব্যালাড স্তবক (ballad stanza : a b c b) :

ব্যালাড স্তবক সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি,
 বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে,
 ফিরে এসো সুরঞ্জনা
 নক্ষত্রের রূপালি আঙুন ভরা রাতে ;

(সাতটি তারার তিমির আকাশলীনা)

কবি এখানে মূলতঃকাস-যুক্ত পংক্তি বিন্যাসে ব্যালাড স্তবকের ‘কথগথ’ মিল দিয়েছেন।

(২) নয়পংক্তির স্পেনসেরীয় স্তবককল্প

স্পেনসেরীয় গানের সুরের মত বিকালের দিকে বাতাসে
 পৃথিবীর পথ ছেড়ে সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
 হৃদয় ভাসিয়া যায়,—সেখানে সে কারে ভালবাসে!—
 পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুজে
 অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজে
 উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতদিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
 নীড়ের মতন বৃকে একবার তার মুখ গুজে
 ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—বাথা পেয়ে গেছে ফেঁসে—
 তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁটে উঠেছিল হেসে।

(ধূসর পাণ্ডুলিপি অনেক আকাশ)

স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শে কবি এখানে কথকথগথগগ—পংক্তিমিল দিয়েছেন। স্পেনসেরীয় স্তবকে প্রথম আটপংক্তি আয়ান্তিক পঞ্চপর্বিক, নবম পংক্তিটি আয়ান্তিক ষটপর্বিক। জীবনানন্দ এখানে প্রথম সাত পংক্তি দ্বিপদী ৮||১০ I মাত্রাভাগে অষ্টম পংক্তিটি দ্বিপদী ৮||৮ I মাত্রাভাগে এবং নবম দীর্ঘতর পংক্তিটি ত্রিপদী ৮||৮||৬ I মাত্রাভাগে রচনা করেছেন। সুতরাং স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শই কবি গ্রহণ করেছেন বলা যেতে পারে।

(৩) তেজ্জরিমা (ত্রিপংক্তিক মিলবন্ধের) সনেট

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
 শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর
 শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
 কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূস্র ক্লান্ত দিক-হস্তিগণ
 প’ড়ে গেছে—প’ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু; আবার করিছে আরোহণ
 আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
 একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন,

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়—কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীল মিশে গেছে সেই সব হুন।

(দ্বন্দ্ব পাণ্ডুলিপি শকুন)

‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘পথ হাঁটা’ সনেটটিও অনুরূপ ছন্দোবন্ধে লিখিত।
কবি এখানে দীর্ঘ ছাব্বিশমাত্রার প্রবহমান পংক্তিবন্ধে কথক, খগখ, গঘগ, ঘঙঘ, ঙঙ—
মিলবিন্যাসে সনেট রচনা করেছেন। বাংলা পদ্যে তেজরিমা ছন্দোবদ্ধ প্রথম চৌধুরী ইতিপূর্বেই
আমদানী করেছেন, জীবনানন্দ তাকে এবারে সনেট রচনায় ব্যবহার করলেন।^{১১}

জীবনানন্দের ‘রূপসীবাংলা’ কাব্যগ্রন্থে ৫৭টি সনেট সংকলিত হয়েছে। সনেটগুলি
সনেট
পয়ার পংক্তি থেকে দীর্ঘতর পংক্তিবন্ধে রচিত। অষ্টক মিল পেত্রাকীয়
(কথকখ, কথকখ) রীতিতে দিয়েছেন, ষটক মিলে কিছু স্বাধীনতা
গ্রহণ করেছেন। অষ্টক-ষটক ভাবগত স্তবকবিভাগ সর্বত্র রক্ষা করেননি। দীর্ঘপংক্তির
ধ্বনিগাঙ্গীর্ষ সনেটের ভাব-গাঙ্গীর্ষের অনুসারী হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা
যেতে পারে।—

মিল

বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ ক
খুঁজিতে যাইনা আর অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে খ
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে খ
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ ক
জাম বট কাঠালের—হিজলের—অশথের করে আছে চূপ; ক
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে; খ
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে খ
এমনই হিজল বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ ক
দেখেছিল, বেহলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে— গ
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়— ঘ
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়, ঘ
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে গ
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় ঘ
বাংলার নদী মাঠ তাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। গ

(রূপসী বাংলা ১ম সং পৃ ১২)

১৪। ইংরেজ কবি শেলী তার প্রখ্যাত Ode to West Wind কবিতা অনুরূপ চতুর্দশ পংক্তিক
(কথক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ) পাঁচটি স্তবকবন্ধে রচনা করেছেন।

মুক্তকের
বাকধর্মী
গাভীর্ষ

জীবনানন্দ দীর্ঘ পংক্তি বিন্যাসে সমিল এবং মিলহীন মুক্তক ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ পদ-পংক্তি তার মুক্তকে একটি মহিমাস্থিত বাকধর্মী ধ্বনি-গাভীর্ষ এনে দিয়েছে। এখানে একটি উদাহরণ তুলছি,—

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আর একটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেষ উষ্ণ অনুরাগে
টের পাই যুথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সজ্জারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে।
রক্ত ক্রন্দ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

(জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা আট বছর আগের একদিন)

জীবনানন্দের গদ্যকবিতা রবীন্দ্র-গদ্যকবিতা থেকে পাঠক মনে পৃথক আবেদন জাগায়। রবীন্দ্র-গদ্যকবিতায় ভাবাবেগ বেশী, বাকপর্বে আবেগের গদ্যকবিতা এক বিশেষ স্পন্দন সেখানে প্রাধান্য পায়। জীবনানন্দের গদ্য

কবিতার ভাবাবেগ সে তুলনায় কম; চিত্রময় অর্থবাহী বাকপর্ব গঠনে তিনি চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। ছোট ছোট সংযত চিত্রময় শব্দবিন্যাস ধীরে ধীরে পাঠকের চোখের সামনে যেন একটি ছবি পরিস্ফুট করে তোলে। ধ্বনি-আবর্তনের হৃদবোধ যতিবিভক্ত ছোট ছোট বাকপর্বের দ্বারাই গড়ে তোলেন তিনি। উদাহরণ তুলছি।—

একটি অদ্ভুত শব্দ।

নদীর জল, মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।

আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এলো।

নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোণো শিশির ভেজা গল্প।

সিগারেটের ধোঁয়া;

টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;

এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

(জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা শিকার)

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) তাঁর ‘ভাব ও ছন্দ’, এবং ‘কেডস ও স্যাণ্ডাল’

সজনীকান্ত কাব্যগ্রন্থ দুটিতে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা ছন্দের বিচিত্র বহু

উদাহরণ রচনা করেছেন। ‘ভাব ও ছন্দ’ কাব্যগ্রন্থের ‘মাইকেলবধ

কাব্য’ অংশে মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র প্রখ্যাত কয়েকটি পংক্তির বিষয়বস্তু প্রাচীন চর্যাপদের ছন্দ থেকে আধুনিক সমর সেনের গদ্যছন্দ পর্যন্ত প্রায় সর্বপ্রকার ছন্দোবন্ধের অনুকরণ করে অপূর্ব ছন্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতি ছাড়া সমস্ত ছন্দরীতিকেই তিনি বিচিত্র আকৃতিবন্ধে প্রয়োগ করেছেন।
পরিশিষ্টে নলিনীকান্ত সরকার-কৃত আঠারটি সংস্কৃত ছন্দেরও বাংলা পদ্ধতির পরিচয়
দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য দু-একটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ তুলছি।

(১) ই হ় দি নী জ় লি যা
কলাবৃত্ত
এ ল দ্বা র খ় লি যা
চোখ মে রে বিল খান
ধ রে সু মু থে।

ধরি তার কোমরে
স্মরি কবি ওমরে
কয় স্মিথ “দিল জান
এক চুমুকে
ও ঠোঁটের পেয়ালা
করি শেষ।”...“কি জালা!”—
জুলীকয়, লজ্জায়
লাল হয় গাল।
পোপোকেটাপেটলে
তিনতলা হোটেলে
স্মিথ বসে গর্জায়
সূর ফাঁকতাল।

(পথ চলতি ঘাসের ফুল ১)

এখানে ভাবযতির ‘পংক্তি ডিঙানো’ প্রবহমানতা এবং পদ বা পংক্তি-শেষে
মুক্তদলের দ্বিকলা-প্রসারণ লক্ষণীয়। পংক্তি মিল (চ||চ||চ||৬ I) কা||কা||—||খ I
গা||গা|| — ||খ I

(২) দুফুট বহর
বরফের ঘর
তাহারি শহর কেলা—
ওরে বেঁটা তিমি
মরণ নিকট
তোর যতখুশি জোরে চেলা।
তীরেতে দাঁড়ায়ে তোরে চোঁচামেচি
ওই দেখ প্রিয়া শুন্ছে,

আমারে সে চেনে, ভাবে মিছামিছি
তিমি কেন জল ধুচ্ছে।

(পথ চলতি ঘাসের ফুল ১৩)

এখানে পদ-পংক্তির মিল, এবং স্তবকবন্ধের গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(৩) দরদী বিধান রায়,
দরদী হলেও ডান্ডারি করে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে;
রাত দিন তার কল—
মনখানি তার জুড়িয়া রয়েছে শিলং ও পলিটিক্স।

(কেডুস ও স্যাণ্ডাল শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী)

এটি কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকের একটি সাথর্ক উদাহরণ। সজনীকান্ত গদ্য কবিতাও লিখেছেন (কে. স্যা আরব্য উপন্যাসের দেশ)। তবে সেখানে নতুন বৈচিত্র্য কিছু আনেননি। বাংলা ছন্দের ক্রম-অগ্রগতি সম্পর্কে সজনীকান্তের সচেতনতা তাঁর ব্যঙ্গ ও পরিহাসমূলক কবিতাগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) বাংলা কাব্যে ভাব ও ভাষার দিক থেকে একটি

সুধীন্দ্রনাথ নতুন আদর্শ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে তিনি অতি সাবধানী শিল্পী ছিলেন। সংবর্ত (২য় সং ১৯৫৩)

কাব্যের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,—

“মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অস্বিষ্ট আমিও জানি যে কবিতার মুখ্য

মালার্মের উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের
শব্দ-শিল্প প্রভাব পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু,
দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে

অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় হয়েছে; শব্দ এবং ছন্দ উভয়েই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।”

(সংবর্ত ২য় সং পৃ. ১০)

উনবিংশ শতকের প্রতীক-ধর্মী ফরাসী কবি মালার্মে কাব্যের শব্দ গ্রহণে প্রত্যেকটি শব্দকেই বিশেষ অর্থ ও ধ্বনি-দ্যোতনার প্রতি লক্ষ রেখে সাজাতেন। শব্দের ধ্বনিবাহককেও এতটুকু ব্যর্থ হতে দিতে চাইতেন না;— অন্যদিকে অহেতুক কোনও শব্দই নিছক মাত্রা পূরণের বা মিলের খাতিরে ব্যবহার করতেন না। সুধীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বাংলা কাব্যে সেই রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। শব্দচয়নে তাঁর পরিধি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দই বিশেষ ভাবদ্যোতনা জাগিয়ে তুলবে এটিই তাঁর অভিপ্রেত ছিল,—আবার ছন্দে শৈথিল্যের তিনি প্রশ্রয় দেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘপদভাগে প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারেও তাঁর নিখুঁত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত বাংলা ভাষায় শব্দ-ব্যবহারের

অসংযম তাঁকে পীড়িত করেছে। ‘সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ’, ‘নামধাতুর বাহুল্য’, ‘ইওয়া এবং করা-ধাতুর পৌনঃপুন্য’, ‘সম্বোধনের অনাবশ্যকভার’, ‘বিভক্তি-বিপর্যয়’ ইত্যাদি যথেষ্টাচার যে পদ্য-ভাষার-ভাব-ও ধ্বনি-সৌন্দর্য শিথিল করে দেয় ‘অর্কেষ্ট্র’ (২য় সং ১৯৫৩) এবং ‘প্রতিধ্বনির’ (১ম সং ১৯৫৪) ভূমিকায় সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রুদ্রদল-বহুল সুমিত শব্দ-গ্রন্থনে তিনি হৃন্দে যে ধ্বনিগাষ্ঠীয় এবং দৃঢ় সংবদ্ধতা ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

শব্দগ্রন্থনে নিশ্চিহ্ন সে নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে—
সংবদ্ধতা ধূমাক্তিত্যে আজ বীতান্ধি দেউটি,
ও আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রও লেগেছে নিদুটি।
গাষ্ঠীয় কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
আমাকে আবিল করে; এক চক্ষু ছায়া,
দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়
চতুর্দিকে চক্রবাহু বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা। (সংবর্ত উজ্জীবন)

শব্দ বহু-ব্যবহারে মসৃণ হয়ে পড়ে। আবার দীর্ঘদিন অব্যবহারে পুরানো শব্দের আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে; রূপদক্ষ শিল্পী সেই শব্দে কাব্যের ধ্বনি ও ভাবোৎকর্ষ ফোটাতে পারেন। সুধীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস-বোধের সঙ্গে মধুসূদনের মিল রয়েছে।^{১৭}

সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি জার্মান ও ফরাসী প্রখ্যাত কবিদের কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে তিনি মূল কবিতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে সযত্ন প্রয়াসী হয়েছেন,

১৫। স্বগত গ্রন্থের ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে কবি লিখেছেন

..দুঃখপোষ্য শব্দের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশী কর্মঠ,...। কিন্তু মানুষের কার্যকারিতার যেমন একটি সীমা আছে, তেমন শব্দের সক্রিয়তাও অমিত নয়। শব্দের স্বভাব টাকার মতো, বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু মুজিয়ামভুক্তি বিলুপ্তি নামান্তর নয়, অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন কমে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে।

অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরাণো শব্দও কাব্যের বাদ সাধে না; এবং ডাউটির রচনায় অ্যাংলো স্যাক্সন শব্দগুলোই আমার কথার শ্রেষ্ঠ সাঙ্গী। উপরন্তু সম্ভ্রান্ত শব্দ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাষানুষ্ণেয় খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীন, দেশী-বিদেশী সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা, কেননা ভাষা রূপেরই উপাদান।

(কাব্যের মুক্তি স্বগত ১ম সং পৃ ২৯)

তবে বাঙালী পাঠকের উপযোগী ভাষা, উচ্চারণ প্রকৃতি ও ছন্দের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। বাংলা অনুবাদে ইংরেজি বা জার্মান উচ্চারণের প্রসঙ্গ আনবার প্রয়োজন বোধ করেননি।^{১৬} তাঁর অনুবাদ কবিতায় এবং মৌলিক রচনায় সনেটের সংখ্যা কম নয়। সনেটের পংক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আঠারো মাত্রিক (৮||১০) দ্বিপদীবন্ধে রচনা করেছেন। মিল-বিন্যাসে, স্তবক-বিভাগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেকস্পীয়রের আনুগত্য দেখিয়েছেন। অনেকগুলি জার্মান কবিতার (প্রতিধ্বনি : হাইনে ও গ্যোটের কবিতা দ্র) অনুবাদে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত লঘুযতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। একটি শেকস্পীয়রের সনেটের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

তথাপি নিশ্চিত থাকো উগ্রচণ্ড যমদূত যবে,
আসিবে আমারে নিতে, শুনিবেনা কারও উপরোধ,
তখনও এ-কবিতায় মোর স্বত্ব বিদ্যমান রবে,
এ স্মৃতি-মন্দির দিবে চিরকাল তোমারে প্রবোধ।
এদিকে তাকালে পরে, খুঁজে পাবে বাণীর নিভূতে
আমার তন্মাত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে;
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধু মিলিবে ধূলিতে;
আমার একাত্ম আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে।
যাবে যা মৃত্যুর গ্রাসে, নিতান্তই সে তো মলময়,
উচ্ছিন্ন জঞ্জাল, তথা ক্রিমিদের উপজীব্য শব,
অধমের গুপ্ত অস্ত্রে অপৌরুষ তার পরাজয়,

অনুবাদ কবিতা ১৬। ‘প্রতিধ্বনি’ কাব্যের ভূমিকায় কবি বিদেশীয় কবিতার বাংলা সম্পর্কে কবির মন্তব্য অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন,—

আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অঙ্কিত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব, এবং ইংরেজির ব্যাকরণ স্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ অথবা জার্মানের অস্বয় তথা সমাস বাহুল্য যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান। অন্ততঃপক্ষে ভুক্তভোগীরা জানেন যে পাশ্চাত্যের কোন কোন সদর্থক বক্তব্য যেমন আমাদের বোধগম্য হয় নেতির সাহায্যে, তেমনিই আমরা এমন অনেক কথা প্রত্যক্ষ ব্যবহার করি যা পশ্চিমে বাগাড়ম্বর পরাকাষ্ঠা, এবং সেই জন্যে আমি বলতে পারিনা যে পরবর্তী পদ্য-রচনা বিবিধ বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা তো বটেই, এমনকি ছন্দের দিক থেকেও যথাযথ অনুকরণ। অনুরূপ চেষ্টা আসলে বিড়ম্বনা; এবং ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ সত্যে পৌছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরিষ্কৃত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলাম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শেই বিধিনিষেধ অকাটা। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপর্বিকের একান্ত ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয়; আমাদের কানে ভালো না লাগলে তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক। (প্রতিধ্বনি ভূমিকা পৃ ৯)

মনে রাখিবার মতো নেই তার তিলার্থ বৈভব।

আধার অপ্রতিগ্রাহ্য, আধেয়ই মহার্ঘ কেবল;

বর্তমান ছন্দোবন্ধে সে-সম্পদ, জেনো, অবিচল।।

(প্রতিধ্বনি অবিনাশ শেকস্পীয়র)

সুধীন্দ্রনাথ ‘অর্কেষ্টা’ কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত অনেকগুলি ছন্দোবন্ধ

রবীন্দ্র

অনুসৃতি

ব্যবহার করেছেন।^{১৭} অন্যান্য অনেক (প্রধানত প্রাথমিক যুগের

রচনায়) কবিতায়ও ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রপ্রভাব লক্ষ করা যায়।

অর্কেষ্টা কবিতাগুলোর একটি কবিতায় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দও প্রয়োগ করেছেন। বিদেশী ছন্দোবন্ধ ও স্ববক-মিল একাধিক কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত কবিতাটির দুটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি,—

স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে ;

মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্জে গগনের গাত্রে ;

(অর্কেষ্টা অর্কেষ্টা)

সুধীন্দ্রনাথের আসল কৃতিত্ব লঘু যতিভঙ্গের কবিতায় নয়, মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘপদী ছন্দকে প্রয়োজন মতো প্রবহমান বা যতিপ্রাস্তিক রেখে শব্দের নীরব জমাট ধ্বনিঝংকারে যে গাভীর্য এনেছেন সেখানে তিনি মধুসূদন ও মোহিতলালের উত্তরসূরী। তবে শব্দ নির্বাচনে তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক সাবধানী শিল্পী। একাধারে ধ্বনিঅলঙ্কার ও অনুপ্রাস, এবং অপরদিকে পরিমিত ও সুষ্ঠু ভাব-প্রকাশের এমন সমন্বয়বোধ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অনন্যসুলভ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে এনেছে।

১৭। তুলনীয় (অর্কেষ্টা কবিতাগুলো থেকে :) (১) রাত্রি শেষের দ্বিধা দুর্বল আলো (সুধীন্দ্রনাথ) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে (রবীন্দ্রনাথ গীতালি কলিকা)

(২) অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা (সুধীন্দ্রনাথ)

একদারাতে নবীন যৌবনে (রবীন্দ্রনাথ সোনারতরী নিদ্রিতা)

(৩) অগাধ গগন হতে দ্বিপ্রহরে (সুধীন্দ্রনাথ)

পবনে দিগন্তের দুয়ার নাড়ে (রবীন্দ্রনাথ মহায়া বরযাত্রা)

(৪) সন্ধ্যাররাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে

অঙ্গার মসি প্রেমালোকে করে পুণ্য (সুধীন্দ্রনাথ)

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মহুরে সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া (রবীন্দ্রনাথ : কল্পনা দুঃসময়)

(৫) আজি ফাগুন বেলার পরসাদ যায়

হারিয়ে অকাল বাদলে (সুধীন্দ্রনাথ) :

অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ। (রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ মরণমিলন)

(৬) স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম

উরুতে নিবিড় নীল নয়ন কোণে

সজলস্মৃতি অঙ্কিত (সুধীন্দ্রনাথ)

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুপ্তিত নয়ন কার নীরব নীল গগনে (রবীন্দ্রনাথ কল্পনা মদনভস্মের পর)

বাংলা ছন্দে কবি অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) পরীক্ষাও বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী যেমন শব্দের মিত-প্রয়োগে একটি নতুন রীতির পরীক্ষা চালিয়েছেন, অমিয় চক্রবর্তী তেমনি প্রতীকধর্মী আপাত অসংলগ্ন শব্দের ব্যবহারে নানাবর্ণের টুকরো ছবির সাহায্যে এক একটি সামগ্রিক চিত্রের আদল (impression) ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাবনাগুলি মসৃণভাবে ক্রমবিন্যস্ত না করে টুকরো টুকরো কল্পনা উদ্বেককারী শব্দের বিন্যাসে তাঁর যে কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়,— ছন্দগ্রন্থনাতেও সেই একই মনের প্রতিফলন প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিগোষ্ঠীর মতো তিনিও পয়ার (বা পয়ারাঙ্গের কবিতা), মুক্তক বা গদ্যকবিতা লিখেছেন। দেশী, বিদেশী, তৎসম, এমনকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবিন্যাসে ভাষায় বাকধর্মী স্বাভাবিকতা এনেছেন। অনেক সময় মিশ্র উচ্চারণ-রীতিতে বিশুদ্ধ মাত্রাভাগের পদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও লৌকিক উচ্চারণের দলবৃত্ত—প্রধান তিনটি ছন্দরীতিতেই নূতনত্ব এনেছেন। তবে প্রয়োজন মতো এই রীতিগত উচ্চারণের বাঁধাবাধি শিথিল করেছেন। তাঁর কাব্যের ভাব ও ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন,—

দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য ...“প্রজ্ঞা নিয়ন্ত্রিত মিষ্টিক চেতনা জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সেরও ছিল। বলতে কি, অমিয় চক্রবর্তীর মেজাজের সঙ্গে হপকিন্সের মেজাজের বহু মিল আছে।”^{১৮}...প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে উভয় কবিই আস্থাহীন।

সুইনবার্ণী অতিকথন দোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্য হপকিন্স যেমন ছন্দের নব নব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন ও ব্যাকরণ বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুকরণ থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় চক্রবর্তীও তেমনি করেছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত শব্দার্থ-বিপর্যয় আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ সে কথা পূর্বেই বলেছি।

উভয় কবির এই ব্যাকরণ-বিভ্রাট প্রকৃতপক্ষে ইমপ্রেশনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিজড়িত। ইমপ্রেশনিষ্টরা যেমন বিশুদ্ধ রঙের ছোপ আপাত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে লাগিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণাঢ্যতার জীবন্ত ছন্দটি ধরতেন, হপকিন্স ও অমিয় চক্রবর্তী তেমনি ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে ভাষার আদিমরূপে পরিবর্তিত করে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছেন।”

(আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,
২য় সং, পৃ. ৩৩০)

১৮। Gerard Manley Hopkins (1844-1889)-এর Sprung Rhythm এর বৈশিষ্ট্য হপকিন্সের সম্পর্কে Herbert Read বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন স্প্রাংরিডম তাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।—

হপকিন্সের পর ইংরেজি কাব্যে যাঁরাই vers libre বা free-verse লিখেছেন তাঁরাই কমবেশী 'sprung rhythm'-এর শিথিল বিন্যাসভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কয়েকজন কবি ছন্দমুক্তিপ্রয়াসী হয়ে শিথিল-বিন্যস্ত মিশ্র উচ্চারণরীতির এই 'sprung rhythm'-এর অনুরূপ বাংলা উচ্চারণরীতির উপযোগী একটি ছন্দরূপ উদ্ভাবন করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী এই রীতির প্রবর্তকদের পুরোবর্তী হয়েছেন। হার্বাট রীড হপকিন্স-এর কাব্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় তার অধিকাংশই লক্ষিত হয়। কবি যুদ্ধের খবর শোনাতে গিয়ে লিখেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং। তাতে গোয়েরিং, ফরাসী পন্টন,
গঙ্গাফড়িং বড়োবাজার,
হাতীর পা, ধর্মযাজক, উত্যক্ত বৃদ্ধ, ওয়ারশ, বর্ণডশ,
বর্মার হাজার
চুরোট, খুন, প্রহলাদ, জহলাদ, চাকরির দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম,
নির্বিকল্প সমাধি, ব্যাধি
ইত্যাদি হরেক প্রকার। এক মোড়কে। মা গৃধঃ
অবশ্যই লোভ করব না
—বলা বাহুল্য—বেছে নেব,
এস্পায়ার বৃত্তি প্রভৃতি পকেটে ভরব না।

(একমুঠো যুদ্ধের খবর)

Common English rhythm (Running Rhythm) in use from the 16th to 19th century is measured by feet of either two or three syllables and never more or less.

In an underlying standard measure, if there is a foot reversed in nearly every line, this rhythm point counter to the proper flow. There the result is probably what Hopkins called Sprung Rhythm.

By this he meant rhythm measured by feet of from one to four syllables. In exceptional cases, for particular effects you may have feet of any number of weak or slack syllables — or on the one syllable — if there is only one. The result is a rhythm of incomparable freedom : any two stresses may either follow one — another running, or may be divided by one two or three slack syllables. The feet are assumed to be equally long or strong, and their seeming inequality is made up by pause or stressing... The scanning runs on without break from the beginning of stanza to the end, and all the stanza is one long stain. — though written on lines asunder.

Further, Hopkins claims that two licences are natural to sprung rhythm. The one is rests, as in music, the other is hangers or outrides, that is one, two or three slack-syllables added to a foot and not counted in the normal scanning.

Hopkins himself observed about such rhythm that is the most natural of things. It is the rhythm of common speech and of written prose, when rhythm is perceived in them. It is found in nursery rhymes, weather saws, and so on.

আপাত অসংলগ্ন টুকরো টুকরো শব্দ বসাতে গিয়ে কবি আকস্মিক যতি বাড়িয়েছেন,—আবার চিত্ররূপের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একের উপর শিথিল দলবৃত্তের অন্যছবি ভীড় করে পর পর এসে পড়েছে। প্রচ্ছন্ন মিলও কম দেননি। গোয়েরিঙ আর গঙ্গাফড়িং, ওয়ারস আর বর্ণডশ, প্রহলাদ আর জহলাদ, সমাধি, ব্যাধি এবং ইত্যাদি, বলা বাহুল্য—বেছে নেব,—এমন বহু বাক্যাংশের প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস পাঠকের কানকে প্রসন্ন করে তোলে। আবার যেখানে লিখেছেন,—

গেল,
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপড় ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত হায়
গৌর বসাকের প'ড়ে রইলো ভরস্তু খেত খামার।

রামনাম সত হায়।।

(পারাপার সাবেকি)

এখানে দলমাত্রিক ছন্দোবন্ধের মাঝে অতিরিক্ত শব্দসমষ্টি (hangers অথবা out riders) ‘রাম নাম সত হায়’ বৈষ্ণবগীতি-আখরের মতোই মাঝে মাঝে ফিরে এসে কাব্যের মূল সুরটি যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কবিতার সুরুতেই ‘গেল’ শব্দটির প্রয়োগ এবং দীর্ঘযতি (rests), অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে গভীর ভাবোদ্যোতক হয়েছে।

ছড়ার-ছন্দের অনুরূপ চতুর্দল পর্বযতির মাঝে শিথিল ত্রিদল বা পঞ্চদল পর্ব ব্যবহার-দৃষ্টান্ত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যথেষ্ট দেখা যায়। এই শৈথিল্য sprung rhythm-এরই অঙ্গবিশেষ। যেমন—

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—

বেরিয়ে এলেই নেই।

‘ভিতরে কত’ লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়

সবুজ অন্ধকার ;

জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ বটের বুড়ি,

‘ভিতরে কত’ ‘আরো গভীরে’ জন্তু চলে, হলদে পথ,

In short we might say that Hopkins is eager to use device the language can hold to increase the force of his rhythm and the richness of the phrasing. Point, counter point, rests, running over, rhythm, hangers or outrides, slurs, end-rhymes, internal rhymes, assonance and alliterations— all are used to make the verse sparkle like rich, irregular crystals in the gleaming flow of the poets limpid thought. [English Critical Essays (20th Cen) The Poems of Gerard Manley Hopkins

Herbert Read P. 369-370 1056 impression]

তীব্র ঝরে ‘জ্যোৎস্না হিম’ বুক চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড ‘মেঘের ঝড়’ ‘বৃষ্টি সেই’ আরণ্যক—

বেবিয়ৈ এলেই নেই।

(পারাপার: বৈদাস্তিক)

এখানে ‘ভিতরে কতো’, ‘আরো গভীরে’ পর্বগুলিতে পঞ্চদল রয়েছে, আবার পংক্তির মাঝে ‘জ্যোৎস্না হিম’, ‘মেঘের ঝড়’, ‘বৃষ্টি সেই’ ত্রিদল-পূর্ণপর্ব ব্যবহার করেছেন। ভাবমুক্তির একটি উপায় হিসেবেই এই শিথিল ছড়ার ছন্দোরূপের পুনঃপ্রবর্তন সাম্প্রতিক কালে হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ যে ভিত্তির হুগোর আদর্শে চতুষ্কোণাকৃতি কবিতা রচনা করেছেন, অনুরূপ অমিয় চক্রবর্তীও কামিংস-এর অনুসরণে ছন্দের আলপনা তৈরী করেছেন (অভিজ্ঞান বসন্ত : অভিজ্ঞান দ্র)। ছন্দের ধ্বনিগত বিচারে এর বিশেষ মূল্য রয়েছে মনে হয় না।

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র ছন্দের সুবিন্যস্ত ধরাবাঁধা পদ্যবন্ধ-রচনারীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসুকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, ‘আমায় নিজের দিক থেকে বলব ঢের বেশী তৃপ্তি পাই অন্তর্লীন বদ্ধত এবং সংহত Verse Libre এর রাজ্যে।’^{১১৯} দীপ্তি ত্রিপাঠিও উল্লেখ করেছেন, ‘গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে পদ্যের চমক খেলানোও অমিয় চক্রবর্তীর বৈশিষ্ট্য।’^{১২০} ভাবমুক্তির এক নতুন পথিকৃৎরূপে কবি অমিয় চক্রবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে-র তুলনায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচলিত বাংলা ছন্দের আনুগত্য অনেক বেশী মেনে চলেছেন।

লৌকিক দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত — বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতিই তিনি স্নাছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তের ব্যবহারে তাঁর কিছু স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায়ও লক্ষ করা যায়। যেমন — বাকধর্মী বাক্য গঠন প্রবণতা, অমিল ও সমিল মিশ্র পংক্তিবন্ধ ব্যবহার, আপাত বি-সম শব্দের আকস্মিক চমক ইত্যাদি। সুশীন্দ্রনাথের মতো ছন্দের দৃঢ়বদ্ধতা প্রেমেন্দ্র মিত্র পছন্দ করেননি, — আবার অমিয় চক্রবর্তীর মতো ‘Verse Libre’ এর শিথিল রাজ্যে বিচরণও তাঁর মেজাজের অনুকূল নয়। নজরুলের দীপ্ত বলিষ্ঠ প্রকাশাবেগ তাঁর ছন্দে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-মুক্তক ও গদ্য কবিতার প্রভাবও তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়।

দলবৃত্ত

মুক্তক

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দকে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন ভাবের পরিবেশনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ-ছন্দের মুক্তক রচনায় তিনি অমিয় চক্রবর্তীর মতো পর্বের দলবিন্যাসে শৈথিল্য রাখতে চাননি। যেমন,—

চিনি তো জল, আকাশ মাটি

মরণ ভীকু বৌদ্র-পায়ী জানি প্রাণের লীলা

১৯। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়

২০। এ

হঠাৎ যেন এসব চেনার অতীত
 গিরির গহন হৃদয় থেকে
 উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
 পেলাম আরেক দিশা।

(সুডঙ্গ ফেরারী ফৌজ)

প্রতি পর্বেই সুনির্দিষ্ট চতুর্দল বিন্যাস করেছেন কবি (তু, পারাপার পৃ ১৪৬)।

কলাবৃত্ত রীতির সৃষ্টি প্রয়োগেও প্রেমেন্দ্র মিত্র সফল হয়েছেন। নজরুলের মতো

কলাবৃত্ত

কয়েকটি কবিতায় এই ছন্দরীতির উদাত্ত বলিষ্ঠ ভাবময় প্রকাশভঙ্গি
 চমৎকার ফুটে উঠেছে। কবির ‘প্রথমা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বেনামী

বন্দর, আমি কবি যত কামারের, সুদূরের আহ্বান, বা পথভ্রান্ত কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে
 উল্লেখযোগ্য। কলাবৃত্তের চতুষ্কল পর্ববিন্যাসে কবি বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন,—

নীল! নীল!

সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝিনা

ফিকে গাঢ় হরেক রকম

কম-বেশী নীল!

তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল

ক’টা গাঙচিল।

ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,

সাদা ফেনা থেকে যেন

শাঁখ-মাজা ডানা মেলে

আকাশের তল্লাস নিচ্ছে।

মিথোই

মিল খোঁজা মন চায় উপমা।

নেই, নেই!

হৃদয় দুচোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,

সেই! সেই!

(সাগর থেকে ফেরা সাগর থেকে ফেরা)

এখানে ‘নীল! নীল!’ ‘নেই! নেই!’ ‘সেই! সেই!’ পংক্তি-ধৃত শব্দসমষ্টির উচ্চারণে যে
 যতি ও প্রসারণ আসছে তাতে প্রতি শব্দই একটি পূর্ণ চতুর্মাত্রক পর্বের মর্যাদা পাচ্ছে।
 যতি-বৈচিত্র্য, উচ্চারণ-প্রসারণ ও মিলবিন্যাসে কবি সাগরের যে ছবি আঁকেছেন তার
 আবেদন চতুষ্কল অন্যান্য কলাবৃত্ত রীতির কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাশাপাশি কবির
 আর একটি চতুষ্কল পদ্য-নিদর্শন তুলছি,—

হাওয়া বয় সনসন

তারান

জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে, না
বহি তাপে?
হৃদয় মরচে ধরা
পুরোনো খাপে!

(সাগর থেকে ফেরা জং)

উভয় কবিতার গঠনভঙ্গি এবং উচ্চারণ ভিন্নতর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কলাবৃত্ত রীতির মিশ্র মিল-অমিল পংক্তি-বিন্যস্ত মুক্তক রচনাতেও বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। যেমন,—

বিনুনী তোমার নামাও রূপাঞ্জল!
ঢেলে দাও সব সোনা।
বুনবো কামিজ
শীতার্ঘ্য যত মানুষের বুক ঢাকতে
যৌবন বার্ষিক্য
চিরন্তন অসখ্য।
কুন্তলে হাত দিও না মা।
দৃঢ় বিশ্বাসে বাধা জয়ী যৌবন
এই উজ্জ্বল রঙ্জু উঠুক বেয়ে।
স্বপ্নের চুমা পাড়তে মানুষ অনেক উর্ধ্বে চড়ে।
জরা আর যৌবন
সত্যেরে দেখে দুই দিকে দুই জন।

(প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা সোনালি চুলের গান)

ছয় কলার পর্বভাগে, অমিল চতুষ্পাঙ্গিক স্তবকের মাঝে মাঝে সমিল দুটি করে পংক্তি এনে ছন্দের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বাড়িয়েছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও বিচিত্র পংক্তিবন্ধের পদ্য রচনা করেছেন। মুক্তক রচনায় হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তিবিন্যাসে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। গদ্যকবিতাও কিছু কিছু রচনা করেছেন। এ-যুগের ছন্দে যে উচ্চারণ-শৈথিল্যের পরীক্ষা চলেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার প্রশয় দেননি। বাক্য রচনায়, মিল ও চিত্রকল্প ব্যবহারে তিনি সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী মতো অতটা সাবধানী ছিলেন না। ছন্দের উপকরণ সংগ্রহে তিনি প্রধানত রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী কবিদেরই বেশী অনুসরণ করেছেন। দু-একটি কাব্যের ছন্দোবন্ধে রবীন্দ্রনাথের (যেমন ‘প্রথম’ কাব্যে ‘বলাকা’র) সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রেমেন্দ্র পাশ্চাত্য কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন,— তবে আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যন্ত কম।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪) ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবন্ধে, বিশেষত কয়েকটি বিদেশী ছন্দোবন্ধ রচনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ক্লেরিহিউ (Clerihew) এবং লিমেরিক (Limerick) ছড়াগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ক্লেরিহিউ চার পংক্তির (দ্বিপদী মিলের) এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ছড়াজাতীয় কবিতা। কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম দিয়ে সূরু হয় এবং চার পংক্তি ক্লেরিহিউ পরিসরেই তার জীবন-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়। ইংরেজী কাব্যে ই. ক্লেরিহিউ (বেন্টলী) এই কবিতার প্রবর্তক।

১৯০৫-এ প্রকাশিত Biography for Beginners বইতে প্রথম তিনি এই জাতীয় ছড়া লিখেছেন।^{২১}

অন্নদাশঙ্কর তাঁর ‘উড়কি ধানের মুড়কি’ কাব্যগ্রন্থে এই জাতীয় কয়েকটি ছড়া লিখেছেন। যেমন,—

- (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিস্বা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

(উড়কি ধানের মুড়কি)

একটু শিথিল উচ্চারণের লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও শিথিল ছড়ার উপযোগী ছন্দও কবি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

- (২) পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

(উড়কি ধানের মুড়কি)

লিমেরিক (limerick) হল, অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত পাঁচ পংক্তি-বন্ধের লিমেরিক মিল ককথকক) অর্থহীন ছড়া। এডোয়ার্ড লীয়ার তাঁর Book of Nonsense (১৮৪৬) গ্রন্থে এই ছড়া লিখে নতুন করে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছেন। ইংরেজি অধিকাংশ লিমেরিক ছড়ার বিষয়বস্তু হল বিরোধাতাস

২১। একটি ইংরেজি ক্লেরিহিউ কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি।

ALFRED DE MUSSET
Used to call his cat ‘Pusset’
(his accent was affected
That was to be expected)

(The Poet’s Tongue Ed. by W. H. Auden and John Garret)

(epigram) - যুক্ত হাক্সা শ্লেষ-বিদ্রূপ। অনেক সময় শেষ পংক্তিতে এই শ্লেষ সার্থক বিরোধভাসের রূপ নেয়।^{২২} অন্নদাশঙ্কর কয়েকটি চমৎকার লিমেরিক লিখেছেন। এখানে একটি উদ্ধৃত করছি,—

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুস।
অবশেষে একদিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—

ফানুস ওড়ায় মানুষ।। (রাঙা ধানের থৈ লিমেরিক)

অন্নদাশঙ্কর ছড়া জাতীয় কবিতায় ছন্দের পর্ব-পদবন্ধ শিথিল করে শিশুমনের আমেজটুকু চমৎকার ফুটিয়েছেন। তার ‘রাঙা ধানের থৈ’ কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য ছড়া রচনা অন্তর্গত কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা ‘আর্তনাদ’ বা লৌকিক দলবৃত্ত লেখা ‘কাঁদুনি’ ও ‘খুকু ও খোকা’ কবিতা দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একাধিক কবিতায় ছড়ার শিথিলবন্ধ ছন্দে ন্যাট্য-সংলাপ দিয়েছেন (‘দুই বেড়াল এক বাঁদর’, ‘জনরব’ — রাঙা ধানের থৈ দৃষ্টব্য) — সেখানেও শিশু কাকলির ছন্দ ধরা পড়েছে; — মূলত কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতি এই কাব্যনাট্য গুলিতে ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮-১৯৭৪) ছন্দে ভাবমুক্তির পরীক্ষায় অনেকাংশে সফল হয়েছেন বলা চলে। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তাঁর লক্ষ্য হল, ছন্দকে যথাসম্ভব কৃত্রিম উচ্চারণ-মুক্ত করে চলতি ভাষার বাকধর্মী স্বাভাবিকতা দান। সে কারণেই প্রয়োজনবোধে তিনি বিভিন্ন ছন্দরীতির উচ্চারণকে অনেক সময় শিথিল করেছেন।

কলাবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ কবি বৈচিত্র্যময় নানাভঙ্গিতে ব্যবহার করলেও মিশ্রবৃত্ত রীতির মিশ্রবৃত্ত (কবির ভাষায় ‘পয়ার জাতীয় ছন্দ’) ছন্দেই বেশী স্চ্ছন্দ্য বোধ করতেন মনে হয়।^{২৩} জীবনানন্দের মতো এ-ছন্দে তিনি দীর্ঘ পদভাগের মুক্তক লিখেছেন। যেমন,—

২২। এডওয়ার্ড লীয়ার রচিত একটি লিমেরিক ছড়া এখানে উদ্ধৃত করছি।—

There was an old man of Khartoom
Who kept two tame sheep in his room.
“For” he said. “they remind me
of one left behind me.
But I cannot remember of whom.

(Encyclopaedia Britannica Vol 14)

২৩। কবি মন্তব্য করেছেন : “বাকরীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত বাঙালির কথা বলার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ।” (সাহিত্য চর্চা পৃ ১০৬-১০৭)

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসঙ্গল নীলস্বর তলে;
 ভঙ্গুর হৃদয় মম বিজড়িত সহস্র পঙ্কুতা—
 জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে
 আজ তার নাহিকো আভাস।
 আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে পড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্ত মুখে
 ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধ-মিশ্রক বিজন বিপিনে। (বন্দীর বন্দনা শাপভট্ট)
 চলিত ভাষার কবি চলিত ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণকে উপযুক্ত মর্যাদা
 স্বাভাবিকতা দিয়ে লিখেছেন,—

এরা তো বাঙালি নয় ॥ ‘কী’ ক রে জানবে

‘মা’ বাবা ভাই বোন ॥ স্বামী ‘স্ত্রী’

এ সব কথার মানে ‘কী’

(দময়ন্তী বিদেশিনী)

এখানে বুদ্ধদেব বসু ‘কী’ (১ম ও ৩য় ছত্রে), ‘মা’ এবং ‘স্ত্রী’ শব্দগুলি প্রসারিত দ্বিমাত্রক উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন, আবার ‘জানবে’ শব্দটি সংশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রক রূপে গণ্য করেছেন। কবি নিজেই এ-সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,—

“যদি লিখতুম

ম:ত্রা, পিতা, ভাই বোন ॥ পত্নী, স্বামী

এ সব কথার কী যে ॥ মানে

তাহলে যা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাকবিন্যাসে হুহু মুখের কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে।”

(আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ২য় সং, দীপ্তি ত্রিপাঠী পৃ. ১৪২-৪৩)

বুদ্ধদেব বিভিন্ন রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছেন।

সনেট রচনা

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাত্রার পংক্তি থেকে হ্রস্ব দশমাত্রা পংক্তিবিন্যাসের সনেট লিখেছেন তিনি। মিল ও স্তবক বিন্যাসে পেত্রার্কার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রথম দিকের রচনায় বেশী প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী রচনায় শেকস্পীয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়। ছোট বড়ো মুক্তক পংক্তিতেও তিনি সনেট রচনা করেছেন^{২৪} এখানে তাঁর দশমাত্রা পংক্তির এবং মুক্তক পংক্তি-বিন্যাসের দুটি সনেট উদ্ধৃত করছি।—

২৪। বুদ্ধদেবের সনেট সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন

“সনেট সম্বন্ধে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ ‘যে আঁধার আলোর অধিক’-এ দেখা যায়। দশ মাত্রার সনেট ‘স্মৃতির প্রতি ৩,’ ‘আটচল্লিশের জন্য : ৩’ যেমন ছান্দসিকের পক্ষে কৌতূহলকর তেমনি ১৬ চরণের সনেট ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’, ‘নবম প্রণয়’, ‘মুক্তির মুহূর্ত’, বা ‘সর্বস্বত্বী’। বোদালোয়ার-সুলত সম্বোধনের ভঙ্গিতে রচিত অথচ উচ্চকিত নয় এমন ধরণের সনেট বাংলা সাহিত্যে নতুন।”

(আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ২য় সং, পৃ. ১৪৬)

(১) দশমাত্রা পংক্তির সনেট	দলবৃত্ত	মিল
পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া		ক
ছাঁটা চুলে যত্নে ঐকো টেরি		খ
লোকে দেখে ভাবুক, ‘আমাদেরই!’		খ
নয়তো ঝড়ে ছিড়বে দড়িদড়া।		ক
সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া		গ
আক্রমণ, কাফে-র করতালি,		ঘ
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।—		ঘ
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া।		গ
ঢাল-তলোয়ার আর কি তোমার আছে,		ঙ
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে		চ
জ্ঞানের মতো, অকথ্য সেই আগুন?		ছ
আর তাছাড়া, সত্যি যদি উনুন		ছ
রাঙিয়ে তোলে নিঃশ্বাসের হাওয়া—		জ
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া!		জ
(বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা এক তরুণ কবিকে)		

(২) মুক্তক পংক্তিবিন্যাসের সনেট	মিশ্র কলাবৃত্ত	শিথিল উচ্চারণ ভঙ্গি	মিল
শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়			ক
নরম, আচ্ছন্ন আলো হলদে-স্নান বইয়ের পাতার			খ
লুকানো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার;			খ
অথবা অতুর চিঠি; মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়			ক
দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী			গ
ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির			ঘ
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী অশীতির			ঘ
মোহগ্রস্ত সভাপতি? উদ্ধারের সত্বাধিকারী			গ
ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগবাম্প, চামর, পাহারা			ঙ
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।			ঙ
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;			চ

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির। ছ
 যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর। ছ
 আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশী পাবে। চ

.(বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা রাত তিনটের সনেট ১)

এখানে ভাষায় গদ্যের উপযোগী বাকধর্মী স্ভাবিক উচ্চারণ রাখতে গিয়ে কবি মাত্রা প্রসারিত করেছেন। তবে উভয় কবিতাতেই স্তবকবিন্যাসে ভাবগত গুরুত্ব সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।

কলাবৃত্ত
 ছন্দ

কলাবৃত্ত রীতির পদ্যরচনায় বুদ্ধদেব কিছু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর মিলহীন স্তবকের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বৃথাই জপিয়েছি। তোমারে, মন, ॥
 থামাও অস্থির। চাঁচামেচি। I
 কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
 এক বসন্তেই শূন্য তৃণ।

(বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা অসম্ভবের গান)

কবি এখানে ৭।৫॥৭।৫ I ৭।৭॥৭।৫ I -মাত্রাভাগে দ্বিপংক্তিক স্তবক রচনা করেছেন। সাত মাত্রার পর্ব কবি ‘কালো চুল’ (‘দ্রৌপদীর শাড়ী’ কাব্যগ্রন্থ দ) কবিতাতেও ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধদেব কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদে সাতমাত্রার তিনটি পর্বের পর তিন, চার বা পাঁচ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব দিয়ে যতিপ্রাপ্তিক অমিল চতুপ্পংক্তিক শ্লোক রচনা করেছেন। যেমন,—

কামের উদ্রেক। যে করে, সেই মেঘে। সহসা দেখে তার। সম্মুখে
 যক্ষ কোনোমতে। চোখের জল চেপে। ভাবলে মনে মনে। বহুক্ষণ
 নবীন মেঘ দেখে। মিলিত সুখীজন। তারাও হয়ে যায়। অন্যমনা,
 কী আর কথা তবে,। যদি সে দূরে থাকে। সে চায় কণ্ঠের। আলিঙ্গন।

(কালিদাসের মেঘদূত পূর্বমেঘ ৩য় শ্লোক পৃ. ৭৯)

কালিদাসের মেঘদূত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ‘যক্ষের নিবেদন’ কবিতায় (পৃ. ৭৮) লঘুগুরু দলবিন্যাসরীতি ঠিক রেখে যথাক্রমে আট-সাত-সাত-পাঁচ-মাত্রাভাগে কলাবৃত্ত রীতিতে বাংলা মন্দাক্রান্তা রচনা করেছেন। এমন সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসে সমগ্র মেঘদূতের অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ কাজ! বিকল্পরীতি হিসাবে ইতিপূর্বেই কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ‘মেঘদূত’ অনুবাদে ৭।৭।৭।৫-মাত্রাভাগে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন! এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় ‘মেঘদূত পরিচয়’ অংশে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র

সেন এই ছন্দকেই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তর বিকল্প' বাংলা ছন্দ রূপে গণ্য করেছেন।^{২৫} সূত্রাং বুদ্ধদেব মূলত প্যারীমোহনের রীতিকেই গ্রহণ করে সমিল পংক্তির পরিবর্তে অমিল পংক্তি রচনা করেছেন এবং পংক্তির চতুর্থ (পঞ্চমাত্রক) পর্বটিকে মাঝে মাঝে ত্রিমাত্রক ও চতুর্মাত্রক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অনুবাদের ছন্দে প্যারীমোহন সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে তাঁর তুলনায় আরও বেশী স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে তুলনাত্মক বিচারের সুবিধার্থে প্যারীমোহনের উক্ত শ্লোকের (ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ) অনুবাদ অংশও উদ্ধৃত করছি,—

যে মেঘ দরশনে । ফুটিয়া উঠি' সদা । কেতকী ফুল-কুল । সুখে দোদুল ।

যক্ষ তাবি আগে । নীরবে ভাবে কত, । হৃদয় হয়ে উঠে । বাষ্পাকুল ।।

হেরিয়া জলধর । সুখীরাে অন্তর । রহিতে চাহে না যে । অচঞ্চল ।

কণ্ঠনীর প্রিয় । জনেরে ছেড়ে দূরে । রহে যে তার দশা । কিবা তা বল ?।

(ঐ পৃ. ৪-৫)

২৫। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্যটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

...যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিরূপকে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নয়, ধ্বনিগাষ্ঠীর্ষ এবং গতিমহুরতাই মন্দাক্রান্তর মর্মস্বরূপ। অথচ সাধারণ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিগাষ্ঠীর্ষ ও গতিমহুরতা তো নাইই বরং ধ্বনির লঘুতা ও গতির নৃত্যপর চপলতাই ওই ছন্দের বিশেষত্ব। অতএব মন্দাক্রান্তর ধ্বনিগত স্বরুপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া মেঘদূতের অনুবাদ করিতে হইলে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নেই। মন্দাক্রান্তা সতের অক্ষরের ছন্দ এবং সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে যথাক্রমে চার, ছয় ও সাত অক্ষরের (syllable) তিনটি পর্বে প্রত্যেক পংক্তি বা চরণ বিভক্ত, প্রত্যেক পর্বের পরই যতি। কিন্তু বাঙালীর কানে সাত অক্ষরের তৃতীয় পর্বটি অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় এবং সুযোগ পাইলেই তৃতীয় পর্বের চতুর্থ অক্ষরের পর আর একটি যতির জন্য বাঙালীর কান ব্যগ্র হইয়া উঠে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন তাতে তিনিও তৃতীয় পর্বের চতুর্থ অক্ষরের পরে বাঙালী কানের অপরিহার্য এই নূতন যতিটিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

অতএব মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলা মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করিতে গেলে তার প্রত্যেক পংক্তির চারটি পর্বে যথাক্রমে আট, সাত, সাত এবং পাঁচটি করিয়া মাত্রা দরকার হয়, তাহা হইলেই অন্তত পর্বচ্ছেদ বিষয়ে মন্দাক্রান্তর অনুরূপ ছন্দ হইবে। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে একপর্বে আট মাত্রা ও তারপরেই দুইটি সাত সাত মাত্রার পর্ব রচনা করার বিপদ আছে; কারণ তাতে ছন্দের মধ্যে অশোভন রকম ধ্বনিবৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সূত্রাং প্রথম পর্বটি হইতে একটি মাত্রা কমাইয়া দিয়া প্রথম তিনটি পর্বকেই সপ্তমাত্রিক করাই সবচেয়ে নিরাপদ, তাতে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার মাত্র একমাত্রার পার্থক্য হইবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি সপ্তমাত্রিক ও একটি পঞ্চমাত্রিক পর্বের সাহায্যে বাংলা ছন্দ যথাসম্ভব সংস্কৃত মন্দাক্রান্তর সারূপ্য লাভ করিবে। প্যারীবাবু মেঘদূতের অনুবাদকালে এই ত্রিসপ্ত-পঞ্চমাত্রিক ছন্দের আশ্রয় লইয়া ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই মনে করি।

[মেঘদূত : 'মেঘদূত পরিচয়' : প্যারীমোহন সেনগুপ্ত : ২য় সং (১৩৪৬) পৃ. ২২-২৮ দ্র]

কলাবৃত্ত ছয় মাত্রার পূর্বে কবি তার প্রখ্যাত ‘কঙ্কাবতী’ বিষয়ক কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন (দ্র সেরিনাড^{২৬}, কঙ্কাবতী, আরশি... কঙ্কাবতী)। একটি কবিতায় পূর্ণপংক্তিশেষে বার বার ‘কঙ্কাবতী’ নামটির পুনরাবৃত্তি টেনিসনের ‘The Ballad of Oriana’^{২৭} কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন,—

মাঝরাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও?

কঙ্কাবতী!

এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও,

কঙ্কাবতী!

(কঙ্কাবতী সেরিনাড)

কলাবৃত্ত মুক্তক
ব্যবহার সম্পর্কে
কবির মতবাদ

কলাবৃত্ত রীতির মুক্তক রচনা তেমন সফল হতে পারে না
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধদেব এ সম্পর্কে মন্তব্য
করেছেন,—

পয়ারের মতো স্বাধীনতা না থাকলেও মাত্রাবৃত্ত তার বাঁধনকে
অনেকখানি আলগা করে দিতে পারে বই কি এবং মুক্তকের উঁচু নিচু রাজ্যে
তার তিনমাত্রার নাচ দেখতে শুনতে ভালোই হয়।

(সাহিত্যচর্চা পৃ ১০৭)

‘কঙ্কাবতী’ কাব্যের একাধিক কবিতায় কবি এ রীতির পরীক্ষা করেছেন।

দলবৃত্ত রীতি

দলমাত্রক ছড়ার ছন্দ বুদ্ধদেব ব্যবহার করেছেন বটে তবু

‘গাষ্ঠীয় এ ছন্দের প্রকৃতিগত নয়’ এবং ‘অনেক ভাব এ ছন্দ বহন
করতে পারে না’ তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণেই এ ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেননি।
তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মন্তব্য করেছেন ‘পয়ারের পরেই ছড়ার ছন্দ। এই ছন্দই

২৬। সেরিনাদ

“Music played by a lover under his lady’s window at night.”

French sérénade, Lat serénus, Italian : Serenata.

(Chambers’ Dictionary)

২৭। তুলনীয়।

My heart is wasted with my woe

Oriana

There is no rest for me below

Oriana

When the long dun worlds are ribb’d

with snow

And loud the Norland whirlwinds blow,

Oriana

Alone I wonder to and fro

Oriana

(The Ballad of Oriana : Tennyson)

আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি।’ (দ্র দয়মন্তী : পৃ ৭৪)। এ ছন্দেও চলিত ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশে কবি কতটা সফল হয়েছেন তার একটি উদাহরণ তুলছি।—

কবি মশাই, অনেক তো ধান ভানলেন,
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক’রে,
ব্যাপারটা কী? আপনি হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে পড়ে?
ঠিক না? তা বলুন না সে কেমনতর?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোট্টে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন?

(শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর কবি মশাই)

ছড়ার লঘু
যতিস্পন্দ

বুদ্ধদেব বসু ‘বারোমাসের ছড়া’র কয়েকটি কবিতায়
লঘুযতিস্পন্দ ও মিলের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। কোথাও

কোথাও শিশু-কাকলির ফুলঝুরি সৃষ্টিতে তাঁর রচনা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন,—

এ কী
জোনাকি
তুই কখন
এলি বল তো।
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই?

(এই সারারাতজ্বলা চির দীপমালা দেয়ালি আলোয়)

(বারোমাসের ছড়া জোনাকি)

গদ্য কবিতা রচনাতেও বুদ্ধদেবের স্বকীয়তা রয়েছে। তাঁর

গদ্য কবিতা

‘তুমি যখন চুল খুলে দাও’, ‘এই শীতে’, ‘স্পর্শের প্রজ্বলন’ প্রভৃতি
কবিতায় (নতুন পাতা) ছোট ছোট বাক্যপর্বে আবেগস্পন্দিত

পদক্ষেপ চমৎকার ফুটে উঠেছে। বাক্যাংশের পুনরুক্তি ধ্বনি ও ভাবের আবর্তন সৃষ্টি করেছে। যেমন,—

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও

ভেসে আসে তোমার চুলের গন্ধ,
 গুনগুন করে গান করো তুমি
 ভয়ে আমার বুক কাঁপে।
 গুনগুন করে গান করো
 আমার পাশে বসে
 তোমার মুখ দেখা যায় না,
 বুকে এসে লাগে চুলের গন্ধ
 ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

(নতুন পাতা তুমি যখন চুল খুলে দাও)

এ যুগের অন্যান্য কবিদের মতো বুদ্ধদেবও গদ্য কবিতায়
 অন্তর্লীন মিল অন্তর্লীন অনুপ্রাস এনেছেন। দু একটি কবিতায় এই মিল অত্যন্ত
 সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন—

“তোমাকে ব’কে ক’রে তোমাকে বকে ভরে কাটে আমার রাত্রি।
 সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার মস্থিত মুহূর্তে
 থমকে দাঁড়ায়— যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
 কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

(নতুন পাতা জন্ম)

সমগ্র কবিতাটিতেই এমন মিলের সচেতন পরীক্ষা করেছেন কবি।

বুদ্ধদেব বসু ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। ছন্দে বাকধর্মী উচ্চারণ কতটা স্বাভাবিক
 ভাবে প্রকাশ করা চলে তার যেমন পরীক্ষা করেছেন, প্রাসঙ্গিক ভাবে একাধিক প্রবন্ধে
 ছন্দের রীতি ও বন্ধ সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন।^{২৮} এই সকল আলোচনা সর্বাংশে
 বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না সন্দেহের অবকাশ
 ছন্দ-সচেতনতা থাকলেও, নতুন কাব্য রচনায় বা আধুনিক কবিদের সমালোচনায়
 তিনি যে রবীন্দ্রোত্তর বাকধর্মী নব ছন্দরীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন

তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

আলোচ্য যুগের সঙ্গীতজ্ঞ-ছন্দসিক কবি দিলীপকুমার রায়ের
 (১৮৯৭-১৯৮২) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা পদ্যে ‘লঘু-গুরু’
 নাম দিয়ে সংস্কৃত ছন্দ যে বিশিষ্ট রীতিতে ব্যবহার করতে চেয়েছেন,
 ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। একটি পত্রে ‘লঘু-
 গুরু’ ছন্দ সম্পর্কে লিখেছেন,—

সংস্কৃত ব্রহ্মবীর্ষ
 উচ্চারণ সম্পর্কে
 দিলীপকুমার
 রায়ের মন্তব্য বিচার

২৮। ‘সাহিত্য চর্চা’, ‘দময়ন্তী’ (ভূমিকা), ‘কালের পুতুল’, ‘মেঘদূত’ (ভূমিকা) প্রভৃতি গ্রন্থ
 দ্রষ্টব্য।

“এ হচ্ছে সংস্কৃত ভাণ্ডা ছন্দ। অর্থাৎ এতে শুধু যুগ্মধ্বনিই দুমাত্রার মর্যাদা পাবে তাই নয়, এতে গুরু বর্ণও— (আ ঙ্গি উ এ ঐ ও ঔ)— টেনে দুমাত্রাকাল স্থায়ী হবে সর্বত্র। অ ই উ—অর্থাৎ লঘু স্বরবর্ণ— অবশ্যই এতেও একমাত্রা।”

[পত্রগুচ্ছ কল্পনাকুমারকে লেখা পত্র অনামী (১ম সং) পৃ. ৪০২]

অবশ্য ‘লঘু-গুরু’ ছন্দে কবিতা রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কবিতার ভূমিকায় আবার বলেছেন,—

...এ কয়টি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত— কিন্তু হুবহু সংস্কৃত ছন্দ নয়। তাই এ ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দ না বলে লঘু-গুরু ছন্দ বলাই ভালো।... সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে এর মিল এইখানে যে এ ছন্দের দীর্ঘ স্বরবর্ণ আ ঙ্গি উ এ ঐ ও ঔ— সংস্কৃত ছন্দের মতোই দুমাত্রা। অমিল এইখানে যে যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ সংস্কৃতে সর্বত্রই গুরু— দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে আর বাংলা (লঘু-গুরু) ছন্দে হয় বিকল্পে।... এক্ষেত্রে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে বাংলায় লঘু-গুরুতে এযাবৎ যত কবিতা রচিত হয়েছে তাতে এ রকম বৈকল্পিকতার চল আছে।... আমি সংস্কৃত ছন্দের হুবহু প্রবর্তন বাংলায় চাইনা। এমন কি স্থান বিশেষে দীর্ঘস্বর প্রচলিত প্রথমত হ্রস্ব উচ্চারিত হলেও আমার খুব আপত্তি নেই— যেমন বৈষ্ণবপদাবলীতে বহুস্থলে হয়।... আমি শুধু বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বরের উদাত্ত কল্লোলটুকু চাই মাত্র। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে করে বাংলা ছন্দে এক নতুন ধরনের গাভীর্য ও ঔদার্য আনবে।

(‘অনামী’ গ্রন্থের ভূমিকা)

সংস্কৃত গুরু স্বরবর্ণের সর্বক্ষেত্রে গুরু উচ্চারণ একান্তই কৃত্রিম। সর্বত্র একরূপ উচ্চারণ বাংলা ছন্দকে পঙ্গু করে দেয়। ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, হরগোবিন্দ প্রভৃতির প্রয়াস এই কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। দিলীপকুমার সে কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় ‘লঘু-গুরু’ কবিতা লিখতে গিয়ে সর্বত্র সংস্কৃত গুরুস্বরের বাংলায় গুরু উচ্চারণ আর চাননি। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে গুরু উচ্চারণ চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন পঞ্চচামর ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন।—

সু দূ র দীপ্তি — বি হু লা

হি র গ্যা-গ-ভ-ব ন্দিতা!

অ মা ত টু স মু ছ লা!

অ দ শ্য র শ্মি-র জি তা!

(রূপান্তর গৌরী)

এখানে ‘সুদূর’ ও ‘অমাতটে’ শব্দ দুটির উচ্চারণ ছন্দকে একান্তভাবে পঙ্গু করে তুলেছে। অনুরূপ তার ‘রুচিরা’, ‘মদিরা’ প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ রচনায়ও দুর্বলতা লক্ষিত হয়। বহু কবিতাতেই ‘লঘু-গুরু’ যে উচ্চারণ-নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন তেমনটি পাঠ করতে গেলে ছন্দ একান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের প্রথমে বা শেষে,— পর্বযতি বা পদযতির অবকাশে মুক্তদলের দীর্ঘ দ্বিকলা উচ্চারণ চলতে পারে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নজরুল ইসলাম তেমন কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। স্বয়ং দিলীপকুমারও যে তেমন ব্যবহার করেননি। তা নয়। যেমন,—

য শা ত প্ত যেজন গেহে কৃ ষ চ র ণ ডা কে ॥ হয়নি ক ল ক্ষি নী । স র্বা না শী ।

যেন) শে জ ফু লে নি তি ॥ স র্প স হে ।

মোর) পু ঙ্গ-বে দ ন তা রে ॥ বলতো কেমন ক’রে ॥ ব র্ণি লো সই—যেনা ॥

শুনল বাঁশি— ।

ই র্ষিত আ যতি ॥ ব্য র্থ ব হে? ।

এখানে (২) চ||চ||চ||৬ I চ||৫ I চ||৬ I মাত্রাভাগে ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন।

‘সেজফুলে নिति’, ‘ইর্ষিত আয়তি’ প্রভৃতি পদগুলির মুক্তদল-কলাপ্রসারণ অনেকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। তবে তার ফলেই এ-ছন্দে আবৃত্তিধর্মী পঠনভঙ্গির তুলনায় গীতিসুরধর্ম বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

দিলীপকুমার রায় যে উক্তি করেছেন “যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ সংস্কৃতে সর্বত্রই গুরু দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে আর বাংলা (লঘু-গুরু) ছন্দে হয় বিকল্পে”—এটি সমর্থনীয়

দিলীপকুমারের
মন্তব্য বিচার

নহে। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের মাঝে বা প্রথমে একমাত্রাক্রমে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ‘লঘু-গুরু’ ছন্দ মূলত প্রাচীন বিশিষ্ট উচ্চারণ-প্রভাবিত কলাবৃত্ত রীতিরই ছন্দ। সেখানে রুদ্ধদল (দিলীপবাবুর ভাষায় যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ) সর্বত্রই দীর্ঘ দ্বিমাত্রক রূপে

উচ্চারিত হয়। তিনি নিজেও ‘লঘু-গুরু’ উচ্চারণরীতিতে লিখিত প্রত্যেকটি কবিতায় রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক রূপেই ব্যবহার করেছেন, কোথাও বিকল্প একমাত্রক উচ্চারণ রাখেননি। সংস্কৃত ‘গুরুস্বরধ্বনি’ বলে নয়, যে কোনও মুক্তদল কলাবৃত্ত রীতিতে পর্ব, পদ বা পংক্তির যতিপ্রান্তে বা পর্বের একেবারে প্রথমে দীর্ঘ দ্বিমাত্রকরূপে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। তবে সে রীতি গানেই অধিকতর সুপ্রযুক্ত হতে পারে। মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণে ধ্বনি সুরাশ্রয়ী হয়, বিশুদ্ধ কবিতায় এই সুরের প্রাধান্য কৃত্রিম বলেই গণ্য হবে।

রুদ্ধদল-স্পন্দন বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) ‘নূতন খাতা’ (১৯২৩) কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। এখানে তার একটি ছন্দ-নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।—

কিরণধন
চট্টোপাধ্যায়

বেলফুল চাইনা জুইফুল দাও!
ও গানটা গেয়োনা এই গান গাও!
কেন ভালবাসলে বল বল না;
হাসলে কেন তুমি? কথা কব না!
কালকের গল্প আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা লাগছে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা এমনিই ভুল!

জুই বেল চামেলি যা খুসী তা দাও,
ও গালেতে চুমা খেলে এ গালেতে খাও ॥

(নূতন খাতা আবদারের আধঘণ্টা)

কবিতাটিতে একদিকে যেমন রুদ্রদল-বহুল চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ৪।৪।৪।২ I পর্ব-পদবিন্যাসে, প্রয়োজন মতো শব্দশেষে মুক্তদলের প্রসারণ ঘটেছে। কিন্তু কবির কৃতিত্ব এখানে যে, এই মাত্রাপ্রসারণ ভাবগত উচ্চারণের খাতিরেই তিনি এনেছেন। ছন্দকে নমনীয় করে ভাবের অনুগামী করেছেন।

কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) মৃদঙ্গ, কল্পলেখা, চিত্রপট এবং রূপছন্দা নামে চারিটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় তিনি বেশ মুগ্ধাআনার পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্রদলবহুল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সমিল মুক্তক বা বিচিত্র স্তবক-মিলের কলাবৃত্ত রচনায় তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর চতুষ্কলপর্বিক কলাবৃত্তে রচিত দ্বিপদী-চৌপদী মিশ্রিত একটি স্তবকের দৃষ্টান্ত তুলছি।—

গম্ভীর গর্জনে গগনের অঙ্গনে
হৃঙ্কারে মেঘদল, অন্ধ এ রাত্রি—
কে গো তুমি কোথা যাও কোন দূরযাত্রী!
বিদ্যুৎ মেঘ ছিড়ি অন্ধ তামস চিরি
উঁকি দেয় দুর্যোগ-বিবাহের পাত্রী।
কে গো তুমি কোথা যাও কোন দূর-যাত্রী!

(কল্পলেখা অভিসার)

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) একজন ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার আরবী ও ফারসী ছন্দ বাংলায় রূপান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

এখানে প্রথমে তাঁর একটি কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত সনেট এবং তারপর কয়েকটি আরবী ছন্দের বাংলারূপ উদ্ধৃত করা গেল।

আকাশ ভুবনে বসেছে যাদুর মেলা,
 নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর;
 রবি শশী তারা বজ্রাঙ্গা অশনি-খেলা,
 লুকোচুরি কত চলেছে নিরন্তর;
 আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারাবেলা,
 কিছু বুঝিনাকো— বিস্মিত অন্তর!
 হাসা-কাঁদা আর ভাঙা গড়া হেলা ফেলা
 সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মন্তর!
 কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
 পিতার ঘরের অনেক খবর জানো;
 কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে
 তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো!
 দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই,
 যাহা বলো, শুনি অবাধ হইয়া তাই!

কবি সর্বপ্রথম মূল আরবী ছন্দ-নির্দেশ এবং তার নীচে বাংলা অনুবাদ কবিতা দিয়েছেন। চিহ্ন সংকেত বর্ণের মাথায়। চিহ্ন দীর্ঘ উচ্চারণ জ্ঞাপক; পাশে। চিহ্ন পর্ব্যতিসূচক; পাশে — চিহ্ন টানা উচ্চারণ বোধক। অনুবাদ আরবী ছন্দের বাংলা তর্জমা কবিতাগুলি সর্বপ্রথম ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে ‘আরবী ছন্দের বাংলা তর্জমা’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি ১৯টি মূল ছন্দ এবং তার ৯১টি বৈচিত্র্যের বাংলা দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন। এখানে সাতটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

ফাউলুন | মফাঈলুন | ফাউলুন | মফাঈলুন
তবীল কানের দুল | চুড়ির শিঞ্জিন | কি সুন্দর | মনে বিনবিন |
কি সুন্দর | তোমার কেশপাশ | হৃদয় মোর || অধীর দিন দিন | |

ফাএলাতুন | ফাএলুন | ফাএলাতুন | ফাএলুন
মদীদ নাইক তুল মোর | প্রাণ-বঁধুর | চোখ জুড়ায় তার | অঙ্গ নূর; |
স্বর্গ কোন ঠাই | কোন সুদূর? | এই ত মোর ভাই | স্বর্গপুর | |

মসতাত্ফ আলুন | ফাএলুন | মসতাত্ফআলুন | ফাএলুন
বসীত মস্তুর পবন | বয় ধীরে | সন্ধ্যার আঁধার || দুই তীরে, |
তর তর তবীর | শির চলে | থমথম নদীর | বক চিরে | |

ওয়াফের মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন
 গভীর বেদনায় | হৃদয় ভেঙে যায় | পরাণ কাঁদে হয় |
 আকুল পিপাসায় I
 সফল আশা মোর | বিফল হল ভাই | জীবন রাখি আর |
 এখন কী আশায় I

ফা'লাতুন | ফা'লাতুন | মফাআলুন
 মদীদ-২ কোন বেদনায় | কাঁদছিস বল | শয়ন লুটি— I
 উচ্ছল জল— | ছল-ছল-ছল | নয়ন্ দুটি I

ফা'লুন | ফা'লুন | ফা'লুন | ফা'লুন
 মোতাদারেক-২ জয় হোক | দেশবীর | নির্ভীক | গান্ধীর I
 জেল-ঘর | হোক তার | মুক্তির | মন্দির! I

ফ'লুন | ফউলুন | ফ'লুন | ফউলুন
 মোতাকারিব-৪ মুখখান | গোলাপ ফুল | কেশ-পাশ | দোদুল-দুল, I
 টুক টুক | অধর কোণ | চুপন | দে বুলবুল I

‘মোতাকারিব’-এর ছয় প্রকারভেদ আছে। ইতিপূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের (পৃ ৮৩) এবং নজরুলের (পৃ ১৩০) ছন্দ আলোচনা কালে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃত এবং বিদেশী একাধিক ছন্দের রূপাদর্শ সত্যেন্দ্রনাথ রুদ্র-মুক্ত দল-বিন্যাসের সাহায্যে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন সে বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। নজরুল এবং গোলাম মোস্তাফা এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

কবি জসীম উদ্দীন (১৯০২-১৯৭৭) স্বকীয় রীতির পল্লী কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্রদল-সমন্বিত নতুন

গ্রামাশব্দ এবং পল্লীর কথ্যভাষা ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার পরিচয় জসীম উদ্দীন পাওয়া যায়। এখানে দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তের দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

কালো মেঘা নামো নামো ফুলতোলা মেঘ নামো,
 দলবৃত্ত ধূলট মেঘা; তুলট মেঘা; তোমরা সবে ঘামো!
 কানা মেঘা টলমল বারো মেঘার ভাই,
 আরও ফটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই!

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া!
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কোটা ভরা সিঁদূর দিব, সিঁদূর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়!

(নক্সী কঁথার মাঠ চার)

ষটকল-পর্বিক
কলাবৃত্ত

“কি কহিলা তুমি? গোরাচাঁদ রায়, বংশী রামের নাতি
—কঠিন হাতের থাপড়ে যাহার ভূমিতে লোটাত হাতি;
তার পোলা আমি কালাচাঁদ রায় বেঁচে আছি যতক্ষণ—
আমার তিরিরে ছিনায়ে লইবে কোথা রয় হেন জন?
কল্লাডা তার টান দিয়ে আমি ছিঁড়িতে পারিনে হাতে,—
হাড়ি তাহার ভাঙিতে পারিনে আছড়াতে আছড়াতে?”

(সোজনবাদিয়ার ঘাট ১ম সং পৃ. ১৪১)

প্রথমনাথ বিশী (১৯০২-১৯৮৫) ছন্দপ্রকৃতির কোনও নতুন পরীক্ষা না করলেও মিলবন্ধের দিক থেকে কিছু কিছু পাশ্চাত্য পদ্ধতির পরীক্ষা করেছেন। ‘মনজুয়ান’ কবিতাগুলো (‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত) বায়রণের Don Juan এর স্তবক মিল (কখকখকখগগ) দিয়েছেন। স্পেনসেরীয় স্তবক-মিলেও কবিতা লিখেছেন। সনেট রচনায় সুনির্দিষ্ট পেন্তার্কীয় বা শেকসপীয়রীয় রীতির অনুসরণ করে দূরাস্থিত মিশ্র মিলবিন্যাসের পরীক্ষা করেছেন। এখানে তাঁর দূরাস্থিত মিলের (প্রবহমান) একটি সনেট তুলছি।—

পশ্চিম দিগন্ত আমি জ্বলন্ত রবির
বাসনার চিতাশয্যা; তুমি সখী দূর
পর্ব বনাস্তুর রেখা — অতুল গভীর
রহস্যের অধিনেত্রী! মোরে দন্ধ করি
জ্বালাই বহির শিখা — তারি দৃশ্য রাগে
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্ছায় বিধুর।
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবস শব্দী;
দেখনা দেখার প্রাস্তে তব মূর্তি জাগে।
কোথা তুমি, কোথা আমি শূন্যতা অগাধ,
বুকে বুকে পরশন ঘটিলনা কভু!
কেবল চুলের গন্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর,
শুধু সৌন্দর্যের কণা — কষায় মধুর।

মিল

ক

খ

ক

গ

ঘ

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

খ

খ

উঠিল গভীর রাত্রে দ্বাদশীর চাঁদ—

ঙ

অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দৌঁছে তবু।

চ

(আধুনিক বাংলা কবিতা প্রাচীন আসামী হইতে)

এযুগের কয়েকজন কবির মতো প্রমথনাথ কিছু সার্থক মূল্যক এবং গদ্য কবিতাও রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে আবেগপ্রধান বাক্যপথে তাঁর গদ্য কবিতা সফল হতে পেরেছে বলা চলে।

মোহিতলালের মতো আব্দুল কাদিরও (১৯০৬-১৯৮৫?) একজন বিশিষ্ট কবি-ছান্দসিক। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল, দিলরুবা এবং উত্তর বসন্ত। কবিতায় তিনি মুখ্যতঃ

আব্দুল কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। সনেটের গঠনভঙ্গি ও
কাদির মিলবিন্যাস নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা করেছেন। মোহিতলালের মতো
আঠারো কলামাত্রক পংক্তির সনেট রচনায় তাঁর প্রবণতা লক্ষিত
হয়। ইংরেজ সনেটকার রসেটির আদর্শে রচিত তাঁর একটি ষোল-পংক্তিক ‘প্রলসিত
সনেট’ (?) এখানে উদ্ধৃত করছি।—

আনন্দ কুহকে ভুলি’ আজো পথে ফিরি উদাসীন,
তঙ্গীর তনুর গন্ধ আজো মোরে করিছে উন্মনা;
তপ্ত জীবনের তীরে কাঁদে কত অতৃপ্ত কামনা—
বাসনা-বুদ্ধদ নিত্য হৃদয়ের সমুদ্রে নিলীন।
কমকান্তি কামিনীর কঙ্কণের ক্ষীণ বিনিঠিন
সহসা শোণিতে মোর সঞ্চারিয়া দেয় অগ্নিকণা,
প্রিয়ার ললিত হাস্যে বিগলিত বীণার মূর্ছনা—
কোমল নয়নে তাঁর হেরি কভু জ্বকুটি কঠিন॥

প্রলসিত
সনেট (?)

রমণী-রভস লাগি’ জাগি দীর্ঘ বিরহ রজনী,
প্রথম চূপন-রাগ আঁকি তা’র স্ফুরিত অধরে,—
স্বর্গ করি’ সৃজি আমি স্পন্দ দিয়া আমার ভুবন।
রতি-আরাধনা করি’ এ-জীবন ধন্য ব’লে গগি,
সুন্দরের শয্যা রচি প্রেয়সীর গীন পয়োধরে,
দেহের আধারে করি অমর্ত্যের সুধা আস্বাদন॥

বাসনার বহ্নিরসে ভরিয়াছি প্রাণের ভূঙ্গার;
দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েছি সে সৌভাগ্য আমার॥

(উত্তর বসন্ত রতি আরাধনা)

এই ষোল পংক্তির কবিতাকে সনেট বলতে হলে, প্রশ্ন উঠবে, বারো, আঠারো বা বিশ পংক্তিক ভাব-সংহত কবিতাকেও এক এক ধরনের সনেট আখ্যা দিতে বাধা কোথায়?

সনেটকে চতুর্দশ পংক্তিমাপের বাইরে টেনে আনা বোধহয় সঙ্গত বা নিরাপদ নয়।

আব্দুল কাদির সুদীর্ঘকাল ধরে ছন্দচর্চা করেছেন। বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকায় (ঢাকা, বাংলাদেশ) প্রকাশিত তার গবেষণাধর্মী দুটি রচনা ‘ছন্দ বিবর্তনের ধারা’ এবং ‘বাংলা ছন্দের বিবর্তন’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

কবি অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯) প্রধান তিনটি ছন্দ-প্রকৃতিতেই আকৃতিগত কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। লঘু যতি ও মিলের সাহায্যে কিছু কিছু ছড়াজাতীয় কবিতায় চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে কলাবৃত্ত চতুর্মাত্রা-পর্বক একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

অজিত দত্ত

কলাবৃত্ত:
চতুর্মাত্রা
পর্ব

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?

পাথর চিবিয়ে আছে অভোস?

নইলে

রইলে

ভাত না খেয়ে,

চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

(আধুনিক বাংলা কবিতা নইলে)

এখানে ‘সব বেশ’ এবং ‘অভোস’ শব্দমিলেও কবি নূতনত্ব দেখিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বহু কবির রচনায়ও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-আদর্শে মুক্তক এবং গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে এ যুগে কবিদের পদ-রচনায় যেমন বিপুল বৈচিত্র্যধর্মী প্রয়াস দেখা দিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শ গ্রহণে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বৃন্দদেব বসু এবং বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণের দৃষ্টান্তও কম নয়। বাহ্যল্যবোধে আর উদাহরণ বাড়াবার লোভ সংবরণ করছি। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভৃতি তরুণতর প্রতিভাবান কবিদের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য অনেকাংশে এই যুগেরই পদাঙ্ক

সাম্প্রতিক
কবিদের ক্ষেত্রে
যুগ-ভাগের
যৌক্তিকতা

অনুসরণ করে চলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে, ‘রবীন্দ্রোত্তর যুগ’ পরিচয়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। ভাবগত দিকে এবং ছন্দের আঙ্গিকের দিকে দুই যুগের মধ্যে স্পষ্টতর সীমারেখা টানা কষ্টকর,—কিছুটা কৃত্রিমও বটে। এই যুগের অধিকাংশ কবিই পরবর্তী যুগে পৌঁছে আরও নতুন নতুন রীতিতে কবিতা করে চলেছেন।

জীবিত, পূর্ণ সৃজনশীল কবিদের ক্ষেত্রে এমনতর সীমারেখা টানা সঙ্গত কিনা সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই যাঁরা তাঁদের প্রতিভার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, আলোচনার সুবিধার জন্যে তাঁদের এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

এবারে আলোচিত এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে।—

(১) অন্ত্যপর্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক রচনায় আরও পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লৌকিক দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পংক্তি-মিলহীন মুক্তক লিখেছেন।

সর্বোপরি, এ-যুগেই গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তন করেছেন। ‘অতিনিরূপিত’ যতি ও মাত্রার বন্ধন-মোচনে গদ্যকবিতাকেই ছন্দোমুক্তির পরিণত পর্যায় বলা চলে।

এই যুগে কবি লঘু যতিস্পন্দে এবং মিল-অনুপ্রাসের ধ্বনি সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ রুদ্ধদলবহুল কিছু শিশুপাঠ্য ছড়া রচনা করেছেন।

(২) প্রত্যেক যুগে কিছু সংখ্যক শক্তিমান কবির মধ্যেও রীতি ও ভাবগত পিছুটান লক্ষ করা যায়। এই যুগে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের কাব্যছন্দে সাম্প্রতিক যুগের তুলনায় পূর্বযুগের (রবীন্দ্র যুগ আদি ও মধ্য পর্ব) প্রভাব বেশী লক্ষিত হয়। করুণানিধান কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি বেশী আনুগত্য দেখিয়েছেন।— এ ছন্দের বাকধর্মী প্রকাশে নূতনত্বও দেখিয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন লৌকিক দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতি বেশী প্রয়োগ করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও তাঁর ছন্দে মৌলিকত্ব বিশেষ লক্ষিত হয় না।

করুণানিধান বা কুমুদরঞ্জনের তুলনায় কবি কালিদাস রায় আধুনিক ছন্দমুক্তিধারার সঙ্গে বেশী সংযোগ রেখেছেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার এবং মুক্তক ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছন্দপ্রভাব তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবপদের ছন্দও তিনি ধ্বনি-অনুপ্রাসের চমৎকারিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কালিদাস রায় প্রাচীন বাংলা ছন্দের আলোচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) মোহিতলাল মজুমদার ছন্দের ক্ষেত্রে ক্লাসিক রীতির দৃঢ়বদ্ধতাই পছন্দ করতেন। সনেটে এবং অন্যান্য স্তবকবন্ধে তিনি ইউরোপীয় রীতির মিলবিন্যাস বাংলায় আমদানী করেছেন। তেজরিমা, স্পেনসেরীয় স্তবক, ব্যালাদে-এ ডাবল রিফ্রেন (Ballade a Double Refrain) প্রভৃতি স্তবক-মিলে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। সনেটে তিনি পেত্রার্কীয় রীতির অনুরাগী ছিলেন। মোহিতলাল নিজে ছান্দসিক ছিলেন। ‘বাংলা কবিতার ছন্দ’ গ্রন্থে ছন্দের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন।

(৪) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রধান তিনটি রীতির ছন্দ ব্যবহার করলেও ছয় ও চার মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে মুক্তক এবং গদ্যকবিতার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যকবিতায় মাঝে মাঝে সুপরিচিত রবীন্দ্রপদ্যপংক্তি এনে নতুন পরীক্ষা করেছেন।

(৫) নজরুল ইসলাম, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের ধারা পুরোপুরি অনুসরণ না করলেও বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায়তা করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দ তাঁর কাব্যে বাকধর্মী উচ্চারণের এক নতুন শক্তি লাভ করেছে (দ্র অগ্নিবীণা)। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং সুকুমার রায়ের অনুসরণে শিশুপাঠ্য কবিতায় নজরুল মিল, যতি ও রুদ্ধদলের লঘু-তরঙ্গিত স্পন্দন-মাধুর্য এনে দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন।

(৬) জীবনানন্দ দাশ প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য বিভিন্ন মিলের স্তবক রচনায় (ব্যালাড, স্পেনসেরীয় স্তবক, তেজরিমা ইত্যাদি) এবং নতুন

রীতির সনেট রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মুক্তক ও গদ্যকবিতা রচনায় রবীন্দ্র-আদর্শের অনুসরণ করেছেন।

(৭) সজনীকান্ত দাস ছন্দের মৌলিক পরীক্ষা না করলেও চর্যাপদ থেকে সমর সেনের গদ্য কবিতা পর্যন্ত ছন্দের সমগ্র বিবর্তন ধারাটি সযত্নে নিজস্ব ভঙ্গিতে উদাহরণের সাহায্যে ('ভাব ও ছন্দ' দ্র) দেখিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রুদ্রদল-বহুল সুমিত শব্দ ব্যবহারে কাব্যে ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্য সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ছন্দোবন্ধে তিনি পূর্ব ঐতিহ্যের পূজারী ছিলেন। নিপুণ এবং মিত শব্দশিল্পী হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। শব্দচয়ন ও ভাবগাঙ্ঘীর্যে তিনি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী বলা যেতে পারে। সচেতন রবীন্দ্র-অনুকৃতি তাঁর ছন্দে লক্ষণীয়।

(৯) কবি অমিয় চক্রবর্তী বাংলা পদ্যে ছন্দমুক্তির নানা পরীক্ষা করেছেন। ইংরেজ কবি জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের 'স্প্রাং রিদম' (Sprung rhythm)-এর আদর্শ নিয়ে তিনি বাংলা ছন্দে নতুনতর পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছেন।

(১০) প্রেমেন্দ্র মিত্র দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত ছন্দে স্বচ্ছন্দ চলতি ভাষা ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। মিলবিহীন দলবৃত্ত মুক্তক রচনায় তিনি বিশেষভাবে সফল হয়েছেন। কলাবৃত্তের যতিভাগ, মাত্রাপ্রসারণ এবং মিলবিন্যাসে তিনি নূতনত্ব দেখিয়েছেন। এ ছন্দে নজরুলের মত বলিষ্ঠ ও উদাত্ত প্রকাশভঙ্গি তিনিও আয়ত্ত্ব করেছেন।

(১১) অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবন্ধে, বিশেষ করে কয়েকটি বিদেশী ছন্দোবন্ধে (যেমন ক্লেরিহিউ, লিমেরিক) চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

(১২) বুদ্ধদেব বসু ছন্দে বাকরীতির প্রয়োগে সফল হয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত — তিন রীতির ছন্দেই প্রয়োজনমত শিথিল উচ্চারণ এনে স্বাভাবিক চলতি ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিদেশী ছন্দ-মিলের প্রয়োগ, ছড়াজাতীয় কবিতার লঘু যতিভাগ ও ধ্বনিস্পন্দে, গদ্য কবিতার ভাববাহী বাকপর্ব বিন্যাসে, প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস ব্যবহারে তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

(১৩) দিলীপকুমার রায় বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের নতুন পরীক্ষা করেছেন। মুক্তদলের গুরু উচ্চারণে তিনি সংস্কৃত ছন্দের 'কল্লোল' বাংলা পদ্যে আনবার চেষ্টা করেছেন। ছান্দসিক-সংগীতকার দিলীপকুমার বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও (ছান্দসিকী) রচনা করেছেন।

(১৪) কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ভাবগত প্রয়োজনে কলাবৃত্তে মাত্রাপ্রসারণ ঘটিয়ে ছন্দকে নমনীয়তা দিয়েছেন।

(১৫) শাহাদাৎ হোসেন কলাবৃত্তে যুগপৎ পর্ব- ও পদ-যতি রেখে যুক্তবর্ণবহুল রুদ্রদলের সার্থক ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

(১৬) গোলাম মোস্তাফা ষটকলপর্বিক কলাবৃত্তে সনেট এবং আরবী ছন্দের রূপাদর্শে রুদ্ৰমুক্ত দলবিন্যাসের কলাবৃত্ত রচনায় ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

(১৭) জসীমউদদীন পল্লী কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ও ষটকল পর্বিক কলাবৃত্তের ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

(১৮) প্রমথনাথ বিশী স্তবক রচনায় মিলবন্ধে এবং সনেট রচনায় পাশ্চাত্য কবিদের কিছুটা অনুসরণ করেছেন।

(১৯) কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। রসেটির আদর্শে ষোল-পংক্তিক ‘প্রলস্কিত সনেট’ (?) লিখেছেন।

(২০) এযুগে কবিরা বৈদেশিক নানা ছন্দোবন্ধ ও মিলবিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।— এযুগের শেষ দিকে ছন্দে ভাবমুক্তির প্রয়াস, বিশেষ করে বাকধর্মী উচ্চারণের শৈথিল্য, বাংলা কাব্যে নব আঙ্গিকের সূচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর যুগ ১৯৪১-১৯৫৮

রবীন্দ্র-তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও বাংলা কাব্যে বিশেষত ছন্দের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও প্রতিভাবান কবির এখনো আবির্ভাব ঘটেনি। কাব্যের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ভাব ও ছন্দের ক্ষেত্রে নবীন সম্ভাবনার সূচনা আজও নানাদিকেই লক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রোত্তর পূর্ণাঙ্গ কোনও নতুন রীতি গড়ে উঠতে পারেনি।

এ-যুগেও একদল কবি পূর্ববর্তী যুগের অনুসরণে গতানুগতিক ধারায় ছন্দ-আঙ্গিক মেনে চলেছেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ, নবীন এক কবিগোষ্ঠী ছন্দে ভাবমুক্তির শতাব্দীকাল-ব্যাপী প্রয়াসকেই আরও নতুন পথে চালনার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রচনায় প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল (১) সুনির্দিষ্ট পদবন্ধের আঙ্গিকে সুমিত ধ্বনি-সমৃদ্ধ শব্দ-গ্রন্থন, (২) চলিত ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োজনে বাকধর্মী স্ভাবিক উচ্চারণের উদ্দেশ্যে ছন্দরীতির শিথিল প্রয়োগ, (৩) পংক্তিবিন্যাসে মিল ও অমিলের মিশ্রণ, এবং ধ্বনি-সমৃদ্ধির জন্য অন্তর্মিল ব্যবহার, (৪) ছন্দের গঠনরূপে প্রয়োজনানুগ শৈথিল্য এনে চলতি বাকরীতির পরিস্ফুটন, (৫) মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দ-মধ্য অযুক্তবর্ণে লিখিত) রুদ্ধদলের একমাত্রক সংশ্লিষ্ট স্ভাবিক উচ্চারণ, (৬) বিদেশী বিচিত্র মিলবিন্যাসে স্তবক গঠন, (৭) কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতির (সমিল বা অমিল পংক্তিবন্ধ) ছন্দে প্রবহমানতা আনবার প্রচেষ্টা, (৮) গদ্য কবিতায় ছন্দের দিক থেকে বেশী গদ্যধর্ম প্রয়োগ; সুপরিচিত পদ্য-পংক্তি ব্যবহারে চমক সৃষ্টি।— এই সব রীতিগত নতুন পরীক্ষায় সম্মোহক রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের সচেতন প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু নতুন সূহ ও সুস্পষ্ট প্রত্যয়বোধের অভাবও সেখানে পরিস্ফুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হতে গিয়ে কবিরা বৈদেশিক প্রভাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ফলকথা, কাব্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, বিশেষত ছন্দের ক্ষেত্রে নতুনের আভাস সূচিত হলেও তার বলিষ্ঠ প্রত্যয়িত পদক্ষেপ এখনও ঘটেনি।

পূর্ববর্তী যুগের জীবিত অধিকাংশ কবিই আলোচ্য যুগেও তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাব্য চর্চা করে চলেছেন। নতুন কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) এবং সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭) নামোল্লেখ করতে হয়। নিশিকান্ত (১৯০৯-১৯৭৩), অশোক বিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-১৯৯৪), সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১৯১৯), নীৰব চক্রবর্তী (১৯২৪), সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

প্রভৃতি কবিদেরও ছন্দ সচেতনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁরা প্রায় সকলেই পূর্ববর্তী যুগ থেকেই পদ্য রচনা শুরু করেছেন, তবে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যধর্মী রচনা এযুগেই বেশী মেলে।— সেদিক থেকে বিচারে এঁদের আলোচ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তেমনি সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি আলোচ্য যুগেও ছন্দের দিক থেকে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ পদ্য রচনা করে চলেছেন; তবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ পূর্ববর্তী যুগেই হয়েছে বলে তাঁদের আলোচনা পূর্ববর্তী যুগের (রবীন্দ্র যুগ : অন্ত্যপর্ব) অন্তর্ভুক্ত করেছি। আসলে, আলোচ্য যুগকে অনেকাংশে পূর্ববর্তী যুগেরই পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে।

ছন্দের দিক থেকে বিচারে কবি বিষ্ণু দে এই যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারেন। তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। বিদেশী কবিদের বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ তিনি বাংলায় প্রয়োগ করেছেন। ছন্দে বাক্ধর্মী চলিত ভাষার আমেজ রক্ষায় সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন। সনেটে কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগে এবং মিলবিন্যাসে স্বকীয়তা এনেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দ-মধ্য অযুক্তবর্ণে লেখা) রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দৃঢ়বদ্ধতা এনেছেন। গদ্য-কবিতার বাক-পর্বিক বিন্যাসে মাঝে মাঝে পরিচিত পদ্যপংক্তি ব্যবহারে ভাব ও ছন্দের ক্ষেত্রে আকস্মিক চমক সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এবং বিদেশী কবিদের আদর্শে একই কবিতায় বিভিন্ন স্তবকে বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ, বিভিন্ন পর্বভাগ এমনকি ছন্দ-প্রকৃতিরও ব্যবহার করেছেন।

বিদেশী স্তবক-বন্ধের মধ্যে কবি ভিলানেল (Villanelle), ব্যালাদ (Ballade), সেসটিনা (Sestina) এবং ট্রিয়োলেট (Triolet) রচনার পরীক্ষা করেছেন।

ভিলানেল রচনা প্রথম শুরু হয় ফ্রান্সে, ১৮৯০-তে। এ ছন্দের স্তবকবন্ধে পংক্তিমিল বিন্যাস হল কখক, কখক,... এই পর্যায়ে কেবল শেষ স্তবকে চারটি পংক্তি থাকে কখকক মিল-বিন্যাসে। কবি এখানে কখক মিলে পাঁচটি ত্রিপংক্তিক স্তবক শেষে কখকক মিলের একটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি কলাবৃত্ত রীতির সাতমাত্রার পর্বে (৩, ৪।৩, ৪ I) রচিত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করছি

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী ফুলে।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওয়া আসা,

জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কূলে।

সে তরু এ হৃদয়, তুমি সে তরুমূলে
বসেছো ফুল সাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কূলে।

(বিষ্ণু দেব শ্রেষ্ঠ কবিতা ভিলানেল)

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব রয়েছে। এ ছন্দোবন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম ও শেষ স্তবকে ব্যবহৃত দুটি পংক্তির একটি করে অন্যান্য প্রত্যেক স্তবকেই ফিরে ফিরে এসেছে। মিলের প্রসঙ্গতা এবং সেইসঙ্গে একটি বিশেষ ভাবের আবর্তন এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

ফরাসী ব্যালাদ (Ballade) কবিতার স্তবকাদর্শে বিষ্ণু দে ‘বালাদা— লুই আরাগঁর জন্ম’ কবিতাটি (দু বিষ্ণু দেব শ্রেষ্ঠ কবিতা) লিখেছেন। এর প্রথম আট পংক্তিক স্তবকগুলির মিল হল কখকখখগখগ; শেষ স্তবকে দশ পংক্তি বিন্যস্ত হয়, মিল কখকখখগখগখগ; ষটপংক্তিক ছয়টি স্তবকে ‘সেসটিনা’ (Sestina) রচিত হয়। ছয়টি স্তবকের পংক্তি-মিলক্রম হল :

ক খ গ ঘ ঙ চ	১ম স্তবক
চ ক ঙ খ ঘ গ	২য়
গ চ ঘ ক খ ঙ	৩য়
ঙ গ খ চ ক ঘ	৪র্থ
ঘ ঙ ক গ চ খ	৫ম
খ ঘ চ ঙ গ ক	৬ষ্ঠ

কবির ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘বারোমাস্যার’ দ্বাদশ সংখ্যক কবিতাটি এই ছন্দে লিখিত।

ট্রিয়োলেট (পংক্তিমিল : কখকককখকখ) বাংলায় প্রমথ চৌধুরী প্রথম লিখেছিলেন। বিষ্ণু দে একাধিক কবিতায় এই ছন্দমিল প্রয়োগ করেছেন। যেমন, ফ্রানচেসকা (হে বিদেশী ফুল), ট্রিয়োলেট গুচ্ছ (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)।

বিষ্ণু দে অনেকগুলি অনুবাদ সনেট-সহ বেশ কিছু বাংলা সনেট লিখেছেন। পেত্রার্কীয়, শেকসপীয়রীয় এবং স্বাধীন মিলের সনেট রচনায় তাঁর কিছু অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। কলাবৃত্ত রীতিতে সনেট লিখতে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ এমন কি মোহিতলালও প্রয়াসী হননি।— বিষ্ণু দে সে প্রচেষ্টা করেছেন। যেমন,—

প্রণয় পালালো প্রচণ্ড দ্রাব ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মস্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপত্নী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতাল ফাটানো হাসে
 বালির পাহাড় ধামাচাপা গীতাভাষ্য।
 খেপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি?
 জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পল্ল
 আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
 বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
 ছিন্নকল্ল দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচার আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
 শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু মিত্র।

(বি. শ্রে. ক. ১৯৩৭)

এখানে মিলবিন্যাসেও বিষ্ণু দে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; অন্ত্য স্রবধ্বনির মিলের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিতে মাত্র মিল রেখেছেন। তাতেও ধ্বনিঅনুপ্রাস চমৎকার ফুটে উঠেছে। শেকসপীয়রীয় রীতিতে ৪, ৪, ৪, ২ — পংক্তিভাগে চারটি শব্দক রেখেছেন, তবে মিলবিন্যাসে আরও স্বাধীন রীতি গ্রহণ করেছেন।— সনেট হিসাবে কবিতাটির ভাবসৌন্দর্যও কম নয়।

মিল-বৈচিত্র্যে বিষ্ণু দে'র কবিতা ঐশ্বর্যময়। কলাবৃত্তে রচিত আটমাত্রা পংক্তিবন্ধের একটি কবিতা থেকে বিচিত্র মিলের দুটি শব্দক উদ্ধৃত করছি।—

তবু আজ মেলে ডানা
 তোমার স্বপ্ন যত।
 নেভানো তন্দ্রাহত
 শহরে দিচ্ছে হানা
 সোনালি ঈগল যত।

শূন্যের নীলিমায়
 আকাশও মৃত্যুনীল,
 ছিড়ে গেছে সব মিল,
 তবুও খুঁজি তোমায়
 যদিও আয়ু বিমায়
 স্নগ্ন সত্য যদি
 হয়ে ওঠে সাবলীল।

(বি. শ্রে. ক. সোনালী ঈগল)

এবারে কলাবৃত্তের ছয়মাত্রা পর্বে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি শব্দক উদ্ধৃত করছি।—

১

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসী খানি
বল তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন?

২

হিরণ পাত্রে রূপালি ঢাকনা পাতা
এই আসা এই যাওয়া
তবুও তোমার যাওয়ার আসার পথেই
অন্ততঃ এক আধটা স্বপ্ন দিয়ে।

১৬

দারোগা সাহেব
একি সুখবর বদলি হলেন!
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম,
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিনতো কাপড়?

(বি. শ্রে. ক. ছত্রিশগড়ী গান)

রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রা-পর্বে কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকের পরীক্ষা করেছিলেন মাত্র।^১ এ-যুগে নবীন কবিরা সে রীতি আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। পূর্বেই বলেছি, দীর্ঘ পদ-বিন্যাসের মিশ্রবৃত্ত রীতিতে মুক্তকের ভাবমুক্তি-প্রয়াস যতটা স্বাভাবিক হয়, কলাবৃত্ত অথবা লৌকিক দলবৃত্তের লঘু সুনির্দিষ্ট পর্বভাগে ভাবের সেই প্রবহমানতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। নবীন কবিরাও সে বাধা অতিক্রম করতে পারেননি। কলাবৃত্ত মুক্তকাভাসিত ছন্দের দিক থেকে কবির ‘ক্রেসিডা’ (সমিল) এবং ‘ঘোড়সওয়ার (সমিল) কবিতা দুটি (দ্র. বিষ্ণু দে’র শ্রেষ্ঠ কবিতা) উল্লেখযোগ্য।

অন্ত্যপর্বের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছন্দ-প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন।^২ বিষ্ণু দে অনুরূপ রীতির কবিতা লিখেছেন। যেমন, একটি কবিতার সূচনা করেছেন মিশ্রবৃত্ত রীতিতে,—

১। কলাবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রা পর্বের অমিল মুক্তক রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ একটিই মাত্র লিখেছেন (দ্র. ব্যথিতা সানাই, রচনার তারিখ জানুয়ারী ১৯৪০)। অবশ্য ইতিপূর্বেই তিনি দূরদৃষ্টি মিলে অনুরূপ কলাবৃত্ত রীতির ষট্‌মাত্রক আর একটি কবিতা (দ্র. উদবৃত্ত সানাই, রচনার তারিখ ৩০/৯/৩৯) লিখেছিলেন।

২। পৃথ্বী কাব্যের অন্তর্গত আশা, ঝড়, আকন্দ, চিঠি প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সূচত্বর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

আবার পরবর্তী অংশে কলাবৃত্ত রীতিতে লিখেছেন,—

বলো ভাববেনা পাগল সং? আচ্ছা না হয় হেসো।
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়।
অলকা, আমার দিন রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন।

(বি. শ্রে. ক. জন্মাস্তমী)

মিশ্রবৃত্ত প্রকৃতিতে শব্দের মাঝে, অযুক্ত বর্ণে লেখা রুদ্ধদল রবীন্দ্রনাথ বহু সময়ে দ্বিমাত্রক গণ্য করলেও, সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণ যে চলতে পারে শেষ জীবনের কিছু কবিতায় তার সার্থক পরীক্ষা করেছেন। আমাদের মতে, শব্দের মাঝে অযুক্ত বর্ণে লেখা রুদ্ধদলের একমাত্রক প্রয়োগই অভিপ্রেত ;— তাতেই এ ছন্দের উচ্চারণ-দৃঢ়তা পরিস্ফুট হতে পারে। আলোচ্য যুগে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চত্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা অনেকাংশে এই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রয়োগ করেছেন। এখানে বিষ্ণু দে'র কবিতা থেকে দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—

- (১) বয়স হয়েছে ঢের, 'পেনসনই' তো পাঁচিশ বছর।
- (২) 'কর্ম সবই' পণ্ডশ্রম, 'চাকরী' সে তো পেটের চাহিদা,
- (৩) করিনি 'তছনছ' কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর।

(সন্দীপের চর আইসারের খেদ)

বিষ্ণু দে বেশ কিছু গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের '২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮' কবিতাটির মতো বিষ্ণু দে'র 'টপ্পা ঠুংরি' কবিতাটির ছন্দেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গদ্যকবিতার মাঝে মাঝে পদ্যের সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগের পংক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উদাত্ত
ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়।
ওপারে ষ্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর
ট্যাক্সির হৃদস্পন্দে, ট্রাফিকের এটাক্সিয়ায়।
এলো ট্রেন
মস্তি করে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মস্তি ক'রে
দেখলুম তোমার ক্লোজ-অপ মুখ জানলায়,

—একটা কুলি—

শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

(আ. বা. ক. টপ্পা-ঠংরি)

যতীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে'র গদ্য কবিতার বাকপর্ব-বিন্যাসে ভাবগত কিছু পার্থক্য আছে। তবে এক জায়গায় উভয়েরই মিল রয়েছে, সুপরিচিত রবীন্দ্র-কবিতা-পংক্তি উভয়েই এই নতুন গদ্য কবিতার মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। পাঠকেরা তাঁদের অতি পরিচিত রবীন্দ্র-কাব্য-পংক্তি অপরিচিত কবিতার মধ্যে আবিষ্কার করে তার ছন্দস্পন্দ সহজেই ধরতে পারবেন— এই প্রত্যাশা বোধহয় উভয় কবিকে একই আঙ্গিক ব্যবহারে উদ্ধুদ্ধ করেছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) এ-যুগে অন্যতম শক্তিমান ছন্দকুশলী কবিরূপে সমাদর লাভ করেছেন। প্রচলিত মুখ্য তিনটি ছন্দপ্রকৃতির ব্যবহারেই তাঁর কুশলতা লক্ষ করা যায়।

সর্বপ্রথম তাঁর একটি যতিপ্রান্তিক পংক্তি-মিলবিহীন কলাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ তুলছি।—

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরোনো সূর ফেরিওয়ালার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের-আলো-জ্বালা এ-দিন শেষে।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বধু)

পাঁচমাত্রা পর্বভাগে কবি এখানে চমৎকার মিলহীন স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন।

‘লাইন ডিঙানো’ ভাবের প্রবহমানতা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে যত স্বাভাবিক হতে পারে, কলাবৃত্তে অথবা লৌকিক দলবৃত্তে তেমনটি হওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ পদভাগে বিন্যস্ত মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ভাবযতি অনুসারে ছন্দযতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লঘুযতিভাগের কলাবৃত্ত বা লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে এই ভাবমুক্তির-প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যাহত হয়। তবু আধুনিক কবিরা কলাবৃত্ত ছন্দে ‘লাইন ডিঙানো’ ভাবের প্রবহমানতা আনবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করে চলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

শ্রীমতী আমার অরণ্য স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাইতো
ওঁ তৎসৎ, — প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে

গ্লেশিয়ার দিন। পেশোয়ারীদের

করকমলেই ভবলীলা শেষ।

(সু. ক. পদাতিক)

ছন্দ এখানে প্রবহমান রাখলেও ভাবের পূর্ণ্যতি কবিকে ছয়মাত্রার পূর্ণপর্বেই সর্বদা দিতে হয়েছে।— তার ফলে মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান রীতির তুলনায় এ ছন্দে প্রবহমানতা অনেক কমে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিপূর্বেই প্রমাণ দিয়েছেন কলাবৃত্ত রীতির ছন্দেও উদাত্ত ভাবস্পন্দ সার্থকভাবে পরিস্ফুট করা যায়। কলাবৃত্ত অমিল মুক্তক রচনায় উদাত্ত ভাবস্পন্দ কবি সুভাষও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।—

অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দূরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপাগি

খুন হয়ে যায় শাদা শাদা ফেনা

ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের

ক্ষুরধার তলোয়ার।

(সু. ক. অগ্নিকোণ)

বাকধর্মী চলতি ভাষার পদগঠনে কলাবৃত্ত ছন্দকে কবি কত স্নাত্ত্বিকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তারও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,—

এক কবি।

তিনি পরতেন চুপি চুপি

লম্বা মেঘের পাজামা।

ঝড় ঝঞ্ঝার ফুঁ দিয়ে

যখন ইচ্ছে বজ্রে

বাজাতেন তিনি

প্রকাণ্ড এক দামামা—

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই

মাটিতেই তাঁর

ছিল পা।

এক কবি।

ছিল আকাশটা তাঁর টুপি

সমুদ্রে তিনি শুতেন।

আলো রাখতেন নুকিয়ে

অন্ধকারের গর্তে।

ভবিষ্যৎকে

হাত বাড়িয়েই ছুঁতেন—

পৃথিবীও তাকে ভালোবেসেছিল খুবই—

মাটি দিল তাঁকে

শিরোপা।

(সু. ক. ছিটমহল)

উদ্ধৃত দুটি স্তবকে একই পর্যায়ের মিল এবং যতি রেখেছেন। পড়তে পড়তে ছন্দ-সচেতন পাঠককেও ভাবতে হয়, সত্যিই কবিতাটি ছয়মাত্রা পর্বের কলাবৃত্তে রচিত কিনা।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, মিশ্রবৃত্তে শব্দের মাঝে অযুক্তবর্ণে লেখা রুদ্রদলের সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ সাম্প্রতিক কালের কবিতায় কিছু কিছু দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ (অন্ত্যপর্ব), অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায় এই সংশ্লিষ্ট রীতির উচ্চারণ কিছু পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই রীতির দ্বিধাহীন দৃঢ় উচ্চারণ লক্ষণীয়। পয়ার পংক্তি রচনায় বেশ স্বচ্ছন্দেই তিনি লিখেছেন,—

(ক) পদার্য সর্দার ‘হাওয়া’ ‘কসরৎ’ দেখায়।

(খ) ‘গোলদীঘির’ গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।

(গ) বসন্ত সত্যিই ‘আসবে’? কি ‘দরকার’ এসে?

(ঘ) ‘অনেক দিন’ ‘খিদিরপুর’ ডকের অঞ্চলে— (সু. ক. আলাপ)

এই রীতি আরও বেশী পরিমাণে প্রচলিত হওয়াই অভিপ্রেত। নবীন কবির আরাও স্বচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই রীতির প্রচলন করলে এ-ছন্দ উচ্চারণ-দৃঢ়তার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই নবীন সম্ভাবনার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করছেন বলা চলে।

ছোটদের জন্যে শুধু নয়, বড়োদের জন্যেও যে ছড়া রচিত হতে পারে অন্তদাশঙ্কর ‘উড়কি ধানের মুড়কি’ কাব্যগ্রন্থে তার নির্দেশন দিয়েছেন। লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বড়োদের চমৎকার ছড়া লিখেছেন। ছড়ায় পর্বিক দলবিন্যাসে যেমন কিছুটা শৈথিল্য থাকে,— এখানেও কবি সেই রীতি গ্রহণ করেছেন। একটি উদাহরণ তোলা যাক,—

পূব দখিনে

আগুন বোনা

সাত সাগরের ঝি।

আকাশ কেন

নীলবর্ণ

সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক খোপে কাটুক

আছে আমার

মন্ত্র-পড়া ফুঁ—

যারে—

সাপের বিষ

দিয়েন বিয়েন

ফুঃ॥

(সু. ক. দিয়েন বিয়েন ফুঃ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিছুটা তির্যক শ্লেষ মেশানো, একান্ত আটপৌরে কথা ভাষায় চমৎকার কিছু গদ্যকবিতা লিখেছেন। পাথরের ফুল, পায়ে পায়ে, ফুল ফুটুক না ফুটুক, কেন এল না প্রভৃতি কবিতার নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই যুগের পরিমিত আত্মবোধের একজন শক্তিশালী কবি হলেন সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার তুলনায় তাঁর গদ্যকবিতা ভাব এবং ভাষা উভয় দিকেই বেশী গদ্যধর্মী হয়ে উঠেছে। বাকপর্বগুলি এখানে প্রায় গদ্য বাক্যাংশেরই রূপ নিয়েছে। একটি উদাহরণ তুলছি,—

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হল
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের ভীষণ দুর্বল অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

(স. সেন ক. একটি মেয়ে)

এত ঝড়, বলিষ্ঠ শব্দপ্রয়োগে, এমন স্পষ্ট অর্থবোধক বাকপর্বে আধুনিক গদ্যকবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল বলা যেতে পারে।

এ-যুগের অন্যান্য নবীন কবিদের ছন্দেও মাঝে মাঝে রচনাগত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

জ্যোতিবিন্দু মৈত্র (১৯১০-১৯৭৭) সংখ্যায় বেশী কবিতা না লিখলেও সচেতনভাবে ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। একই কবিতার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার তাঁর মধুবংশীর গলি, পিতৃলোক প্রভৃতি কবিতায় লক্ষিত হয়। তাছাড়া, একই কবিতাংশে মিশ্রবৃত্তের সঙ্গে কলাবৃত্তের শিথিল মিশ্রণ ঘটিয়ে ধ্বনি-বৈচিত্র্য এনেছেন। অনেক সময় মিল-অমিলেরও একটা শিথিল সীমা তৈরী করেছেন। যেমন,—

তোমা'রি প্রেরণা পেয়েছি
বারে বারে আনন্দে গেয়েছি
'নিরঙ্কুশ এ' জীবনের কলনাদে ভরেছে অম্বর।
'হে পঁচিশ নম্বর'
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।

(রাজধানী ও মধুবংশীর গলি, মধুবংশীর গলি)

সমিল মিশ্রবৃত্তে রচিত এ কবিতাংশে চিহ্নিত পদগুলিতে কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এনেছেন কবি। এই কবিতার আর একটি অংশ লিখেছেন,—

ছারপোকাকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই
খাটিয়ার উপর বসি, বিড়ি ধরাই
আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা রোজ করি—
দোহাই পতিতপাবন হরি,
আর নয়, আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে
দস্যু লোভগুলিকে,
চালান করো আন্দামানে।

(ঐ)

এখানে পংক্তিমিল থাকলেও, ছন্দে গদ্য কবিতার আমেজ ফুটে উঠেছে। একই কবিতায় অন্যত্র লিখেছেন,—

শোনো
তুমি কোনো,
বরযাত্রার মিছিলে কখনো
বাঁশী-পতাকায় আলোতে মাখানো
নব যাত্রার মিছিলে দেখেছ রূঢ় বিধাতার হাসি।

(ঐ)

স্পষ্টতই কবি এখানে ছয়কলাপর্বক কলাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এর পরেই আবার দলবৃত্তে লিখেছেন,—

উড়িয়ে দেবে দিগ্বিদিকে
শুকনো ধূলো
শুকনো পাতা
ঝরিয়ে দেবে।

(ঐ)

সনেট সাধারণত মিশ্রবৃত্তে, পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে রচিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র ষটকলপর্বক কলাবৃত্তে দ্বিপংক্তিক মিলে একটি সনেট লিখেছেন।—

স্বপ্ন-প্রলাপ মেদুর করেছে গতি।
স্বদেশ আমার বিদেশ আমার, নতি
জানাই তোমাতে। আরক্ত ঋতু-রঙে
হিংস্র-কোমল কঠোর করুণ ঢঙে
বিচিত্র দিন, তবু তোমাতেই নতি—
বিদেশী স্বদেশ, স্বদেশী বিদেশ প্রতি।
জীবনধারণে চক্রঘষার জ্বালা—
আগ্নি দিনে তবু প্রেয়সীর মালা—।
তোমার আমার পয়ারে পয়ারে মিলে
জ্বলে ওঠে গান, ছন্দের এ নিখিলে।

কতনা দেশের প্রভাতে সন্ধ্যা এসে
 আকাশে আকাশে নীল বাহু এসে মেশে।
 ধ্বংসের পাশে তোমারই কোমল যতি।
 সারা মানুষের স্বদেশ তোমায় নতি।।

(রাজধানী ও মধুবংশীর গলি, একটি সনেট)

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৮২) কলাবৃন্দের প্রতিই বেশী পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত ‘এক ঝাঁক পায়রা’ চতুষ্কল পর্বক কলাবৃত্তে রচিত। এখানে পঞ্চকলপর্বক একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

অঙ্গে তার নেই চাঁপার স্বর্ণাভা,
 উষ্ণসুখ রেশমী লাল ওষ্ঠেতে;
 রুদ্ধমন কাব্যে আর ছন্দ নেই
 শান্তি নেই ব্যর্থ এই জন্মেতে।

(একালের কবিতা, মেঘনগর, বিষ্ণু দে সম্পাদিত)

এখানে প্রতি পর্বসূচনায় রুদ্ধদলে তরঙ্গঘাত পাঠক অনুভব করবেন।

অবিভক্ত বাংলার কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) দেশ বিভাগের পর ‘বাংলাদেশে’র কবিরূপ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর কাব্যেও মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃন্দের নিখুঁত প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এখানে একটি চতুষ্কলপর্বক কলাবৃত্ত রীতির কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

মৃত্যুর ভৎসনা আমরা তো অহরহ শুনিছি
 আঁধার গোরের খেতে তবু তো ভোরের বীজ বুনছি।
 আমাদের বিক্ষত চিহ্নে
 জীবনে জীবনে অস্তিত্বে
 কালনাগ ফণা উৎক্ষিপ্ত
 বার বার হলাহল মাখছি।

(কবিতা, সংগ্রাম চলবেই)

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-১৯৯৪) মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য প্রয়াসী কবি। কলাবৃত্ত রীতির একটি কবিতায় সংলাপ-প্রশ্নোত্তর কিভাবে বিন্যাস করেছেন লক্ষ্যবীয়া।—

‘ভালো কি বাসতে?’

— ‘বাসতুম।’

‘স্বপ্ন দেখেছো?’

— ‘দেখতুম।’

‘ঈশ্বর কোথা?’

— ‘হিম ঋতু এলে জবাব মিলবে যদিচ,

এখন কিন্তু ওষুধ-পথ্য আসল স্বর্ণঘটিত।’

(তিমিরাভিসার নকল সূর্য)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫) প্রথম কবিতার বই প্রকাশ্য করেন ১৯৪২-এ। তারপর থেকেই দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তে কবিতা ও ছড়া রচনায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ছন্দ পড়েনি। কিছু ভালো গদ্য কবিতাও লিখেছেন। এখানে তাঁর একটি লোকনৃত্য-সংগীতের ছন্দের নিদর্শন তুলছি।

কোথা থেকে উঠছে এ কালো মেঘেরা;

বৃষ্টির ঝরঝরানি...

টপ্ টপ্ চুপ চুপ কোনখানে পড়ছে এরা?

পূর্বদিকে দেখ ভীড় করে মেয়েরা,

বৃষ্টির ঝরঝরানি...

টপ্ টপ্ চুপ চুপ পশ্চিমে পড়ছে এরা।

এ লাল পাগড়ি কার, দিলো ভিজিয়ে?

বৃষ্টির ঝরঝরানি...

কার এ দীঘল চুল, বৃষ্টিতে উঠল নেয়ে?

(তিন পাহাড়ের স্বপ্ন ওঁরাও নৃত্যসংগীত অনুসরণে)

কবি এখানে চতুষ্কলপর্বক কলাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। তবে লঘু পর্বযতি লোপ করে দীর্ঘ আটমাত্রার পদযতিকে প্রাধান্য দেবার কিছু নিদর্শন রয়েছে; refrain বা ‘ধূয়া’ জাতীয় পুনরাবৃত্ত পংক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী (১৯২৪) বিষ্ণু দে’র অনুসরণে কলাবৃত্ত পয়ার লিখেছেন।— তাতে পর্ববিভাগ থেকে পৃথক ভাবযতি দেবারও পরীক্ষা করেছেন। পংক্তিমিলেও বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন,—

এখানে কেউ । আসেনা, ভালো । বাসেনা, কেউ, । প্রাণে

কী ব্যথা জ্বলে । রাত্রিদিন, । মরু-কঠিন । হাওয়া

কী ব্যথা হানে জানেনা কেউ, জানেনা, কাছে পাওয়া

ঘটেনা। এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো

পোষাকে মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে

আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনেনা কেউ সোনা;

এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো

ঝরেনা, ভেঙে পড়ে না ঢেউ — এখানে থাকবো না।

যে মাঠে সোনা ফলানো যায় আগাছা জমে উঠে

সেখানে, একা জানেনা কেউ কি রঙে ঝিলিমিল

জীবন,— তাই বা চেনা কেউ; দুয়ারে এটে খিল

নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা

ঝরেনা, ভেঙে পড়েনা ঢেউ — দুয়ারে মাথা কোটে,

এখানে মন বড়ো কৃপণ — এখানে থাকবো না।

(নীলনির্জন ঢেউ)

৫।৫।২ I— কলাবৃত্তের পর্বভাগ, মিলে দূরান্বয়, ভাবযতি ও ছন্দযতিতে মাঝে মাঝে সুখকর অমসৃণতা।— সবদিক থেকে বিচারে কবি এখানে নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন।— উভয় যতির স্পন্দন-বৈচিত্র্য, শব্দগত (ও ভাবগত) ধ্বনির অনুপ্রাস-মিলে কবিতাটিতে নতুনতর ছন্দ রচনা-প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীরেন্দের মিশ্রবৃত্তে শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

নিতান্তই ক্লাস্ত ‘লোকটা’ । শুধু
ছোট ‘একটা’ ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের ‘জানলা’ দিয়ে শুধু
অফুরন্ত মাঠ ‘দেখবে’ । আর
পশ্চিমের ‘জানলা’ দিয়ে লাল
সূর্যডোবা সন্ধ্যার বাহার।
নিতান্তই ক্লাস্ত ‘লোকটা’ । শুধু
ছোট্টো, ‘একটা’ ঘরের কাঙাল।

(নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা নিতান্ত কাঙাল)

এখানে ‘লোকটা’, ‘একটা’, ‘জানলা’, ‘দেখবে’,— শব্দগুলি সবই সংশ্লিষ্ট দ্বিকল উচ্চারণে কবি ব্যবহার করেছেন। অমিয়, বিষু, বুদ্ধদেব, সুভাষের ধারাই অনুসরণ করেছেন।

নীরেন্দ্রও সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমারের মতো ছান্দসিক-কবি। তবে কবিতায় কোথাও ছন্দের অতি-সচেতনতার পরিচয় দেননি।

নবীনতর কবিদের আরও দু-একটি বিচিত্র ছন্দের নিদর্শন তোলা যাক। মরা গাছ ‘টুপটাপ’ শব্দে পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। ঝরা পাতার সেই শব্দ কবিমনে অর্থ বহন করে আনে। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের রুদ্ধদল-ধ্বনিস্পন্দে তারই চমৎকার প্রতিধ্বনি ফুটিয়েছেন প্রফুল্ল সরকার।—

মরা গাছের ঝরা পাতা
পায়ের তলায়—
পথে চলায়
কথা বলে— দাঁড়াও
সাড়া দাও!
চূপ— চূপ— চূপ—
টুপ— টাপ— টুপ—
ফুল ঝরে কি পাতা ঝরে—
পথের পরে?
পাতা— পাতা
শুকনো ঝরা পাতা!

(দেশ, শ্রাবণ ১৪৮৫ মরা গাছ)

সাতমাত্রার কলাবৃত্তে প্রবহমানতা এবং অমিল মূল্যকের আমেজ ফোটাতে চেয়েছেন শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়।—

বিমায় কলকাতা । ক্লাস্ত কলকাতা । ধূসর উপকূলে
চিমনি, ছোট বড় কল ও কলকাতা।
সুদূরে বাঁশি বাজে...
বলয় রেখা ছিঁড়ে ভিড়বে জাহাজেরা ‘হাওয়ার অনুকূলে’।
সকাল দুপুরের জেটিতে বন্দরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে
দেখবে চুপচাপ মাঝি ও মাল্লারা
উজানী জাহাজীরা
‘নগরোপনিবেশে’ ছড়াবে মুঠি মুঠি কথার কণিকাকে।

(দেশ ২৬ ভাদ্র, ১২৬০, দ্বীপ)

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের একটি বড়ো অংশ অধিকার করে আছে সনেট কবিতা। গদ্যকবিতায় সমিল পংক্তিবিদ্যাসের উদাহরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি।— এই ছন্দে সনেট রচনার প্রচেষ্টা আরও অধিক নয় কি? বিশ্বজিত গুপ্ত গদ্যকবিতার ছন্দে সনেট কবিতা লিখেছেন। যেমন,—

অমাদের শহরতলীর ফ্ল্যাটে আসুন
কবার । এই গলিতে আপনার গাড়ি
(ছুটি রাস্তা, পরিষ্কার দুদিকেই বাড়ি)
চুপবে। সিঁড়ির মাথায় দরজা, কাশুন,
বা টোকা দিন। দরজা খুললে বসুন
বসুর ঘরে । দেয়ালে মণিকার আঁকা
ছবি কোণে বুদ্ধমূর্তি, কালিতে বাঁকা
আখরে মেজেতে— সমীরণ ও প্রস্ন।
মণিকা, ছেলেরা বুদ্ধমূর্তি, আমি
এই ফ্ল্যাটে, এই গলি, ধীরে অগ্রগামী
সাধারণ মানুষের সভ্যতাধারার
এই শাস্ত ছবি— একে বিনাশ করার
কে আপনাকে ক্ষমতা দিল অকারণে—
অকস্মাৎ— গামা— রে ও বিবিধ মারণে।

(দেশ ১৩৮৫, শারদীয়া সংখ্যা জৈনৈক বিশ্বনেতার প্রতি)

বাকপূর্বে স্রাবিক কথ্যভাষার আমেজ সুস্পষ্ট। কিন্তু এমন একান্ত কৃত্রিম চোখ-ভোলানো সনেট-আঙ্গিক রচনার প্রয়োজন ছিল কি? প্রকৃতিগুণে এটি যে সনেট আদৌ হয়ে উঠতে পারেনি, পড়তে গেলেই তা ধরা পড়ে; পংক্তিমিলও নিতান্ত কৃত্রিম। অকারণে কবিকে

সে সম্পর্কে সজাগ হতে হয়েছে,— অথচ পাঠকের কানে এই মিল ধরা পড়ে না।

তরুণতর কবিদের কাব্য থেকে মিল-বৈচিত্র্যের বহু উদাহরণ তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার আর আবশ্যকতা এই। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভৃতি কবিরা কাব্যে যে নবীন ভাবগত ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে শুরু করেছেন, সাম্প্রতিক কালের অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরাও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেকাংশে সেই ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দে ভাবমুক্তির যে সূচনা রঙ্গলাল-মধুসূদনের হাতে হয়েছিল, পর পর বহু স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রোত্তর কালে তারই প্রবাহ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হয়, ছন্দের অলঙ্কারের দিকে এ-যুগে কবিরা অনেকটা মনোযোগী হলেও উচ্চারণ-রীতির দিক থেকে নবীন কোনও সম্ভাবনার বলিষ্ঠ সূচনা দেখা দেয়নি। রবীন্দ্র-ছন্দের সম্মোহক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গিয়ে কবিরা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে উদ্যোগী হয়েছেন। সুনির্দিষ্ট ছন্দরীতির শৈথিল্য এনে, যতিভাগে এবং মাত্রা-উচ্চারণে নানা রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা নতুন পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই কিছুটা দ্বিধার ভাব, অনিশ্চয়তার আভাস পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পর পর (আদি, মধ্য ও অন্ত্যপর্বে) ছন্দের নবীনতর পরীক্ষায় যে সুনিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছেন রবীন্দ্রযুগের অন্ত্যপর্বের বা পরবর্তী রবীন্দ্রোত্তর যুগের নবপথের সন্ধানীরা তেমন কোনও সাফল্যের দাবী করতে পারেন না। আলোচ্য যুগ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে এ-যুগের প্রকৃত ফসল এখনও অনারদ্ধ রয়ে গেছে।

এই যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে আর একবার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।—

(১) আলোচিত ‘রবীন্দ্রোত্তর যুগ’ পূর্ববর্তী যুগেরই (রবীন্দ্র-যুগ অন্ত্যপর্ব) পরিশিষ্ট। কারণ পূর্ববর্তী যুগের জীবিত অধিকাংশ কবিই এ-যুগেও কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। একদল যেমন রবীন্দ্র আদি ও মধ্য-পর্বের বা আরও পূর্ববর্তী যুগের আদর্শেই ছন্দরীতির প্রয়োগ করেছেন, তেমনি নবীন একদল কবি রবীন্দ্র-ছন্দরীতি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন।

(২) এই যুগের নবীন রীতির কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। তিনি কলাবৃত্ত ছন্দে প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিদেশী কবিদের ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনে, ছন্দে চলতি ভাষার বাকধর্মী প্রয়োগ-স্বাভাবিকতায়, কলাবৃত্ত রীতির সনেটবন্ধ রচনায়, মিশ্রবৃত্ত রীতির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে, গদ্য কবিতার মাঝে পদ্য-পংক্তি ব্যবহারে, ধ্বনিগত অনুপ্রাস-অলঙ্কারে তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় শক্তিশালী কবিরূপে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছেন। তিনিও কলাবৃত্ত রীতির বিচিত্র প্রয়োগে, বিশেষত বাকধর্মী ভাষার গদ্যোপম প্রয়োগ-নৈপুণ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণে লেখা)

রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণে এ-যুগে তিনিই সবচেয়ে বেশী সাহস দেখিয়েছেন। ছড়ার লঘু ও লঘুতর যতি-স্পন্দিত ছন্দ ব্যবহারেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে।

(৪) সমর সেন অনেকগুলি নতুন ভঙ্গির গদ্য কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর গদ্য কবিতা গদ্যের বেশী কাছে এসেছে,—সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

(৫) সাম্প্রতিক তরুণতর কবিরা কম-বেশী পূর্বোক্ত কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। যে সকল কবি বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই রবীন্দ্র-ধারা থেকে মুক্ত হবার জন্যে সচেতন প্রয়াস করেছেন, নবীন কবিরা অনেকাংশে তাঁদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ-যুগের ছন্দোবদ্ধ রচনায় বিদেশী কবিদের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা অংশত রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হলেও, বলিষ্ঠ নতুন কোনও রীতি এখনও, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলা চলে না।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্প্রতিক যুগ (১৯৫৮-১৯৭৮)

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ১৯৫৮ পর্যন্ত আলোচনার সীমারেখা টানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলা কাব্যে আরও দুটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বভাবতই ছন্দজিজ্ঞাসুদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দুই দশকে বাংলা কাব্যছন্দে আর কতটা অগ্রগতি ঘটেছে। সংযোজিত এই নতুন অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেই পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল। পূর্ব অধ্যায়ে যে কথা বলেছি আলোচ্য পর্ব সম্পর্কেও সেই কথাই বলতে হয়। তরুণতর শক্তিমান কবিরা ছন্দ-সচেতনতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেও, বাংলা কাব্যছন্দে মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এ-যুগের সম্ভাবনাময়, শক্তিমান কবিদের মধ্যে রয়েছেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-৯২), রাজলক্ষী দেবী (১৯২৬), শামসুর রাহমান (১৯২৯), কবিতা সিংহ (১৯৩১), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩), বিজয়া মুখোপাধ্যায় (দাশগুপ্ত), স্বদেশরঞ্জন দত্ত (১৯৩৩), আনন্দ বাগচী (১৯৩৩), কবিরুল ইসলাম (১৯৩৪), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৭), কেতকী কুশারী ডাইসন (১৯৪০), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫), তারাপদ রায় (১৯৩৬), রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬), সেবাব্রত চৌধুরী, আল মাহমুদ (১৯৩৬), মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৩৭), আশিশ সান্যাল (১৯৩৮), ওমর আলী (১৯৩৯) প্রমুখ কবিবৃন্দ। তাছাড়া পূর্ব যুগের অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, মনীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবিরা এ-যুগেও নিয়মিত লেখক ছিলেন, বা রয়েছেন। ছন্দ-আঙ্গিকে অবশ্য তাঁরা বিশেষ পরিবর্তন আনেননি।—পুরোনো অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

বাংলা দেশের শক্তিমান তরুণ কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯) মুখ্য তিন ছন্দরীতিতেই বেশ কিছু সার্থক কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির অমিল মূল্যক রচনায় তাঁর সহজাত আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এখানে ষটকলাপর্বক কলাবৃত্তে রচিত তাঁর একটি কবিতাংশ থেকে শব্দের পুনরাবৃত্তির সার্থক দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

স্বাধীনতা তুমি

রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।

স্বাধীনতা তুমি

কাজী নজরুল, ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলানো

মহাপুরুষ, সৃষ্টিসুখের উন্মাদে কাঁপা—

স্বাধীনতা তুমি

শহীদমিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা।

(বন্দীশিবির থেকে, স্বাধীনতা তুমি)

কবিতাটিতে মোট ৪৪ টি পংক্তি; তার মধ্যে ১৯ বার ‘স্বাধীনতা তুমি’ শব্দগুচ্ছটি পুনরাবৃত্ত হয়ে বহুব্যবহারে একটি শ্লোগানের শক্তি যুগিয়েছে।

কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) মিশ্রবৃত্ত রীতির আখ্যানধর্মী দীর্ঘ মূলক রচনায় এবং লৌকিক দলবৃত্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের গঠনভঙ্গিতেও কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। এখানে মিশ্রবৃত্তে স্তবক-বৈচিত্র্যের নমুনাস্বরূপ তাঁর একটি ছোট কবিতা উদ্ধৃত করছি।—

আজ আর কেউ নেই, ঘুমন্ত ঘরের নীল জল,
ঠাণ্ডা বারান্দার গায়ে মধ্যরাতে দেবতার দীপে—
হাতে খেলে যায় হাওয়া।

আজ চুপ করে ভাবো, এই রাত মৃদু জলটেউ,
বড়ো একাকিনী গাছ, মাঝে মাঝে কার কাছে যাব,
ঘুমায় ঘরের গায়ে ছায়াময় বাহিত প্রপাত,
বুকে খেলে যায় হাওয়া।

দুইজনে পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো,
এখন বসন খোলো দেবতা দেখুক দু-নয়নে,
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদূরতা অধীর জলধি
শুধু বহে যায় হাওয়া।
আজ আর কেউ নেই মাঝে মাঝে কার কাছে যাব।

(শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, মধ্যরাত্রে)

কবিতাটিতে চারটি স্তবক; ত্রিপংক্তিক প্রথমটি, চতুষ্পংক্তিক দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি; শেষ স্তবকটি মাত্র একটি পংক্তিতে গঠিত। প্রথম তিন স্তবকের শেষে একই ধরনের প্রায় একই শব্দগুচ্ছের পংক্তি-বিন্যাস। শেষ স্তবক-পংক্তিটি পূর্ববর্তী দুটি পংক্তির শব্দগুচ্ছ জুড়ে তৈরী হয়েছে। এই গঠন-পারিপাট্যে কবির মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) শব্দ প্রয়োগে এবং পংক্তিবিন্যাসে সচেতন ছন্দশিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টতার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের সংহত উচ্চারণে অলোকরঞ্জনও কতটা দক্ষ ছিলেন এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

‘বাগনানে’ যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেবো
সারা রাত্রি কথা ‘বলবে’।

‘বাগনানে’ যাবার পথে কাঁদা ‘ছুঁড়বে’ যে কেউ আমাকে
তল্লিতল্লা থেকে ‘অমনি’ তিনটে বাচাল ‘কলকলাবে’,
কথার কথায় তারা লোফালুফি ‘করবে’ ‘কলকাতাকে’,
তাদের বাদিত্র জানি বড়োজোড় ‘আম আটির ভেঁপু’।

(রক্তান্তর বরোখা, তিনসঙ্গী)

বাগনানে, বলবে, ছুঁড়বে, অমনি, কলকলাবে, করবে, কলকাতাকে, আম আটির
ভেঁপু—শব্দগুলির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পাশাপাশি ‘তিনটে’ শব্দটির দ্বার করে বিশিষ্ট
(তিনকলা) উচ্চারণ লক্ষণীয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) যেমন ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখেছেন, তেমনি
ভালো কিছু গদ্যকবিতাও লিখেছেন। তবু লৌকিক দলবৃত্তের প্রতি তাঁর কিছুটা বেশি
আকর্ষণ লক্ষিত হয়। সংলাপী ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী এই কবির ছন্দ ও ছন্দহীনতার
মাঝামাঝি পর্যায়ে রচিত একটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত তুলছি।—

সব শেখালে, তুমি আমার বললে, মিছে
অষ্টপ্রহর, এই যে পায়ের শব্দ পিছে
উঠে চলেছে, তারতো আছেই অর্থ নানা—
সমস্ত সম্মুখে যাবে, ফিরে তাকাতে করলে মানা
বালককালের ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে

(সোনার মাছি খুন করেছি, বালককালের ও দোলমঞ্চ)

চতুর্দলপর্বক দলবৃত্তে ছন্দযতি ও ভাবযতির কিছুটা বিরোধ ঘটিয়ে, কোথাও বা
পঞ্চমুদ্রদল পর্ব এনে কবি ইচ্ছে করেই ছন্দের নিয়মিত তরঙ্গ মাঝে মাঝে ভেঙে
দিয়েছেন; পড়তে গেলেই পাঠক সেটা অনুভব করবেন।

আল মাহমুদ (১৯৩৬) বাংলা দেশের অন্যতম তরুণ প্রতিষ্ঠাবান কবি। ছন্দোবদ্ধ
কবিতার প্রতিই তাঁর অনুরাগ। বাংলা তিন রীতির কবিতাতেই দক্ষতা দেখিয়েছেন।

এখানে পঞ্চকলপর্বক কলাবৃত্তের একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

ধৈর্য ধরে থেকেছি বহুকাল
খ্যাতির ধাপে উঠল বুঝি পা,
ভিতর থেকে বিমুখ মহাকাল
বললো নারে, এখনো নয়, না
ধৈর্য ধরে থেকেছি বহু দিন
ভেবেছি এই বাজারে হাততালি:
ধৈর্য শুধু বাজলো রিণরিণ

ভুরুর নীচে জমালো বুলকালি। (আল মাহমুদের কবিতা, ধৈর্য)

চতুষ্পংক্তিক পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি রচিত। প্রত্যেক স্তবকে একই ধরনের শব্দগুচ্ছ
দিয়ে আরম্ভ করেছেন। প্রথম স্তবকে পা, না—একদল শব্দের প্রত্যাশিত দ্বিকলা প্রসারণও

লক্ষণীয়। আল মাহমুদের ছড়া লেখার হাতও ভালো, একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,—

চাকমা মেয়ে রাকামা

ফুল গুঁজে না কেশে

কাপ্তাইয়ের বিলের জলে

জুম গিয়েছে ভেসে।

(আল মাহমুদ কবিতা, ছড়া)

৪।৪।৪।২—দলমাত্রাভাগে ছড়াটি রচিত; ‘রাকমা’ পর্বে দ্বিদলে ষট্‌কল প্রসারণ ছড়ার আমেজ স্পষ্টতর করে তুলেছে।

জাপানী ক্ষুদ্রায়তন কবিতার প্রতি এক সময় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। একালে কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কয়েকটি জাপানী ‘হাইকু’ রচনার পরীক্ষা করেছেন। দুটি উদাহরণ তুলছি,—

(১) অস্ত-গোধূলিতে ও কার চিতা জ্বলে!

গৌরী মেঘ এক চলেছে পশ্চিমে

সতীর মতো সহমরণে চিতানলে!

(২) নম্র মায়াবিনী হাওয়ার কন্যারা

দীঘির কালোজলে শীতল পাটি বোনে,

দিও না জলে ঢেউ, জলের বৃকে সাড়া!

(এ-কালের কবিতা, হাইকু, পৃ ২৭৬—বিষ্ণু দে সম্পাদিত)

কবি এখানে বিষম সাতমাত্রার পর্ব (কলাবৃত্ত) এবং ক্ষুদ্রায়তন ত্রিপংক্তিক পরিসর রেখেছেন। কিন্তু সপ্তদশ দল বা তির্যক, তীক্ষ্ণ ভাবদ্যোতনা রক্ষা করেননি।

এ যুগেও কয়েকজন মহিলা কবি পদ্য ও গদ্য কবিতার রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজলক্ষী দেবী (১৯২৭), বিজয়া (দাশগুপ্ত) মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৭), কেতকী কুশারী ডাইসন (১৯৪০) এবং কবিতা সিংহের (১৯৩১) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিজয়া এবং কবিতার এক একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

বরং প্রেমকে ছাড়া যায়

লোকমানি ছাড়া অসম্ভব

শিষ্য যারা আছে চারপাশে

‘অত্যাচার’ তাহাদের স্বব

অনুভবে কাজ নেই মোটে

‘আড্ডাটা’ রোজ যদি জোটে।

(আমার প্রভুর জন্য, পুরুষার্থ, বিজয়া দাশগুপ্ত)

১। ‘হাইকু’ ১৭ দলে বিন্যস্ত, বিসম মাত্রা-পর্বিক, ক্ষুদ্রাকার (ত্রিপংক্তিক), তির্যক ভাবদ্যোতক (epigrammatic) কবিতা। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা এ-কবিতার বৈশিষ্ট্য।

মিশ্রবৃত্তেও পংক্তি বা পদ-সূচনায় কলাবৃত্তের বিলিষ্টতা কানে বেসুরো লাগেনা এটা মধ্যযুগের কবিরাও জানতেন। বিজয়া সেই ধ্বনিসঙ্গতি কাজে লাগিয়ে ‘অত্যাঙ্গ’ এবং ‘আড্ডাটা’ শব্দ দুটিকে চারকলা হিসেবে গণ্য করেছেন।

চোখে যদি মন ফোটালে
মনেতে চোখ দিলে না
বদলে তার বদলে
লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে।

লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে
তবু কেন ছেয়ে দিলেনা।
বদলে তার বদলে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালামুখ ঢেকে দিলে না
বদলে তার বদলে
রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে।

(স্বনির্বাচিত, সহজসুন্দরী-২, কবিতা সিংহ)

অতিপর্বিক দোলা এবং কলাপ্রসারণ-সহ কবি এখানে পূর্ণপর্বে ছয় কলার উচ্চারণ রেখেছেন। পংক্তি- বা পদ-শেষে এককলার প্রসারণ, কোথাও অতিপর্বেও এককলার প্রসারণ এ-কবিতায় নতুন ধ্বনিগুণ সৃষ্টি করেছে। গঠনে ও মিলবিন্যাসেও কবি কিছু স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

আঞ্চলিক লোকভাষার ব্যবহার লোকগীতে মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। রজনীকান্ত সেন আধুনিক কালেও তার ব্যবহার করেছে না। তবে দলবৃত্তে বা কলাবৃত্তেই এতদিন এসব লোকগীতি বা ছড়াগুলি রচিত হত। বাংলাদেশের তরুণ কবি ওমর আলি (১৯৩৯) এবারে মিশ্রবৃত্তেও আঞ্চলিক লোকভাষা ব্যবহারের পরীক্ষায় মেনেছেন দেখা গেল। যেমন,—

আমি কিন্তু যামুগা, আমারে যদি বেশী ঠাট্টা করো
হুঁ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাকমুনা।
আমারে যতই কও, তোতাপাখি, চান, মনি, সোনা।
আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরো।

আমারে ভ্যাংচাও ক্যান, আমি বুঝি কথা জানি নেকো।
আমার একটি কথা নিয়ে তুমি অনেক বানাও।

তুমি বড়ো দুষ্ট, তুমি আমারে চেতায়ে সুখ পাও।

অভিमानে কাঁদি, তুমি তখন আনন্দে হাসতে থাকো।

(এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি, আমি কিন্তু যামুগা)

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে কবি পুরোপুরি সফল না হলেও, ১৮ মাত্রা পংক্তির মিশ্রবৃত্তে এ-ভাষাকে বাঁধবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গদ্য কবিতা এ-যুগের প্রায় সমস্ত কবিই লিখেছেন। সমর সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এখানে কবিরা রবীন্দ্র-ভাবাবেগ-প্রধান গদ্যকবিতার প্রভাব যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এ-কাজে জগন্নাথ চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সেবারত চৌধুরী, কবিরুল ইসলাম, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিদের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। গ্রন্থ-পরিসরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আর দৃষ্টান্ত বাড়ানো।

সব শেষে, এ-যুগের কবিদের একটি বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ করে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় যতি টানা যেতে পারে। এ-যুগের বেশ কিছু সংখ্যক কবি লৌকিক দলবৃত্তে চতুর্দল (ষট্‌কল) পর্বের সঙ্গে পঞ্চকল (মুক্তি পঞ্চকল) পর্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটান। শিথিলবদ্ধ ছড়ার আদর্শে এ-কাজ অল্পসল্প রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন অন্যান্য কবিরা না করেছেন এমন নয়। যেমন,—

আদর করে মেয়ের নাম

‘রেখেছে ক্যালি’ফর্ণিয়া।

গরম হল বিয়ের হাট

‘ঐ মেয়েরই’ দর নিয়া।

(খাপছাড়া ৪৩ নং কবিতা, রবীন্দ্রনাথ)

ছড়াটি লৌকিক দলবৃত্তে লেখা ধরলে ‘রেখেছে ক্যালি’ পঞ্চ-মুক্তদল পর্বটি বেমানান, আবার পঞ্চকলপর্বিক কলাবৃত্ত ধরলে ‘ঐ মেয়েরই’ ওজনে ভারী হয়ে পড়ে। তবু ছড়ায় সেটা চলতে পারে।

এ-কাজ রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরাও কিছু করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলি,—

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পরে অনাথ শিশু,

মেলায় বাজি’করের খেলায়’ একটা মুখ মুখোশ পরে হাসায়।

খেয়ার নায়ে ‘ওপারে যেতে’ কবে যে কোন ভীড়ে

একটা মুখ এক নিমেষে আকুল স্রোতে ভাসায়।

কার সে মুখ কার?

‘জানে কি তারা’—‘ছিঁটোন অন্ধ’কার!

(অথবা কিন্নর, মুখ, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্তের উচ্চারণে পড়তে গেলে এখানে বাজি’করের খেলায়’ বা

‘ছিঁটোন অন্ধ’কার—অংশগুলিতে ছয়কলা-পর্বের আদল ফুটে ওঠে; আবার চতুর্দলপর্বিক দলবৃত্তের গঠনভঙ্গি আনতে গেলে ‘ওপারে যেতে’ বা ‘জানে কি তারা’ পঞ্চদল পর্বগুলি বাধা সৃষ্টি করে।

ঠিক একই পদ্ধতি এ-যুগের কবিরাও অনুসরণ করে চলেছেন। সুনীল লিখেছেন,—

‘ছিল নিঝঝুম’ পুষ্করিনী
জলে নামলো কে?
এলো যে আজ ‘অভিমানিনী’
ওলো জোকার দে!

(সু. গ. শ্রে. কবিতা. অভিমানিনী)

শক্তি লিখেছেন,—

‘ছেড়ে দিয়েছ’ বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম ‘জীবন এবার’ ‘তোমার সঙ্গে’ ভোগ করেছি
এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী’—সোনায়ে কোন ‘গ্লানি লাগে না’
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।

(সোনার মাছি খুন করেছি, নীল ভালোবাসায়)

শঙ্খ লিখেছেন,—

‘বুকের ভিতর’ ‘খরদীপালি’ জ্বালিয়ে বলে, তালি, তালি
‘দুহাতে তালি’, ‘দুহাতে তালি’, শ-হাতে তালি বাজে
এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে ‘তাকাতে পারি’?
কিংবা ওরা ‘আমার মুখে’ ‘গমক গমক’ আঁচে?

(শ. ঘো. শ্রে. ক, প্রতিশ্রুতি)

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। ছন্দ-সচেতন পাঠক মাত্রই প্রশ্ন করবেন, চতুর্দল (ষটকল)-পর্বিক দলবৃত্তে পঞ্চ মূলদল (পঞ্চকল)-পর্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণ সম্ভবপর কি? উভয় ছন্দরীতির উচ্চারণে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে কবিরা তার সামঞ্জস্য করেছেন কিভাবে? আবৃত্তিকালে যদি কিছুটা কৃত্রিমভাবে পঞ্চকলপর্বকে ষটকল হিসেবে তাঁরা উচ্চারণ করে থাকেন সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, দলবৃত্তের চতুর্দল পর্বে ছয়কলার যে ‘মীড়’ বা সুরের দোলা জেগে ওঠে, পঞ্চকল কলাবৃত্তের পর্বে এককলার প্রসারণে সেই দোলা অনুভব করা যায় কি? এখানে প্রশ্নটি রাখা গেল, ছান্দসিকদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেবার বোধহয় এখনো সময় আসেনি।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে সূত্রাকারে আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে।—

(১) পূর্বযুগের মতো এ-যুগেও কবিদের রচনায় ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় মেলে।

(২) বাংলা দেশের তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি শামসুর রাহমান মুখ্য তিন রীতির ছন্দেই ভালো কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত মুক্তক রচনায় তাঁর কিছুটা বেশী আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

(৩) কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ গদ্য ও পদ্য কবিতার উভয় রাজ্যেই স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন। মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘপংক্তিক মুক্তক তাঁর কাহিনী-কবিতার মুখ্য বাহন। কবিতার গঠনরীতি সম্পর্কেও তিনি বেশ সচেতন।

(৪) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শব্দ-সচেতন কবি। শব্দের সংহত উচ্চারণে তাঁর দক্ষতা পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

(৫) শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংলাপী বাকরীতিকে চমৎকারভাবে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। পদ্য এবং গদ্য — উভয়বিধ কবিতা রচনাতেই তিনি সমদক্ষ।

(৬) বাংলা দেশের অন্যতম তরুণ কবি আল মাহমুদের ছন্দ-সচেতনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিন রীতির ছন্দেই তিনি সার্থক কবিতা লিখেছেন।

(৭) কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত জাপানী ‘হাইকু’ এবং ওমর আলী (বাংলাদেশ) আঞ্চলিক বাকরীতিতে মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার রচনায় নূতনত্ব দেখিয়েছেন।

(৮) সাম্প্রতিক কয়েকজন মহিলা কবি ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী দেবী, বিজয়া দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন এবং কবিতা সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৯) এ-যুগের প্রবীন ও নবীন অধিকাংশ কবিই ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনার পাশাপাশি গদ্যকবিতা রচনাতেও সমদক্ষতা দেখিয়েছেন।

(১০) এ-যুগের কাব্যে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, চতুর্দলপর্বিক কলাবৃত্তের সঙ্গে পঞ্চকল-(মুক্তপঞ্চদল)-পর্বিক কলাবৃত্তের সংমিশ্রণ।— সে বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনো আসেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবর্তন ও ভাবী-সম্ভাবনা

বর্তমান অধ্যায়ে সমগ্র বাংলা কাব্যছন্দের বিবর্তন ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত নয় দশকের, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯৭৮-এর অগ্রগতিকে একনজরে আর একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আদি ও মধ্য
যুগের উচ্চারণ
বৈশিষ্ট্য

চর্যাগীতি (আনুমানিক দশম শতক) থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনারস্ত-কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যছন্দের প্রাচীন (আদি ও মধ্য) যুগ ধরা যেতে পারে। এই যুগে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের ধারাপথে ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দের নিজস্ব আকৃতি ও

প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে মুক্তদলের সংস্কৃতানুগ হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ শিথিল হয়ে আসছিল। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে সংস্কৃতির গুরু উচ্চারিত মুক্তদলের লঘু এককলা উচ্চারণ আংশিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির মৈথিলী গীত প্রভাবে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব গীতে সংগীত সুরাশ্রয়ী, লঘু-গুরু উচ্চারণ সমন্বিত কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই রীতিকেই পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক রীতির কলাবৃত্ত প্রবর্তন করলেন। লক্ষ করবার বিষয়, বৈষ্ণব গীতে ছাড়া, প্রাচীন ও আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো কবিই কলাবৃত্তে কবিতা রচনার কথা ঠিক মত ভাবেননি। মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ (পঞ্চদশ শতক) থেকে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়েছে। সে যুগে প্রধানত কাহিনীধর্মী কাব্যগুলিতে এই ছন্দ ব্যবহৃত হত; গীতিসূর-প্রাধান্যের পরিবর্তে এই কাব্যগুলিতে কথকতার এক বিশেষ সুরাশ্রয়ী পঠনভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে। সেই পঠনরীতির আরও পরিবর্তন ঘটেছে ঊনবিংশ শতকে; প্রথম ঈশ্বর গুপ্ত, তারপর রঙ্গলাল বাকধর্মী, সুনীরপেক্ষ নতুন উচ্চারণের মিশ্রবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তন করলেন। আর তারই ফলে মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ,

ঊনবিংশ
শতকের
ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের পক্ষে এই ছন্দে ‘অমিত্রাক্ষর’ এবং মুক্তক রচনা সম্ভব হল; গদ্যকবিতার মাধ্যমে কাব্যের ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির পরীক্ষা সফল হল। বাংলা কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই, মিশ্রবৃত্ত রীতিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছন্দরীতি

হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দলবৃত্ত ছন্দ গ্রাম-বাংলার অকৃত্রিম সম্পদ। প্রাচীন ছড়া এবং লৌকিক গানের মাধ্যমে এই লঘু চতুর্দল (ষটকল) যতিস্পন্দিত ছন্দের ধারাটি শান্ত ও বৈষ্ণব কবির, কবিরায় ও বাউল সম্প্রদায়, পল্লী গীতিকার কবিগণ গ্রহণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কিছুটা লঘু মেজাজ

কবিতা গানে এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে গম্ভীর ভাবাত্মক কবিতায় ব্যবহার করলেন; উচ্চারণের শৈথিল্য ঘুচিয়ে তিনি এ-ছন্দকে আধুনিক শিল্প কবিতায় কৌলীনা্য দান করলেন। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত — প্রাচীন যুগে তিন ছন্দোরীতিতেই উচ্চারণ-শৈথিল্য ছিল। এই শৈথিল্যের ফলে একই কবিতায় একাধিক ছন্দোরীতির মিশ্রণও দেখা যেত। তবে তিন ছন্দোরীতিরই পৃথক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আধুনিক-পূর্ব যুগে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগের কবিরা এই তিন ছন্দ-প্রকৃতির উচ্চারণকে আরও সুনির্দিষ্ট ও মার্জিত করে তুললেন। আঙ্গিক মাত্রার হিসাবে এই ছন্দরীতিগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্য নিরূপণ এখন ছন্দ জিজ্ঞাসুর পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, আধুনিক যুগে ছন্দ-প্রকৃতিগুলির উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট হবার ফলে, তাদের উপর ভিত্তি করে আরও নতুনতর আকৃতি-প্রকৃতিগত পরীক্ষা সম্ভবপর হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রাচীন যুগের কাব্যে ছন্দ-শৈথিল্যের জন্য সে যুগের কবিদের দোষারোপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের ছন্দের শ্রুতিবোধ অনেকাংশে সঙ্গীতের আদি ও মধ্য যুগের সুরাশ্রয়ী পঠনভঙ্গি তাল-মাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। গায়কের গানে বা কথকের সুরাশ্রয়ী পঠনে কাব্যের মাত্রাশৈথিল্য ঢাকা পড়ে যেত। শ্রাব্য, সুরাশ্রয়ী কাব্য আধুনিক যুগে, যখন বহুলাংশে সুর নিরপেক্ষ পাঠ্য কবিতায় রূপান্তরিত হল, তখন কবিকে ছন্দশৈথিল্য সম্পর্কে আরও সতর্ক হতে হল। দুই যুগের কাব্যান্বাদনের এই রীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে প্রাচীন যুগের কবিদের প্রতি আর অবিচারের শঙ্কা থাকে না।

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলার ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল, কাব্যের ক্ষেত্রে তার প্রভাব যেমন দূরপ্রসারী তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। এই বিস্ময়কর প্রভাবের ফলেই আধুনিক বাংলা ছন্দ প্রায় নব কলেবর লাভ করেছে বলা যেতে পারে। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এই আধুনিকতার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। সঙ্গীত-সুরাশ্রয়ী প্রাচীন কাব্যধারা থেকে সুর-নিরপেক্ষ পঠনোপযোগী আবৃত্তিধর্মী আধুনিক ছন্দের রূপান্তর ছাপাখানার যুগে প্রথম তাঁর দ্বারাই ঘটেছিল।

এরপর ইতিহাসশ্রিত আখ্যান কাব্য লিখতে গিয়ে রঙ্গলাল মিশ্রবৃত্ত রীতির ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দেই যথাসম্ভব ভাবমুক্তির কথা ভেবেছিলেন। আঠারো মাত্রার (আট+দশ) মহাপয়ার রঙ্গলাল ও মধুসূদন সম্ভবত ভাবস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তিনি রচনা করেছিলেন এবং একই প্রয়োজনে চৌদ্দমাত্রার পয়ারে সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রার পদযতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। তবে লাইন ডিঙিয়ে ভাবপ্রবাহের

স্বচ্ছন্দ গতি সৃষ্টির কথা তাঁর মনে আসেনি। মধুসূদন এসে প্রবহমান পয়ার রচনার মাধ্যমে এক মুহূর্তে এই বাধার আবরণ ছিন্ন করলেন। শেকস্পীয়র — মিলটনের নাটক-কাব্য পাঠ করে তিনি Blank-verse-এর যে শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা মিশ্রবৃত্ত পয়ারে সেই শক্তি সঞ্চারিত করার দুঃসাহসিক পরীক্ষায় তিনি সফল হলেন। সংস্কৃত ভাষার

শক্তি ও সম্ভাবনাকে তিনি বাংলা ভাষায় আরোপ করলেন। মধ্যযুগের কাব্যে যে ধর্মীয় রোমাণ্টিকতা এবং ভাষাছন্দের আত্যন্তিক কোমলতা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল মধুসূদন তাঁরই বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে নবক্লাসিক কাব্যের উপযোগী ভাষা-ছন্দের সন্ধান করেছিলেন। সন্ধ্যা সাহিত্য-জীবনে সেই নব কবিভাষার কাঠামো তিনি গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিপরীতে, অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে এই নব প্রবর্তিত কাব্যধারাকে, তাঁর ভাষাছন্দকে যথার্থভাবে পরবর্তী কোন কবিই অনুসরণ করতে পারেননি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ব্যর্থ অনুকারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ এসে আপন রুচি ও প্রতিভা অনুসারে মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দ ও নব ক্লাসিক রীতির কবিভাষাকে অনেকাংশে বদলে নিলেন। মধুসূদন-প্রবর্তিত ভাবস্বাধীন

রবীন্দ্রনাথ ও ছন্দযতির অতটা স্বাভাবিকতা তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। তাছাড়া কবিতায় প্রান্তিক মিলের প্রতিও তার আকর্ষণ ছিল। ফলে, মধুসূদন

বাংলা কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দমিল এবং অলঙ্কারে যতটা বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে আমাদের আবার পরিচিত এবং অভ্যস্ত ‘মিত্রাক্ষর’ ছন্দ-প্রভাবিত ললিত কবিতার জগতে বহুলাংশে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু যেখানে ভারতচন্দ্র এসে থেমেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখান থেকে আর শুরু করার উপায় ছিল না। মধুসূদনের ভাষাছন্দের দুর্বীর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় নি। বস্তুত, বাংলা কাব্যে ভাবের ছন্দমুক্তির যে সচেতন প্রয়াস মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ সূচিত হয়েছিল মুক্তক এবং গদ্যকবিতায় তাঁরই পরবর্তী সোপান যারা গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে তিনি মধুসূদনের যোগ্য উত্তরসূরী। অন্যদিকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার যুগ থেকে বাংলা কাব্যে যে ললিত ছন্দমিলের অলঙ্কৃত ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল সেখানেও ইউরোপীয় নব-রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শের সংযোগে যে ঐশ্বর্য ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে দেখা দিয়েছিল তারও সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপকার হবেন রবীন্দ্রনাথ। নব কলাবৃত্তের তিনি হলেন এ-যুগের সর্বাপেক্ষা সার্থক শিল্পী। ধ্বনি-ঐশ্বর্যে, মিলবিন্যাসে, গঠনগত রূপাদর্শে বাংলা কাব্যকে তিনি নব যৌবন-সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিয়েছেন। মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষরের যুগ্ম রশ্মি হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের যুগল অশ্রুচালিত রথখানি স্রয়ং বাসুদেবের মতোই নিপুণ হাতে চালিত করেছেন। তাঁর হাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধানতম তিন ছন্দপ্রকৃতি যেমন পূর্ণতা পেয়েছে তেমনি নব নব সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সমকালীন ও পরবর্তী প্রায় সমস্ত কবিই তাঁর প্রবর্তিত বা পরিমার্জিত ছন্দরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কলাবৃত্তে মধ্যযুগীয় লঘুগুরু উচ্চারণ পরিহার করে সব মুক্তদলেই এককলা এবং রুদ্ধদলে দ্বিকলা উচ্চারণের নবরীতি তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। মিশ্রবৃত্তের মাত্রানির্দেশ এবং পর্ববিভাগ পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বের, সম্ভবত

ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই অনেকাংশে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন এই ছন্দেই ভাবমুক্তির পথ উন্মোচন করেছিলেন; স্তবক বিন্যাসে ও মিলে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথ যোগ্য উত্তরসূরীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। লৌকিক দলবৃত্ত যে কাব্যে স্বাভাবিক বাকভঙ্গি পরিস্ফুটনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাহন এবং শিষ্ট কাব্যেও যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেকথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম নির্দিষ্টায়া ঘোষণা করলেন; সার্থক কবিতা ও গান রচনা করে তার স্বাক্ষর রাখলেন। দলবৃত্ত মূলক বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই দান। গদ্য কবিতায় এসে কবিতার ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির বৃত্তটি সম্পূর্ণতা লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণের ‘গদ্যপদ্য’ বা ‘পদ্যপৌত্তলিক গদ্য’ যার সূচনা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় তার সচেতন পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট, দীর্ঘ পদপ্রধান উচ্চারণ এনে এবং লঘু পর্বযতি বিলুপ্ত করে দলবৃত্তে স্বাভাবিক বাকভঙ্গির সংহতি কতটা ফোটানো যেতে পারে রবীন্দ্র সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার পরীক্ষা করেছেন,— অনেকাংশে সফলও হতে পেরেছেন। সম্ভবত ইংরেজি সংহত উচ্চারণের ‘সিলেবিক’ ছন্দ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলায় এই নবরীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। ঠিক মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও একই অনভ্যস্ততার জন্য সঠিক ভাবে এই ছন্দ ব্যবহারে কোন কবিই আর অগ্রসর হননি।

বাংলা কাব্যের ছন্দ-বিবর্তনে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষিত হয়। প্রথমটি হল, কৃত্রিম ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির ক্রম প্রচেষ্টা। মিশ্রবৃত্ত রীতি এই বিবর্তন-ধারার মুখ্য বাহন। রঙ্গলাল ঝাষ-মহাপয়ারে গতানুগতিক ছন্দযতির পরিবর্তন এনে এই ভাবমুক্তির ক্ষীণ সূচনা করলেন; মধুসূদন প্রবহমান পয়ারের মাধ্যমে তাতে নব শক্তি সংগর করলেন; রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র মুখ্যতঃ নাট্য সংলাপে মূলক প্রবর্তন করে স্বাধীন পদক্ষেপের পরবর্তী সোপান তৈরী করলেন; রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সেই সোপানকে আরও দৃঢ়তা দিলেন এবং

ছন্দ বিবর্তনের
ত্রিধারা

(১) ভাবমুক্তি

তারই উপর ভাবমুক্তির সর্বোচ্চ কাঠামো তৈরী করে গদ্যকবিতা রচনা করলেন। সেখানে ছন্দের স্পন্দন থাকল কিন্তু সুনিরূপিত মাত্রার হিসাব রইল না। গদ্যকবিতার সেই ধারা আজও পর্যন্ত রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের হাতে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দলবৃত্তে এই ভাবমুক্তি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি পৃথক পথে এনে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত লৌকিক দলবৃত্তেই যথাসম্ভব চলিত বাকভঙ্গি এনে অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মূলক (সমিল ও মিলহীন) রচনা করে এই ছন্দোবর্তনের শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য ‘সিলেবিক’ ছন্দের দীর্ঘযতিপ্রধান সংহত উচ্চারণ মনে রেখে, আট-দশ-ছয় দলমাত্রাব পদভাগে নতুন সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত রচনা করে প্রমাণ করলেন, এই ছন্দই কথ্য বাকভঙ্গির সবচেয়ে কাছাকাছি পৌছানোর শক্তি রাখে। মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্তের তুলনায় কলাবৃত্তে ভাবমুক্তির প্রয়াস, সম্ভবত উচ্চারণ-কৃত্রিমতার জন্যই, কিছুটা কম

হয়েছে। অবশ্য সেখানেও রবীন্দ্রনাথ মুক্তক রচনার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবহমান রীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন। প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অমিয়, বিষ্ণু, সুভাষ প্রমুখ কবিরা এই ক্ষীণধারায় কিছু শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয়টি হল, সুনির্দিষ্ট পংক্তি ও স্তবক-বিন্যস্ত ‘মিত্রাক্ষর’ কবিতার ধারা। আদি ও মধ্য যুগে মুখ্যতঃ সমিল-পংক্তিক শ্লোক রচনা করে কবিরা এ ধারাটি রক্ষা করেছেন।

- (২) মিত্রাক্ষর তার মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীগীতে সামান্য কিছুটা স্তবক-ধারার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তখন পয়ার, ত্রিপদীই ছিল মুখ্য পংক্তিবদ্ধ।
অলঙ্কার উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে বৈচিত্র্যময় স্তবক রচনার প্রয়াস দেখা দিল। মধুসূদন সনেট (চতুর্দশপদী কবিতাবলী) এবং

সমিল নানা রূপাদর্শের স্তবকবদ্ধ (ব্রজঙ্গনা কাব্য) রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এবং সম্ভবত জয়দেব-সহ মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ গ্রহণ করে স্তবক রচনায় ও মিলবিন্যাসে নতুন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিবৃন্দ সম্ভবত কবিতার গঠনগত শিল্পকলায় তাঁকে কিছুটা প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। মধুসূদন মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ কবিতাতেই মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছাড়াও কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত, — অর্থাৎ মুখ্য তিনরীতিতেই তাঁর মগুন শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীদের মধ্যে যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এবং বিহারীলাল চক্রবর্তী মিত্রাক্ষর কাব্যধারায় কিছুটা শক্তি যুগিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিবৃন্দও এই ধারাকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন।

তৃতীয় ধারাটি অনেকাংশে কৃত্রিম। এখানে মুখ্যত সংস্কৃত এবং গৌণত অন্যান্য বহিরাগত ছন্দের উচ্চারণ-প্রকৃতি বাংলায় রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। বহিরাগত ছন্দের রূপাদর্শে বা মিল-বিন্যাসের সাহায্যে বাংলা কাবোর গঠনগত সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণ যেখানে বাংলা কবিতার বিবর্তন ধারায় ধীরে ধীরে বর্জিত হয়েছে, সেখানে কৃত্রিম উচ্চারণে তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস

- (৩) সংস্কৃত ও ব্যর্থ হওয়াই স্ভাবনিক। চর্যাগীতি বা বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তৎকালীন
বিশেষী ছন্দের সুরাশ্রয়ী পঠনরীতিতে আংশিক লঘু-গুরু উচ্চারণ যতটা স্ভাবনিক
বাংলা ছিল, অষ্টাদশ শতকে এসে ভারতচন্দ্রের রচনায় তার কৃত্রিমতা স্পষ্ট
রূপান্তর-প্রয়াস হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই অত্যন্ত

সীমাবদ্ধ ভাবে, বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, দু-একটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের কৃত্রিম উচ্চারণে বাংলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এরপর হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ (ঠাকুর), বলদেব

(পালিত), হরগোবিন্দ (লক্ষ্মণ চৌধুরী), সত্যেন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, নজরুল, দিলীপকুমার, নিশিকান্ত, প্যারীমোহন (সেনগুপ্ত), বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ এই কৃত্রিম উচ্চারণকে বাংলায় কিভাবে কতটা স্থান দেওয়া যেতে পারে তার নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল লঘু কবিতা ও গানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে লঘু-গুরু ছন্দের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। তবে এই প্রচেষ্টার ক্রমধারাটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে রক্ষা না করলে, মুখ্য তিনছন্দ-প্রকৃতির কোনও একটিকে অবলম্বন না করলে, বহিরাগত কোন ছন্দের ব্যবহারেই কবিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। গানের ক্ষেত্রে অবশ্য সুরারোপের অবকাশ রয়েছে বলেই লঘু-গুরু উচ্চারণ কিছুটা খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বহিরাগত শব্দ-সম্পদকে যারা বাংলা কাব্য রচনায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ব্রজবুলি গীতের কবিবৃন্দ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ছিলেন মধ্যযুগের শিল্পী। ছড়াগান, কবিগান, এবং পল্লী-গীতিকার জ্ঞাত-অজ্ঞাত কবিবৃন্দও সম্ভবত মধ্যযুগের কালসীমার মধ্যেই ছিলেন। আধুনিক যুগে যাদের নাম বিশেষভাবে মনে পড়বে তাঁরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত), মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, অমিয় (চক্রবর্তী), সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কবিবৃন্দ। পল্লী অঞ্চলের লোকভাষাকে, বিভিন্ন উপভাষাকে শিষ্ট কাব্যে ছাড়পত্র দেবার প্রচেষ্টা বহু কবির রচনাতেই লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ব্যতীত বহিরাগত ভারতীয়, ইউরোপীয়, ফারসী, চীনা-জাপানী প্রভৃতি ছন্দের বাইরের গঠনাকৃতিকে বাংলায় স্থান করে দেবার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, অমিয় (চক্রবর্তী), বিষ্ণু, বিশ্ব (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ কবিবৃন্দ। হাল আমলে সাঁওতালী, ওরাঁও, চাকমা প্রভৃতি আদিবাসীদের নানা গীতিচণ্ড বাংলায় আনবার সচেতন প্রয়াস কোন কোন কবি করেছেন।

যেমন ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও বাংলা কাব্যের পরিসর বিস্তৃত করবার প্রচেষ্টা এ-যুগের কবিরা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, রবীন্দ্র যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্যে ছন্দের ঐশ্বর্যদীপ্তি অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছে। এই বিরাট সর্বগ্রাসী প্রতিভা অধিকাংশ কবিকেই ভাব ও ছন্দ উভয়

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা
কাব্যে ছন্দ
বৈচিত্র্যের অভাব

দিক থেকেই বহুলাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।— এই সম্মোহক রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই একদল তরুণ কবি সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কবিতার নব আঙ্গিক প্রবর্তনে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে

গিয়ে কতকাংশে আবার সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য কাব্য-আঙ্গিকের প্রভাবে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রথাবদ্ধ ছন্দ-কাঠামো মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়ে গদ্যের বাক্‌ধর্মী উচ্চারণ পরিস্ফুটনের চেষ্টা, গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের চমক সৃষ্টির প্রয়াস, স্প্রাং রিদম-এর বিকল্প রূপে শিথিলবদ্ধ ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস, পাশ্চাত্য কবিতার গঠনভঙ্গি ও মিলবিন্যাসের

অনুসৃতি,— এ সবেৰ মধ্যে নব পথের সন্ধানস্পৃহা লক্ষ করা যায়। তবে তিন ও চারের দশকে এক শ্রেণীর কবিদের মধ্যে যে সচেতন রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কালের ব্যবধানে সেই ‘রবিছায়া’র আতঙ্ক কেটে গেছে মনে হয়। আশা করা যেতে পারে, এবারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে প্রত্যয়-বলিষ্ঠ নতুন ছন্দোবীতির প্রবর্তনায় বাংলা কাব্য-আঙ্গিকের কিছু লক্ষণীয় দিক-পরিবর্তন সূচিত হবে।

পরিশিষ্ট-ক

ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কেবলমাত্র যে একজন বিশিষ্ট ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা ছন্দচিত্তর ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য ছান্দসিকের সম্মানও তাঁরই প্রাপ্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ‘বিচিত্রা ক্লাবের’ এক অধিবেশনে (১৫ ফ্রাণ্ডন, ১৩২৪, ইং ২৭-২-১৯১৮ তারিখে) তিনি ‘ছন্দ-সরস্বতী’ নামে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করেন। ১৩২৫-বৈশাখ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিক প্রবন্ধাকারে নয়, অনেকটা গদ্য-পদ্য মেশানো রম্য রচনার ঢঙে এটি লিখেছিলেন। ছন্দ-সরস্বতী কিশোর কবির কাছে নাকি পাঁচবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে, বিভিন্ন বাহনে চেপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশ ‘আদ্যাশ্রী মূর্তি—মকরান্দী ডিম্বাবাহন—গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতিতে।— এ অংশে একেবারে চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিহারীলাল পর্যন্ত পয়ার-ত্রিপদীর ধারাটি (মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত) ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত-সহযোগে দেখিয়েছেন। পয়ার, ত্রিপদী—সম্পর্কে কবির ছন্দোবদ্ধ সূত্রনির্দেশ বেশ কৌতুকপ্রদ। পয়ার সম্পর্কে পয়ার বন্ধেই তিনি লিখেছেন,—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।

আটে ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড় ॥

যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—

মারো ঝট, ডিম্বা ভেসে যাবে ডগমগি ॥

ঠাঁই বুঝে গুণ টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।

যুক্তায়ুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড় ॥

(ছন্দ-সরস্বতী আনন্দধারা সং, পৃ. ২)

কবি-ছান্দসিক এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় অনেক মূল্যবান তথ্য হাজির করেছেন। আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদীর যতিবিভাগ, প্রত্যেক পদে বিজোড়ে-বিজোড়, জোড়ে-জোড় শব্দ-গ্রন্থন কৌশল, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণে (রুদ্ধদলে) হসন্ত উচ্চারণের রহস্য, কোথাও দ্রুত এগিয়ে

১। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর তিন সপ্তাহ বাদে বিচিত্রা ক্লাবের আর একটি সাহিত্য সভায় (৬ চৈত্র, ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলা ছন্দ’ নামে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুমিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকালে রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধই তাঁকে ছন্দ বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ‘ছন্দের ‘অর্থ’ নামে সবুজপত্র, চৈত্র, ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যাওয়া (গুণ টেনে), কোথাও বা ধীর ভঙ্গিতে চলা (দাঁড় টেনে),— অর্থাৎ সরল ও মিশ্র-কলাবৃত্ত উচ্চারণ রীতির পার্থক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত,—এবং সর্বোপরি ছন্দের দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে যুক্ত-অযুক্ত দুই রকমের বর্ণসমন্বয়ের আবশ্যিকতা স্বীকার,— এ-সবগুলিই বাংলা ছন্দের উচ্চারণ ও গঠন বিষয়ক গভীর উপলব্ধি-প্রসূত সূচিস্থিত মন্তব্য।

ত্রিপদী বন্ধের সংজ্ঞাও কবি ত্রিপদী ছন্দেই দিয়েছেন,—

আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়,
ছয়-ছয়-আট ত্রিপদীর।
লঘু ছন্দ এনে বসে দীর্ঘ আট-আট দশে’
রচনা করিবে তুমি ধীর॥

(ঐ, পৃ. ২)

কবির কাছে ছন্দ-সরস্বতীর দ্বিতীয় আবির্ভাব ‘হৃদ্যাক্ষী মূর্তি’—মঞ্জুমরাল বাহন— গঙ্গা যমুনা পদ্ধতিতে। এ-অংশের আলোচনায় তিনি (সরল) কলাবৃত্তের উচ্চারণ-রহস্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। এ-ছন্দের ধ্বনিগত মাত্রামাপ সঠিক উপলব্ধি করে মন্তব্য করলেন,—

‘পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর,
প্রকৃতপক্ষে যে একজোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন
ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না।’
(ঐ পৃ. ১০)

ঐ-কার, ঔ-কারকে কবি সরসঙ্কর বা diphthong ধরতে বলেছেন।—অর্থাৎ কলাবৃত্তে তাকে একজোড়া সরবর্ণরূপে গণ্য করতে হবে।— এ ছন্দের সন্ধান তিনি প্রথম পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘কাব্য গ্রন্থাবলী’ থেকে। তাঁর ‘অপেক্ষা’ কবিতা থেকে ‘ছন্দ পাটির অনুসারে’ একটি পংক্তি সাজিয়ে এ-ছন্দের মাত্রাগত হিসেবটাও বুঝিয়ে দিলেন,—

‘কলস ঘায়ে । উরমি টুটে ।
রশশি রাশি । চুরণি উঠে ।

শানত বায়ু । প্রানত নীর । চুমবি যায় । কভু ।

ছন্দময়ী দেখে বললেন, ‘ঠিক হয়েছে, প্রতি পংক্তি-পর্বে পাঁচ। এ আমার পাঁচকড়াই পাঁইজোড়।’

ছন্দ সরস্বতীর তৃতীয়বার আবির্ভাব হল ‘চিত্তেশী মূর্তি’ — মত্তময়ূরবাহন — বর্ণাব্যামর পদ্ধতিতে। এখানে কবি লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের রহস্য ধরতে চেয়েছেন। স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

‘ও হল বাংলা ভাষার প্রাণপাখি। ওকে যে বশ করতে পারবে বদ্ধবাণীর
স্বরূপ সে প্রত্যক্ষ করবে। বাংলা সঙ্গীতের মর্মের কথা তার কাছে রূপ
ধরে ফুটে উঠবে।’
(ঐ, পৃ. ১৫)

আরও স্পষ্ট করে এ ছন্দের মাত্রা গণনার নির্দেশ দিলেন,—

‘এ ছন্দে হসন্ত বা ভাংটা অক্ষর ছাটাই করে, খালি স্রাস্ত বা গোটা অক্ষর
গুণতে হয়। শব্দের যে যে অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের
চিহ্ন দিয়ে দ্যাখ— বুঝতে পারবে।

আমি আবার ছন্দপাটি ধরলুম,—

তোমার আমার । মাঝ খানেতে ।

একটি বহে । নদী ।

দুই তটেরে । একই গান সে ।

শোনায় নির । বধি ॥’

(ঐ. পৃ. ১৫-১৬)

প্রথম পরীক্ষা করে কবি-ছান্দসিক ‘দুই তটেরে’ পর্বে পাঁচটি স্রাস্ত বর্ণ পাচ্ছিলেন। ছন্দময়ী তাঁকে সংশোধন করে বললেন, ‘দুই শব্দের ই-কার পুরো উচ্চারণ হচ্ছেনা, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল’।— সূত্রাং পর্বগুলি সবই চারের। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে পর পর প্রাচীন বহু কবির কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এ-ছন্দকে সত্যেন্দ্রনাথ ‘শব্দ পাপড়ি গোনা ছন্দ’ বলেছেন।

ছন্দ-সরস্বতী চতুর্থবার আত্মপ্রকাশ করলেন ‘দৃগুশ্রী-মূর্তি—গগন গরুড় বাহন—বিমান বিহার পদ্ধতি’তে। কবি এখানে তাঁর নিজস্ব ধারায় সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপায়ণের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তিনি মূলত সংস্কৃত, আরবী-পারসী প্রভৃতি প্রাচীন ক্লাসিক ছন্দগুলির বাংলা রূপান্তর-পদ্ধতি ধরতে চেয়েছেন। সংস্কৃত মুক্তস্বরে লঘু-গুরু উচ্চারণের তারতম্য আছে। আরবী-পারসীতেও রয়েছে। বাংলার সন্ধিস্বর (diphthong) ছাড়া গুরু মুক্তস্বর নেই। সত্যেন্দ্রনাথ সে কারণেই সংস্কৃত মন্দাক্রান্ত, মালিনী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের বা আরবী মোতাকরিব, হজজ জাতীয় ছন্দোবন্ধের বাংলা রূপান্তরে গুরুস্বরের বিকল্প হিসেবে রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। তাতে নতুন নতুন ছন্দ-প্যাটার্ন এলেও ওই সব ক্লাসিক ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ঠিকমতো ফোটেনি। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, ইংরেজি প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ ধ্বনিরূপও রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের সাহায্যে ফোটানোর প্রচেষ্টা তাঁর সর্বাংশে সফল হয়নি। এই শ্রেণীর ছন্দ-প্যাটার্নের বিন্যাসে কবি নিজে বহু পরীক্ষা করেছেন। তাকেই এখানে দৃগুশ্রী-মূর্তিরূপে অভিহিত করেছেন। ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়েও এ-জাতীয় ছন্দকে কলাবৃত্তেরই রূপভেদ হিসেবে গণ্য করতে হয়।

পঞ্চম আবির্ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ-সরস্বতীকে ‘মঞ্জুশ্রীমূর্তি — বিদ্যুৎ তাঞ্জামবাহন — বলবল গুলজার পদ্ধতি’তে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে কবি আর বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ বা লঘু-গুরু বিন্যাসক্রমের অনুসরণ করেননি; রুদ্ধ-মুক্ত নানা প্যাটার্নের নিজস্ব পরীক্ষা করেছেন। কোনও শ্লোকে সবই রুদ্ধদল, কোথাও বা সবই মুক্তদল, কোথাও রুদ্ধ-মুক্ত বিন্যাসের নব উদ্ভাবিত প্যাটার্ন; দ্বিদল, ত্রিদল,

চতুর্দল পর্বের নানা ভঙ্গী। এ-ধরনের ছন্দ-প্যাটার্ণ তৈরীতে সত্যেন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল বহু কবিতায় তার নিদর্শন মিলছে। এখানেও (সরল) কলাবৃত্তের বিচিত্র পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-অধ্যায়ে তিনি বাংলায় অন্তস্থ-ব এবং অন্তস্থ-য়-এর ব্যবহার সম্পর্কে সূচিস্তিত মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, ছিঃ, অঃ, বাঃ, হঃ প্রভৃতি ধন্যাত্মক একদল শব্দের বা বাক্য-সূচনার ধা, হা, গো জাতীয় একদল দীর্ঘ উচ্চারণযুক্ত শব্দের দ্বিকলা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও তাঁর কানে ধরা পড়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছন্দ-সরস্বতীর প্রথম তিনবারের আবির্ভাবে (সরল) কলাবৃত্ত, মিশ্র (কলা) বৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত — বাংলা ছন্দের এই তিন মুখ্য রীতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ অনেকাংশে ধরতে চেষ্টা করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম আবির্ভাবে সংস্কৃত অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপান্তর এবং কবির স্বকল্পিত রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের নানা প্যাটার্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ছন্দ-সরস্বতীর চতুর্থ ও পঞ্চম আবির্ভাবে প্রদর্শিত মূর্তি পূর্বোক্ত মূর্তিগুলির মধ্যেই,— বিশেষ করে হৃদ্যাক্ষী মূর্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। আলোচ্য রচনাটির অপর আকর্ষণ হল, সর্বপ্রথম এখানেই একজন ছান্দসিক বাংলা কাব্যে ছন্দ বিবর্তনের কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। চর্যাগীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্র মধ্যপর্বের কাব্য পর্যন্ত তাঁর পদচারণা। এদিক থেকেও সত্যেন্দ্রনাথের ‘ছন্দ-সরস্বতী’ রচনাটি পরবর্তী ছান্দসিকদের দিক্‌দর্শনী হিসাবে গণ্য হতে পারে।

পরিশিষ্ট-খ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্যধারায় ছন্দ-সচেতনতা

নিকটতম প্রতিবেশী হলেও, এই পশ্চিমবঙ্গে বসে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চার পরিচয় রাখা যে সহজ কাজ নয় ভুল্‌ভোগীমাঝেই সে কথা স্বীকার করবেন। তৎসত্ত্বেও বাংলা কাব্যের ছন্দ বিবর্তনের চর্চা করতে বসে বাংলাদেশের বিগত চার দশকের (১৯৫০-১৯৯০) কাব্যধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। সুতরাং আপাতত হাতের কাছে যে কাব্যসংকলনগুলি পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে খ্যাত বা স্বল্পখ্যাত কয়েকজন কবির যে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগ মিলল, তার ভিত্তিতেই ওপার বাংলার সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দ-সচেতনতা সম্পর্কে এই নিবন্ধটি রচনার প্রয়াস করা গেল।

পঞ্চাশের দশক থেকে আজও পর্যন্ত অক্লান্তভাবে সাহিত্যচর্চা শামসুর রাহমান করে এবং চল্লিশটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে যিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁর নাম শামসুর রহমান (১৯২৯)। তিনি দুই বাংলার কবিতাপ্রেমী পাঠকবৃন্দের কাছেই সমান প্রিয়। কিছুকাল পূর্বে কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশন-সংস্থা (দে'জ) থেকেও তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শামসুর প্রথম তরুণ বয়সে যেমন বঙ্গবিভাগ (১৯৪৭) দেখেছেন, কয়েক বছর বাদেই (১৯৫২) আবার ভাষা-আন্দোলনের শরীক হয়েছেন। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামেও (১৯৭১) সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। একজন সহানুভূতিপ্রবণ কবি হিসাবে এই ঘটনাগুলি স্ভাব্যতাই তাঁর সৃজনধর্মী রচনায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাঁর 'বন্দী শিবির থেকে' মুক্তি যুদ্ধের সময় (১৯৭২) কলকাতা থেকে (অরুণা প্রকাশনী) প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে প্রকাশিত 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' বা 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা দুটি তখন বাঙালী

পূর্ববাংলার কবিতা, মিহির আচার্য-সম্পাদিত, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ-কবিতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

আধুনিক কবিতা (সংকলন), রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

বাংলাদেশের কবিতা: এক স্ববক, বিষ্ণু দে-সম্পাদিত, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার-সম্পাদিত, কলিকাতা, জুন, ১৯৮৫।

লক্ষ করবার বিষয়, আমার সংগ্রহের মধ্যে চারটি সংকলন-গ্রন্থই কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এর থেকে ধরা যাবে, পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে রচিত কবিতার প্রতি আকর্ষণ কত বেশি। কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত কবিতার বইও কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশক প্রকাশ করেছেন।

তরুণ-তরুণীদের রঙে যে দোলা দিয়েছিল, তার সঙ্গে বোধহয় একমাত্র নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’র কবিতাগুলির তুলনা চলতে পারে। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন প্রেম-প্রকৃতি, আত্মদর্শন জাতীয় মানুষের সহজাত বোধগুলি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আবার স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসাও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় অবশ্যই পূর্ববাংলা মুখ্য পটভূমি হয়েছে। তবে দেশ-কালের উপরেও সমগ্র মানবচেতনার কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য আমাদের লক্ষ্য তাঁর কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দান নয়, তিনি তাঁর কবিভাবনার সুষ্ঠু প্রকাশে ভাষা-ছন্দকে কতটা কার্যকরী করে তুলেছেন তারই প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ মাত্র।

শামসুর রাহমান একজন ছন্দ-সচেতন কবি। বাংলা ছন্দের মুখ্য তিন রীতির অর্থাৎ কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত), মিশ্রবৃত্ত (অক্ষর বৃত্ত) এবং দলবৃত্তের (স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ) স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে এবং সেই সঙ্গে প্রাজ্ঞল গদ্যকবিতা রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখানে কিছু নমুনা তোলা যেতে পারে।—

(১) পঞ্চকল-পর্বিক কলাবৃত্ত (সমিল)

মনে কি পড়ে নিঝুম কুয়োতলা,
গাছগাছালি, রাস্তা জমকালো,
মস্ত মাঠ, দেয়াল, ঘর-বাড়ি,
বকুলতলা শ্লোগানে চমকালো?

তোমার ছবি রাত্রি রাখে বৃকে,
স্বপ্ন-ঘোড়া মগজ জুড়ে ছোটো।
তোমার ছবি নদীতে মাঠে মেশে,
ফুল চোখ নীলপদ্মে ফোটো।

[বাংলাদেশের কবিতা, ডাউদ হায়দর-স., টানাপোড়েন]

সাতটি চতুঃপংক্তিক স্তবকে (৫।৫।।২ I), প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির মিলবন্ধে রচিত, কবিতাটির অধিকাংশ পর্বে কবি চতুর্দলে পাঁচ কলামাত্রার বিন্যাস করেছেন। তবে পাঠক যাতে এ-ছন্দকে দলবৃত্ত বলে ভুল না করেন সেজন্যে মাঝে মাঝেই পাঁচ মুক্তদলে পাঁচ কলার সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

(২) ষটকল-পর্বিক, মিলহীন

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি

শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।...
 স্বাধীনতা তুমি
 অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

স্বাধীনতা তুমি
 গৃহিণীর ঘন খোলা কালোচুল,
 হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
 স্বাধীনতা তুমি
 খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা
 খুকীর অমল তুলতুলে গালে
 রৌদ্রের খেলা।
 স্বাধীনতা তুমি
 বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
 বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
 যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., স্বাধীনতা তুমি]

অন্য দুই ছন্দরীতির মতো কলাবৃত্তেও যে প্রয়োজনে উদাত্ত ওজস্বিতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল তার সাক্ষ্য রেখেছেন। এখানে শামসুরও সার্থকভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। প্রতি পংক্তি-সূচনায় ‘স্বাধীনতা তুমি’ ছয়মাত্রার পর্বটি পুনরাবৃত্ত হয়ে কবিতাটির চড়া সুরে বাঁধা মূল ধূয়াটিকে সজাগ করে রেখেছে।

- (৩) সপ্তকল পর্বিক কলাবৃত্ত (প্রবহমান-মিলবিহীন)
 জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখ ফোটে
 নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা
 কাঁপি না ভয়ে আর দ্বিধার নেই দোলা—
 এবার তবে রাতে হাজার দীপ জ্বলে
 সাজাবো তার পথ যদি সে হেঁটে আসে।
 যদি সে হেঁটে আসে, প্রাণের ছায়াপথ
 ফুলের মতো ফুটে তারার মতো ফুটে
 জ্বলবে সারারাত, ঝরবে সারারাত।
 জেনেছি ত্রিসীমায়: স্পন্দ-ধ্বনি শুধু
 হৃদয়ে বলে নাম, একটি মৃদু নাম।।

[পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায় স., পূর্ববাগ]

স্পষ্টতই কবিতাটিতে পশ্চিমী হৃন্দাবন্ধের আভাস রয়েছে। তবে কবি সুনির্দিষ্ট কোনো রূপাদর্শ বা প্যাটার্ন গ্রহণ করেননি। পংক্তিমিল না রেখেও বেশ কয়েকটি পর্বে শব্দগুচ্ছের সচেতন পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। যেমন, জেনেছি কাকে চাই, যদি সে হেঁটে আসে, জ্বলবে সারারাত/ঝরবে সারারাত, বলি না তার নাম/হৃদয়ে বলে নাম/একটি মৃদু নাম ইত্যাদি।

এ-যুগের অন্যান্য কবিদের মতো শামসুরও অপর দুই-হৃন্দরীতির তুলনায় মিশ্রবৃত্তেই বেশি কবিতা লিখেছেন। তারমধ্যে সনেট আছে, মুক্তক রয়েছে, সমিল ও মিলহীন নানা হৃন্দাবন্ধের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন রয়েছে। এখানে দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

(৪) মিলহীন মুক্তক

বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বলি
দয়াবান বৃক্ষ তুমি একটি কবিতা দিতে পারো?
বৃক্ষ বলে, আমার বাকল ফুঁড়ে আমার মজ্জায়
যদি মিশে যেতে পারো, তবে
হয়তো পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

জীর্ণ দেয়ালের কানে বলি
দেয়াল আমাকে তুমি একটি কবিতা দিতে পারো?
পুরোনো দেয়াল বলে শেওলা-ঢাকা স্বরে,
এই ইট সুরকির ভেতর যদি নিজেকে গুড়িয়ে দাও, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

একজন বৃদ্ধের নিকট গিয়ে বলি, নতজানু,
হে প্রাচীন দয়া করে দেবেন কি একটি কবিতা?
স্তব্ধতার পর্দা ছিঁড়ে বেজে ওঠে প্রাপ্ত কণ্ঠ—যদি
আমার মুখের রেখাবলী তুলে নিতে পারো
নিজের মুখাবয়বে, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

কেবল কয়েক ছত্র কবিতার জন্যে
এই বৃক্ষ, জরাজীর্ণ দেয়াল এবং
বৃক্ষের সম্মুখে নতজানু আমি থাকবো কতোকাল?
বলো, কতোকাল?

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, একটি কবিতার জন্যে]

আঙ্গিক বোঝাবার জন্যে এখানে সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল। স্বল্পায়তন চার স্তবকের কবিতার প্রথম তিন স্তবকের প্রথম-দ্বিতীয় লাইনে প্রশ্নাকারে এক ভাষাভঙ্গির পুনরাবৃত্তি। বৃক্ষ, দেয়াল এবং এক বৃদ্ধের কাছে কবিতা প্রার্থনা। প্রতি স্তবকেই পরবর্তী লাইনগুলিতে একই ভাষাভঙ্গিতে বৃক্ষ, দেয়াল ও বৃদ্ধের প্রত্যুত্তর। চতুর্থ স্তবকে প্রতীক্ষারত, হতাশাঙ্কু কবির চিরন্তন জিজ্ঞাসা দিয়ে নিটোল একটি কবিতার সমাপ্তি।

কবি দলবৃত্তেও মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর কিছু কবিতা লিখেছেন। এখানে একটি মিলবিহীন মুক্তকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল।—

(৫) দলবৃত্ত মুক্তক, মিলবিহীন

এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা

শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি,

এক নিমেষে ছলছলিয়ে ওঠে কেমন বৃকের পুঙ্কর।

কোথায় যাবে? কেন যাবে? এমনিতিরো প্রশ্ন শুধু

চোখের তারায়, ঠোঁটের রেখায়

কাঁপতে থাকে।

বয়সা কেউ সূর্য ডোবার মতো হঠাৎ ডুবে গেলে,

অন্ধকারে মনের সঙ্গে

একা দোকা খেলে কাটাই ক্লান্ত বেলা।

দুঃখ কেবল দুঃখ হ'য়ে ফেলে গভীর দীর্ঘ ছায়া

মুখের রেখায়—

তখন বৃকের ভেতর শুধু একলা লাগে,

একলা লাগে।

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এখন আমি]

পংক্তিগুলি চতুর্দল-একপর্ব থেকে সাতপর্ব পর্যন্ত প্রয়োজন মতো কবি দীর্ঘায়ত করেছেন। সচেতন কোনো মিলের প্রয়াস না থাকলেও মাঝেমধ্যে প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস বা পর্বমিল পাঠকের কানকে তৃপ্ত করে।

লোককবিরী, গ্রাম্য ছড়াগানের অজ্ঞাত-পরিচয় গীতিকারেরা সেই প্রাচীন কাল থেকেই লোকভাষা ব্যবহার করে চলেছেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবি লোচন দাস, এবং ১৭-১৮ শতকের পূর্ববঙ্গগীতিকার পল্লীকবিগণ এই লোকভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। ১৯-২০ শত শতকের কবি রজনীকান্ত সেন এবং জসীমউদ্দিন তাঁদের কবিতা-গানে লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। এ-কালেও দুই বাংলার কবি ও গীতিকারগণ প্রয়োজনমতো লোকভাষা ব্যবহার করে কবিতা গানের সীমারেখা প্রসারিত করে চলেছেন। উপন্যাস-নাটকে শিল্পীরা এখন আঞ্চলিক ভাষা যথেষ্ট ব্যবহার করছেন, লক্ষ করা যায়। শামসুর প্রথম দিকে না করলেও, বোধহয় অনুজপ্রতিম কবিদের

প্রভাবেই ইদানীং মাঝে মাঝে গ্রাম্য লোকভাষায় কবিতা রচনার পরীক্ষা করছেন।
যেমন,—

(৬) আঞ্চলিক লোকভাষা: মিশ্রবৃত্ত, ১৮ মাত্রার প্রবহমান, মিলবিহীন ছন্দ:

হালায় আজকা নেশা করছি বহত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপড়ির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাত দুইটা কেমন
আলগা আলগা লাগে, গাঢ় আবরের সুনসান
আন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিন বান্ধা পাও।

আমারে হগলে কয় মইফার পোলা, জুন্মনের
বাপ, হুসাবানুর খসম, কয় সুবরাতি মিস্ত্রি।
বেহায়া গলির চাম্পা চুমাচাট্টা দিয়া কয়, ‘তুমি
বাপারী মনের মানু আমার, দিলের হকদার।’

আসলে কেউগা আমি? কোন্‌হানতে আইছি হালায়
দাগাবাজ দুনিয়ায়? কৈবা যামু আখেরে ওস্তাদ?
চুড়িহাট্টা, চান খাঁর পুল, চকবাজার, আশক
জমাদার লেইন; বংশাল; যেহানেই মকানের
ঠিকানা থাউক, আমি হেই একই মানু, গোলগাল
মাথায় বাবরি; থুতনিতে ফুদি দাড়ি, গালে দাগ,
যেমন আধলি একখান খুব দূর জমানার।

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এই মাতোয়ালা রাইত]

ছন্দ কিছুটা শিথিলবদ্ধ হলেও, মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণরীতি মোটামুটিভাবে এখানে রক্ষিত হয়েছে।

শামসুর পরিচ্ছন্ন রুচির কবি হলেও, বোধহয় এ-কালের সংস্কারমুক্ত সাহসিক কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু নিষিদ্ধ ‘স্ল্যাং’ শব্দ মিশিয়ে ছন্দবদ্ধ কবিতা লেখার সাহসিক পরীক্ষা করেছেন। যেমন,

(৭) মিশ্রবৃত্ত, ১৮ মাত্রা-লাইনের প্রবহমান অমিল ছন্দ,—

এখন নখরাবাজি ছাড়। লচ খাওয়া হয়ে গেছে
অনেক আগেই; সেই কবে থেকে জোমে আছি আর
তোমার জন্যেই আজ আমি এমন উঠাইগিরা।
তোমার অশোক ফুল ফোটা পড়েছে আমার চোখে
বহবার, বহবার দেখেছি বুলপি ছাতি। জিভ

ভ্যাংচানো; বুলিয়েছি হাত ঝাপে। জোড়-খাওয়া তাও
হয়েছে অনেকবার হে চামর খেপলু আমার।

কেন তুমি মাঝে মধ্যে খামোকা বাতেলা দিতে চাও
আনসান কথা রাখ চনমনে মেয়ে যদি তুমি
আমার এ থোমা-বিলা দেখে সবকিছু গুলিট
করে দিতে চাও, তবে কেন নিয়েছো আমার ছল্লা
ঘন ঘন কানকি মেরে? চুমকি তুমি, সাত ঘাটে ঘুরে

ফিরে বেড়ানোই কাজ; স্থিত হয়ে বসতে পারো না
কোথাও সামান্যক্ষণ। এখন হঠাৎ ঠাণ্ডা পানি
হবে তুমি, তা হবে না। কেননা হেকোরবাজ নই
আমি আজো, যদিও ঢামনা বলা যায় ইদানীং।

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কবিতার প্রতি ঢামনা]

আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি এবং রকবাজ ‘মান্নান’ ছেলেদের ব্যবহৃত শব্দাবলী ব্যবহারের
সাহায্যে কবি সম্ভবত বাংলা কাব্যের সীমা প্রসারিত করতে চেয়েছেন। এ কাজ এপার
বাংলার সাম্প্রতিক কবিরাও অল্পস্বল্প করছেন, দেখা যাবে।

শামসুর বেশ কিছু ভালো গদ্যগন্ধী মিশ্রবৃত্ত রীতির কবিতাও লিখেছেন। অন্তর্মিল,
প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস যে এ-জাতীয় কবিতার একটি বড়ো সম্পদ একথা বুদ্ধদেব বসু,
অমিয় চক্রবর্তী বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো শামসুরও জানতেন। তাঁর বহু কবিতায় এর
সাক্ষ্য মেলে। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

এখন আমাকে রাশি রাশি ফুল, ফুলের বাহরী তোড়া দিচ্ছো,
দাও, করবো না

বারণ। কারণ চলৎশক্তিহীন। প্রজাপতি
কিংবা একরত্তি মাছি এসে যদি বসে নাকের ডগায়, সতি
পারবো না তাড়াতে ওদের হাত নেড়ে।

লোবান অথবা

আগরবাতির দ্বাণ আমাকে করে না আমোদিত। পড়ে আছি
চিত হয়ে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি নিয়ে। হুহ কান্না অথবা গোলাপজল
উভয়ের প্রতি উদাসীন। আমাকে করাবে স্নান
যে লোকটা, চুলকাছে সে নধর পাছা তার। সে তব্বীর স্তন

হয়নি নমিত শোকে, তার

যৌবন আমাকে জপায় না আর জীবনের

আগড়ম বাগড়ম শ্লোক।

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, মুখোশ]

কবিতাটি পড়তে গেলেই পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন, কবি কত অনায়াসে অলঙ্কৃত শব্দ-ধ্বনির আবর্তনে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ, সরস করে তুলেছেন।

এবারে সবশেষে, কবির একটি নিপুণ ব্যঙ্গধর্মী, কথ্য ভাষা-সমৃদ্ধ গদ্যকবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর ছন্দসচেতনতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ করতে চাই।—

চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল নুন লাকড়ি পাচ্ছি,
ভাগ-করা পিঠে পাচ্ছি, মদির রান্ধিরে কাউকে নিয়ে
শোবার ঘর পাচ্ছি, হেঁটে বেড়ানোর
তকতকে হাসপাতালি করিডোর পাচ্ছি।
কিউতে দাঁড়িয়ে খাদ্য কিনছি,
বাদ্য শুনছি।

মধ্যে মধ্যে আমার মগজের বাগানের সেই পাখি
গান গেয়ে ওঠে; আমার চোখের সামনে
হঠাৎ কোনো রূপালী শহরের উদ্ভাসন;
দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুটি চেপে ধরবেন না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্রেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্ক য়াচ্ছি, মাইক্রোফোনি কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

[শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দৃঃস্বপ্নে একদিন]

গভীর প্রত্যয়সিদ্ধ কবিভাবনার ছন্দবদ্ধ স্বচ্ছ প্রকাশনা শামসুর রাহমানের কবিতার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা যেতে পারে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে তার ক্ষীণ আভাসমাত্র পাওয়া যাবে। কৌতূহলী পাঠককে তাঁর এযাবৎ প্রকাশিত মূল রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তাঁর সাহিত্যজীবন এখনো দীর্ঘ দিন সক্রিয় থাকবে। পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে ভবিষ্যতে তিনি অবশ্যই আরও নতুন নতুন ভাব ও ছন্দ-আঙ্গিকের কবিতা উপহার দেবেন।

আশরাফ সিদ্দিকী পঞ্চাশের দশকের আর একজন প্রতিভাবান কবি হলেন আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬)। তাঁর সুপরিচিত ‘তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০-এ। ‘বিষকন্যা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩-তে। কবির আরও দু’একটি কাব্যগ্রন্থের নাম, সাতভাই চম্পা, উত্তর আকাশের তারা ইত্যাদি।

আশরাফ একজন ছন্দমনস্ক, সমাজ-সচেতন, রোমাণ্টিক কবি। তাঁর বক্তব্য আবেগপ্রবণ, মাঝে মাঝে কিছুটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মেশানো। ভাষারীতি স্বচ্ছ ও প্রাজ্ঞল।

এ-যুগের অন্য কবিদের তুলনায় তিনি খুবই কম লিখেছেন। তবে অল্প যতটা যা লিখেছেন তাতেই পাঠকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এখানে তাঁর বিভিন্ন ছন্দরীতি প্রয়োগের একটি করে নমুনা পেশ করা গেল।—

(১) কলাবৃত্ত ছয় মাত্রা পর্ব

জজের দুলালী সাহারা বিদেশী জিনিষে বিরূপা!
বলতো: জানিস আশরাফ ভোগের ললনা আমি নই।
জজের দুলালী সাহারা সেই সাহারাই স্বেচ্ছায়
বেছে নিল আনোয়ারকে,
'হলওয়েল মনুমেন্টে'র বিপ্লবী বীর আনোয়ার।
বিচারে সে যার জেল হয়। তারি বাবা ছিল বিচারক!

সাহারা এখন ঢাকাতে? পলিটিক্সের প্রফেসর?
আনোয়ার আজো জেলেতেই? মা বাবার আলো মুখে সেই!
সাহারার মেয়ে সাবেরা। সেই দৃঢ় ওর দুটি হাত।
সাবেরা! তোমার মা কেমন? বাবাকে কি খুব মনে পড়ে?
আমাকে চিনতে? রবিকা'? মা-বাবার কাছে শুনতে?

সাহারার মেয়ে সাবেরা। বিপ্লবী নেশা চোখে ওর
সাহারার মেয়ে সাবেরা। ওদের পৃথিবী আসছে ॥

[তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, সাহারার মেয়ে সাবেরা]

কলাবৃত্তে কবি ৬।৪।৬।৪ I পর্ব-পদ-যতি বিন্যাস করেছেন। অনেক সময় পংক্তির প্রথম পদে ৬।৩ মাত্রা দিয়ে, একমাত্রার প্রসারণ রেখেছেন। তাতে ছন্দ চমৎকার দোলার সৃষ্টি হয়েছে। পংক্তি-প্রান্তে মিল রাখেননি। তবে সে অভাব পাঠক তেমন উপলব্ধি করতে পারেন না।

মিশ্রবৃত্তেই কবি বেশি কবিতা লিখেছেন। এখানে অসমান পংক্তিক, মিলবিহীন একটি কবিতা থেকে উদাহরণ তুলছি।—

(২) এলাম কবিকে দেখে।

'কারমাইকেল হোস্টেল থেকে' আমি আর কাজি আনোয়ার
সার্কুলার রোডে গিয়ে ট্রামে উঠলাম।
আমরা স্বাধীন আজ! আর এই স্বাধীন হাওয়ায়
বিদ্রোহী কবির কথা বার বার মনে পড়ে যায়।।

সার্কুলার ক্রসিং-এ ছোট এক বাংগালী হোটেল,
চলছে কলের গান: চির-চেনা নজরুল সংগীত—
এ গান আমিও গাই। আপনাকে নবরূপে চিনি।

বিড়ি বাঁধে বিড়িওয়ালা। গান গায়: সেও গান গায়
'ছাত্র-তরুণ গান গায়'!

বিদ্রোহী কবির গান! যে গান রক্তের মত লাল!

[তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, কাজী নজরুল ইসলাম]

চিহ্নিত পদগুলিতে কোথাও অতি-সংশ্লেষ (কারমাইকেল হোস্টেল থেকে ৪, ৪, ২

মাত্রা) বা কোথাও কলাবৃত্ত-ভঙ্গিম অতি-বিশ্লেষ (ছাত্র তরুণ গান গায়: ৩, ৩, ৪ মাত্রা)
ছন্দ-সচেতন কবি এনেছেন। এই স্বাধীনতা প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ অগ্রজ
কবিরাও গ্রহণ করতেন।

এবারে দলবৃত্ত রীতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

(৩) ছড়ার ঢঙে: ৪|৪||৪|২/১—সমিল।—

ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে পথ। পেরিয়ে মাঠবন!
চুলছি আমি। ঢুলছো তুমি। কাঁপছে তোমার চুল।
ছোট্ট নদী এই পালালো! এ কোন্ ইন্সটেশন!
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে তোমার দুল।

চলছে ট্রেন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে সাথে।
এগিয়ে চলে বয়স মন দিবস জোছনাতে ॥

সকাল সাঁঝে দিবস রাতে আলোক আঁধিয়ারে:
ছুটছে ট্রেন! আমরা যাবো দূর সে তেপান্তরে।
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে পথ সে অনেক দূর।
এরির মধ্যে দেখা হ'লো অনেক জনার সাথে।
আলাপ হলো! চায়ের কাপে একটুখানি ঝড়।
তারপরেতেই নূতন স্টেশন। বিদায়! নমস্কার ॥

মিনিয়ে গেলো কোথায় তারা কোন সে তেপান্তর!
সন্ধ্যাভাষা। নতুন পথিক স্থান নিয়েছে তার।
নতুন পথিক। নতুন কথা। নতুন আলাপন!
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে মাঠ-বন।

কাল সকালে নাববে গিয়ে সে কোন ইন্সটেশন ॥

[তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, ট্রেন]

সতের পংক্তির সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল। উদ্দেশ্য, পাঠক যাতে গাড়ির চলার
ছন্দের সঙ্গে চতুর্দল দলবৃত্তের পর্বস্পন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে,

চলমান জীবন ট্রেনের মতো চঞ্চল গতিভঙ্গে কেমন এগিয়ে চলে তার রূপকাক্রমী চিত্রটিও সুন্দর উপভোগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, বিশের দশকে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ‘রেলঘুম’ (অনুপূর্ব) নামে রুদ্ধদল-সমৃদ্ধ চতুর্মাত্রা-পর্বক একটি কবিতায় অনুরূপ চলমান রেলের ধ্বনিতরঙ্গ চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

আশরাফ গদ্যকবিতা রচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর সুপরিচিত ‘তালেব মাস্টার’ এবং ‘মনোমোহন মাস্টার’ কবিতা দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে ‘তালেব মাস্টার’ কবিতার শেষাংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(৪) যুদ্ধ থেমে গেছে। আমরা তো স্বাধীন।

কিন্তু তালেব মাস্টারের তবু ফিরল না তো দিন!

স্ত্রী ছয় মাস অসুস্থ

আমারও সময় হয়ে এসেছে: এই তো শরীরের অবস্থা!

পাঁচ মাস হয়ে গেছে: শিক্ষা বোর্ডের বিল নাই

হয়তো এবারের টাকা আসতে আসতে শেষ হবে আয়। তাই

শতচ্ছিন্ন জামাটা কাঁধে ফেলে পাঠশালায় যাই

ক্ষীণ কণ্ঠে পড়াই:

‘হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোর ধীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে...

মো মনে বলি:

যদি ই ফোটে একদিন আমার এইসব সূর্যমুখীর কলি।

ইতিহাস সবই নিয়ে রেখেছে। রাখবে—

কিন্তু এই তালেব মাস্টারের কথা কি লেখা থাকবে?

আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা

আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু

নিজের জীবনই অন্ধকারমালা।

মানিকবাবু! অনেক বই পড়েছি আপনার

পদ্মানদীর মাঝির ব্যথায় আমিও কঁদেছি বহুবার

খোদার কাছে মুনাজাত করি: তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন

আমার অনুরোধ আপনি আরও একটা বই লিখুন

আপনার সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে তুলে ধরুন

আর, আমাকেই তাব নায়ক করুন!

কোথাও রোমাস নেই! খাঁটি করুণবাস্তবতা

এবং এই বাংলাদেশেরই কথা।

[এ, তালেব মাস্টার (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে)]

কবিতাটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠক অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতাটি স্মরণ করবেন। সেখানে কুরুপা একটি মেয়ের প্রেম-বার্থতা ঘোঁচাতে কথাসিল্পী শরৎবাবুর কাছে আকুল আবেদন। এখানে একজন জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত দরিদ্র শিক্ষকের মর্মস্বন্দ ট্রাজেডিকে অমরত্ব দেবার জন্য মানিকবাবুর কাছে সকাফের আর্জি। দুটিই গদ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথ লাইন শেষে মিল দেননি। আশরাফ লাইন শেষে মিলের পরীক্ষা করেছেন। গদ্যকবিতার মুখ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: (i) ছোট ছোট বাক্যপর্বের ব্যবহার, (ii) প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস প্রয়োগ, (iii) আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচলিত syntax বা বাক্যগঠনরীতির হেরফের ঘটানো, মাঝে মাঝে সংলাপী বাচনভঙ্গী প্রয়োগ ইত্যাদি। মুখ্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য উদাহরণটিতেও লক্ষ করা যাবে।

সৈয়দ শামসুল

হক

এবারে এ-কালের আরও কয়েকজন ছন্দ-মনস্ক কবির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পঞ্চাশের দশকেই

লিখতে শুরু করেছেন, তবে স্বীকৃতি পেয়েছেন আরও কিছুকাল

পরে। ষাটের দশকের একজন প্রতিশ্রুতিবান ছন্দমনস্ক কবি হলেন, সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৪)। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম হল, একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বিরতিবিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০)। এর পরেও সম্ভবত আরও কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, যেগুলি সীমানা পেরিয়ে আমার হাতে পৌঁছায়নি। প্রাপ্ত সংকলন গ্রন্থগুলিতে তাঁর যেসব কবিতাওচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে লক্ষ করা গেল, মিশ্রবৃত্তে বা গদ্যকবিতায় তাঁর প্রবণতা বেশি থাকলেও কলাবৃত্তে ও দলবৃত্তেও সমান দক্ষতা রয়েছে। এখানে দু’একটি নিদর্শন তোলা যেতে পারে।—

(১) সাতমাত্রা পর্বের কলাবৃত্ত (মিলহীন): প্রবহমান পাঁচলাইনের স্তবকবন্ধ

এমন শৌখিন দেখায় রাজধানী কে পারে তার সাথে পাল্লায়?

সন্ধ্যা নেমে এলে জড়ানো চাই তার রঙিন ফুলে আঁকা আলোয়ান।

এবং যেখানেই ছড়িয়ে সূর্য্যণ নেমেছে রাস্তায় মহিলা

সেখানে সমবেত শীর্ণিত যুবকেরা কণ্ঠে তুলে নেয় কাব্য।

তবুও বর্বর, আস্ত বর্বর, তাকেই মনে আমি করছি।

এমন ধনবান এই যে নাগরিক, রাষ্ট্রপতি তাঁর বন্ধু;

এমন সভা নেই যেখানে তিনি নেই, কাব্য নয় তার কণ্ঠ;

পাঁচটি মহাদেশ দেখেন তিনি ছেনে নারীর শরীরের বিদ্যুৎ

এবং অক্ষত; অউহাসি তাঁর যেন বা মোহরের নিকুণ।

তবুও নির্ধন, নিঃস্ব নির্ধন, তাঁকেই মনে আমি করছি।

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., প্রেমিকের গাঁথা]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘মন্দাক্রান্ত’র বিকল্প হিসাব ৭।৭।৩/৪/৫ মাত্রা ভাগের অমিল পংক্তি বুদ্ধদেব বসু ইতিপূর্বেই তাঁর ‘মেঘদূত’ের অনুবাদে (১৯৫৭) ব্যবহার

করেছেন। এখানে শামসুল একই ছন্দবন্ধে ব্যঙ্গশাণিত আধুনিক প্রেমগাথা রচনা করেছেন। লাইনশেষে মিল না রেখে এবং অধিকাংশ স্তবকের শেষ লাইনটিতে বন্ধব্যবহার আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কবিতাটি রচনা করেছেন।

ইতিপূর্বে শামসুর রাহমানের ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতার একটি দৃষ্টান্ত তুলেছি। শামসুলও সম্ভবত মৈমনসিংহ-অঞ্চলের লোকভাষায়, চমৎকার কয়েকটি সনেট লিখেছেন। এখানে মিশ্রবৃত্ত রীতির ৮||১০-মাত্রক, সেকসপীয়রীয় রীতির একটি চতুর্দশপদী উদ্ধৃত করা গেল।—

(২) আমি কার কাছে গিয়া জিগামু সে দুঃখ দেয় ক্যান,
ক্যান এত তপ্ত কথা কয়, ক্যান পাশ ফিরা শোয়,
ঘরে বিছান নিয়া ক্যান অন্য ধানখাত রোয়?—
অথচ বিয়ার আগে আমি তার আছিলাম ধ্যান।
আছিলাম ঘুমের ভিতরে তার যান জলপিপি
বাঁশের লহরে ডোবা পরাণের ঘাসের ভিতরে,
এখন শুকনো পাতা উঠানের পরে খেলা করে,
এখন সংসার ভরা ইন্দুরের বড় বড় টিপি।
মানুষ এমনভাবে বদলায়া যায়, ক্যান যায়?
পুল্লিমার চান হয় অমাবস্যা কিভাবে আবার?
সাধের পিনিস ক্যান রঙচটা রোদ্দুরে শুকায়?
সিন্দুর মতির মেলা হয় ক্যান বিরান পাথার?
মানুষ এমন তয়, একবার পাইবার পর
নিতান্ত মাটির মনে হয় তার সোনা মোহর।

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., পরাণের গহীন ভিতর-২]
দলবৃত্তের ব্যবহারে শামসুলকে এ-কালের কবিদেরই সগোত্র বলা যেতে পারে। চতুর্দল-ষট্‌কল পর্বের মাঝে মাঝে তিনিও অনায়াসে পাঁচ মুক্তদল পর্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কবির প্রবহমান ৪|৪|২/১-দলমাত্রক, ছয়-ছয়-ছয়-পাঁচ, মিলাবিহীন পংক্তিসজ্জায় রচিত চার স্তবকের একটি কবিতা থেকে প্রথম ও চতুর্থ স্তবক দুটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

২. ‘পরাণের গহীন ভিতর’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৮৯) কাব্যে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,—

ইংরেজি ভাষার আওতার ভিতরেই একজন মার্কিন নিগ্রো কবি, একজন আফ্রিকান কবি যদি লৌকিক বাগভঙ্গী, শব্দ এবং উচ্চারণ ব্যবহার করে সার্থক স্মরণীয় কবিতা লিখতে পারেন, আমরাই বা বাংলায় সে সম্ভাবনা পরীক্ষা করে কেন দেখব না? কখনো কখনো? পাশাপাশি?—অথবা একই সঙ্গে?

[সৈ. শা. হক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬]

(৩) যখন তুমি আধেক মুখ তোলো
ছড়ায় যেন চন্দ্রালোকের তাপ
কিন্তু যখন আঁধার করো মুখ
মুহূর্মুহু গিরি, অগ্নিগিরি,
ছড়ায় লাভা, ধূম্রজালে মরি।
আমার তুমি শত্রু হলে সখী?

না হয় তুমি শত্রু হলে, সখী,
তোমার মুখ ‘বিষবে খাঁড়া’ সূর্য
পোড়ায় ঘর, শস্য, শুকোয় জল,—
‘পড়েছি আমি’ কঠিন ভাগ্যলেখা
তৃষ্ণা তুমি তৃষ্ণা নিবারণী।।

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., তুমি]

প্রথম তিন স্তবকের শেষ refrain পংক্তিটি চতুর্থ স্তবকের প্রথম পংক্তিরূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। চিহ্নিত পর্বদুটি (বিষুবখাড়া, পড়েছি আমি) পঞ্চ মুক্তদলে অর্থাৎ পাঁচ কলামাত্রায়, কলাবৃত্তের আদলে রচিত হয়েছে। এ-কালের কবিরা এ-জাতীয় মিশ্র ছন্দবন্ধের কবিতা কি ভাবে পাঠ করেন সেটাই জিজ্ঞাস্য। একে কি নাম দেওয়া যাবে? দলবৃত্তের আমেজ মেশানো কলাবৃত্ত, না কলাবৃত্তের উচ্চারণ-প্রভাবিত দলবৃত্ত?

শামসুলের দলবৃত্তে লেখা অসমান পংক্তিক আর একটি কবিতা মিলের নূতনত্বে আকর্ষণীয়। দীর্ঘ ৩৫ লাইনের কবিতাটিতে তিনি প্রায় প্রত্যেকটি লাইনের শেষে অপূর্ণ ত্রিদল পর্বে রুদ্ধ-মুক্ত-মুক্ত দলবিন্যাসে একই মিল রক্ষা করেছেন। এখানে প্রথম ও শেষের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি।—

(৪) ভেতরে কেউ কাঁদছিল তখন থেকে কাঁদছিল
সেই তখন থেকে
যখন আমার সাজানো এক ঘর ছিলো

ভেবেছিলাম আলাদা কেউ কাঁদছিল
তারপরে যেই এগিয়ে এলে
শূন্যতাকে সরিয়ে দিলে
স্কন্ধতাকে গড়িয়ে দিলে
দরোজা খুলে দেখিয়ে দিলে
আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে
আমার মধ্যে একলা আমি তখন থেকে কাঁদছিল।

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., কাঁদছিল, কেউ কাঁদছিল]

কবি এ-কবিতাটিতে শব্দান্ত, পদ-পর্বান্ত ধ্বনিমিলের চমৎকার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, এটিও লক্ষ্য করবার বিষয়।

আলাউদ্দিন

আল-আজাদ

ষাটের দশকের প্রতিশ্রুতিবান, ছন্দমনস্ক কবির সংখ্যা

অনেক। এই স্বল্প পরিসর বাংলাদেশের ছন্দসচেতন কবিদের

আলোচনায় স্ভাব্যতাই তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

আবার যাঁদের কথা বলব, তাঁদেরও মাত্র দু'একটি রচনার দৃষ্টান্ত তুলে নিরস্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে এবারে যাঁর নাম করতে চাই, তিনি হলেন সমাজ-সচেতন, দেশপ্রেমী কবি, আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২)। তিনি গদ্য কবিতা এবং ছন্দবদ্ধ কবিতা উভয় রচনাতেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর 'একশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সুপরিচিত 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি। কবিতাটি শিখিল মিল-বিন্যস্ত, যমাত্রা পর্বক, প্রবহমান কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। কবি কখনও অসমান পংক্তি ব্যবহার করেছেন, কোথাও আবার সমমাপের পংক্তি সাজিয়েছেন।

(১) স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য

পারেনি ভাঙতে

হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা

খোলা তলোয়ার

খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ

যে পদপ্রান্তে

যারা বুনি ধান

গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার

হাপর চালাই

সরল নায়ক আমরা জনতা

সেই অনন্য

ইটের মিনার

ভেঙেছে, ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার, আমরা জাগরী

চার কোটি পরিবার।

কিছুটা অসমান পংক্তিক এই স্তবকের পর কবি ৬।৬।৬-মাত্রাপর্বে সমমাপের পংক্তি সজ্জায় (অনেকটা মিল রেখে) যে স্তবকটি লিখেছেন এবারে সেটিও উদ্ধৃত করছি।—

(২) এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

শিয়রে যাহার ওঠেনা কান্না, বারেনা অশ্রু?

হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং

সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং

এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার

হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার

পদাতিক ঋতু কলমে দেয় কবিতার কাল?

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., স্মৃতিস্তম্ভ]

এরপর এগারো লাইনের আর একটি স্তবক। তারও প্রথম দুটি লাইন উপরোক্ত প্রথম স্তবকের সূচনাংশের অনুবৃত্তি (সামান্য পরিবর্তন-সহ)।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কণ্ঠ অধিকাংশ কবিতাতেই একটু চড়া সুরে বাঁধা, গদ্যকবিতা বা ছন্দবদ্ধ কবিতা, -সর্বত্রই। এবারে রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত, প্রবহমান দীর্ঘ বাইশ মাত্রা লাইনের মিশ্রবৃত্তে রচিত একটি সনেট উদ্ধৃত করে কবির ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।—

মিল

(৩) সূর্যকে আমরা চিনি। বিসর্পিল পরীক্ষার দিনের তিমিরে ক
তার উষ্ণ প্রদক্ষিণ রেখে যাব মালবিকা সৌর-সঙ্গীতের খ
মিলিত মূর্ছনা, নিষ্পন্দ বাদামী ঠোটে গুণী সুরাপাত্র ধীরে ক
তুলে ধরে। সে পানীয়ে রক্তিম অমৃত, তাই বিস্মিত শিল্পীর খ
দৃষ্টি মেলে দেখি চারিদিকে: ময়নাপাড়ার সেই কালো মেয়ে গ
কেমন হরিণ-চোখা; ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে আর ঘ
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে; নাগিনী নিশ্বাস, ও
বিজয় রথের চাকা ব্যর্থ হয় আদিম বাহতে বার বার ঘ
হে সূর্য হৃদয়ে থাকে। পৌরাণিক প্রণয়ীর মতো অনির্বাক চ
শিশিরে পুষ্পের ঘ্রাণে শিশুর হাসিতে আর মায়ের প্রজ্ঞায় ছ
ধান ও গমের ক্ষেতে আকঙ্কিত মৌসুমের মুখর ঝঞ্ঝায় ছ
নেমে এসো, নেমে এসো, তুমি। সময়ের আমরা যাত্রিক, গান চ
চাই নয়া সড়কের, রোমাঞ্চিত ঘাসে ঘাসে চকিত উজ্জল জ
এখনো বিশ্বাসে আছি দূরে নয় দূরন্ত শান্তির কোলাহল।। জ

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., পূর্বলেখ-২]

কবি এখানে পেত্রকীয় বা শেকসপীয়রীয়,-কোনো একটি সনেটরীতিতে আবদ্ধ থাকেননি। আরও লক্ষণীয়, কবি লাইন শেষে মিল দিতে দিতে মাঝে একটি অমিল পংক্তি (৭ম) ব্যবহার করেছেন। তাতে ছন্দ এতটুকু শিথিল হয়নি। কৌতূহলী ছন্দমনস্ক পাঠক অবশ্য আকস্মিক অমিলের কিছুটা চমক উপলব্ধি করেন।

এ-যুগের আর একজন ছন্দ-সচেতন কবি হলেন, ময়হারুল

ময়হারুল ইসলাম

ইসলাম (১৯২৭)। তিনি পঞ্চাশের দশক থেকে (মার্চি ফসল ১৯৫৫)

লিখতে শুরু করলেও, ষাট-সত্তরের দশকে এসে যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।^৩ তিনি ছন্দবদ্ধ তিন মুখ্যরীতির কবিতা যেমন লিখেছেন, তেমনি গদ্যকবিতার ক্ষেত্রেও অনয়াসে পদচারণা করেছেন। এখানে তাঁর রচনার দু'একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

৩. প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রায় পনের বছর পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' (১৯৭০) প্রকাশিত হয়। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আর্তনাদে বিবর্ণ' (১৯৭১)। এর পরও নিশ্চয়ই আরও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি দেখবার সুযোগ হয়নি।

(১) চতুষ্কল-পবর্ক সন্ল কলবৃত্ত ;

ফাল্লুনে কাল গুণে চলবার লগ্ন
ছাই হোল লেলিহান আঙনের স্পর্শে
স্বপ্নের সঁড়িঙলো একে একে ভগ্ন
নিজীব চোখে দেখি লালফুল সর্ষে।

[বাংলাদেশের কবিতা এক স্তবক, বিষ্ণু দে স., আজকের কবিতা]
যাঁরা ভুলক্রমে মনে করেন, পর্ব-সূচনায় stress বা ঝাঁক হল, দলবৃত্ত হৃন্দরীতিরই বৈশিষ্ট্য, তাঁরা লক্ষ করবেন, পর্ব-সূচনায় রুদ্ধদল-শব্দ এনে কবি এখানে চতুষ্কল কলবৃত্তেও চমৎকার ঝাঁক সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ঝাঁক বা শ্বাসাঘাত যে কোনও হৃন্দরীতি নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারেনা, এখানে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

(২) এবারে কবির দলবৃত্তে রচিত ছোট্ট একটি ছড়া জাতীয় রচনা উদ্ধৃত করি,—

ময়না এখন	কয়না বচন	লজ্জাতে
নিয়েছে তার	গয়না ও হার	বজ্জাতে
সয়না ব্যথা	লেগেছে তা	মজ্জাতে
ময়না যে তাই	নিয়েছে ঠাই	শয়্যাতে।

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., ময়না এখন]
ছড়াটিতে যমক-অনুপ্রাসের ধ্বনিমিল-সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন নিয়ে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে অধিকাংশ সাম্প্রতিক কবিই কিছু না কিছু লিখেছেন। কেথাও আবেগ, কোথাও বলিষ্ঠ অঙ্গীকার, কোথাও বা হৃজুগপ্রিয় দেশ-ভাষা-প্রেমীদের প্রতি বিদ্রূপ। এখানে কবির আত্মবিশ্লেষণাত্মক, বিদ্রূপধর্মী একটি গদ্যকবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(৩) সারা বছর আমরা মরেছি।

বেঁচে উঠেছি শুধু এই একটি দিনে
বজ্রকঠোর প্রত্যয়ের স্পর্শে
আমাদের তিমির তুহীন দিনগুলো
গড়িয়ে গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়
এই একটি দিনের প্রান্তে
যেখানে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবলয়
জন্ম দেয় সূর্যের অরুণোদয়।
যেখানে আলোর বন্যায় উদ্দীপিত
কোটি মানুষের হৃদয়ে মুখর হয়
রৌদ্র রাঙা শপথের স্বাক্ষর
আমরা বাঁচতে চাই
আমরা বাঁচতে চাই।

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., অগ্নিবলয়ের প্রান্তে (একুশে ফেব্রুয়ারী)]

আল মাহমুদ

শব্দ এবং চিত্রকলা ব্যবহারে সতর্ক, ছন্দ-সচেতন ষাট-সত্তর দশকের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আল মাহমুদ (১৯৩৬)। সোনালী কাবিন, কালের কলস, লোক লোকান্তর, পাখির কাছে ফুলের কাছে, —এই চারটি বই থেকে বাছাই করে তাঁর একটি কবিতা সংকলন, ‘আল মাহমুদের কবিতা’, ১৯৭১-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তগুলি কবির এই সংকলন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হল।^৩

(১) কলাবৃত্ত : সামিল, প্রবহমান একাবলী (৬।৫):

এতদিন জল ঢেলেছি যার
গোড়ায়, এখন দেখি যে তার
পোকায় কেটেছে শিকড় সব;
অকালে শাখার পাতার স্তব
শুকাবে, এখন ভেবেই তল
পাইনে, বিফল করেছি কি
কোথায় ঢেলেছি পরম জল?
হৃদয় নিঙড়ে লাল তরল,
ভাবছি এবার ছড়িয়ে দিই
শরীর, মাংস চর্বি বল! [মায়াবৃক্ষ]

কলাবৃত্তের ৬।৫-মাত্রক একাবলীতে সামিল প্রবহমানতার পরীক্ষা সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিক থেকে কবি নূতনত্বের দাবি করতে পারেন। তবে কতটা সফল হয়েছেন সে প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকের মনে আসতে পারে।

প্রতি লাইনের প্রান্তিক পর্বে যুক্তবর্ণনাশ্রিত রুদ্রদলের দোলা এনে ছ’মাত্রা পর্বের কলাবৃত্ত রচনায় কবি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

(২) ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে ভাঁ তের গন্ধ
জেগে উঠতেই চারিদিকে দেখি, দুয়ার বন্ধ।
দ্বার খোলবার সাহসে যখন শরীর শব্দ
হঠাৎ তখনই মহতেরা বলে, লোকটা অন্ধ।

বুকের অতলে লাফায় নীরবে আহত রক্ত। [নতুন অঙ্গ]

একই প্যাটার্ন বা রূপাদর্শে কবি আরও দুটি পাঁচ লাইনের (ক ক খ ক—খ) স্তবক এনে কবিতাটি শেষ করেছেন।

৪. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লোক লোকান্তর’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩-তে। তারপর বেরোয় ‘কালের কলস’। ‘সোনালী কাবিন’ ১৯৭১-এ ছাপা হয়েছিল। প্রকাশের পূর্বে মৃত্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে’ কবির হুড়ার বই। —এটিও ছাপা হয়ে অপ্রকাশিত থেকে যায়।

(৩) এ কেমন অস্বাভাবিক বঙ্গদেশ উত্থান রহিত

বুঝিনা রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা ‘রাখতেন’।
গাছ নেই, নদী নেই, অপুষ্কক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, ‘জন্মের’ বিরুদ্ধে সবাই।

অবিস্তৃত হওয়া আছে, নেই কোন শব্দের দ্যোতনা
দু'-একটা পাখি শুধু অশথের ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যলাপ করে;
বৃষ্টিহীন বোশেখের 'নিঃশব্দ' পাঁচিশে তারিখে।

এবারে কবির দলবৃন্দের চতুর্দল পর্ব-প্রভাবিত, পঞ্চকল-পর্বিক কলাবৃন্দের একটি দষ্টান্ত তলছি।—

- (৪) বরুক পাতা ‘পুরনো পাতা’ হলুদ পাতা বরুক
বীজের মুখ সবুজ কুঁড়ি অবুঝ মাথা গড়ুক।

কালকে যারা ‘বালিকা ছিল’ নিজের বুক দেখুন,
অতল চোখে কাজল টেনে নিগূঢ় ছিল লেখুন।

গভীর পুরো কুয়াশা যাক হাওয়ার তোড়ে ভেসে
আগুন, পানি, খাদ্য হাতে ক্ষুধার্তরা এসে—

নীরব নীল শীতের মাসে লাগিয়ে দিক আগুন

করুণ মুখে তরুণ যত আগুন দেখে জাগুন। [মন্ত্র]

ধ্বনি-অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ, কিছুটা পর্ব-প্রসূরিত এ-কবিতাটি ছান্দসিকেরা চতুর্দলপর্বিক দলবৃত্ত না বলে পঞ্চকল-পর্বিক কলাবৃত্তই বলবেন, আশা করা যায়।

‘আল মাহমুদের কবিতা’ গ্রন্থের ভূমিকায় কবি তাঁর কবিতায় গ্রামীণ জীবনচিত্র এবং গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তবে তার প্রয়োজন ছিল না, মনে হয়। তাঁর কবিতায় বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু শব্দ অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। যেমন, দাওয়াত, কাবিন, সিকস্তী, পানিউড়ী, কসম খাওয়া, হালাল, নাপাক, নাস্তা ইত্যাদি। কিন্তু তার ফলে টাটকা পল্লীসুভাস ভরা কবিতাগুলির ওজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে; কবির পল্লীকেন্দ্রিক অকৃত্রিম সমাজ-মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

ওমর আলী

ষাট-সত্তর দশকের আর একজন ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে

সচেতন কবি হলেন, ওমর আলী (১৯৩৯)। তাঁর কবিতায় বর্ণিত

গাঁয়ের ‘শ্যামল রঙ রমণী’র ছবিটিই পাঠকের মনকে বেশি আকৃষ্ট করে। মুখ্য তিন ছন্দরীতির এবং গদ্যকবিতা-ছন্দের ব্যবহারে কবির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে লৌকিক ভাষায়, সামিল ১৮-মাত্রক পংক্তির মিশ্রবৃত্তে রচিত একটি ছোট্ট প্রেমের কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।—

- (১) আমি কিন্তু যামুগা। আমাকে যদি বেশি ঠাট্টা করে।
হুঁ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাকুম না।
আমারে যতোই কও, তোতাপাখি, চান, মগি, সোনা।
আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরো।

আমারে ভ্যাংচাও ক্যান, আমি বুঝি কথা জানিনাকো।

আমার একটি কথা নিয়ে তুমি অনেক বানাও।

তুমি বড়ো দুষ্ট, তুমি আমারে চেতায়ে সুখ পাও,

অভিমনে কাঁদি, তুমি তখন আনন্দে হাসতে থাকো।

শোবোনা তোমার সঙ্গে, আমি শোবো অন্যখানে যেয়ে
 আর এ রাইতে তুমি শুয়ে রবে একা বিছানায়,
 দেখুম ক্যামনে তুমি সুখী হও আমারে না পেয়ে,
 না, আমি, এখনি যাইতেছি চলে অন্য কামরায়।

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., আমি কিন্তু যামুগা]

এ-কবিতাটি মেজাজের দিক থেকে যেন কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) ‘নূতন খাতা’র অন্তর্ভুক্ত ‘আবদারের আধ ঘণ্টা’ কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে ভাষা অবশ্য কলকাতা-কেন্দ্রিক চলিত বাংলা, ছন্দ: চতুষ্কল পর্বিক কলাবৃত্ত।

এই সময়কার আর একজন শক্তিমান রোমান্টিক কবি হলেন,
 আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩)। তিনি শব্দ, ছন্দ ও আঙ্গিক সচেতন,

সাহসিক প্রেম-ভাবনার চমক জাগানো কবি। সওকত ওসমান তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘জন্মান্তর কবিতাগুলি’ পড়ে তাকে ‘সুররিয়ালিষ্ট’ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে ‘মুক্তধারা’ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠকবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তাঁর দেশপ্রেম, মানবিক প্রেম ও কাম এবং ব্যঙ্গাত্মক বিভিন্ন মেজাজের ও বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা স্থান পেয়েছে। এখানে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।—

(১) মিশ্রবৃত্ত + কলাবৃত্ত সনেট

যতি মিল

কিছুনা-কেবল তুমি হেঁটে চলেছিলে। সম্ভবত কাজে।	৮॥৬।৬। ক
সম্ভবত সে-কাজও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।	৮॥৮॥৪। খ
শাড়ি আঁটো, পদক্ষেপ দ্রুত, সকাল আটটার সময়	৪।৬॥৮। খ
ব্যস্ত রাস্তা, প্রত্যেকেই চলেছে অফিসে। সাঁঝে	৪।১০।২। ক

আবার ফিরবে কি এই রাস্তা দিয়ে? আমি সব কাজ ফেলে	৮॥৪।৮॥ গ
দাঁড়িয়ে থাকবো ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ রহস্যের সামনে।	১০॥৮। ঘ
দেখবো আবার সেই শিল্প, যা পাইনি আবাল্য শিল্পযাপনে।	১০॥৪।৮। ঘ
তারপর বিবরে ঢুকবো তুমি হেঁটে চলে গেলে।	১০॥৮। গ

মাত্রাবৃত্তে তোমাকে ধরবো সম্পূর্ণ	৬।৬।৫। ঙ
পয়ারে অচল, স্বরবৃত্তেও সম্ভব না,	৬।৬।৫। চ
এক ঈশ্বর ছাড়া কে তোমাকে করবে দ্বিতীয় রচনা?	৬।৬।৬।৩। চ
রূপালি চাঁদের হাতুড়ি পিটিয়ে গদ্য করেছ চূর্ণ।	৬।৬।৬।৩। ঙ
কটিতে বক্ষে, নিতম্বে আর পায়ের যুগল ছন্দে	৬।৬।৬।৩। ছ
আমারও মতন নিরাশাবাদীর নিরাশা দোলাও আনন্দে	৬।৬।৬।৪। ছ

[আবদুল সৈয়দ মান্নানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬১-৮৬),
 একটি মেয়ের হেঁটে যাওয়া]

প্রথম চতুষ্কটি অসমান পংক্তিমাপে, অনিয়মিত পদযতি-সজ্জায়, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত। দ্বিতীয় চতুষ্কটি গদ্য কবিতার ঢঙে পড়াই স্বাভাবিক, তবে কিছুটা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে, অসম মাপের মিশ্রবৃত্তের ছকেও ফেলা যায়। শেষ ছয় পংক্তি ষটমাত্রা-পর্বিক কলাবৃত্তে লিখিত। হৃন্দ-সচেতন কবি নিজে কবিতার মধ্যেই তার উল্লেখ করেছেন। একই কবিতার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রীতির হৃন্দ ব্যবহার ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ অনেক কবিই করেছেন। তবে তাঁরা কেউই ‘চতুর্দশপদী’র ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা করেননি। কবি সেখানে স্বকীয়তা দাবি করতে পারেন। তবে— এই চতুর্দশপদী ‘সনেটে’র মর্যাদা পেতে পারে কিনা পাঠক অবশ্যই সে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

এবারে হৃন্দে স্বেচ্ছা-শৈথিল্যের নিদর্শন হিসাবে কবির মিশ্রবৃত্তে রচিত আর একটি রোমান্টিক সনেট উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

	যতি	মিল
‘রমণযোগ্যা’ তুমি। ফুটে ওঠো প্রথম-চুমোতে।	৮ ১০।	ক
‘না! না!’ বলে তুমি ‘আহ্নান’ করো।	৮ ৬।	খ
মদালস স্বপ্ন ঢলে ‘যুগ্ম ঐ’ আঁখিতে উরতে।	৮ ১০।	ক
যখন আকাঙ্ক্ষা করো, বলো ‘যা-ও! স-রো!’	৮ ৬।	খ
কবিতারই মতো তুমি জানো অন্য অর্থে শব্দ ব্যবহার	১০ ১০।	গ
কবিতারই মতো জানো হাঁটা নয়, নৃত্যের ভঙ্গিতে	৮ ১০।	ঘ
পৃথিবীতে সর্গ নামে। মৃত্যুহীন মৃত্যুময় রূপের বাহার	৮ ৮ ৬।	গ
তুমি জানো — আছে শুধু শরীরেরই আশ্চর্য সঙ্গীতে।	৮ ১০।	ঘ
‘নারী’ বা ‘মহিলা’ নও, তুমি শুধু নিবিড় ‘রমণী’,	৮ ১০।	ঙ
যোনীতে — শ্রোণীতে — স্তনে তুমি পরিপূর্ণা বসুমতী,	৮ ১০।	চ
মৌলিক কবিতা তুমি, তাই কি কবিতা দেখে হাসো?	৮ ১০।	ছ
নির্বৈদ সরিয়ে তুমি খুলে দাও আনন্দের খনি।	৮ ১০।	ঙ
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছ তুমিই। ফলবতী	৮ ৬।৪।	চ
তুমি পৃথিবীর; তবু তোমার ভিতরে জ্বলে স্বর্গের আভাসও ॥	৬।১০ ৬।	ছ

[ঐ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, রমণী]

এখানে পেত্রাকীয় সনেটের মিল রয়েছে। তবে লাইনগুলি সমমাপের নয়।—চোদ্দ থেকে বাইশ মাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত। মাত্রা বিভাগও ভাবানুসারী,—অসমান। ‘রমণযোগ্যা’ এবং ‘আহ্নান’ শব্দদুটি কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ছয় ও চার মাত্রায় উচ্চারিত, ‘যুগ্ম ঐ’—চার মাত্রা; আবার ‘শরীরেরই’ ‘কবিতার’, ‘আভাসও’—শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে যথাক্রমে চার, চার এবং তিন কলামাত্রক। ‘তুমিই’ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিনকলা। শব্দ ও হৃন্দের উপরে যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকলেই এমন নমনীয়তার পরীক্ষা সম্ভব।

এবারে কবির সাতমাত্রা পর্বের কলাবৃত্তে (৭।৭) রচিত আর একটি রোমান্টিক অনুবাদ কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করি।—

(৩) মেয়েটি একেবারে আমূল নগ্নিকা,
আমরা শুনে যাই জানালা ঘেঁষে আছে
যে বীথি পপলার — দুলছে আঁকা বাঁকা,
দুই পাতাগুলি কী আছে, কত কাছে?

মস্ত কদরায় আধেক নন্দিনী;
আমাকে এড়িয়েছে বন্ধ দুটি কর,
হরসে হেলে দোলে ছোট্টো পা-দু'খানি
ছোট্টো পা দু'খানি মধুর বিস্তর।

—সরল ভাষাময়ী ছোট্টো সুনয়না—
আমার আগ্রহী ঠোঁটের চুমো খেলো
মাথার উৎক্ষেপে জানিয়ে মিছে ঘৃণা
বললে মেয়ে ‘ছাই! ঐ তো ছিল ভালো’

কেবল দুটো কথা বলতে দাও, ‘ধ্যাত!'
—যুগল স্তন তার চুমিয়ে বলি কথা,
অধরে আনে তার যে-চুমো অচিরাত
বিহীন প্রতিবাদ হসির কোমলতা।

[ঐ, প্রথম প্রদোষ (জাঁ আর্তুর র্যাবোঁ)]

ছন্দবদ্ধ অনুবাদ কবিতা রচনায় আবদুল মান্নানকে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর সার্থক অনুসারী বলা চলে। ছন্দ কোথাও এতটুকু টলেনি। সাতমাত্রার পর্বে ৩+৪ মাত্রার শব্দগ্রন্থনা সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মান্নান বেশ কিছু উপভোগ্য গদ্য কবিতাও লিখেছেন। তার মধ্যে ‘পার্ক স্ট্রীটে একরাত্রি’, ‘কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড’ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতায় যদিও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তবে বিষয় ও উপস্থাপনা-রীতিতে মৌলিকতাও যথেষ্ট ফুটে উঠেছে। তাঁর বহু-ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দচিত্র হল, মাছ, নারী ও ঘোড়া। নিঃসংশয়ে তিনি বিষয়বস্তু, প্রকাশ ভঙ্গি, ছন্দ, চিত্রকল্প ও শব্দচয়নে এ-কালের কবিদের মধ্যে স্বকীয়তা দাবি করতে পারেন। এবারে কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশক দুটি কবিতাকণা উদ্ধৃত করে এ-প্রসঙ্গে যতি টানতে চাই।—

(৪) কবিতাকে নোঙরা থাকতে দাও, ব্লেন্ডে ছেঁটে দিওনা তার আকীর্ণ চোয়াল;
সংশোধনে স্বর্ণ পায় একমাত্র মেয়েরাই— ব্যয়ের বাইরে আর ছিপের অতীত ॥

(৫) আমার কবিতা

দরোজায় অক্টোপাস, চারি ছিদ্রে নিমন্ত্রণকারী

বিজোড় পতিতা।

[ঐ, টুকরো টুকরো মৃত্যু]

জিয়া হায়দার

এ-যুগের আর একজন প্রতিশ্রুতিবান কবি হলেন, জিয়া হায়দার

(১৯৩৬)। তাঁর ‘এক তারাতে কান্না’ এবং ‘কৌটার ইচ্ছেগুলো’

কাব্যগ্রন্থ দুটি আধুনিক কবিতাপ্রিয় পাঠকের কাছে সুপরিচিত। তিনি মিশ্রবৃত্তে অতি-সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পরীক্ষা করেছেন, বেশ কিছু ভালো গদ্য কবিতা লিখেছেন। কবির প্রাচীন বাংলা চর্যাঙ্গীতির জগত-পরিক্রমা বিষয়ক একটি কবিতা, মিশ্রবৃত্তের নমুনা হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

(১) গলায় হাড়ের মালা;

বামনি, তুই ডোমনি হলি যদি

নগরের বাইরে ঘর বাঁধলি যদি তুই

কিন্তু শোন, কোনো নেড়া বামনের

তোর সঙ্গ সুরতের সাধ

বর্তমানে নিঃস্বাদ-অনীহা,

শুধু-স্মৃতিচিত্র মাত্র;

ডোমনি তুই যোগিনী হলিনে তাহলে।

পদ্মের পাপড়িতে ডোমনি নাচিসনে আর

কিংবা সরোবর ভেঙ্গে মুগালের অস্থিও চিবোসনে

জিনপুর বহুদূর, বীতরাগ তথাগত মৃত,

এমন কি কানুপাও বিমনা নির্বাণে।

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., নির্বাণ গাথা]

লক্ষণীয়, বামনি ডোমনি, বাইরে; বাঁধলি, পাপড়িতে, নাচিসনে, চিবোসনে প্রভৃতি শব্দের সংশ্লিষ্ট দুই বা তিন মাত্রার প্রয়োগ এ-কবিতায় মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণগত দৃঢ়তা এনে দিয়েছে।

এবারে কবির একটি গদ্যকবিতার নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(২) আর শোন, এতোক্ষণ বলাই হয়নি,

আমার মাথার নীচে একটা কৌটো আছে,

সেটাও বউমাকে দিবি; জানিস ওতে কি আছে,

আমার কয়েক টুকরো ইচ্ছে—

ফুল, বৃষ্টি, পায়রা, ধানশীষ, গান,

ইচ্ছেগুলো কৌটোর ঢাকনা খুলে বেরোতে পায়নি কোনোদিন,

তোর হাতে, না, তোর না, তুই, তোরা বড়ো অলক্ষুণে,

পয়মন্ত বউমার হাতে পড়ে দেখিস একদিন

ইচ্ছেগুলো বেরোবেই ঠিক, রং বেরঙের প্রজাপতি হয়ে,

সারা বাড়ী, ঘরময় ঘুরবে, উড়ে উড়ে আরো, আরো
নতুন ইচ্ছের রেশম বানাবে।

তখন আমার নামে একটা মিলাদ দিস;

[ঐ, কৌটোর ইচ্ছেগুলো]

এমন সংলাপী, আত্মকথনের ভঙ্গিতে সমগ্র কবিতাটি রচিত হয়েছে। গদ্য কবিতার পরিসর প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কতটা বিস্তৃত হতে পারে আলোচ্য কবিতায় কবি তারই পরীক্ষা করতে চেয়েছেন।

হায়াৎ মামুদ

কবি হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) লিখতে শুরু করেন ষাটের দশকে। তবে কবিস্বীকৃতি পান সত্তরের দশকে পৌঁছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘স্নাগত সংলাপ’ ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি’ বেরিয়েছে আরও বিশ বছর পরে, ১৯৮৭-তে। যদিও কবি বাংলা মুখ্য তিন ছন্দরীতিই সচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন, তবে এ-ব্যাপারে একটু যেন ঢিলেঢালা প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বেশ কিছু ভালো গদ্য কবিতাও লিখেছেন। এখানে দু’একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

(১) প্রসঙ্গ প্রভাবিত, চতুর্দল + পঞ্চকল মিশ্র কলাবৃত্ত/দলবৃত্ত:

তোমার কাছে চাইবো ব’লে কিছু
মশাল জ্বলে মিছিল পায়ে এলাম পিছু পিছু।

কি হু শেষে এই কি দিলে—ভস্মাহত ছাই?
ই ছ ছিল ছিনিয়ে নেবো লুকানো রোশনাই।
এখন তবে ফিরেই চলি বন্ধ দ্বার মেনে,
এবার ঠিক আসবো জেনো সূর্য ছিঁড়ে এনে।

তাই কি হয়? এমনি ভাবে প্রতারণার দায়
চিরটা কাল এড়িয়ে যাবে অন্ধকার পায়?

[বাংলাদেশের কবিতা, দাউদ হায়দার স., তুমি]

চতুর্থ ও অষ্টম পংক্তির ‘ছিনিয়ে নেবো’ এবং ‘এড়িয়ে যাবে’ পর্বদুটি পাঁচ মুক্তদলে, কলাবৃত্ত হিসাবেই পড়তে ভাল লাগে। তাছাড়া, সমগ্র কবিতায় কবি কোথাওই চতুর্দল-ষটকল পর্ব ব্যবহার করেননি, সুতরাং আট লাইনের এই ছোট্ট কবিতাটিকে পঞ্চকল-পর্বিক কলাবৃত্ত হিসাবেই গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

একটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি শুরু করেছেন ৪|৪|৪|৩-দলমাত্রার আদলে; কিন্তু শেষ করেছেন ৬|৬|৬|২-মাত্রক কলাবৃত্ত হিসাবে। যেমন,

(২) তোমার কথা বলতে পারি ভাগ্যে আমার সে সুখ নেই;
অভিজ্ঞতা? শূন্য ঝারি—বৃথাই খুঁজি স্মৃতির খেই।

তখনও জানিনি বেজে যাবে ঢাক দ্রিমিদ্ৰিমি গুরুগুরু
প্রস্ফুটমান গাঙ্গেয় ভূমি কম্পিত নদী তরু ॥

[প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি, ফেব্রুয়ারি: আত্মজৈবনিক স্মৃতি]
কবিতাটির প্রথম চোদ্দ লাইন দলবৃত্তে লিখিত। শেষ দু'লাইনে ষটকলপর্বিক কলাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন।

এবারে কবির গদ্যকবিতার নিদর্শন হিসাবে ছোট, এগারো লাইনের একটি রচনা উদ্ধৃত করছি।—

(৩) দ্যাখো মা, তোমার দাঁড়ের ময়না দাঁড়ে পড়ে রইলো। তোমার
ফেলে যাওয়া রুলি আমি তো কখন পরিনি।

সাপেরা পাকে পাকে আমায় জড়িয়েছে। মা, আমি সাপিনী হয়ে
গেছি। কী সর্বনাশ, মাগো কী লজ্জা! স্পনেরা এলো না,
জোনাকিরা এলো না। আমি বাধিনী হয়ে পিছনে পিছনে ছুটেছি।
দমকা হাওয়া হা হা হেসেছে; বৈরাগ্য, তোমার আঙিনায়
নিমগ্নাছটা আহা মা, মানা করেছিলো। আমি শুনি নি।

মোল্লাপুকুরের শামলা গন্ধ জড়াইনি। আমার ভয় করছিলো, মা।

এখনো যে হাসলে আমার গালে টোল পড়ে। মা তুমিই তো গান
গেয়েছিলে: হাসলে গালে টোল পড়ে।

মাগো, তুমি আমায় ঈশ্বর দিলে না ॥

[আধুনিক কবিতা, রফিকুল ইসলাম স., বিষাদগীতি]
কবিতাটিতে বিরহিনী কন্যা তাঁর মাকে বার বার ডেকে, মনের আকৃতি, বেদনা, এবং
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। তার ফলে, কবিতাটি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫)

নির্মলেন্দু গুণ লিখতে শুরু করেছেন ষাটের দশক থেকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ
'প্রেমাংগুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০-এ। ১৯৮৩-তে জাতীয় সাহিত্য
প্রকাশনী (ঢাকা) থেকে 'নির্বাচিত' নামে যে কবিতা-সংকলন বেরিয়েছে সেখানে তাঁর
তখন পর্যন্ত প্রকাশিত দশটি কাব্যগ্রন্থ থেকে, ১৯৭০ থেকে ১৯৮৩-এর মধ্যে প্রকাশিত
বেশ কিছু কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। এই সচেতন শিল্পী তাঁর রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,
আমার যা বলবার, স্পষ্ট করেই আমি তা বলবার চেষ্টা করি। যা কঠিন, আমার
মন তাতে সহজে সাড়া দেয় না। সহজ করে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে।
চার পাশের কঠিনের ভীড়ে আমি চাই সহজ করে বলতে—জানি এ স্বভাব নাগরিক
কবির নয়, লোককবির।

[কবিতার সংগ্রাম, সংগ্রামের কবিতা]

নির্মলেন্দু বাংলা তিন ছন্দে রীতিরই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন, প্রয়োজনে প্রচলিতরীতি লঙ্ঘন করেছেন। ভালো কিছু গদ্যকবিতাও লিখেছেন। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে যথাসম্ভব মান্য করেই চলেছেন। এবারে তাঁর ছন্দবদ্ধ কিছু রচনার নমুনা তোলা যেতে পারে।

(১) দলবৃত্ত + পঞ্চকলপর্বিক কলাবৃত্ত:

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো ‘অন্যরকম’
হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এঘর থেকে ওঘরে যায়
মানুষগুলো ‘অন্যরকম’ সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়।

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষ হলে
‘তোমাকে নিয়ে’ ‘কবিতা লেখা’ আর হতো না
‘তোমাকে ছাড়া’ সারাটা রাত ‘বেঁচে থাকাটা’ আর হতো না।

মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়
‘অথচ আমি’ সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি।

[নির্বাচিতা, মানুষ]

কবিতাংশের চিহ্নিত শব্দগুলি লক্ষণীয়। ‘অন্যরকম’ চতুর্দল-ষট্‌কল পর্ব; আবার ‘তোমাকে নিয়ে’, ‘কবিতা লেখা’, ‘তোমাকে ছাড়া’ ‘বেঁচে থাকাটা’, ‘অথচ আমি’ — পর্বগুলি পঞ্চ মূলদলে রচিত। ‘আমি হয়তো মানুষ নই’ বাক্যটিকে কবিতার refrain বা ধূয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লাইনশেষে প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে,— অনিয়মিতভাবে মিল দেওয়া হয়েছে।

‘কৃষ্ণা চতুর্দশী’ নামে কবি পাঁচটি চোন্দ্র লাইনের কবিতা (সনেট?) লিখেছেন। তার কোনোটি কলাবৃত্তে, কোনোটি আবার মিশ্রবৃত্তে রচিত। কোথাও মিল দিয়েছেন, কোথাও আবার আদৌ মিল রাখেননি। এখানে তার একটি ‘চতুর্দশী’ উদ্ধৃত করছি।—

(২) নিয়েছ যখন ভাল বেসে তবে হোল্ড অলে বেঁধে
কুলিকে দিও না, সবটুকু নিও নিজে। প্রিয়তমা
আমি বড়ো বেশি দেশী কাঁচের মতেন, ভেঙে
যাই খুব সাধারণ করাঘাতে। নিয়েছ যখন
অবহেলা নয় তোমার গলায় ক্যামেরার মতো
আমাকে বুলিয়ে রেখো। একবার শুধু চুমু খেয়ো
দিনে, একাধিক নাহি চাই, খুব ভাল হয় যদি
ছেড়ে দাও ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতরে কিছুটা ঠাই।
অথবা রাখিবে সন্তর্পণে খোঁপার ভিতরে গুঁজে,
কলমের মতো তোমার বুকের গবিনী গম্বুজে।

যদি মনে করো প্রয়োজনহীন, ফেলিয়াও দিতে
 পারো—এই পরবাসে কি করে জানিব কোনখানে
 তুমি রাখো? কোনখানে আমি কতটুকু বেঁচে আছি?
 একবার শুধু ছিঁড়িবার আগে চুম্বন করো চুয়া।

[নির্বাচিতা, কৃষ্ণ চতুর্দশী-এক]

যন্মাত্রপর্বিক কলাবৃত্তে রচিত এ কবিতায় কবি লাইন ডিঙানো প্রবহমানতা এনেছেন।
 লাইনশেষে মিল তুলে দিয়ে মাঝেমাঝেই প্রচ্ছন্ন অন্তর্মিল এনেছেন। অবশ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য
 চোদ্দ লাইনের কবিতা হলেও একে গুণগত বা আঙ্গিকের বিচারে সনেট বলা ঠিক
 হবে না।

মিশ্রবৃত্ত মুক্তকে কবির দেশজ শব্দ ব্যবহারের একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে
 এবারে।—

(৩) নেকাব্বর জানে তাঁর সম্পত্তির হিসাব চাইতে আসবে না

কেউ কোনোদিন

এই জন্মে শুধু একবার চেয়েছিল একজন, ‘কি কইর্যা

পালবা আমারে;

তোমার কি আছে কিছু তেনা?’

সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে ফতিমাকে জড়িয়ে দু’হাতে বকে পিষে

বলেছিল নেকাব্বর

‘আছে আছে, লোহার চাক্কার মতো দুই আত,

গতরে আতীর বল—আর কিডা চাস মাগী।’

‘তুমি বুঝি খাবা কলাগাছ?’

আজ এই গোধূলিবেলায় প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা চোখে নিয়ে নেকাব্বর

সহসা তাকালো ফিরে সেই কলাবাগানের গাঢ় অন্ধকারে।

তিরিশ বছর পরে আজ বুঝি সত্য হলো ফাতেমার মিষ্টি উপহাস!

[ঐ, নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ]

পূর্বসূরীদের কিছু কিছু লাইন, চিত্রকল্প, ভাষা ও ছন্দ নির্মলেন্দু সচেতন ভাবেই,
 প্রয়োজনীয় সীকৃতিসহ অনেক সময় ব্যবহার করেছেন। যেমন ‘রামপ্রসাদের কাছে ক্ষমা
 প্রার্থনাপূর্বক’ দলবৃত্তে নিয়েছেন,—

(৪) ইতিহাস কি লিখবো মাগো

আমি তো আর শেষ জানিনা।

এই যে মহাকালের ধ্বজায়

রাজার কথা লিখছে প্রজায়

আমি সে ইতিহাস মানিনা।

রবীন্দ্র-ভাষাছন্দে লিখলেন,

(৫) ফুলে ফুলে ভুলে ভুলে মনে মনে কতবার

উড়ে উড়ে সুরে সুরে গাঁথি কতো মণিহার

বুদ্ধদেবের অনুবাদ-মেঘদূতের ভাষা-ছন্দ মনে রেখে লিখলেন,

(৬) শুভ্রমণিজাল মগজ মন্তনে জাগিল ফেনসম মদিরে,

আপন উরুযুগে ঝরিল পয়োধারা, আহা কি অমৃত অপচয়।

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দকে একসঙ্গে স্মরণ করে লিখলেন,

(৭) কি দেখো অমন ক'রে আমার ভিতরে?

আমি দেখি, আমি কি কেবলই দেখি? নীহারিকা

শুধু পটে লিখা তুমি কি কেবলই ছবি?

ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে—আমি তাই

চোখে চোখে ভালবাসা দেখি, ভাবি

বাচাল ছেলের মতো বেয়াদপ পংক্তিগুলো কি ক'রে যে

প্রতিদিন লজ্জাহীন নাচায় আমাকে।

[ঐ, সহবাস]

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কৌতূহলী পাঠককে কবির জন্মদিন স্মরণে, রবীন্দ্রনাথের ‘জন্মদিন’ কবিতাদর্শে লিখিত ‘সাতই আষাঢ়’ কবিতাটি পাঠ করতে অনুরোধ জানিয়ে, এবারে পরবর্তী কবি-প্রসঙ্গে চলে আসা যেতে পারে।

হেলাল হাফিজ

ইতিপূর্বে দেশজ লোকভাষায় কবিতা রচনা প্রয়াসের কিছু

দৃষ্টান্ত শামসুর রাহমান, শামসুল হক বা ওমর আলীর রচনা থেকে তুলেছি। আশির দশকের আর একজন কবি হেলাল হাফিজ নেত্রকোণা-অঞ্চলের কিছুটা অশ্লীলতা-দুষ্ট ভাষা কেমন সাবলীল ভাবে ব্যবহার করেছেন এখানে তার একটি নিদর্শন তোলা যেতে পারে।—

ভোলায়াভালায়া আর কথা দিয়া কতোদিন ঠগাইবেন মানুষ

ভাবছেন অহনো তাদের অয় নাই হুঁশ।

গোছায়া গাছায়া লন বেশিদিন পাইবেন না সময়

আলামত দেখতাছি মানুষের অইবোই জয়।

কলিমুদ্দিনের পোলা চিড়ি দিয়া জানাইছে,—‘ভাই

আইতাছি টাউন দেখতে একসাথে আমরা সবাই,

নগরের ধাপ্লাবাজ মানুষেরে কইও রেডি অইতে

বেদম মাইরের মুখে কতোক্ষণ পারবো দাঁড়াইতে।’

টিকেটঘরের ছাদে বিকালে দাঁড়ায়া যখন যা খুশি যারা কন

কোনোদিন খোঁজ লইছেন গ্রামের লোকের সোজামন

কী কী চায়, কতোখানি চায়

কয়দিন খায় আর কয়বেলা নাখায়া কাটায়।

রাইত অইলে অমুক ভবনে বেশ আনাগোনা, খুব কানাকানি,
আমিও গ্রামের পোলা চুতমারানি গাইল দিতে জানি।

[যে জলে আগুন জ্বলে, যার যেখানে জায়গা]

কবিতাটি চতুর্দশপদী; তবে ‘সনেট’ বলা চলে না। চার-চার-চার-দুই লাইনের সামিল স্তবকবন্ধে রচিত। ছন্দ: শিবিলবদ্ধ মিশ্রবৃত্ত। লাইনগুলি অসমান। দৈনন্দিন কথাবার্তায় গ্রাম্য মানুষের ব্যবহৃত ‘স্লাং’ (slang) শব্দ এ-কালের কবিরা সবসময় এড়িয়ে যেতে চাননা। হেলাল হাফিজও চাননি। তাঁর ‘যেজলে আগুন জ্বলে’ নামক ছোট কবিতার বইটি ১৯৮৬-তে প্রকাশিত হয়েছে।

রফিক আজাদ

রফিক আজাদ (১৯৫১) ‘সশস্ত্র সুন্দর’ নামে একটি ছোট

কবিতার বই ১৯৮২-তে প্রকাশ করেছেন। ঘুণে ধরা, কৃত্রিম মধ্যবিত্ত রুচিবোধকে তিনি ছন্দবদ্ধ চাবকের আঘাতে আহত করতে চেয়েছেন। মিশ্রবৃত্তে রচিত তার স্লাংশব্দ-মিশ্র একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

মানুষের কথা ও বক্তৃতা শোনার চেয়েও আমি
গভীর গভীরতর অর্থবহ শব্দ
শুনেছি তো গোরুদের কাছে,
গোরুদের ভাষা তবু বুঝি;
মানুষের হান্সা আমি কিছুতে বুঝিনা—
চুদির ভাইরা সব সদা-সর্বদাই
ঘোং ঘোং করতে ভালবাসে।...

[ঐ, অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন বেঙ্গলি]

নাসিমা সুলতানা

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই

মহিলা কবির সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তার মধ্যেও অবশ্য দু’চারজন প্রতিশ্রুতিবান, সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কবির রচনা পড়তে পড়তে চমক লাগে। নাসিমা সুলতানা তেমনি একজন সংস্কারমুক্ত কবি। তিনি মুখ্যতঃ গদ্য কবিতা লিখেছেন। একটি নিদর্শন তুলছি এখানে।—

যা কিছু পারোনি তুমি, দাওনি আমাকে

আমি তাই দেব অন্য কাউকে—তোমাকে দেব না।

ইচ্ছে হলে খালি পায়ে ঘুরে আসবো পৃথিবীর তাবৎ নিষিদ্ধ এলাকা
শহরের সবচাইতে নোংরা চায়ের দোকানে নিঃশেষ করে কয়েকটি পেয়ালা
সবচে উচ্ছল্লে যাওয়া ছোকরাদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে বেলল্লাপনা
ক্লিনশেভ ফুরফুরে তরুণদের ধড়-মুণ্ডগুলো চিবিয়ে চাবিয়ে
হাড়গোড় উচ্ছিষ্ট সব সাজিয়ে রাখবো ড্রেসিং টেবিলে

চন্দ্রাহত মানুষের মতো

শরীর গরম হয়ে উঠবে তোমার তরল আঙনের ফেনময় স্রোত

শিষ দিয়ে বেজে উঠবে শিরায় শিরায়

আর সেই তোলপাড় প্রবল দ্বৈরথ

উজ্জ্বল চাবির মত নিয়ে যেতে যেতে হরিৎ শীর্ষে

আমাকে পাবে না তুমি।

[মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া, যা কিছু পারোনি তুমি]

নাসিমা সুলতানার ‘মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া’ (মুক্তধারা, ঢাকা থেকে ১৯৮৫-তে প্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি কৌতূহলী কবিতাপ্রিয় পাঠকদের।

আর এক মহিলা কবি, জরিলা আখতারের ‘কালো ময়ূরের

জরিলা আখতার

ডাক’ (রূপম প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ১৯৮৬ তে প্রকাশিত) পড়বার

সুযোগ হল। জরিলা যেমন ছন্দে কবিতা লিখেছেন, তেমনি বেশ কিছু ভালো গদ্যকবিতাও লিখেছেন। এখানে তাঁর বেদনাধ্বজ একটি রোমান্টিক গদ্যকবিতা উদ্ধৃত করা গেল।—

পেখম মেলেছে বাতাস

হৃদয়ের বহতা নদীটি বাঁক নেবার মুহূর্তে

আলিঙ্গনাবদ্ধ যুবক-যুবতী পানসী ভাসাবে,

আর তীরের লোকালয় প্রেমের প্রশস্তি গাইতে গাইতে রাত্রি যাপন করবে,

ভোর হবে—ততোধিক বন্দনাগীতি রচনা করবে এক কবি।

কিন্তু ওই চোখে বুলে আছে কামার্ত বিশ্বের প্রতিচ্ছবি

আদিগন্ত চুসন-তৃষ্ণায় ওষ্ঠে জমেছে ক্রোধ—

যেন মাংস ছাড়া আর কোনো বস্তুতে রুচি নেই

যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো খেলায় আগ্রহ নেই।

তবু তৃতীয় বিশ্বের এক নির্বোধ কুমারী

আজও স্বপ্ন দেখে,

দেখে বহমান জল রাশি, তার তীর আবেগ

রাতের আঁধারে একটি রূপালি পাল ওড়ে

আলিঙ্গনের সূচারু পাল হয়ে;

অথচ ভোরের আলোয় নদীটি নেই।

[কালো ময়ূরের ডাক, নদীটি]

তসলিমা নাসরিন

আশির দশকের শেষদিকে তসলিমা নাসরিন (১৯৬২) নামে

আর এক মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নাম এখন সবার মুখে মুখে। ‘নির্বাচিত কলাম’ (১৯৯১) রিপোর্টাজ ধরনের চমক জাগানো গদ্য গ্রন্থটির জন্যে তিনি সম্প্রতি (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) আনন্দ পুরস্কার পেলেন। দুই বাংলা থেকেই

ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এবং গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এখন পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল: নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে (১৯৮৯), আমার কিছু যায় আসেনা (১৯৯০), অতলে অন্তরীণ (১৯৯১), বালিকার গোলাছুট (১৯৯২), নির্বাচিত নারী (১৯৯২), বেহলা একা ভাসিয়েছিলাম ভেলা (১৯৯৩)। কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলনও সম্প্রতি বেরিয়েছে।^৬

তসলিমা বাংলা মুখ্য তিন রীতির ছন্দই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গদ্যের মতো, কবিতাও বক্তব্যে অকুণ্ঠ, অগ্নিগর্ভ, নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের বর্বর অত্যাচারের নগ্ন প্রতিবাদী চিত্র সংবলিত। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি।—

(১) দলবৃত্তের আমেজমিশ্র পঞ্চকল-পর্বক কলাবৃত্ত (মিলবিহীন)

ভালোবাসা কি শূন্যে ওড়ে
হাত বাড়িয়ে ধরতে বলো?
নিজেকে সব অলীক থেকে
আলপটকা সরিয়ে নেবো,
মানুষই তো ভাঙতে পারে
এক সময়ে যত্নে গড়া
ভালোবাসার সাজানো ঘর।

[নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে, গোলাছুট]

(২) সাতমাত্রা পর্বে, কলাবৃত্তে (মিলবিহীন) লিখেছেন,

পেছনে কিছু নেই, পেছনে ফাঁকা ঘর, পেছনে খোলা মাঠ
পেছনে শূন্যতা, স্মৃতির তোরঙ্গে তিনশ' আরশোলা
পেছনে ভুলচুক, পেছনে খাল নালা, পতন নিশ্চিত
পেছনে ক্রন্দন, পেছনে কেউ নেই, অন্ধ হাঁটাইটি।

[অতলে অন্তরীণ, মাঝরাতের আলো]

কলাবৃত্তে কবি যম্মাত্রক পর্বও ব্যবহার করেছেন; মিশ্র ৪।৬।২-মাত্রক কবিতাও লিখেছেন। বাহল্যবোধে তার আর উদাহরণ তুলছি না। কৌতূহলী পাঠক তাঁর ‘অতলে অন্তরীণ’ কাব্যগ্রন্থের আন্তর্ভুক্ত ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতাটি পড়ে দেখতে পারেন।

মিশ্রবৃত্তে কবি বেশ কিছু ভালো কবিতা লিখেছেন। এখানে একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

(৩) আমিও মানুষ বটে

সামাজিক যাতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী শুধু

৬। সম্প্রতি ঢাকা থেকে ‘নির্বাসিতা নারীর কবিতা’ নামে আরও একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে বলে জানা গেল। গ্রন্থটি এখনো পড়বার সুযোগ পাইনি। তিনি এখন ইউরোপে স্বেচ্ছা নির্বাসিত।

দ্বিপদী চিড়িয়া নই, আমিও মানুষ।

আমিও মানুষ বটে

আমারও একলা রাতে বড় একা লাগে

জোসনার জলে স্নান সেরে থোকা থোকা কষ্ট পেড়ে আনি
ভালোবাসা আমাকেও বিষম কাঁদায়।

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা

আমার পৃথিবীটা এত জল পোষে, এত মাটি

আমি তবু তৃষ্ণার্তই থেকে যাই অধিক জীবন।

[নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে, শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা]

কবিতাটি মিলবিহীন মিশ্রবৃত্ত মুক্তক রীতিতে রচিত।

এবারে দলবৃত্তে লেখা একটি শ্লেষাত্মক অমিল মুক্তকের দৃষ্টান্ত তুলছি।—

(৪) মেয়ে রাখবে মেয়ে?

নানা রকম মেয়ে,

ফর্সা মেয়ে, লঙ্গা মেয়ে, হাঁটু অঙ্গি চুল

কোমর সরু, গায়ে গতরে মাংস আঁটসাঁট

তেল হবে না, নুন হবে না, ত্বকেও কোনো ভাঁজ পড়ে না দেখ।

নাকের ফুটো, কানের ফুটো, পরিপাকের ফুটো।

আঙুল টিপে পরখ করো অন্য ফুটো নেই

যৌনাঙ্গে হাত পড়েনি, জল পড়েনি, অনাস্রাত মেয়ে

মেয়ে রাখবে মেয়ে?

তিন প্রহরে ভালোমন্দ খাবার দিও মুখে

শাড়ি কাপড় গয়না দিও, গায়ে মাখার সাবান দিও ভালো।

চোখ তোলে না, স্বর ওঠে না, লজ্জাবতী মেয়ে

এক দুপুরে রাঁধতে জানে সপ্ত ব্যঞ্জন।

যেমন খুশি ব্যবহারের জিনিষ বটে নারী!

ইচ্ছে হলে পায়ে শিকল, হাতে শিকল, শিকল দিও মনে

ইচ্ছে হলে তালাক পারো তালাক দিও, তালাক বলে দিও।

[অতলে অন্তরীণ, নারী দ্রব্য]

এবারে নারীর প্রেম-স্বপ্নের আর্তি বিষয়ক একটি সাহসিক গদ্যকবিতা উদ্ধৃত করছি।—

শুয়ে থাকলে তোমাকে কেমন দেখা যায়
 অথবা ঘুমোলে
 তুমি স্বপ্ন দেখলে কেমন দেখা যায়
 স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে
 জেগে বাথরুমে গেলে, জগ থেকে এক গ্লাস
 জল ঢেলে খেলে
 গার্হস্থ্য জীবনে তোমাকে দেখিনি কখনো
 তোমাকে সেভ করলে কেমন,
 স্নান করলে কেমন, আবার গুণগুণ গান ধরলে?
 (সাধারণত স্নানের সময় তুমি
 রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি সিনেমার গান ধরতে বেশি ভালোবাসো!)
 তোমাকে সার্ট খুললে কেমন দেখায়,
 প্রশস্ত বুক কেউ চুলের অরণ্য খুলে
 একরাশ আদর ছোঁয়ালে কেমন দেখাবে,
 গভীর রাত্তিরে হঠাৎ জেগে উঠলে
 কেমন দেখাবে জেগে উঠে কোনো রমণীর নদীর মতো জলে,
 ঢেউয়ে বন্য ভালোবাসায় ডুবে গেলে।
 একদিন খুব দেখতে ইচ্ছে করে
 তোমার আঙুলের ছোঁয়া পেলে কেমন তিরতির কাঁপন লাগে
 নারীর শরীরে
 একবার বড় বেশি নারী হতে ইচ্ছে করে।

[নির্বাসিত বাহিরে অস্তরে, স্বপ্নের দালাল কোঠা]

‘কেমন’ শব্দটি কবি আটবার ব্যবহার করেছেন। একই অনুপ্রাস সমৃদ্ধ অসমাপিকা ক্রিয়া (যেমন, শুয়ে থাকলে, ঘুমোলে, স্বপ্ন দেখলে, জেগে উঠলে, গেলে, খেলে, সেভ করলে, স্নান করলে, গান ধরলে, সার্ট খুললে, আদর ছোঁয়ালে, ডুবে গেলে, ছোঁয়া পেলে) প্রায় প্রতি ছত্রই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তার ফলে কবিতাটি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তসলিমার বয়স এখন সবে ৩২ বছর। আশা করা যায়, এই ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প এবং হৃন্দবোধকে আশ্রয় করে তিনি ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন।

বাংলাদেশে আশি-নব্বই-এর দশকে আরও বেশ কিছু তরুণ, প্রতিশ্রুতিবান কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের রচনায় কিছু কিছু অভিনবত্বও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, আবুল হাসান (রাজা যায় রাজা আসে), রফিক আজাদ (সশস্ত্র সুন্দর), আবু হাসান শাহরিয়ার

(অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ), মুহম্মদ নুরুল হদা (শুক্লা শকুন্তলা), আসাদ চৌধুরী (জলের মধ্যে লেখা জোখা), অরুণাভ সরকার (কেউ কিছই জানেনা), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (ছোবল), শিহাব সরকার (জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে) প্রমুখ কবিবৃন্দ। স্বল্প পরিসর এ-নিবন্ধে তাঁদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত তোলা আর সম্ভবপর হল না।

উপসংহারে, সাম্প্রতিক চার দশকের বাংলাদেশী কাব্যছন্দে ও ভাষাভঙ্গীতে মুখ্য যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়েছে সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে।

এক। পূর্বসূরী কবিদের মতো এ-কালের অধিকাংশ প্রতিভাবান কবিও ছন্দমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কাব্যরচনার উপকরণ হিসেবে প্রেম, প্রকৃতি, আত্মসমীক্ষণ ছাড়াও পূর্ববাংলার দুটি যুগান্তকারী ঘটনা, অর্থাৎ ভাষা-আন্দোলন (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) এবং মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাঁরা সেই গভীর বেদনাস্বাদ অনুভূতি মুখ্যত ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন।

দুই। এই চার দশকের অধিকাংশ কবির রচনায় প্রচলিত বাংলা তিন ছন্দরীতির, অর্থাৎ কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত), মিশ্রবৃত্ত (অমরবৃত্ত) এবং দলবৃত্তের (স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ) স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গদ্য কবিতা রচনায়ও তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রে কবিরা মুক্তকের (সামিল ও মিলবিহীন) ব্যবহারে বেশি আকর্ষণ বোধ করতেন মনে হয়। নানা ভঙ্গির চতুর্দশপদী রচনার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

তিন। কবিরা অনেক সময় ধরাবাঁধা ছন্দসূত্র মেনে চলেননি। যেমন, অনেকেই চতুর্দল-পর্বিক দলবৃত্তে পঞ্চকল-পর্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অনেক সময় মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মধ্যে কলাবৃত্তের বিস্ত্রিষ্ট উচ্চারণ এনে ফেলেছেন। কখনো আবার গদ্যকবিতায় মিশ্রবৃত্তের আমেজ এনে ফেলেছেন। সেটা কখনো বা সচেতনভাবে করেছেন, কখনো আবার নিজেদের অগোচরে করেছেন। একথা এ-যুগের দুই বাংলার কবিদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই শৈথিল্য মধ্যযুগের সুরাশ্রয়ী বাংলা কবিতায় যথেষ্ট পরিমাণ ছিল; ১৯-২০ শতকের বহু কবির রচনাতেও ছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল বা তিরিশ-চল্লিশ দশকের কবিরাও এই শৈথিল্যকে অল্পস্বল্প প্রশ্রয় দিয়েছেন।

চার। অনুপ্রাস-মিল এবং পংক্তিসজ্জা নিয়ে একালের কবিরাও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সেগুলি যে সর্বদা সার্থক হয়েছে তা বলা চলে না।

পাঁচ। ধর্মীয় সমাজ ঘেষা শব্দ এবং স্ত্রীলতার গণ্ডি বহির্ভূত শব্দ এবং চিত্রাবলীর প্রয়োগে কোনও কোনও কবি যে প্রবণতা বা সাহসিকতা দেখিয়েছেন সেটা সর্বথা প্রশংসনীয় নয় ঠিকই, তবে তার ফলে কবি-ভাষার পরিসর যে অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে তা স্বীকার করতে হয়।

ছয়। একথা অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বীকার্য, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ প্রমুখ পূর্বসূরীরা বাংলা ছন্দের যে কাঠামো গড়ে দিয়ে গেছেন, এ-কালের

দুই বাংলারই অনুবর্তী কবিরা প্রধানত সেই চৌহদ্দির মধ্যেই সঞ্চরণ করেছেন। কেন্দ্রীয় ছন্দসূত্রগুলি অবলম্বন করেই, তার চারপাশে যতটা বিচরণ করা যায় তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তবে স্বীকার করতে হবে, এঁদের হাতে বাংলা কবিতার ভাব-ভাষা-আঙ্গিকগত কিছুটা ঋতুবদল অবশ্যই ঘটেছে।—এখনো ক্রমাগত ঘটে চলেছে। তাতে বাংলা কাব্যে দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাছন্দের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেকথা ভুললে চলবেনা।

আলোচনা-শেষে একটি বিনীত কৈফিয়ৎ। ইচ্ছা সত্ত্বেও বহু কবির প্রসঙ্গই এ-নিবন্ধে অনুল্লেখিত রয়ে গেল। তার একটি বড়ো কারণ, প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, প্রবন্ধের সীমিত পরিসর। ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটলে আলোচনাটি আরও কিছুটা পরিমার্জনার ইচ্ছা রইল।^৬

২৪-৪-১৯৯৪।

৬। প্রবন্ধটি রচনায় সাহায্য করেছেন ‘মহাদিগন্ত’ পত্রিকার সম্পাদক কবি উত্তম দাশ। এর প্রাথমিক খসড়াটি ১৯৯২-তে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিদেশিকা

(উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থ ও রচনা, তারকাচিহ্নের দ্বারা পাদটীকা নির্দেশিত হল।)

অক্ষয়কুমার বড়াল ২২-২৪, ৩৪, ১৯৯

ফার্সী রুবাই ২৪

মিশ্রবৃত্ত স্তবক ২৩

অজিত চক্রবর্তী ৯১-৯২

অজিত দত্ত ১৬৬, ১৮৭

চতুর্মাত্রক কলাবৃত্ত ১৬৬

‘অনুপূর্বা’ (যতীন্দ্রনাথ) ১২৫-২৮

অনুষ্ঠান ৬৭

অন্নদাশঙ্কর রায় ১১১, ১৫০-৫১, ১৬৮,

১৭৮, ১৯৯, ২০০

ক্লেরিহিউ ১৫০

লিমেরিক ১৫০-৫১

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫, ৭০,

৯৮-১০২, ১০৮

পালাগানের দলবৃত্ত ৯৮

সংলাপধর্মী ছন্দ ৯৯

গদ্য কবিতা ১০০

গদ্যের ছন্দস্পন্দ ১০০

নাটকের গদ্য-পদ্য মিশ্র সংলাপ ১০১

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ৬৮

অমিয় চক্রবর্তী ১১১, ১৪৪-৪৭, ১৬৬,

১৬৮, ১৮৫-১৮৭, ১৯২, ২০০,

২৪৫-৪৭

‘স্প্রাং রিদম’ ১৪৬, ১৪৭, ২০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৮৭, ১৮৮-৮৯,

১৯৪

অশোকবিজয় রাহা ১০২, ১৭০

আই. এ. রিচার্ডস ১১৩

‘Principles of Literary

Criticism’ ১১৩

‘আধুনিক কবিতা’ রফিকুল ইসলাম —

সংকলিত, ২০৬।*

‘আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়’ (দীপ্তি ত্রিপাঠী)

১৪৪, ১৫২

‘আধুনিক সাহিত্য’ (রবীন্দ্রনাথ) ৪৮-৪৯

আনন্দ বাগচী ১৮৭

আব্দুল কাদির ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯

প্রলম্বিত সনেট ১৬৫

‘আবোল তাবোল’ (সুকুমার রায়)

৯২-৯৪

আয়ামিক ৮৩

‘আর্যগাথা’ ১ম ২য় ভাগ

(দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৪-৪৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ ২২৬-২২৯

আরবী ছন্দ ১৬২-১৬৩

আল মাহমুদ ২২৩-২২৫

আলাউদ্দিন আল আজাদ ২২০-২২১

‘আলেখ্য’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৫৮-৬৪

‘আলোছায়া’ (কামিনী রায়) ২৭-২৯

আশরাফ সিদ্দিকী ২১৩-২১৭

‘আষাঢ়ে’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৫৮*

‘উড়কি ধানের মুড়কি’ (অন্নদাশঙ্কর) ১৫০

একদল চীনা ছন্দ ৮৪

এডওয়ার্ড লীয়ার (The Book of
Nonsense) ১৫০

এনাপেস্ট ৮৩

ওটাভারিমা (Ottava Rima) ৬৫

‘ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড’ (শেলী) ১৬৭*

‘ওড টু নাইটিঙ্গেল’ (কীটস) ৬৫

ওমর আলী ১৮৭, ১৯১-৯২, ১৯৪,
২২৫-২২৬

‘কঙ্কাবতী’ (বুদ্ধদেব) ১৫৬-৫৭

‘কড়ি ও কোমল’ (রবীন্দ্রনাথ) ১, ৩৭

‘কণিকা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

‘কথা ও কাহিনী’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

কবিতা সিংহ ১৮৭, ১৯০, ১৯৪

কবিরুল ইসলাম ১৮৭, ১৯২

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০, ১১৫,
১১৬, ১৬৭

‘কর্ণ-কুন্তী সংবাদ’ (রবীন্দ্রনাথ) ৪

কলাবৃত্ত ২-৪, ৪৫-৪৬, ১১৯-২১,
১২৯, ১৩১, ১৫৪-৫৬

কলাবৃত্ত-সংলাপ ৪৬

‘কল্লনা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১, ৩৫, ৩৭

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ১৯০, ১৯৪

‘কাব্যকুসুমাজ্জলি’ (মানকুমারী বসু) ২৪

কালিদাস রায় ১১০, ১১৬-১৭, ১৬৬

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ১৬০, ১৬১, ১৬৮

‘কিরাতার্জুন’ (নবীনচন্দ্র দাস) ৯

কীটস ৬৫, ১২১

কীটসের স্তবক ১২১

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১১০, ১১৬, ১৬৭

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৯৯

‘কেডস্ ও স্যাণ্ডাল’ (সজনীকান্ত)

১৩৮-৩৯

কেতকী কুশারী ডাইসন ১৮৭, ১৯০, ১৯৪

‘ক্রেসিডা’ (বিষ্ণু দে) ১৭৪

ক্লেরিহিউ ১৫০

ক্ষেমেন্দ্র ৯

‘খাপছাড়া’ (রবীন্দ্রনাথ) ২, ১১০, ১১৩

গদ্য কবিতার ছন্দ ১১৩, ১১৫

‘গান্ধারীর আবেদন’ (রবীন্দ্রনাথ) ৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮, ৬৮, ৬৯, ১১০,
১৯৫-৯৮

গৈরিশ মুক্তক ৬, ৭

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৮, ১১, ২২, ৩৪

‘গীতালি’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৫, ৩৭, ৪০

গীতাঞ্জলি (রবীন্দ্রনাথ) ৩৫, ৪০

‘গীতিমালা’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৫, ৪০

গুজরাটি অঁজনী ছন্দ ৮৪-৮৫

গোপাল ভৌমিক ১৮৭

গোবিন্দচন্দ্র দাস ৮, ১০-১২, ৩৪

দলবৃত্ত বাকধর্মী প্রকাশ ১১

সনেট ১২

স্তবক বৈচিত্র্য ১১

গোলাম মোস্তাফা ১৬১-৬৩, ১৬৯, ২০০

গৌড়ী গায়ত্রী ৭৮, ৮০

গ্রীক বেদীভূমক (Bumos) ছন্দ ৮৬

‘ছোড়সওয়ার’ (বিষ্ণু দে) ১৭৪

চর্যাগীতি ১৯৫

‘চারুচর্যাশতক’ (ক্ষেমেন্দ্র) ৯

‘চিত্রা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

‘চিত্রাঙ্গদা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

চীনা ছন্দ ৮৪

‘চৈতালি’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

‘ছড়া’ (রবীন্দ্রনাথ) ১১৩

‘ছড়ার ছবি’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৪, ১১০, ১১৩

‘ছন্দ’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৯*

‘ছন্দ চতুর্দশী’ (মোহিতলাল) ১২৩-২৪

‘ছন্দ সরস্বতী’ (সত্যেন্দ্রনাথ) ৩৫, ২০২

ছন্দ হিল্লোল ৮৯

ছন্দের ছবি ৮৬-৮৭

‘ছন্দোক্তরু রবীন্দ্রনাথ’ (প্রবোধচন্দ্র) ১

‘ছন্দোমঞ্জরী’ (গঙ্গাদাস) ১৮, ৭১-৭২, ৭৭-৭৮, ১৩৪-৩৫

জগন্নাথ চক্রবর্তী ১৮৭, ১৯২

জয়দেব ১৯৫

জরিনা আখতার ২৩৬

জসীম উদদীন ১৬৩-৬৪, ১৬৯, ২৩০

জাপানী তানকা সপ্তক ৮৩

জাপানী হাইকু ১৯০

জিয়া হায়দার ২২৯-২৩০

জীবনানন্দ দাশ ১১১, ১৩৫-৩৮,

১৬৬-৬৭, ১৮৫, ২০০

ব্যালাড স্তবক ১৩৬

তেজরিমা ১৩৬

সনেট ১৩৭

মুক্তক ১৩৮

স্পেনসেরীয় স্তবক ১৩৬

‘বনলতা সেন’ ১৩৭

‘রূপসী বাংলা’ ১৩৭*

জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স ১৪৪-৪৭

স্প্রাং রিদম ১৪৬-৪৭

জ্যোতিবিন্দু মৈত্র ১৭৯-৮১

টেনিসন ১২০

ট্রিয়োলেট ৯৫-৯৬

ট্রোকে (Trochee) ৫৫*, ৮২

তসলিমা নাসরিন ২৩৬-২৩৯

তারাপদ রায় ১৮৭

‘তারাবাদি’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৪

তিন মাত্রার চলন ১০৫

তেজরিমা ১২০, ১৩৬

তোটক ৭১, ৭৮, ৭৯, ১৩৪

‘ত্রিবেণী’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৪, ৬৪-৬৬

দলবৃত্ত ১৯, ৫৪-৫৬, ৫৭-৬৭,

৯০-৯১, ১০৪, ১০৬, ১১২, ১৩২

দলবৃত্ত মুক্তক ১১২

দশ পংক্তিক স্তবক ৫০

দশপদী বা দশপংক্তিক কবিতা ৬৫-৬৬

‘দশাননবধ কাব্য’ (হরগোবিন্দ) ৭৪-৭৫

দান্তে (ডিভাইনা কমেডিয়া) ৯৭

দাশরথি রায় ৫৭

‘দি ব্যালাড অফ ওরিয়ানা’ (টেনিসন) ১৫৬

দিলীপকুমার রায় ৮১, ১১১, ১৫৮-৬০,

১৬৮, ১৮৭, ২০০

দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৪৪, ১৪৭

‘আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়’

১৪৪, ১৪৭*

দেবেন্দ্রনাথ সেন ৮, ১৫-১৯, ৩৪, ১৯৯

অন্যান্য ছন্দোবন্ধ ১৭-১৮

দলবৃত্ত পয়ার ১৯

মিশ্রবৃত্ত ১৮

সংস্কৃত ছন্দ ১৮

সনেট ১৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১, ৩৫, ৩৮, ৪১-৭২,
৯৪, ১০৭, ১১১, ১৯৮-২০০

অনুষ্ঠান ৬৭

‘আর্যগাথা’ ১ম, ২য়, ৪৪-৪৭

‘আষাঢ়ে’ ৪৪

‘আলেখ্য’ ৪০-৪৪, ৫৮-৬৪

ওটাভারিমা ৬৫

কলাবৃত্ত (প্রবহমান) ৪৫-৪৬

কাব্যগ্রন্থসমূহ ৪৪

ট্রোকে ছন্দ ৫৫*

‘ত্রিবেণী’ ৬৪-৬৬

দশ পংক্তিক স্তবক ৫০

দশপদী ৬৫-৬৬

দ্বিজেন্দ্র মুক্তক ৪৬-৪৭

পজঝটিকা ৬৭

‘মন্দ’ ৪১, ৪৭

মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ৪৬-৪৭

রাইম রয়াল ৬৫

লৌকিক দলবৃত্ত ৫৪-৫৬

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ৫৭-৬৭

‘সীতা’ ৪৪

স্পেনসেরীয় স্ট্যাঞ্জা ৫০*

‘হাসির গান’ ৪৪, ৫৪-৫৫

‘দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার’
(রবীন্দ্রনাথ রায়) ৬৮

নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী ৩২

নজরুল ইসলাম ১১০, ১২৯-৩৫,
১৬৭, ২০০

আরবী মোতাকাবিব ছন্দ ১৩০

কলাবৃত্তে উচ্চারণ-সঙ্কোচন ১৩১

কলাবৃত্তে লঘুদলে গুরু উচ্চারণ

১২৯, ১৩১

‘বিদ্রোহী’র কলাবৃত্ত ১২৯

মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ার ১৩১-৩২

লৌকিক দলবৃত্ত ১৩২

সংস্কৃত ছন্দ ১৩৪-৩৫

সপ্তমাত্রক কলাবৃত্তে কোমলতা ১৩৩

নলিনীকান্ত সরকার ১৩৯

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০২-০৩, ১০৯

নবনীতা দেবসেন ১৯০, ১৯৪

নবীনচন্দ্র দাস ৮, ৯, ৩৪, ১৮৭

নবীনচন্দ্র সেন ৫১, ১৯৯

নরেশ গুহ ১৮৭

নাসিমা সুলতানা ২৩৫-২৩৬

নিত্যকৃষ্ণ বসু ৮, ৩০, ৩৪

নির্মলেন্দু গুণ ১৯২, ২৩১-২৩৪

নিশিকান্ত ১৭০, ১৮৭, ২০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৭০, ১৮২, ১৮৩,
১৮৭

পংক্তি-অনুচ্ছেদ ১৬

পজঝটিকা ৬৭

পঞ্চচামর ৭৭-৭৮

‘পদচারণ’ (প্রমথ চৌধুরী) ৯৬-৯৭

‘পত্রপুট’ (রবীন্দ্রনাথ) ১১০*

‘পলাতক’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৫, ১১০*,

১১১

‘পরিশেষ’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৭, ১১০*

‘পুনশ্চ’ (রবীন্দ্রনাথ) ১১০* ১৭৪*

‘পূর্ববাংলার কবিতা’,

মিহির আচার্য-সম্পাদিত, ২০৬*

‘পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা’,

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, ২০৬*

পেত্রার্কী (সেনেট) ৩৬

প্যাটার্ণ পোয়েট্রি ৮৫-৮৬

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ১৫৪, ১৫৫, ২০০

প্রফুল্ল সরকার ১৮৩

প্রবহমান পয়ার ৪-৬

প্রবোধচন্দ্র সেন ১, ৪, ৫৯-৬০, ১৫৪

প্রমথ চৌধুরী ৩৫, ৪২, ৭০, ৯৪-৯৮,

১০৮, ১৯৯, ২০০

ট্রিয়োল্ট ৯৬-৯৭

তেজরিমা ৯৬-৯৭, ১২০

‘পদচারণ’ ৯৬-৯৭

বীরবলী সনেট ৯৫

‘সনেট পঞ্চাশৎ’ ৯৫

প্রমথনাথ বিশী ১৬৪-৬৫, ১৬৯

প্রমীলা নাগ ৮, ৩১, ৩৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৪৭-৪৯, ১১১, ১৬৮,

১৮৫, ১৮৭, ১৯২, ১৯৯

ফার্সী রুবাই ১১৯

‘ফুলশর’ (বিজয়চন্দ্র) ৭২

ফেমিনি রাইম ৭১

ফ্রি ভার্স (ভার্স লাইবার) ১৪৫

‘বনবাণী’ (রবীন্দ্রনাথ) ১১০*

‘বনলতা সেন’ (জীবনানন্দ) ১৩৭

বলদেব পালিত ১৯৯

বলপ্রসন্ন ৫৮-৫৯

‘বলাকা’ (রবীন্দ্রনাথ) ৩৫, ৪০-৪১, ১১১

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ৩১-৩২, ৩৪

‘বাংলা কবিতার ছন্দ’ (মোহিতলাল) ৮৫

‘বাংলাদেশের কবিতা এক স্তবক’,

বিষ্ণু দে-সম্পাদিত, ২০৬*

‘বাংলাদেশের কবিতা’,

দাউদ হায়দার-সম্পাদিত, ২০৬*

বাকধর্মী প্রবহমান পয়ার ৪৯

‘বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ’

(অশোকবিজয় রাহা) ১০২

বায়রণ (ডনজুয়ান) ১৬৪

বিচিগ্রাব ২০২

‘বিচিগ্রিতা’ (রবীন্দ্রনাথ) ১১০*

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৫, ৪২, ৭০-৭৩,

৭৭, ১০৮, ২০০

বিজয়া (দাশগুপ্ত) মুখোপাধ্যায় ১৮৭,

১৯০-৯১, ১৯৪

‘বিদায় অভিশাপ’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

বিদেশী ছন্দ ৮১-৮৪

বিদ্যুন্মাল ৭৯

বিনয়কুমারী ধর ৩২

বিনুনী মিল ১২০

বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৮১

বিশ্বজিত গুপ্ত ১৮৪

বিষ্ণু দে ১৬৬, ১৭০-৭৬, ১৮৫,

১৮৭, ২০০

‘ক্রেসিডা’ ১৭৪

গদ্য কবিতা ১৭৫

‘ঘোড় সওয়ার’ ১৭৪

ট্রিয়োল্ট ১৭২

ব্যালাদ ১৭১-৭২

ভিলানেল ১৭১

সনেট ১৭২

সেসটিনা ১৭১

‘বিসর্জন’ (রবীন্দ্রনাথ) ১

বিসম চলনের ছন্দ ৩৯

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭, ১৯২, ১৯১,

২০০

বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৯৯

বীরবলী সনেট (ফারাসী সনেট) ৯৫

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮২

‘বুক অব ননসেন্স’ (এডওয়ার্ড লীয়ার) ১৫০

বুদ্ধদেব বসু ১১১, ১১৫, ১৫১-৫৮,

১৬৬, ১৬৮, ১৮৫, ১৮৭, ১৯২,

১৯৯-২০০

কলাবৃত্ত ১৫৪-৫৬
 কলাবৃত্ত মুক্তক ১৫৬
 গদ্যকবিতা অন্তর্লীন মিল ১৫৮
 চলিত ভাষাভঙ্গি ১৫২
 ছড়ার ছন্দ ১৫৭
 দলবৃত্তের মৌখিক ভাষাভঙ্গি ১৫৭
 মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ১৫৩
 ‘মেঘদূত’ অনুবাদের ছন্দ ১৫৪
 সনেট দলবৃত্ত ১৫২-৫৩
 সনেট মিশ্রবৃত্ত ১৫৩
 বোদালেয়ার ১২০
 ব্যালাড ১৭১-৭২
 ব্যালাড স্তবক ১৭২
 ব্রাউনিং ৯৬

‘ভাব ও ছন্দ’ (সজনীকান্ত) ১৩৮

ভারতচন্দ্র ১০, ৭৭, ১৯৯-২০০
 ‘ভারতী’ পত্রিকা ২০২
 ভার্স-প্যারাগ্রাফ ১৬
 ভার্স লাইবার ১৪৫-৪৭
 ভিক্টর হুগো ৮৬*
 ভৃঙ্গধর রায় চৌধুরী ৩২

মণীন্দ্র রায় ১৮৭

মধুসূদন দত্ত ৪, ১০, ৯৪, ১১০,
 ১৯৫-৯৭, ২০০
 ‘মন্দ্র’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৪, ৪৮
 মন্দাক্রান্ত ১৮, ৭২, ৭৭-৭৮
 ময়হারুল ইসলাম ২২১-২২২
 মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৮৭
 মানকুমারী বসু ৮, ২৪-২৬, ৩৪
 ‘মানসী’ (রবীন্দ্রনাথ) ১-৮
 ‘মালার্মে’ ১৪০
 ‘মালিনী’ (রবীন্দ্রনাথ) ৭৭, ৭৮

মিলটন ১৫, ৬৮
 মিশ্রবৃত্ত মুক্তক (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৬-৪৭
 মিশ্রবৃত্ত মুক্তক (রবীন্দ্রনাথ) ৭
 মুক্তক ৪০-৪২, ৪৮
 ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (দল মাত্রক পরীক্ষা) ৬৩
 মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় ৩২
 মোতাকারিব ছন্দ ৮৩, ১৩০, ১৬৩
 মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৮৭
 মোহিতলাল মজুমদার ৮৫, ১১১,
 ১১৮-২৪, ১৬৭, ১৯৯
 কলাবৃত্ত ১১৯-২৫
 কীটস-এর স্তবকাদর্শ ১২১
 ‘ছন্দ চতুর্দশী’ ১২৩-২৪
 তেজরিমা ১২০
 ফার্সি রুবাই ১১৯
 বিনুনি মিল (বোদালেয়ের আদর্শে)
 ১২০
 ব্যালাদে ডবল রিফ্রাইন ১২২
 সনেট ১২২-২৩
 সুইনবার্ণের কবিতা স্তবক ১২২
 ‘সুনির্বাচিত কবিতা’ ১১৮-১৯, ১২৩
 স্পেনসেরীয় স্তবক ১২১
 ‘স্বপনপসারী’ ১৬, ১১৯
 ‘স্মরণরল’ ১৬, ১১৯
 ‘হেমন্ত গোখলী’ ১১৯-২০

‘যজ্ঞভস্ম’ (বিজয়চন্দ্র মজুমদার) ৭১

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১১০, ১২৪-২৮,
 ১৬৭
 যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১০৫, ১০৬, ১০৯
 যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১০

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫, ১৯৬

রজনীকান্ত সেন ১০৩, ১০৪, ১৯১
 রঘুবংশ (নবীনচন্দ্র দাস) ৯

রত্নেশ্বর হাজারা ১৮৭
 রথীন্দ্রনাথ রায় ('দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও
 নাট্যকার') ৬৮
 রফিক আজাদ ২৩৫
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১-৮, ৩৫-৪২,
 ১১০-১৫, ১৯৮, ২০০
 'অস্ত্যপর্ব' ১১০-১৫
 অসম চলনের ছন্দ ৩৯
 'আকাশ প্রদীপ' ১১০*
 আদিপর্ব ১-৮
 'আরোগ্য' ৩৭, ১১০*
 'উৎসর্গ' ৩৫, ৩৭, ৩৯
 'উবশী' ('চিত্রা') ১৮
 এক কবিতায় একাধিক ছন্দরীতি ১১৩
 'কড়ি ও কোমল' ১, ১৭, ৩৭
 'কণিকা' ১
 'কথা ও কাহিনী' ১, ৮, ৯
 'কর্ণকুস্তি সংবাদ' ৪
 কলাবৃত্ত ২-৩
 'কল্পনা' ১, ৩৫, ৩৭
 'ক্ষণিকা' ৩৫
 'খাপছাড়া' ১১০*, ১১৩
 'খেয়া' ৩৫
 গদ্য কবিতার ছন্দ ১১৩, ১১৫
 গভীর ভাবের কবিতার দলবৃত্ত ৮
 'গান্ধারীর আবেদন' ৪
 'গীতাঞ্জলি' ৩৫, ৪০
 'গীতালি' ৩৫, ৩৭, ৪০ /
 'গীতিমাল্য' ৩৫, ৪০
 'চিত্রা' ১, ৮, ৩৭
 'চিত্রাঙ্গদা', ১, ৪
 'চৈতালি' ১, ৮, ৩৭
 'ছড়া' ১১৩
 'ছাঁড়ার ছবি' ৩৭, ১১০*, ১১৩

'ছন্দ' ৬৩
 'জন্মদিনে' ১১০*
 দলবৃত্ত মুক্তক ১১২
 দলবৃত্তের প্রকাশ-বৈচিত্র্য ৩৬, ১১২
 দূরান্তি মিল ১১২-১৩
 'নব-জাতক' ১১০*
 'নৈবেদ্য' ৩৬, ৩৭
 'পত্রপুট' ১১০*
 'পরিশেষ' ৩৭, ১১০*
 'পলাতক' ৩৫, ১১০*, ১১১
 'পুনশ্চ' ১১০*, ১১১, ১১২
 'পূরবী' ১১০* ১৭৪*
 পেন্তার্ক্যা (অনুবাদ) ৩৭
 প্রবহমান পয়ার :
 মধুসূদনের সঙ্গে পার্থক্য ৪-৫
 'প্রহাসিনী' ১১০*
 'প্রাস্তিক' ৩৭, ১১০*
 'বনবাণী' ১১০*
 'বলাকা' ৩৫, ৪০-৪১, ১১১
 বলাকার মুক্তক ৪০-৪১
 'বিচিত্রিতা' ১১০*
 'বিদায় অভিসাপ' ১, ৪
 'বিসম চলনের ছন্দ ৩৯
 'বিসর্জন' ১, ৪
 'বীথিকা' ১১০*
 মধ্যপর্ব ৩৬-৪২
 'মহুয়া' ৩৭, ১১০*
 'মানসী', ১-৮, ৩৭, ৪০
 'মালিনী' ১, ৪
 মিশ্রবৃত্ত মুক্তক (গৈবিশ
 মুক্তকের সঙ্গে পার্থক্য) ৬-৭
 মুক্তক (দলবৃত্ত) ৪১-৪২, ১১২
 মুক্তক (মিশ্রবৃত্ত) ৪০, ১১৩
 'রাজা ও রানী' ৪

‘রোগশয্যায়’ ১১০*

‘লিপিকা’ ১১০*

‘লেখন’ ১১০*

শিখিল মিশ্রীতির ছন্দ ৩৮

‘শিশু’ ৩৫, ৩৭, ৩৮

শিশুপাঠ্য কবিতার ছন্দ ১১৩

‘শিশু ভোলানাথ’ ১১০*, ১১৩

‘শেষ লেখা’ ১১০*

‘শেষ সপ্তক’ ১১০*

‘শ্যামলী’ ১১০*

সংলাপে মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ার ৪

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত মূলক

১১১-১২

সনেট ৭, ৩৬-৩৭

সনেটের পূর্ণ তালিকা ৩৭*

সমচলনের ছন্দ ৩৯

‘সানাই’ ১১০*, ১১২, ১৭৪*

‘সেঁজুতি’ ৩৭* ১১০*, ১১২

‘সোনার তরী’ ১, ৪, ৩৭

স্তবক গঠনে বৈচিত্র্য ৭

‘স্মরণ’ ৩৫, ৩৭

রমণীমোহন ঘোষ ৩২, ৩৪

রসেটি ৬৫

রাইম রয়াল ৬৫

রাজকৃষ্ণ রায় ১৯৭-৯৮

‘রাবণবধ’ (গিরিশচন্দ্র) ৬*

রুচিরা ৭৭, ৭৯

‘রূপসী বাংলা’ (জীবনানন্দ) ১৩৭

লঘু-গুরু ছন্দ ১৫৯-৬০

লিমেরিক ১৫১

লৌকিক দলবৃত্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৫৪

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৮৭, ১৮৯,
১৯২-৯৪

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৪

শঙ্খ ঘোষ ১৮৭-৮৮, ১৯৩-৯৪, ১৯৯

শামসুর রাহমান ১৮৭, ১৯২-৩, ১৯৯,
২০৬-২১৩

শাদুল বিক্রীড়িত ৭৮, ৭৯, ১৩৪

শাহাদাৎ হোসেন ১৬১, ১৬৮

‘শিশুপালবধ’ (নবীনচন্দ্র দাস) ৯

শেকসপীয়র ১৫, ৬৮

শেকসপীয়রের সনেট ১২৪

শেলী ১৩৭*

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ৫৭-৬৭, ১০৫

সংস্কৃত ছন্দ ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৪,
৭৭-৮০, ১৩৪-৩৫, ১৯৯

অনঙ্গশেখর ১৩৫

অনুষ্ঠান ৬৭, ৮০*

উপেন্দ্রবজ্রা ৭৪

গৌড়ী-গায়ত্রী ৭৮, ৮০

চণ্ডবৃষ্টি ৮০*

ছালিকা ৮০*

তোটক ৭১, ৭৮, ৭৯, ১৩৪

পজঝটিকা ৬৭

পঞ্চচামর ৭৭, ৭৮

বসন্ততিলক ৭২

বিদ্যাম্বালা ৭৯

মন্দাক্রান্ত ৭২, ৭৭, ৭৮

মালিনী ৭৭, ৭৮

রুচিরা ৭৭, ৭৯

শাদুল বিক্রীড়িত ৭৮, ৭৯, ১৩৪

সিংহবিক্রীড় ১৩৫

সজ্ঞনীকান্ত দাস ১১১, ১৩৮-৩৯, ১৬৮

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৫, ৪২, ৭৫-৯২,
 ১০৬, ১০৮, ১১০, ১৯৯-২০০,
 ২০২-০৪
 ‘অন্ন-আবীর’ ৭৬
 ইয়ং লকিনভারের ছন্দ (স্কট) ৮২
 ‘কাব্যসঞ্চয়ন’ ৭৬
 ‘কুহ ও কেকা’ ৭৬
 ‘তীর্থরেণু’ ৭৬
 ‘তুলির লিখন’ ৭৬
 ‘ফুলের ফসল’ ৭৬
 ‘বিদায় আরতি’ ৭৬
 ‘বেণু ও বীণা’ ৭৬
 ‘বেলাশেষের গান’ ৭৬
 সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ৭৬-৮১
 ‘সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা ৭৬
 ‘সঙ্ক্ষিপ্ত’ ৭৬
 ‘হসন্তিকা’ ৭৬
 ‘হোমশিখা’ ৭৬

সনেট ৭, ১২, ৩৬-৩৭, ১২০, ১৩৭,
 ১৪২, ১৫২-৫৩, ১৮০
 পেত্রার্কীয় সনেট ১২৩
 শেকসপীয়রীয় সনেট ১২৪
 সমর সেন ১১৫, ১৬৬, ১৭০,
 ১৭৯, ১৮৬-
 সরোজকুমারী দেবী ৩২, ৩৪
 সিকান্দার আবজাফর ১৮১
 সিলেবিক ছন্দ ৬০
 সুইনবার্ণ ১২২
 সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৭০
 সুকুমার রায় ৩৫-৩৬, ৪২, ৭০,
 ৯২-৯৪, ১০৮, ১১০
 আবোল তাবোল ৯২-৯৪
 কলাবৃত্ত ৯৩
 দলবৃত্ত ৯৪
 সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১১১, ১৪০-৪৩, ১৬৮,
 ১৮৫, ১৯৯-২০০
 সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭, ১৯৩
 সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১৭০
 সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৬৬, ১৭০,
 ১৭৬-৭৯, ১৮৫, ১৮৭,
 ১৯২, ১৯৯
 সেবাব্রত চৌধুরী ১৮৭, ১৯২
 সেরিনাদ ১৫৬
 সেসটিনা ১৭২
 সৈয়দ শামসুল হক ২১৬-২২০
 ‘স্কলার জিপসী’ (ম্যাথু আর্নোল্ড) ৬৫
 স্পেনসরীয় স্ববক ৬৫, ১২১, ১৩৬
 স্প্রাং রিদম ১০২, ১৪৩-৪৬,
 ২০০
 স্বদেশরঞ্জন দত্ত ১৮৭
 স্বর্ণকুমারী দেবী ১২-১৫, ৩৪

ইপিকিনস ১০২

হরগোবিন্দ লক্ষ্মীর চৌধুরী ৭৪-৭৫, ৭৭,
 ১০৮, ২০০
 উপেন্দ্রবজ্রা ৭৪
 ‘দশাননবধ কাব্য’ ৭৪-৭৫
 সংস্কৃত ছন্দ ৭৪-৭৫
 হরপ্রসাদ মিত্র ১৭০, ১৮১, ১৮৭
 হরিশচন্দ্র নিয়োগী ৩২
 হায়াৎ মামুদ ২৩০-২৩১
 হার্বার্ট রীড ১৪৪
 ‘হাসির গান’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) ৪৪,
 ৫৪-৫৫
 হিরন্ময়ী দেবী ৩২
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, ৭৭,
 ১৯৫, ১৯৯
 ‘হোয়ালি’ (বিজয়চন্দ্র) ৭৪
 হেলাল হাফিজ ২৩৪-২৩৫